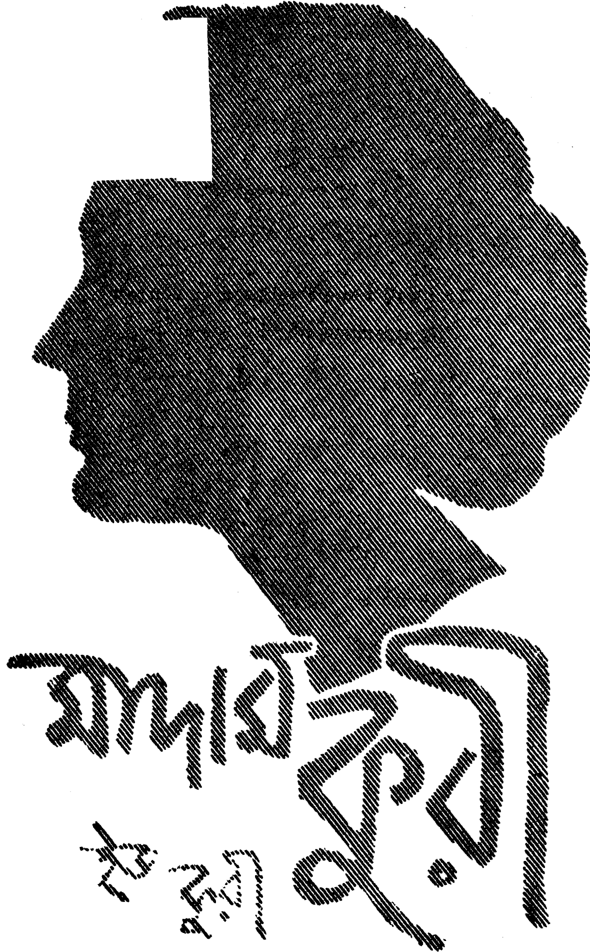


অনুবাদ : কল্পনা রায়

ভূমিকা : জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব : কলিকাতা—১২

Madame Curie

by her daughter

Eve Curie

Translated and Published in Bengali
by arrangement with the author

প্রথম বাংলা সংস্করণ—১৯৬২

প্রচ্ছদপট ও নামপত্র : সত্যজিৎ রায়

প্রকাশক : র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, ৬ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২
মুদ্রক : আর চ্যাটার্জি, নিউ প্রিণ্ট হাউস, কলিকাতা-৯

॥ উৎসর্গ ॥

কর্মক্ষেত্রে যাঁর নিরলস সেবা ও নিঃস্বার্থ পরিশ্রম আমার জীবনের আদর্শস্বরূপ, সেই পরমারাধ্যা মাতৃদেবীর উদ্দেশে

নিবেদন

যাঁদের সহৃদয় সহযোগিতা ভিন্ন এই অতুলনীয় জীবনকাহিনী প্রকাশ করা অসম্ভব হতো, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় শ্রীপ্রসাদ রায়, শ্রীসুব্রত সেনগুপ্ত ও শ্রীবিমল মিত্রের নাম। এঁদের আন্তরিক সহায়তা এই বইকে প্রকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম করেছে। বিদেশী শব্দের দুরূহ উচ্চারণকে বাঙলায় সহনীয় ক'রে তুলতে সাহায্য করেছেন শ্রদ্ধেয় ফাদার ফ্যালোঁ, মৌলানা খাফী খান, শ্রীপাহাড়ী সান্যাল ও শ্রীরামচন্দ্র রায়। জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু এই অনন্যসাধারণ জীবনীর ভূমিকা রচনা দ্বারা বইখানিকে সমৃদ্ধতর করেছেন। স্বভাব-শিল্পী শ্রীসত্যজিৎ রায় প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা দ্বারা বইখানির শ্রীবৃদ্ধি করতে সহায়তা করেছেন। এঁরা আমার ধন্যবাদার্হ।

কল্পনা রায়

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

বাঙলা অনুবাদের ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে, অদ্ভুত একটি বোমার বিস্ফোরণে জাপানের হিরোশিমা সহর প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আবার ২।৪ দিন বাদে একই রকম আক্রমণের ফলে নাগাসাকী সহরের অসংখ্য নিরীহ লোক প্রাণ হারালে। এইভাবে বিশ্বমানবের মনে মহাপ্রলয়ের বিভীষিকা জাগিয়ে নতুন পারমাণবিক যুগের সূচনা হয়েছে। তারপর থেকে পরীক্ষাচ্ছলে এই ধরনের বিস্ফোরণ হয় নানা স্থানে—তার কথা প্রায়ই খবরের কাগজে ছাপা হয়। এরই ফলে তেজস্ক্রিয় ধূলিকণা পৃথিবীর আকাশে-বাতাসে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। বহুদিন বেপরোয়া এই ভাবের পরীক্ষা চালালে অবাঞ্ছিত জঞ্জাল জড় হয়ে তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে পৃথিবীতে প্রাণশক্তির স্বচ্ছন্দ বিকাশের অন্তরায় ঘটাবে—এই ধরনের কথা সাধারণ লোকের মুখেও মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে আমাদের দেশে—ও এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে শোভাযাত্রাও বেরোচ্ছে মাঝে মাঝে।

যে তেজস্ক্রিয়তার গুণাগুণ আজ এইভাবে সাধারণজনের আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, ৬০।৬২ বৎসর আগে কিন্তু লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানীমহলেও এর খবর অজানা ছিল! আবিষ্কারের ধারা শুরু হলো ফরাসী বিজ্ঞানী বেকেরেলের এক সমীক্ষা থেকে। অন্ধকার বাক্সের মধ্যেও ইউরেনিয়ম ঘটিত যৌগিক-পদার্থগুলি কাল কাগজে মোড়া ফটো-ফলকের উপর কোন অজ্ঞাত উপায়ে পরিবর্তন ঘটাতে পারে। সম্ভবতঃ কোন অজানা রশ্মির প্রভাবে এটি হচ্ছে মনে হলো—কারণ কাল কাগজ তাকে প্রতিরোধ না করলেও পাতলা ধাতুর চাক্‌তি সে-রশ্মিকে আটকায়; ফলকটিকে বের করে ছবি উঠাবার জানা প্রক্রিয়ার মধ্যে ফেললে দেখা যায় ধাতুর চাক্‌তিগুলির ছাপ পড়ে গিয়েছে ওই ফলকের উপর।

বেকেরেলের এই নিরীক্ষার মধ্যে যে রহস্যের ইঙ্গিত ছিল, তার মর্ম পরিস্ফুট করতে বদ্ধপরিকর হলেন কুরী দম্পতী—অজ্ঞাতকুলশীল এক যুবতী অনুসন্ধানী ও তাঁর যশস্বী অথচ নিরভিমান আত্মভোলা স্বামী পিয়ের কুরী। তাঁদের বহুবৎসরের পরিশ্রমের ফলে রেডিয়ম ও পলোনিয়মের আবিষ্কার হলো। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীদের চোখের সামনে খুলে গেল নতুন এক জগৎ। তেজস্ক্রিয়তার প্রথম প্রকাশ হলো ও শুরু হলো পদার্থবিজ্ঞানের নতুন এক অধ্যায়ের রচনা।

এই বৈজ্ঞানিকী ইতিকথা উপন্যাসের মতোই মনমাতান ও রোমাঞ্চকর। যুগের আলোক তখনো কুরী দম্পতিকে উদ্ভাসিত ক'রে বিশ্বের সামনে প্রকাশ করে নি। তাঁরা নিজেদের যথাসর্বস্ব এই কাজে ব্যয় ক'রে চলেছেন—অন্ধকারে অপরিষ্কার পরিত্যক্ত নীচের তলার একটি ঘরে, কলকারখানার মতো ব্যয়সাধ্য ও শ্রমসাপেক্ষ কর্মরীতিতে তাঁরা মেতে রইলেন ৩।৪ বৎসর। উৎসাহ দেবার মতো কোন সভা, বিশ্ববিদ্যালয় বা ওই রাজ্যের সরকার তখনও এগিয়ে আসেন নি। শুদ্ধ সত্যের সন্ধানে নতুন জ্ঞান আবিষ্কারের উন্মাদনা তাঁদের চালাচ্ছিল। রেডিয়ম-আবিষ্কার সারা পৃথিবীকে চমৎকৃত করলে। দেশে বিদেশে যখন কুরী দম্পতির সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে, তখনও নিজের দেশের উপযুক্ত প্রশংসা ও সাহায্য পেতে অনেক দেরী হয়েছিল কুরীদের। এই কাহিনীর পক্ষে মানুষের দৃঢ়পণ-নিপুণতা ও একাগ্রতার বর্ণনা একসঙ্গে মিশে যে অপূর্ব এক গাথার সৃষ্টি করেছে, তার বর্ণনা অতি সুন্দরভাবেই করেছেন কন্যা ইভ।

অবশ্য ইতিমধ্যে চলচ্চিত্রের সাহায্যে এদেশের অনেকের সঙ্গে এই কাহিনীর পরিচয় হয়েছে।

আর আমার মতো দু'চার জন বিজ্ঞানী এদেশে এখনো রয়েছেন যাঁদের সৌভাগ্য হয়েছিল মাদাম কুরীকে স্বচক্ষে দেখা, তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করা—তাঁর বিখ্যাত লেবরেটরিতে কাজ করা বা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতা শোনা! তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তা' রেডিয়ম আবিষ্কারের অনেক পরে। নিদারুণ দুর্ঘটনায় পিয়েরের তিরোভাব ঘটেছে। একাই কৃত্যকর্তব্য চালিয়ে দু'বার নোবেল পুরস্কার বিজয়িনী মাদাম কুরী প্রায় তখন উপকথার মানুষ! দেবদুর্লভ যশের অধিকারিণী তিনি—তাঁকে দেখতে, তাঁর নির্দেশে কাজ করতে সারা বিশ্ব থেকে লোক এসে জুটছে পারীর বিদ্যামন্দিরে!

আজ তেজস্ক্রিয়তার সঙ্গে যেন অভিশাপ যুক্ত হয়ে রয়েছে! কিন্তু ভুললে চলবে না এই রেডিয়ম আবিষ্কারের পর দুরারোগ্য ব্যাধির উপশমের জন্য তার ব্যবহারই ছিল কুরী দম্পতির প্রধান লক্ষ্য!

আজ পারী নগরে রু্য দ পিয়ের কুরীতে সুবৃহৎ অট্টালিকা উঠেছে যেখানে রেডিয়ম ইত্যাদি তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রয়োগে রোগীর চিকিৎসা চলছে। সারা বিশ্বে এই ধরনে রোগ উপশমের পদ্ধতি আজ জনপ্রিয় হয়েছে। এই কলিকাতা নগরীতেও দেশবরেণ্য চিত্তরঞ্জনের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে ক্যানসার ইনষ্টিটুট্—সেখানেও তেজস্ক্রিয় ধাতুর ব্যবহার আজ সুবিদিত।

অবিস্মরণীয় এই অমর কাহিনী লিখে ইভ কুরী বিশ্বজনকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কাছে কুরী পরিবার সুপরিচিত। মারীর কন্যা আইরিন মা'র কাছে শিক্ষালাভ ক'রে নিজের জীবন মায়ের আদর্শেই গড়েছিলেন। তাঁরই মতো এই তেজস্ক্রিয়তার সন্ধানে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন আইরিন ও তাঁর স্বামী ফ্রেডরিক জোলিও, এঁরাও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নানা আবিষ্কার ক'রে যশস্বী হয়েছেন ও নোবেল পুরস্কারও পেয়েছেন এঁরা দু'জনে। ভারতের বিজ্ঞানীদের প্রতি জোলিও ও আইরিন কুরীর অকৃত্রিম সহানুভূতি ছিল। ২।৩ বার এই দেশে নানাভাবের বিচক্ষণ পরামর্শ দিতে এসেছিলেন জোলিও। আইরিনও ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে বোম্বাইএ এসে বিজ্ঞান সভায় যোগদান করেছিলেন। বিজ্ঞানী মহলে এ সব কথা সকরুণ স্মৃতি জাগায়—কারণ এঁরা দু'জনেই চলে গিয়েছেন। নানাভাবে মানবসেবায় ও বিজ্ঞান প্রগতির ইতিহাসে কুরী পরিবারের নাম চিরকালের জন্য স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ভারতীয়দের কাছে তাই এই জীবনকাহিনী এত আদরণীয়। বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞানের প্রচার আমার চিরকালের কাম্য। বাঙলা দেশের লোক প্রখ্যাত বিদেশী বিজ্ঞানীদের জীবন-চরিত পড়ুক ও বাংলার মাধ্যমে এই পরিচয় ঘটান অবশ্যকর্তব্য বলে আমার মনে হয়।

শ্রীমতী রায়-জায়া নিজের নানা কাজের মধ্যেও যে এই অনুবাদ করার অবসর পেয়েছেন—সেটি আমাদের সপ্রশংস বিস্ময় উৎপাদন করেছে। বাঙলায় এই উপভোগ্য তর্জমা পড়ে আমি ও অনেকে সুখ্যাতি করছি। শুনেছি অনুবাদিকা নিজে ইংরাজীতে এই জীবনী পড়ে এত অভিভূত হয়েছিলেন যে সারা দেশের বাঙলাভাষীকে সেই আনন্দের ভাগ দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁর এই পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। তিনি বাঙলার বিজ্ঞান-সমাজের যে উপকার করেছেন তা' ভুলবার নয়। ভাষাপ্রেমিকদের পক্ষ থেকে তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানাই।

আশা করি সুধীসমাজে ও ছাত্রমহলে এই পুস্তকটির যথেষ্ট আদর হবে। ইতি—

১৪ই জুলাই, ১৯৬২।

২২, ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা-৬

সত্যেন বোস



তিন কন্যা সহ (মানিয়া, ব্রনিয়া ও হেলা) অধ্যাপক শক্লোদোভস্কি, ১৮



মারী শক্লোদোভস্কা-কুরী



পিয়ের কুরী ঃ
স্বামীর এই ছবিটিই ছিল মারীর কাছে সবচেয়ে প্রিয়



পিয়ের ও মাদাম কুরী

বিবাহের পর ফ্রান্সের পথে যখন সাইকেলে ঘুরে বেড়াতেন



দুই কন্যা ইভ ও আইরিন সহ মাদাম কুরী, ১৯০৮



গবেষণাগারে মাদাম কুরী, ১৯১২
(নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পরের বৎসর)



কন্যা আইরিনকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিচ্ছেন মারী, ১৯২৫



পারীর রেডিয়ম ইন্সটিটিউটের অফিসে মাদাম কুরী, ১৯২৫

ভূমিকা

মারী কুরীর জীবনের চারপাশে এত অধিক সংখ্যক প্রতিভাবান ব্যক্তির সমাবেশ হয়েছিল যে, তাঁর জীবনী গল্পের মতোই বলা যায়।

মারী ছিলেন নির্যাতিত দেশের কন্যা। দরিদ্র ও সুন্দরী। অদম্য কর্ম-প্রেরণায় তিনি মাতৃভূমি পোল্যাণ্ড ছেড়ে পারীতে পড়াশোনা করতে এসেছিলেন। বহুদিন তাঁকে দারিদ্র্য ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হয়েছে। এখানে তাঁর এক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হলো যিনি ছিলেন তাঁরই মতো প্রতিভাধর। বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হলেন তাঁরা এবং তাঁদের বিবাহিত জীবন অত্যন্ত সুখের হয়েছিল। তাঁদের বিপদভয়-ভ্রূক্ষেপহীন একান্ত নিরলস প্রচেষ্টার ফলে রেডিয়ম নামক এক অপূর্ব পদার্থ আবিষ্কার হলো। এই আবিষ্কারের ফলে কেবল যে এক নতুন বিজ্ঞান, এক অভিনব জীবন-দর্শনের সূত্রপাত হলো তাই নয়, এই আবিষ্কার মানুষের হাতে সাংঘাতিক এক রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করার অস্ত্র তুলে দিল।

যে সময়ে এই দুই মহাপ্রাণ বৈজ্ঞানিক বিশ্বজোড়া যশের অধিকারী হ'তে চলেছিলেন ঠিক সেই সময়ে মারী এক নিদারুণ শোকের সম্মুখীন হলেন। এক দুর্ঘটনার মধ্যে তাঁর জীবন-সঙ্গী, তাঁর স্বামীকে তিনি হারালেন। কিন্তু এই মনোবেদনা এবং ভগ্নস্বাস্থ্য অগ্রাহ্য করে- তিনি স্বামীর সঙ্গে মিলে যে গবেষণা আরম্ভ করেছিলেন, তার ছিন্ন সূত্র তুলে নিলেন এবং দু'জনের গড়ে-তোলা বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে চললেন।

বাকী জীবন ধরে এই বিদুষী মহিলা যেন মানুষের সমাজকে শুধু একটানা দিয়ে-যাবার সঙ্কল্প নিয়েই কাজ ক'রে গিয়েছেন। যুদ্ধে আহত সৈনিকদের তিনি দিয়েছেন তাঁর একাগ্র অভিনিবেশ এবং তার জন্য নিজের স্বাস্থ্যের দিকেও তাকান নি। পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হ'তে সমবেত ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিকদের তিনি দিয়েছেন উপদেশ, পরামর্শ, দিয়েছেন তাঁর সবটুকু সময়।

ঐশ্বর্যের পথ তিনি প্রত্যাখান করেছিলেন, সম্মান তিনি গ্রহণ করেছিলেন ঔদাসিন্যের সঙ্গেই এবং জীবনের কর্মশেষে পরিপূর্ণ ক্লান্তি নিয়ে তিনি চোখ বোজেন।

এই মহামতি নারীর জীবনী লিখতে বসে সামান্যতম অলংকরণের প্রয়াস আমার দূষণীয় মনে হয়েছে। তাই স্থির নিশ্চিত না হ'য়ে আমি এর একটি ঘটনাও উল্লেখ করি নি। অপরিহার্য কোনো বাক্যাংশকে সুবিধে মতো বিকৃত করতে বা তাঁর ব্যবহৃত পোশাকের রং পর্যন্ত আমি আমার কল্পনার রঙে রাঙাতে চেষ্টা করি নি। সত্য যা তাই লিখেছি, যে সব কথা সত্য সত্যই হয়েছে তাই আমি উল্লেখ করেছি মাত্র।

আমার পোলদেশীয় আত্মীয়দের কাছে আমি এক্ষেত্রে ঋণী। তাঁরা সংস্কৃতিবান, মার্জিত। বিশেষ ক'রে আমার বড় মাসিমা ম্যাদাম দ্লুস্কা আমার মার সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিলেন; তাঁর কাছ থেকে মূল্যবান সব চিঠি এবং বৈজ্ঞানিকের তরুণ বয়সের ঘটনাবলির বহু তথ্যাবলি আমি পেয়েছি। ব্যক্তিগত কাগজপত্র, সংক্ষেপে লেখা মা'র নিজের জীবনের ছোট বড় অভিজ্ঞতার কথা, সরকারি দপ্তরের অসংখ্য দলিল-দস্তাবেজ, আমার মা'র ফরাসী ও পোলদেশীয় বন্ধু-বান্ধবদের চিঠিপত্র ও তাঁদের জানা ঘটনাবলি, আমার দিদি আইরিন জোলিও কুরী, ভগ্নীপতি ফ্রেডরিক জোলিও কুরী এবং আমার নিজের স্মৃতিসাগর মন্থন ক'রে যা পাওয়া গেছে সেই সব উপাদান মিলিয়ে তাঁর জীবনের শেষের দিকের দিনগুলি চিত্রিত করেছি।

চরিত্রের অটল দৃঢ়তা, যা প্রতিদানের কোনরকম দাবী না ক'রে শুধু দিয়েই যায়; কিছুমাত্র গ্রহণ যিনি করেন না এমন এক মনস্বিনীর সচেতন আত্মোৎসর্গ; প্রশংসা বা দুঃখ যাঁর অন্তরের পবিত্রতা স্পর্শও করতে পারে নি; সেই মহীয়সী নারী মারী কুরীর ক্ষণস্থায়ী জীবন ও তাঁর অনন্যসাধারণ কাজের গণ্ডী পেরিয়ে পাঠকের অনুভূতিকে নাড়া দিতে পারে—এইটুকুই যদি আমি তুলে ধরতে পেরে থাকি লেখিকা হিসেবে তাতেই আমি খুশি।

এই রকম একটি অন্তরের অধিকারিণী ছিলেন বলেই, প্রকৃত মনীষীরা অকুণ্ঠ যশের সঙ্গে সঙ্গে যে অর্থ, পার্থিব সুখসাচ্ছন্দ্য স্বাভাবিকভাবে লাভ ক'রে থাকেন, মারী কুরী অনায়াসে সেসব প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছিলেন। তাঁর মনটি ছিল এত বেশী সচেতন ও কর্তব্যনিষ্ঠ যে, যশের আনুষঙ্গিক কোন পন্থাই তিনি বেছে নিতে পারেন নি; পারেন নি তিনি অন্তরঙ্গতা বা কৃত্রিম সৌহার্দ্য, আয়াসসাধ্য কৃচ্ছ্রসাধন অথবা লোক দেখানো বিনয় দেখাতে।

কি ক'রে খ্যাতি অর্জন করতে হয়, তা তাঁর জানা ছিল না।

আমার জন্মের সময় মা'র বয়স ছিল সাঁয়ত্রিশ। যখন তাঁকে বোঝবার বয়স হ'লো ততদিনে তিনি যশের শিখর পেরিয়ে প্রৌঢ়ত্বের গণ্ডী পেরোবার

পথে পা বাড়িয়েছেন। তবু তাঁকে সুপ্রসিদ্ধা বৈজ্ঞানিক হিসেবে ভাবতে আমার খুবই আশ্চর্য মনে হয়। বোধ হয় তার কারণ এই, যে মা নিজেই কোনদিন নিজেকে 'সুপ্রসিদ্ধা বৈজ্ঞানিক' বলে মনে করেন নি। বরং আমার এই ধারণাই আছে যে, আমার জন্মের বহু পূর্বের মারী শ্ক্লোদোভস্কা নাম্নী যে গরীব ছাত্রীটি জেগে স্বপ্ন দেখত, আমি যেন চিরটাকাল তারই কাছাকাছি মানুষ হয়েছি।

এবং মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত মারী কুরী তাঁর এই অল্প বয়সী মেয়েটির মধ্যে নিজের সাদৃশ্য যেন সবচেয়ে বেশী খুঁজে পেয়েছিলেন। দীর্ঘ, দুরূহ, উজ্জ্বল কর্মজীবন তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি, তাঁকে মহোত্তর বা দীনতর করতে পারে নি। জীবন-প্রারম্ভের অপরিচিত, অপরিজ্ঞাত দিনগুলিতে যেমনটি তিনি ছিলেন, জীবনের শেষ দিনটিতেও তেমনি তিনি নম্র দৃঢ়মতী, ভীরু ও সকল বিষয়ে কৌতূহলী থেকে গিয়েছিলেন।

মহাপুরুষদের জন্য যে সাড়ম্বর সৎকারের সরকারী ব্যবস্থা আছে, তাঁর সৎকার সেভাবে করা হলে তাঁর স্মৃতির অমর্যাদাই করা হতো। গ্রাম্য পরিবেশে, গ্রীষ্মকালের ফুলের মাঝে, অত্যন্ত সহজ শান্ত ভাবে তাঁর শেষকৃত্য সমাপ্ত হলো ...যেন সহস্র সহস্র সাধারণ মানুষের সমাধির মতো এও আর একটি সমাধি।

আইনষ্টাইন তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন: 'সুপ্রসিদ্ধ মনীষীদের মাঝে একমাত্র মারী কুরীর জীবনই যশের প্রভাবমুক্ত বলা যায়।' নিজের জীবনটা যিনি অপরিচিতের মতো সম্পূর্ণ ভাবে পেরিয়ে এলেন, নিজের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন থেকেই যিনি দিন কাটিয়ে গেলেন, সেই চিরকেলে ছাত্রীটির কথা লিখতে বসে আজ আমি নিজের মধ্যে সাহিত্যিক প্রতিভার অভাব বোধ করছি।

ইভ কুরী

প্রথম খণ্ড

॥ মানিয়া ॥

রবিবার। রাস্তার নাম নোভোলিপকি। মোটা মোটা থাম দিয়ে ঘেরা প্রকাণ্ড ইস্কুলের সদর দরজা আজ বন্ধ। মাথার ওপর অর্ধচন্দ্রাকার প্রস্তর ফলকে বড় বড় হরফে রুশ ভাষায় খোদাই করা রয়েছে ইস্কুলের নাম : "বালক-দিগের উচ্চ বিদ্যালয়।" দেখে মনে হয়, যেন শান্ত পরিত্যক্ত কোন দেবালয়। দীর্ঘচ্ছন্দে টানা নীচু-মাথা বাড়িটার আলোক-স্নাত ঘরগুলোতে সারি সারি কাঠের ডেস্কের ভিড়। ডেস্কের ওপর ছুরির দাগ আর নামের আদ্যাক্ষরের ছড়াছড়ি। বিদ্যার্থীদের কলকাকলি আজ বন্ধ, তাই এই নিবিড় নীরবতা। মাঝে মাঝে শুধু গির্জার আরতি ঘণ্টা সান্ধ্য-আকাশের নিরবচ্ছিন্নতা ভঙ্গ ক'রে পূজার্থীদের ডাক দিয়ে ফেরে। ক্বচিৎ কখনও শোনা যায় গরুর গাড়ির একটানা টুংটাং শব্দ, কিংবা রুশী দ্রোস্কীর অশ্বখুরের অলস মন্থর গতিছন্দ। পাঁচিলের গায়ে চারটে লাইল্যাক্ ফুলের গাছ ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে। রবিবাসরীয় পোশাকে সজ্জিত কোন পথচারী হঠাৎ এই মধুঝরা গন্ধে চমকে থেমে যায়। মে মাস শেষ হবার আগেই রীতিমত গরম পড়ে গেছে। ওয়ার্‌স শহরে শীতের যত প্রকোপ, গ্রীষ্মেরও তত নির্মমতা। কিন্তু রবিবারের এই শান্তি কোথায় যেন ব্যাহত হচ্ছিল। ইস্কুল-বাড়ির বাঁ-হাতি একতলায় শ্রীযুত ব্লাদিস্লাভ শ্‌ক্লোদোভস্কি সপরিবারে বাস করেন। ভদ্রলোক ফিজিক্সের অধ্যাপক ; এছাড়া এই ইস্কুল তদারকের দায়িত্বও তাঁর ওপর ন্যস্ত। বাড়ির এদিক থেকে বিচিত্র সব শব্দ আসছে, এলোপাথাড়ি হাতুড়ি ঠোকা, হুড়মুড় ক'রে কি-যেন সব পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হৈ-হৈ শব্দ, আবার খানিকটা ঠুক্‌ঠুকানি। পোল ভাষায় কার যেন চিৎকার শোনা গেল : 'হেলা, আমার গোলাগুলি যে ফুরিয়ে এল !'

'যোসেফ প্রাসাদের চূড়োটাকে তাক কর !'

'মানিয়া, পথ ছাড় !'

'ওঃ !'

হঠাৎ হুড়মুড় ক'রে খণ্ড খণ্ড কাঠের টুকরো সমস্ত মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল,

আবার একবার সেই প্রচণ্ড পতনের শব্দ আর সেই সঙ্গে স্তূপীকৃত কাষ্ঠখণ্ড ধরাশায়ী হলো।

শিশুদের এই 'রণক্ষেত্রের' বড় বড় জানালা দিয়ে দেখা যায় ইস্কুলের উদ্যান-প্রান্ত। ঘরের চার কোণে চারটি শিশু-শয্যা। পাঁচ থেকে নয় বছরের মধ্যে চারটি শিশু অপরিসীম উৎসাহে প্রচণ্ড হুঙ্কারে 'যুদ্ধ' 'যুদ্ধ' খেলায় মগ্ন। এই কাঠের খেলনাগুলো কাকাবাবু তাদের বড়দিনে উপহার পাঠিয়েছিলেন। ভদ্রলোক খেলনাগুলোর এই ব্যবহার সম্বন্ধে বোধ হয় নিজে ধারণাও করতে পারেন নি। প্রথম ক'দিন যোসেফ, ব্রনিয়া, হেলা এবং মানিয়া বাক্সের ভেতরের নির্দেশ-পুস্তিকা দেখে দেখে লক্ষ্মী ছেলেমেয়ের মতো রাজপ্রাসাদ, নদীর পুল, গির্জা ইত্যাদি গড়েছিল, কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কাঠের কড়ি, বর্গা, থাম জাতীয় খণ্ডগুলো স্বাভাবিক ভাবেই আপন আপন পথে পরিচালিত হলো। এই শিশু রণবীরের দল খেলনাগুলোকে যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র, কামান ইত্যাদির কাজে লাগাল।

বুকে হেঁটে যোসেফ কামান নিয়ে ক্রমেই শত্রুর দিকে এগিয়ে চলেছে। যুদ্ধের এক চরম মুহূর্ত উপস্থিত। তার সুন্দর শিশুসুলভ মুখখানি ঘিরে একরাশ রেশমের মতো চুল; সত্যিকারের সেনাপতির মতোই তার মুখ গম্ভীর। ভাই-বোনদের মধ্যে সেই সবচেয়ে বড় আর বিচক্ষণ এবং সে হলো একমাত্র ভাই। বোনদের গায়ে রবিবারের ভালো পোশাক, ফ্রিল্ দেওয়া কলার আর রিবন বসানো এপ্রন, এপ্রনের রং গাঢ়।

সত্যি বলতে কি, মেয়েরা ভালোই যুদ্ধ করল। যোসেফের দলে হেলার চোখ দুটিতে যোদ্ধসুলভ বীরত্ব ফুটে উঠেছে। কাঠের টুকরোগুলো প্রাণপণ শক্তিতে বহু দূরে ছুঁড়ে ফেলার ইচ্ছা তার অদম্য; আট বছরের ব্রনিয়ার কাছে সে পরাজিত হয়েছে এবং তার জন্য মনে মনে সে ক্ষুব্ধ। ব্রনিয়ার নরম গালে টোল পড়েছে, মাথা ভরতি সোনালী চুলের রাশ। প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল চঞ্চল মেয়েটি জানালার মধ্যবর্তী সমর-এলাকায় সৈন্যদল সংরক্ষণে ব্যস্ত। ব্রনিয়ার ক্ষুদে দেহরক্ষীটি সৌখিন এপ্রনে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ভরে নিয়ে দুই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ছুটে বেড়াচ্ছে। তার কচি মুখখানা জ্বলজ্বল করছে, অত্যধিক হাসি ও চিৎকারে ঠোঁটদুটি শুকিয়ে উঠেছে।

'মানিয়া!'

জমজমাট যুদ্ধের মাঝে শিশু থমকে থেমে যায়। বুক পর্যন্ত টেনে তোলা এপ্রনে ধরা যাবতীয় যুদ্ধের সরঞ্জাম মেঝেতে পড়ে যায়।

'ব্যাপার কি!'

শ্‌ক্লোদোভস্কি বাহিনীর দিদি জোসিয়া ঘরে এসে দাঁড়াল। বারো বছর এখনও পূর্ণ হয় নি, তবু ছোট ভাইবোনদের কাছে তাকে ভারিক্কি দেখায়। রূপোলী লম্বা চুল মেয়েটির কাঁধ ছাপিয়ে পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে।

'মা বলেছেন, অনেক খেলা হয়েছে, এবার শেষ করো।'

'কিন্তু আমি যে ব্রনিয়াকে সাহায্য করছি; ওকে যে কাঠের জোগান দিচ্ছি!'

'কিন্তু মা তোমাকে ডাকছেন।'

মুহূর্তের দ্বিধা তারপরেই রণে ভঙ্গ দিয়ে দিদির হাত ধরে ধীর গম্ভীর ভঙ্গীতে সে পা ফেলে চলে গেল।

পাঁচ বছর বয়সে যুদ্ধ করা বাস্তবিকই কঠিন ব্যাপার। ক্লান্ত শিশু তার শক্তির সীমায় পৌঁছে গিয়েছে, তাই সে খুশী মনেই যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ ক'রে গেল। পাশের ঘর থেকে কে যেন মিষ্টি সুরে আদর ক'রে ডাকছে:

'মানিয়া, মান্যুসিয়া···আমার আন্সিউপিসিও!···'

পোল্যাণ্ড দেশটিতে ডাকনামের ছড়াছড়ি। শ্‌ক্লোদোভস্কি পরিবারে সোফিয়াকে জোসিয়া ছাড়া কেউ কোনওদিন ডাকে না, ব্রনিস্লাভা থেকে হয়েছে ব্রনিয়া, হেলেন থেকে হেলা, যোসেফ থেকে যোশিও! অবশ্য সবচেয়ে ছোটো আদরের মেয়ে মারিয়ার অসংখ্য ডাকনাম। মানিয়া বলেই তাকে সাধারণতঃ সবাই ডাকে। মান্যুসিয়া আদরের ডাক, আর আন্সিউপিসিও তার আরেকটি আদরের নাম।

'আমার আন্সিউপিসিও, চুলের একি দশা করেছিস মা! আর মুখখানা কিরকম লাল হয়ে উঠেছে!'

শীর্ণ দুর্বল নরম দু'টি হাত ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিকের ছোট রাশভারী মুখের চারপাশ থেকে চুলগুলো সরিয়ে নেড়ে ঠিক ক'রে রিবনটা বেঁধে দেয়। ক্রমে শিশুর শ্রান্ত দেহ এলিয়ে পড়ে।

·

মায়ের প্রতি মানিয়ার ভালবাসার অন্ত ছিল না। তার মনে হতো পৃথিবীতে এত সুন্দর এত বুদ্ধিমতী বুঝি আর কেউ নেই।

মাদাম শ্‌ক্লোদোভস্কি গাঁয়ের জমিদার বাড়ির বড় মেয়ে। তাঁর বাবা ফেলিক্স বোগুস্কি ছিলেন পোল্যাণ্ডের মুষ্টিমেয় জমিদার গোষ্ঠীর অন্যতম। নিজের জমির আয়ে সংসারের ভরণপোষণ সম্ভব না হওয়ায় তিনি অপরাপর অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন জমিদারদের সম্পত্তি দেখাশোনা করতেন। তাঁর নিজের বিবাহ-

ব্যাপারে বেশ একটু অভিনবত্ব ছিল। সঙ্গতিহীন অভিজাত বংশীয়া মেয়ের প্রেমে পড়ে মেয়েটির বাপমায়ের অমতে তিনি একদিন তাকে নিয়ে পালিয়ে যান এবং বিয়ে করেন। ক্রমে বৃদ্ধ বয়সে এই বীরপুঙ্গব ভীরু নিরীহ ব্যক্তিতে পরিণত হন এবং এককালের সেই সুন্দরী ভবিষ্যতে রুদ্রাণী রূপধারিণী ঠাকুরমায় পরিণত হন। ছয়টি সন্তানের মধ্যে মাদাম শ্‌ক্লোদোভস্কি সবচেয়ে শান্ত, ধীর ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। ওয়ার্‌সর এক প্রাইভেট ইস্কুলে তিনি উপযুক্ত শিক্ষা পান এবং শিক্ষানবিসী করা মনস্থ ক'রে সেই ইস্কুলেই প্রফেসর এবং পরে ডিরেক্টর হন। ১৮৬০ সালে প্রফেসর ব্লাদিস্লাভ শ্‌ক্লোদোভস্কি যখন তাঁর পাণিপ্রার্থী হন, তখন এই রমনী যথেষ্ট শিক্ষিতা বলেই পরিচিতা ছিলেন। অর্থাভাবের মধ্যেও তিনি বিদুষী, সুচরিতা ও গুণবতী বলে সমাদৃতা ছিলেন। জীবনের, তথা জীবিকার পথ তাঁর সুনির্দিষ্ট ছিল। উপরন্তু তিনি ছিলেন সুগায়িকা : পিয়ানো সহযোগে অপূর্ব ব্যালাড গাইতেন।

মহিলা ছিলেন নিখুঁত সুন্দরী। বিয়ের সময়ে তোলা একটি ছবিতে তাঁর অতুল মুখখানি, বেনীবদ্ধ সুপুষ্ট কেশদাম, বঙ্কিম ভ্রূরেখা, মিশরবাসিনীদের মতো টানা ধূসর দু'টি চোখে শান্ত সমাহিত ভাব পরিস্ফুট।

সাধারণের চোখে এই বিয়ে 'রাজ-যোটক' বলেই মনে হয়েছিল।

পোলদেশের ছোট-ছোট জমিদারীগুলো এই সময়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, এবং তাদের মধ্যে এই শ্‌ক্লোদোভস্কি পরিবারও ছিল। ওয়ারস শহরের-উত্তরে শ্‌ক্লোদিতে প্রায় একশো কিলোমিটারের ওপর বিভিন্ন খামার নিয়েই এদের সূত্রপাত। এই শ্‌ক্লোদিতে বহুপুরুষ ধরে কয়েকটি পরিবার পারিবারিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে শ্‌ক্লোদোভস্কি উপাধি গ্রহণ করে।

এরা প্রধানতঃ ছিল চাষী কিন্তু কালে এদের অবস্থা পড়ে গেল, চাষের ভূমিও হাতছাড়া হয়ে গেল। অষ্টাদশ শতকেও ব্লাদিস্লাভ শ্‌ক্লোদোভস্কির পূর্বপুরুষ বেশ কয়েকশ বিঘা জমি ভোগদখল করেছিলেন এবং তাঁর বংশ-ধরেরা সুখেই ছিলেন। কিন্তু অধ্যাপকের বাবা যোসেফের সময় সে-অবস্থা আর রইল না। অবস্থার উন্নতি এবং বংশমর্যাদা বৃদ্ধি করার সঙ্কল্প নিয়ে যোসেফ লেখাপড়ায় মন দিলেন। কিছুকাল যুদ্ধ-বিদ্রোহের মধ্যে নাটকীয় জীবন যাপনের পর হঠাৎ তাঁকে দেখা গেল লুবিন শহরে ছেলেদের ইস্কুলে মাষ্টারী করতে। পরিবারের প্রথম বুদ্ধিজীবী হলেন ইনি। বোগুস্কি আর শ্‌ক্লোদোভস্কি দুটো পরিবারই বেশ বর্ধিষ্ণু। সন্তানের সংখ্যা এঁদের ছয়টি ; ওঁদের সাতটি। কৃষাণ, ইস্কুল মাষ্টার, সম্ভ্রান্ত নাগরিক, ধর্মজাজক ছাড়া এক-

আধজন বিকৃতমস্তিষ্কের মানুষও এঁদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। মাদাম শ্‌ক্লোদোভস্কির এক ভাই হেনরিক্‌ বোগুস্কি নিজেকে অত্যন্ত প্রগতিশীল মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, যে-কোনরকম অসম্ভব কাজ সম্ভব করার প্রতিভা তাঁর ছিল। এদিকে এই অধ্যাপকের এক ভাই জিস্লাভ শ্‌ক্লোদোভস্কি একাধারে পিটর্সবুর্গের উকিল, পোল বিদ্রোহের সৈনিক, নির্বাসিত রাজনীতিবিদ প্রোভেন্সের কবি, টুলো'র আইন বিশারদ ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে কখনও সম্পদে, কখনও বিপদে বিচিত্র জীবন যাপন ক'রে গেছেন।

দুই পরিবারের মধ্যেই শান্ত ও ছিটগ্রস্ত লোকের দেখা পাই। দেখি ধীর বুদ্ধিসম্পন্ন চরিত্রের পাশাপাশি উদ্দাম চরিত্রের লোকদের।

মারী কুরীর মা ও বাবা উভয়েই স্থির প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। পিতা, তস্য পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে পিটর্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-চর্চা শেষ ক'রে ওয়ার্‌সতে অঙ্ক ও ফিজিক্সের অধ্যাপক হলেন। মা নিয়েছিলেন মেয়ে-ইস্কুলের দায়িত্ব এবং সে-ইস্কুলের সুনাম এতদূর ছাড়িয়ে পড়েছিল যে, বড় বড় ঘরের মেয়েরা সেখানে পড়তে আসত। ফ্রেটা স্ট্রীটের সেই ইস্কুল-বাড়ির দোতলায় এঁরা সপরিবারে আট বছর বাস করেছিলেন। ছোট ছোট ঝুল-বারান্দা থেকে মেয়েদের খেলার মাঠটুকু চোখে পড়ত। প্রতিদিন সকালে অধ্যাপক যখন তাঁর ইস্কুলে যাবার জন্যে নেমে আসতেন, তখন সামনের ঘরগুলো মেয়েদের কল-কাকলিতে ভরে থাকত। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ব্লাদিস্লাভ শ্‌ক্লোদোভস্কি প্রাক্তন ইস্কুল ছেড়ে যখন নোভোলিপকি স্ট্রীটের ইস্কুলের অধ্যাপক ও পরিচালক হয়ে চলে এলেন, তখন তাঁর স্ত্রীকেও অগত্যা তাঁর ইস্কুলবাড়ি ছেড়ে চলে আসতে হলো। তাঁর কোয়ার্টার থেকে প্রতিদিন মেয়ে-ইস্কুলে যাওয়া এবং সেই সঙ্গে পাঁচটি শিশু-কন্যার পরিচর্যা অসম্ভব হয়ে উঠল। ফ্রেটা স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে আসার সময় তাঁর খুবই খারাপ লেগেছিল, কারণ, মাত্র কয়েক মাস আগে সেই বাড়িতে (৭ ই নভেম্বর ১৮৬৭) মারী কুরী বা ছোট মানিয়ার জন্ম হয়।

'আমার সোনামণি আন্সিওপিসিও, ঘুম পেয়েছে!'

মায়ের পায়ের দিকে কুশান ঢাকা ছোট মোড়ার মধ্যে শরীরটাকে গুটিয়ে নিয়ে মানিয়া উত্তর দেয়:

'না মা মণি, আমি বেশ আছি।'

মাদাম শ্‌ক্লোদোভস্কির চাঁপার কলির মতো আঙুলগুলো বার বার তাঁর কন্যার চুলের ভেতর দিয়ে বিলি কেটে যায়। মানিয়ার কাছে মায়ের এই

আদরটুকু ভারি মিষ্টি লাগে। যদ্দূর তার মনে আছে, মায়ের চুমু সে কোন-দিনই পায়নি, এই অপূর্ব সুন্দরী ম্রিয়মাণা জননীর যথাসম্ভব কাছ ঘেঁষে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকতে তাঁর বড় ভাল লাগত। ক্বচিৎ একটা কথা, একটু হাসি, এতটুকু স্নেহ মাখা দৃষ্টি—সব মিলিয়ে তার যেন কেবল মনে হতো এক অপরিসীম মমতা তার শিশু-অদৃষ্টকে রক্ষাকবচের মতো ঘিরে আছে।

কোন্ নিষ্ঠুর ভাগ্যলিপি তার মাকে সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছে, সে-তথ্য বোঝার সময় তার জীবনে তখনও আসে নি। মাদাম বিশেষ অসুস্থ ছিলেন। মানিয়ার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই যক্ষ্মার লক্ষণ ধরা পড়ে এবং পাঁচ বছর ধরে সেবা যত্ন ও চিকিৎসা সত্ত্বেও রোগ তার নিজের পথে এগিয়েই গিয়েছে। কিন্তু তেজস্বিনী নারী প্রাণপণ চেষ্টায় নিজের শারিরীক কষ্ট গোপন করতেন। পরিচ্ছন্ন পোশাক প'রে তিনি সংসারের যাবতীয় কাজ মনের জোরে ক'রে যেতেন এবং তাঁর প্রফুল্লতা দিয়ে অসুস্থতা ঢেকে রাখতেন। নিজের সম্বন্ধে তিনি কঠোর সব নিয়ম পালন করতেন, নিজের বাসনপত্র ছাড়া ব্যবহার করতেন না, মা হয়েও ছেলেমেয়েদের আদর ক'রে কাছে কখনও টানতেন না। এমনি ধারা আরও কতো বিধিনিষেধের শৃঙ্খল! শিশুরা তাঁর অসুখ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানত না। মাঝে মাঝে শুকনো কাশির শব্দ ঘরে ঘরে ঘুরে যেতো আর সেই সঙ্গে বাবার মুখে বিষাদের ছায়া ফুটে উঠতো। সান্ধ্য-প্রার্থনায় 'আমাদের মা জননীকে সারিয়ে তোল—' এই সব ছোট খাট ঘটনার ভেতর থেকে সামান্য কিছু আভাস তারা পেত।

কিন্তু অবুঝ শিশু যখন ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরতো, আলগোছে শিশুর বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মা বলতেন:

'মান্যুসিয়া এবার আমি উঠি মা, আমার কত কাজ যে পড়ে আছে!'

'আমি আরেকটু এখানে থাকি না মা—বসে বসে বই পড়ি।'

'বাইরেটা কি সুন্দর দেখেছিস, যা, বাগানে বেড়িয়ে আয়।'

পড়ার কথা বলার সময় মানিয়ার মুখে কেমন যেন সঙ্কোচের আভা দেখা যায়। তার পেছনে একটা ছোট্ট কাহিনী আছে।

বছর খানেক আগে ওদের দেশের বাড়িতে ব্রনিয়া বেচারী নিজে নিজে সমস্ত বর্ণপরিচয়টুকু আয়ত্ব করতে গিয়ে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল। তখন সে এক উপায় উদ্ভাবন করল। মানিয়াকে পড়ুয়া বানিয়ে তার ওপর মাষ্টারী করার ছলে নিজের পড়াটুকু শিখে নেবার চেষ্টা করে। কার্ডবোর্ডে কাটা অক্ষরগুলো যেমন তেমন ক'রে সাজিয়ে তারা কয়েক সপ্তাহ ধরে এই পড়া-পড়া খেলায় মেতে উঠে-

ছিল। তারপর একদিন-সকালে বাপ-মায়ের সামনে ব্রনিয়া একটা লাইন কিছুতেই পড়তে পারছে না দেখে ছোট বোন মানিয়ার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে গেল। চট ক'রে বই খানা দিদির হাত থেকে টেনে নিয়ে গড় গড় ক'রে খানিকটা পড়ে ফেলে। এই মজার খেলায় অভিভূত হ'য়ে সে আরও খানিকটা পড়ে ফেলে, শেষে হঠাৎ তার চমক ভাঙ্গে। বাবা মা'র মুখের নির্বাক ভাব, ব্রনিয়ার বিষণ্ণ দৃষ্টি, কয়েকটা না-বোঝা ছাড়া-ছাড়া মন্তব্য সব মিলিয়ে তার বুকের ভেতর থেকে কান্না ঠেলে আসতে থাকে। ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে কেঁদে ফেলে: 'মাপ করো তোমরা আমায়, আমি ইচ্ছে ক'রে করি নি। আমার দোষ নেই, দিদি-ভাইয়েরও দোষ নেই! এ তো সহজ বলেই তো আমি পড়ে নিলাম।' তার ভয়, পাছে এই পড়তে শেখার জন্যে বাবা মা তার ওপর রাগ করেন।

এই ঘটনার পর থেকে বইয়ের অক্ষরগুলো শিশুর কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। ওই বয়সে পড়াশোনায় সে অবশ্য খুব বেশী এগোতে পারে নি, কারণ বাবা মা সযত্নে তার হাতের কাছ থেকে বই সরিয়ে রাখতেন। বয়সের তুলনায় অতিরিক্ত মেধা শিশুসন্তানের পক্ষে ক্ষতিকর মনে ক'রে বিচক্ষণ শিক্ষক-দম্পতি সতর্কতা অবলম্বন ক'রে চলতেন। বড় বড় হরফে লেখা এ্যালবামে বাড়ি ভরতি ছিল। শিশু সেদিকে হাত বাড়ালেই প্রতিবাদ শোনা যেত: 'কাঠের খেল্‌না নিয়ে খেল তো গিয়ে, পুতুলটা কোথায় রেখেছিস! মানিয়া একটা গান শোনা তো মা'—কিংবা, 'যা তো মা, একটু বাগানে বেড়িয়ে আয়।'

খানিক আগে যে দরজা দিয়ে ঢুকেছিল সেইদিকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি ফেলে দেখে নিয়ে মানিয়ার বুঝতে বাকী রইল না যে, ফেলে-আসা রণক্ষেত্র আগের মতোই সরগরম, সেখানে বাগানে বেড়াবার সাথী খুঁজতে যাওয়া বৃথা। রান্নাঘরের দিকে গিয়েও কোন লাভ নেই, কারণ হাতা-খুন্তির শব্দ থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, ভৃত্যরা সবাই সান্ধ্য-ভোজনের ব্যবস্থায় ব্যস্ত।

'যাই, জোসিয়াকে ডেকে আনি।'

'বেশ তো, তাই ডাক।'

'জোসিয়া···জোসিয়া··· !'

লুকোচুরি খেলার অল্প পরিসর মাঠটুকুর ভেতর দিয়ে দুইবোন হাত ধরাধরি ক'রে বেরিয়ে যায়। ইস্কুলের হাতা ছাড়িয়ে তারা ঘুণ-ধরা কাঠের ফটক-ওয়ালা এক বিরাট বাগানের মধ্যে এসে দাঁড়াল। ঘাস আর বুনো গাছের কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ চারদিকে।

'জোসিয়া, আমরা বুঝি শিগগিরই জ্যোলায় যাব।'

'এক্ষুণি না, জুলাই-এর আগে নয়···কিন্তু জ্যোলার কথা তোর মনে আছে?'

আছে বৈকি! মানিয়ার যে অসাধারণ স্মরণ শক্তি! গত গ্রীষ্মের ছুটিতে সে আর তার দিদিরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা নদীতে ডিঙ্গি বেয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। জামা কাপড়ে কাদার ছিটে মাখিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে কাদা দিয়ে কত রকম খাবার তৈরি করেছে! আবার সেই কাদামাখা এপ্রনগুলো কেচে কাঠের তক্তার ওপর মেলে শুকিয়েও নিয়েছে। কেউ টের পায় নি। তাছাড়া সেই কাঠের পাটাতনটার খবরই কেউ জানত না। সেই পুরোনো লেবু গাছটায় এক সঙ্গে সাত-আটটি ভাই-বোন বন্ধুরা সব চড়ে বসত। ওকেও তারা কোলে ক'রে তুলে নিত, কারণ তখনও তার ক্ষুদে ক্ষুদে হাত-পা গাছে চড়ার মতো বড় হয় নি। বড় বড় বাঁধা কপির পাতা দিয়ে গাছের শক্ত ডালগুলোর ওপর বসার জন্য গদি তৈরি হতো, কচি পাতার ঠোঙ্গার ভেতর গাজর, চেরি, টেপারি জাতীয় খাবার ভরে ওরা ছোট ডাল পালার মধ্যে গুঁজে রাখত।

আরও মনে পড়ে মার্কিতে সেই ময়দা-কলের কথা, যেখানে যোসেফ যেত নামতা শিখতে। সেখানে একদিন তোড়ে গম পড়ছিল। সেই গমের চাপে মানিয়া তো আর-একটু হ'লে চাপাই পড়ে গিয়েছিল!···গাড়ি চালাবার সময়ে বুড়ো ফাদার সৃক্রিপোভোস্কি চাবুকটাকে বাতাসের গায়ে বার কয়েক সপাং সপাং শব্দে নাড়তেন! আর সেভিয়ার কাকার সেই ঘোড়াগুলো!···

প্রতি বছর ছেলেমেয়েরা একবার ক'রে দেশে গিয়ে স্ফূর্তিতে কাটিয়ে আসত। এই বিরাট পরিবারের একটি মাত্র লতিকা শহরবাসী হয়েছিল। শ্ক্লোদোভস্কিদের বহু আত্মীয়স্বজন দেশের মাটি কামড়ে পড়েছিল। শ্ক্লোদোভস্কি আর বোগুস্কিরা অনেকে গ্রামে চাষবাস ক'রে বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল। সেইজন্যে ছুটিছাটায় এই অধ্যাপক সপরিবারে কোথাও-না-কোথাও গিয়ে উঠলে, নিজেদের বাড়িতে স্থান সঙ্কুলান না হলেও, অতিপ্রিয় এই আত্মীয়দের আশ্রয় দিতে কারুরই আপত্তি হতো না। সংসারের অকিঞ্চিৎকর আয় সত্ত্বেও, স্বল্পবিত্ত ওয়ার্সবাসীদের মতো সস্তা গ্রীষ্মাবাসগুলির দমবন্ধকরা ভিড় মানিয়াদের কোন ছুটিতেই সহ্য করতে হয় নি। গ্রীষ্মকালে এই বুদ্ধিজীবী দম্পতির সন্তানরা দস্তুরমত স্বাস্থ্য ও শক্তি অর্জন ক'রে আবার শহরে ফিরে আসত।

মায়ের স্থান পূর্ণ করার জন্য যে গাম্ভীর্যের প্রয়োজন তা পুরোমাত্রায় আয়ত্ত

ক'রে নিয়েছে বড় মেয়ে জোসিয়া। সে বলে: 'আয় আমরা দৌড়োই, দেখ তোর আগেই আমি বাগানের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাব।'

'আর দৌড়তে ইচ্ছে করছে না; একটা গল্প বলো না দিদি!'

আর এই জোসিয়ার মতো গল্প বলার ওস্তাদ কেউ ছিল না— মাও না, বাবাও না। পরীদের গল্প বলতে গিয়ে সুদক্ষ শিল্পীর মতো গল্পের প্রতি অংশ কল্পনার বিচিত্র রঙে রঙীন ক'রে তোলার অপূর্ব ক্ষমতা ছিল তার। বিস্মিত চমৎকৃত ভাইবোনদের সামনে স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যরস সে অপূর্ব প্রাণের আবেগে ভরে নিয়ে পরিবেশন করত। রচয়িতা ও অভিনেত্রী হিসেবে জোসিয়া মানিয়ার মনে বিশেষ এক শ্রদ্ধার স্থান অধিকার করেছিল। দিদির গল্পে অলৌকিক, রোমাঞ্চকর ব্যাপার সব শুনতে শুনতে পাঁচ বছরের শিশু সবখানি না বুঝেও আনন্দে উত্তেজনায় দিশেহারা হয়ে যেত।

এবার বাড়ি ফেরার পালা। ইস্কুল-বাড়ির কাছাকাছি এসে দিদির গলার স্বর আপনা থেকেই নীচু হয়ে এল। যে গল্পটা সে বলতে শুরু করেছিল তা এখনও শেষ হয়নি, তবু জোসিয়া ছেটে কেটে শেষ ক'রে ফেলল। ডানদিকের ঘরের জানালাগুলোয় একই রকম লেসের পর্দা ঝোলান। দুই বোন নিঃশব্দে সেই জায়গাটা পেরিয়ে এল। এই ঘরের মধ্যে শ্ক্লোদোভস্কি সন্তানদের চরম ভীতি ও বিতৃষ্ণার পাত্র মঁসিয়ে আইভানভ বাস করতেন। ভদ্রলোক ব্যায়াম শিক্ষক, তিনি যেন 'জার' রাজত্বের নিষ্ঠুর প্রতিনিধি।

১৮৭২ সালে পোল্যাণ্ডের লোকেদের, বিশেষ ক'রে বুদ্ধিজীবীদের জীবন, অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে সর্বদাই বিদ্রোহের বীজ অঙ্কুরিত হতো এবং সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর লোকেদের তুলনায় এরাই ছিল সব চেয়ে বেশী উৎপীড়িত। ঠিক একশ বছর আগে দুর্বল সাম্রাজ্যের প্রতিবেশী একদল শক্তি-লোলুপ লোক পোল্যাণ্ড দেশটার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। পর পর তিনটি দেশভঙ্গ আন্দোলনের ফলে পোল্যাণ্ড তিনটি ছোট ছোট টুকরোতে বিভক্ত হয়ে যায় জার্মান, রুশ আর অস্ট্রিয়ানদের মধ্যে। কয়েকবারই পোল দেশের জনসাধারণ অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। আর তার ফলে রাজবন্দীদের জীবনে আরও কঠিন আঘাত পড়ে।

১৮৩১-এর অসম সাহসিক বিদ্রোহ বিফল হওয়ার পর জার নিকোলাস পোল্যাণ্ডের ওপর প্রচণ্ড প্রতিশোধ নিতে শুরু করে। দলে দলে দেশপ্রেমিকদের বন্দী ক'রে নির্বাসনে পাঠান হয় এবং তাদের ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

১৮৬৩ সালে আবার একবার মুক্তি আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এবং তার বিফলতা পোলবাসীদের জীবনে নিদারুণ অভিসম্পাত বহন ক'রে আনে। বিদ্রোহীরা সেদিন কেবলমাত্র কুড়ুল, দা, শড়কি সম্বল ক'রে জারের রাইফেলের সম্মুখীন হয়েছিল। আঠারো মাস ধরে জীবনমরণ পণ ক'রে সংগ্রাম চলেছিল। তারপর বিজয়ী জারের হুকুমে বিদ্রোহী নেতাদের মৃতদেহ ওয়ার্স শহরের দেয়ালে দেয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এরপর এই অমর পোল্যাণ্ডকে বাধ্যতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখার সবরকম চেষ্টা করা হয়। দলে দলে শৃঙ্খলাবদ্ধ বিদ্রোহীকে সাইবেরিয়ার তুষারপথে নির্বাসনে পাঠানো হলো, দেশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল অগুন্তি পুলিশ, এল ইস্কুলে ইস্কুলে বিশেষ ধরনের শিক্ষক। তাদের ওপর ভার রইল, পোলবাসীদের ওপর কড়া নজর রাখার ; তাদের ধর্ম, পাঠ্য-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা বিনষ্ট করার। ইস্কুলে তাদের মাতৃভাষা ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হলো। এক কথায় তাদের জীবন্মৃত ক'রে রাখার পাকা ব্যবস্থা করা হলো। অপর পক্ষে বাধা দেওয়ার মালমশলা সহজেই তৈরি হয়ে গেল। নিদারুণ দুঃখে পোলবাসীরা এটুকু বুঝেছিল যে, শক্তি দিয়ে তারা স্বাধীনতা জয় করতে পারবে না, অন্ততঃ এই মুহূর্তে। সুতরাং বর্তমানের কর্তব্য শুধু সুযোগের জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকা, আর সেই অবসরে যে-ভীতি, যে-হতাশা জমতে পারে দেশবাসীর মনে, তার জড় সমূলে উৎপাটিত করা।

সুতরাং সংগ্রাম শুধু ক্ষেত্র পরিবর্তন করল। যারা কুড়ুল কাস্তে নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে বীরের মতো দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন (—যেমন বীর লুই নার্ৎ)—'দেশমাতার জন্য প্রাণ বিসর্জনের কি অপূর্ব মহিমা'—এই কথা বলে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন, পরবর্তী কালের বীরদের সঙ্গে তাঁদের কর্ম-পদ্ধতির পার্থক্য দেখা দিল। শিল্পী, ধর্মযাজক, অধ্যাপক—এই শ্রেণীর বুদ্ধি-জীবীরা, জনসাধারণের মন নিয়ে যাঁদের কারবার—এঁরাই এগিয়ে এলেন বিদ্রোহের হাল ধরতে। এঁরা ভালমানুষের মুখোশ প'রে জারের নির্ধারিত যে কোন অপমানজনক পরিস্থিতিকে মানিয়ে নেবার ভান ক'রে সেখান থেকে গোপনে পোল যুবকদের কানে বিদ্রোহের মন্ত্র দিতে ও সহকর্মীদের নির্দেশ দিতে লাগলেন। ফলে সারা পোল দেশ জুড়ে ভদ্রতা ও সৌজন্যের তলে তলে বিজীত ও বিজেতার মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো বিতৃষ্ণা ও বিদ্রোহের ধারা নিঃশব্দে প্রবাহিত হলো। নিপীড়িত শিক্ষকবৃন্দ ও রাষ্ট্রচর অধ্যক্ষমশায়—শক্লোদোভস্কি ও আইভানভদের মধ্যেও এর ব্যতিক্রম হলো না

নোভোলিপকি ষ্ট্রীটের এই বিশেষ আইভানভ লোকটা অত্যন্ত জঘন্য প্রকৃতির মানুষ ছিল। যে সব শিক্ষকদের ওপর স্বদেশবাসী সন্তানদের রুশ-ভাষা শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব ছিল, সেই হতভাগ্যদের ওপর তাঁর বিতৃষ্ণার অন্ত ছিল না। নির্মমভাবে তিনি এদের মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত ক'রে পরে হঠাৎ গালাগাল দিয়ে তাড়িয়ে দিতেন। অশিক্ষিত এই মানুষটি সরকারকে খুশি করার আগ্রহাতিশয্যে ছাত্রদের খাতার পাতায় 'পোলবাদ' খুঁজে বেড়াতেন। একদিন এক নিরীহ ছাত্রকে সমর্থন করতে গিয়ে শ্ক্লোদোভস্কি বলেছিলেন: 'মঁসিয়ে আইভানভ, ছাত্র যদি ভুল ক'রে থাকে, তবে সেটা ভুলই। আমাদের নিজেদেরও তো রুষভাষা শিখতে গিয়ে অনেক সময় এমন এক-আধটা ভুল হয়। আপনারও হয়। আপনি নিশ্চয়ই ইচ্ছে ক'রে সে-ভুলটা করেন না। মনে করুন না কেন, ছেলেটিরও সেই রকম ভুলই হয়েছে, ইচ্ছে ক'রে করে নি।' অধ্যাপক এই প্রসঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে যখন কথা বলছিলেন, ঠিক সেই সময়ে জোসিয়া আর মানিয়া বেড়িয়ে ফিরে বাবার ঘরে ঢুকল।

'তোমার মনে আছে গত সপ্তাহে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্ররা বিশেষ প্রার্থনার-আয়োজন ক'রে চার্চে একটি অনুষ্ঠান করেছিল। ওরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলেছিল। সেই বিশেষ প্রার্থনা যে কি, সেকথা তারা আচার্যকেও জানায় নি। গতকাল ছোট্ট বার্জিনস্কি আমার আছে সবকথা স্বীকার করেছে। ওরা শুনেছে যে আইভানভের ছোট মেয়েটির টাইফয়েড হয়েছে। অধ্যক্ষের প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণায় ওরা সবাই মিলে সেদিন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছে যে, তার মেয়েটিকে যেন তিনি নিজের কোলে টেনে নেন। বেচারা আচার্য যদি এ খবর জানতে পারতেন, তবে না জানি কী মর্মাহত হতেন।'

শ্ক্লোদোভস্কির কাছে ঘটনাটি মজার বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু মাদামের তো মায়ের প্রাণ, তিনি পারলেন না হেসে উড়িয়ে দিতে। তিনি তখন বসে বসে জুতো সেলাই করছিলেন, হাতের কাজটার ওপর তাঁর মাথাটা আরও একটু ঝুঁকে পড়ল। গুণবতী মাদাম কোন কাজই ছোট মনে করতেন না।

'মান্যুসিয়া, এই জুতো জোড়া তোর। তোকে খুব সুন্দর মানাবে!'

মায়ের হাতের কাটা শুকতলা আর সুতোটুকু মানিয়ার চোখ এড়ায় না। বাবা সবেমাত্র তাঁর প্রিয় চেয়ারটায় গা এলিয়ে বসেছেন। এই বেলা একবার তাঁর কোলে চড়ে বসে যত্নে বাঁধা টাইটাকে এলোমেলো ক'রে দিতে কি মজাই না লাগবে! আর ওই মধুর হাসিমাখা ভারী মুখখানা ঘেরা বাদামী রঙের দাড়িতে হাত বুলোতে ভারী ভাল লাগে তার। কিন্তু বুড়ো মানুষদের কথাবার্তাগুলো

কেমন যেন কাঠ, কাঠ ; 'আইভানভ, পুলিশ, জার, নির্বাসন, চক্রান্ত, সাইবেরিয়া'—পৃথিবীতে এসে অবধি মানিয়া এই জাতীয় কতকগুলি দুর্বোধ্য শব্দ শুনে আসছে। সব মিলিয়ে কেমন যেন আশংকা তার মনে বাসা বেঁধেছে। তাঁদের কাছ থেকে সে সরে এল।

শিশুমনের স্বপ্ন-রাজ্যই তার ভালো। বাবা-মা'র অন্তরঙ্গ আলোচনার মাঝে মাঝে পেরেকের ওপর হাতুড়ি ঠোকার শব্দ, কখনও বা চামড়ার ওপর কাঁচির শব্দ—এসবের থেকে দূরে সরে গেল সে। নেহাৎ খেয়াল খুশিমত ঘরের এদিক ওদিক খানিক ঘুরে বেড়াল। তারপর হঠাৎ উদাসী পথচারীর মতো তার বিশেষ আকর্ষণের বস্তুগুলির সামনে এসে দাঁড়াল।

টুকিটাকি কাজের সরঞ্জাম ঘরের চারদিকে ছড়ান। সারা বাড়ির মধ্যে এই ঘরটি মানিয়ার কাছে প্রিয়। মেহগনি কাঠের বিরাট ফরাসী ডেস্কখানা আর 'রেষ্টোরেশন' আমলের পুরু লাল ভেলভেটে-মোড়া চেয়ারের দিকে পরিপূর্ণ সম্ভ্রম ভরে তাকিয়ে থাকত সে। কি সুন্দর পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে এই আসবারগুলা! বড় হ'য়ে মানিয়া যখন ইস্কুলে যাবে, তখন অধ্যাপক শ্‌ক্লোদোভস্কির এই অনেকগুলি দেরাজ সমেত লম্বা টানা ডেস্কের অপর প্রান্তে দিদিদের সঙ্গে বিকেল বেলা সেও পড়তে বসবে। 'তিসিয়ান'কে উপহার দেওয়া এই পরিবারের বিশেষ সম্পদ বিরাট সোনালী ফ্রেমে বাঁধাই করা এক বিশপের প্রতিকৃতি ঘরের অপর প্রান্তে দেয়াল জুড়ে শোভা পাচ্ছিল। এর প্রতি কিন্তু মানিয়ার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। বাবার ডেস্কের ওপর উজ্জ্বল সবুজ রঙের তামার ঐ বড় ঘড়িটার আকর্ষণ তার কাছে অনেক বেশী ; গোল টেবিলের ওপরের ঘড়িটা এক আত্মীয় গতবছর পালের্মা থেকে এনে উপহার দিয়েছিলেন। টেবিলটার ওপর দাবার ঘর কাটা এবং তার প্রত্যেকটি ঘর বিভিন্ন রঙ দিয়ে তৈরি। অষ্টাদশ লুই-এর প্রতিকৃতি শোভিত একজোড়া নীল রঙের সূক্ষ্ম ফরাসী কাঁচের পেয়ালা পিরিচ উঁচু ষ্ট্যাণ্ডের ওপর তোলা রয়েছে। শিশুকে অন্ততঃ হাজার বার এই জিনিসটিতে হাত দিতে নিষেধ করা হয়েছিল, কাজেই বেচারীকে সাবধানে এই জিনিসটি পেরিয়ে ঘরের মধ্যে তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিসের সামনে এসে দাঁড়াতে হতো। কাঠের ফ্রেমে বসানো একটি তাপমান যন্ত্র দেয়ালে টাঙানো ছিল। তার দীর্ঘ উজ্জ্বল কাঁটা সাদা ডায়ালের ওপর ঝক্‌মক্ করছিল। মাঝে মাঝে উৎসুক ছেলেমেয়েদের সামনে অধ্যাপক এটিকে নামিয়ে পরিষ্কার করতেন। ঘরের মধ্যে আরেকটি অপূর্ব বস্তু ছিল, বইয়ের তাক-সমেত একটা কাঁচের আলমারি। এর তাকে তাকে হরেক রকমের কাঁচের টিউব, ছোট দাঁড়িপাল্লা,

বিভিন্ন পদার্থের নমুনা, নানা ধরনের যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক শক্তি নির্ণয় করার জন্য সোনার পাতের এক যন্ত্র সাজানো ছিল। অধ্যাপক শ্ক্লোদোভস্কি ইস্কুলে গিয়ে এই সবের সাহায্যে ছাত্রদের নানা বিষয়ে জ্ঞান দান করতেন, কিন্তু সরকারের তরফ থেকে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য অপেক্ষাকৃত অল্প সময় নির্ধারিত করা হলো। কাজেই অধিকাংশ দিনই এই আলমারির চাবি আর খোলা হতো না। এই সমস্ত আশ্চর্য সৌখিন জিনিসগুলো কি হতে পারে মানিয়া ভেবে পায় না। একদিন পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে এই সব আজব বস্তুগুলির দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে আছে দেখে বাবা শুধু নামটা বলে দিলেন : 'ফিজিক্সের যন্ত্রপাতি।' কি বিদ্‌ঘুটে নাম বাবা! নামটা কিন্তু সে ভোলে নি, প্রাণের আবেগে, গানের সুরে ঐ নাম সে বারবার উচ্চারণ করল।

॥ অমানিশা ॥

২

'মারিয়া শ্ক্লোদোভস্কা—'

'হাজির।'

'ষ্টানিস্‌লাস্ অগাষ্টাস্ সম্বন্ধে যা জানো,—বল।'

'১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ষ্টানিস্‌লাস্ অগাষ্টাস্ পেনিয়াতোভস্কি পোল্যাণ্ডের সম্রাট হন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সুশিক্ষিত সম্রাট এবং শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যের দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়া তিনি বিশৃঙ্খল রোধ করিবার জন্য যত্নবান হন। দুর্ভাগবশতঃ তাঁহার সাহসের অভাব ছিল।'

···বরফ ঢাকা সাদা খেলার মাঠটুকু জানালা দিয়ে দেখা যায়। তারই পাশে তৃতীয় সারিতে নিজের জায়গায় উঠে দাঁড়িয়ে যে ছাত্রীটি এতক্ষণ পড়া বলে গেল, তার সঙ্গে ক্লাসের বাদবাকী মেয়েদের বিশেষ কোন পার্থক্য চোখে পড়ে না। ইস্কুল-বোর্ডিংএ যে ধরনের ষ্টীলের বোতাম, কড়া কলার দেওয়া নীল সার্জের জামা পরতে হয় এই বছর দশেকের মেয়েটির পরনেও তাই। তার এলোমেলো কোঁকড়া চুলের রাশ কিন্তু চোখে পড়ে না। বব চুল সামনে

থেকে টেনে নিয়ে শক্ত ক'রে সরু ফিতে দিয়ে একটা বিনুনি বাঁধা। তার মুখখানাও আর সব মেয়েদের মতোই সাদামাটা দেখাচ্ছে। হেলার সুন্দর কোঁকড়া চুলের বেনীটি অপেক্ষাকৃত পুষ্ট ও গাঢ় রঙের। পাশের ডেস্কেই সে বসেছে। বাহুল্য বর্জিত পোশাক ও টেনে-বাঁধা চুল এই ছিল মাদ্‌মোয়াজেল সিকোর্স্কার প্রাইভেট স্কুলের নিয়ম।

চেয়ারে উপবিষ্ট শিক্ষয়িত্রীর চেহারা গম্ভীর, চাপল্যবর্জিত। তাঁর কালো মোটা সিল্কের জামা ও শক্ত কলার তিনি যে সৌখিন নন তাই প্রকাশ করত। মাদ্‌মোয়াজেল টুপাল্‌স্কার অবশ্য সৌন্দর্যের প্রতি আদৌ আসক্তি ছিল না। তাঁর ভারী, অসুন্দর চেহারা দেখে কেমন যেন মায়া হতো। তিনি পরিচিত ছিলেন 'টুপসিয়া' নামে; তিনি শুধু অঙ্ক আর ইতিহাসই পড়াতেন না, ইস্কুলের ভালোমন্দের ভারও ছিল তাঁর ওপর। এই কারণে অনেক সময়ে স্বাধীনচেতা, তেজস্বিনী শ্‌ক্লোদোভস্কি-শিশুদের ওপর অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তিনি কঠিন ব্যবহার করতে বাধ্য হতেন।

তবু ছোট্ট মানিয়ার প্রতি মন তাঁর আপনা থেকেই কোমল হয়ে আসত। ক্লাসের আর সব মেয়েদের চেয়ে দু'বছরের ছোট হয়েও যার কাছে কোন পাঠই দুর্বোধ্য ঠেকে না, ইতিহাস, সাহিত্য, জার্মান, ফরাসী গ্রন্থগুলিও যার কাছে কঠিন মনে হয় না, তাই দেখে এমন ছাত্রী সম্বন্ধে শিক্ষয়িত্রীর মনে গর্ব থাকা স্বাভাবিক।

ইতিহাসের ক্লাস হচ্ছে। ক্লাসটা নীরব, নিস্তব্ধ, কেমন যেন থম্‌থমে ভাব। চাপা উত্তেজনা সকলের চোখে মুখে। হতবাক শিশু-দেশপ্রেমিকদের চব্বিশ জোড়া চোখে এবং টুপসিয়ার এবড়ো খেবড়ো মুখে এক উত্তজনার আলো। বহুযুগ আগের সেই সম্রাটের বিষয় আবৃত্তি করতে গিয়ে মানিয়ার সুরেলা গলায় কোথা থেকে আগুনের হল্কা লাগে। 'দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর সাহসের অভাব ছিল।' আসলে এই ক্লাসে পোল ভাষাতেই শিক্ষয়িত্রী পোল্যাণ্ডের ইতিহাস পড়াচ্ছিলেন। তাঁর এবং বয়সের তুলনায় অত্যধিক গম্ভীর ছাত্রীদের মুখে-চোখে যেন এক গোপন ষড়যন্ত্রের ছায়া ফুটে উঠেছে।

চক্রান্তকারীদের মতোই হঠাৎ তারা স্তব্ধ হয়ে যায়। সিঁড়ির দিক থেকে কলিংবেলের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি ভেসে আসে। দু'বার একটানা, দু'বার ছাড়া ছাড়া শব্দ হয়। সামান্য সংকেতে, নির্বাক চাঞ্চল্যে মুহূর্তে সবাই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। টুপসিয়া চেয়ারের ওপর ছড়ানো বইপত্র নিমেষে সরিয়ে ফেলেন। চারজন মেয়ে ক্ষিপ্রহস্তে ডেস্কের ওপর থেকে যাবতীয় পোলিশ বই আর কাগজ এপ্রনের

মধ্যে ভরে নিয়ে চকিতে বোর্ডিংয়ের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আবার নিমেষের মধ্যে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসে যার যার জায়গায় বসে পড়ল। ঠিক সেই মুহূর্তে মাঝের দরজা খুলে গেল।

কে? না, ওয়ার্‌সর প্রাইভেট বোর্ডিং-ইস্কুলগুলির ইন্‌স্পেক্টর ম'সিয়ে হুর্নবারা। হল্‌দে প্যান্টের ওপর চক্‌চকে বোতাম বসানো নীল টিউনিক পরনে। মোটা সোটা মানুষটি, জার্মান কায়দায় চুল ছাঁটা, ফোলা ফোলা গাল, সোনার ফ্রেমের চশমার পেছনে শ্যেন দৃষ্টি। ভদ্রলোক কোন কথা না বলে ছাত্রীদের দিকে তীব্র দৃষ্টি মেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। ইস্কুলের ডিরেক্টর মাদমোয়াজেল সিকোর্স্কা সঙ্গে ছিলেন, তিনিও চুপ ক'রে ওদের দিকে চেয়ে রইলেন। বাইরে থেকে স্থির নিশ্চিন্ত দেখালেও ভেতরে তাঁর উদ্বেগের অন্ত ছিল না। আজ মোটে প্রস্তুত হবার সময় পাওয়া যায় নি। দারোয়ান 'আসতে আজ্ঞা হয়' বলবার সঙ্গে সঙ্গে হুর্নবারা, গাইডের তোয়াক্কা না করেই, নিজেই সিঁড়ির বাঁক পেরিয়ে সোজা ক্লাসের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। কি জানি, সব ঠিক আছে তো!

ঠিকই ছিল সব। পঁচিশটি মেয়ে আঙুলে থিম্বল্‌ পরে চৌকো কাপড়ের টুকরোর ওপর নিবিষ্ট মনে বোতামের ঘর সেলাই ক'রে চলেছে। শূন্য ডেস্কের ওপর কাঁচি আর সুতোর লাছি সাজান।

টুপসিয়ার মুখখানা ভয়ে বেগুনি হয়ে উঠেছে, কপালের শিরা দপদপ করছে কিন্তু সামনে পরিষ্কার রুশ হরফে ছাপান বই খোলা রয়েছে, মুখের ভাব নির্বিকার।

'স্যার, এই শিশুরা রোজ দু'ঘণ্টা ক'রে সেলাই করে।' ডিরেক্টর-সিকোর্স্কার শান্ত কথা ক'টি নীরব ক্লাসের মধ্যে ঝরে পড়ে। শিক্ষয়িত্রীর কাছে এগিয়ে এসে হুর্নবারা প্রশ্ন করেন: 'আপনি যেন এতক্ষণ জোরে জোরে কি পড়াচ্ছিলেন!...কি বই পড়াচ্ছিলেন!'

'ক্রাইলভের পরীর গল্প, আজই বইটা শুরু করলাম!' টুপসিয়ার কণ্ঠ শান্ত, নিরুত্তাপ; ধীরে ধীরে তাঁর গালের ওপর স্বাভাবিক রঙ ফিরে আসছে।

যেন অন্যমনস্কভাবে আপনা থেকেই হুর্নবারার হাতের সঙ্গে ডেস্কের ঢাকনাটা উঠে এল। কই ভেতরে তো কোন সন্দেহজনক বই হুর্নবারার চোখে পড়ছে না!

শেষ ফোঁড়টকু তুলে কাপড়ের ডগায় ছুঁচটি তুলে মেয়েরা তাদের হাতের কাজ বন্ধ করে। গাঢ় রঙের ওপর সাদা কলার দেওয়া পোশাকে পঁচিশটি

শিশু ডেস্কের ওপর হাতদুটি জড়ো ক'রে একই ভঙ্গীতে বসে আছে। মুখের ওপর একটা চাপা আশঙ্কা, চাতুরী এবং সেই সঙ্গে বিতৃষ্ণার ছায়া পড়েছে, মনে হয়, হঠাৎ যেন এদের বয়স টেনে লম্বা ক'রে দেওয়া হয়েছে।

টুপসিয়া একখানা চেয়ার এগিয়ে দেন হর্নবারার দিকে; ভদ্রলোক তাঁর বিশাল বপুখানা টেনে নিয়ে তার ওপর ধুপ ক'রে বসেন। 'ওদের মধ্যে থেকে একটি মেয়েকে কাছে ডাকুন তো।'

তৃতীয় সারির মারিয়া শ্‌ক্লোদোভস্কা সন্ত্রস্ত ভাবে জানালার দিকে তার ছোট মুখখানি ফিরিয়ে নিয়ে মনে মনে প্রার্থনা করে: 'দয়া করো ভগবান, আমায় বাদ দিয়ে আর কাউকে যেন ডাকা হয়।' কারণ সে ঠিকই জানত তাকেই ডাকা হবে। সর্বদাই সরকারী ইন্‌স্পেক্টরের সামনে প্রশ্নোত্তর দেবার কাজ তারই ওপর পড়ত, কারণ ক্লাসের মধ্যে সাধারণ জ্ঞান তারই ছিল সবচেয়ে বেশী এবং রুশ ভাষাটাও বলতে পারত সে চমৎকার।

তার নাম শুনে সোজা উঠে দাঁড়াল বেচারী। প্রথমে মনে হলো গরমে তার কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছে, তারপরেই হাত পা সব ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। কোথা থেকে একরাশ লজ্জা এসে তার গলা যেন টিপে ধরছে।

হর্নবারার ব্যবহারের ভেতর ঔদাসীন্য ও একঘেয়েমির প্রকাশ ছিল। ভদ্রলোক বললেন: 'প্রার্থনা-সঙ্গীত শোনাও।'

ভাব বর্ণ-বৈচিত্রহীন স্বরে মানিয়া বলে গেল: 'আমাদের পিতা...' পোল-শিশুদের দৈনিক প্রার্থনা রুশভাষায় বলানো অধীন পোলদেশের জনসাধারণকে অপমান করার একটি ধূর্ততম সরকারী চাল। মানুষের অন্তরের শ্রদ্ধা ভক্তি আর সম্মান বোধের ওপর এ একধরনের আঘাত।

আবার সব চুপচাপ। 'দ্বিতীয় ক্যাথারিনের পর যাঁরা আমাদের পুণ্য রুশ দেশ শাসন ক'রে গেছেন, সেই সব সম্রাটদের নাম বল তো।'

'দ্বিতীয় ক্যাথারিন, প্রথম পল, প্রথম আলেকজান্দার, প্রথম নিকোলাস্, দ্বিতীয় আলেকজান্দার।'

ইন্‌স্পেক্টর খুশি হলেন বলে মনে হলো। শিশুটির স্মরণ-শক্তিকে তারিফ করতে হয়! আর উচ্চারণই বা কি সুন্দর! এ মেয়ের সেন্টপিটর্সবুর্গে জন্মানো উচিত ছিল!

'রাজপরিবারের নাম আর উপাধিগুলো বলে যাও তো।'

'মহামহিমময়ী সম্রাজ্ঞী, শ্রীরাজচক্রবর্তী নৃপকুল মুকুটমণি স্যেজারিভিচ আলেকজান্দার, শ্রীরাজচক্রবর্তী নৃপকুলধন্য গ্রাণ্ড ডিউক—'

এই জাতীয় লম্বা ফিরিস্তির শেষে হের্নবারার ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাস্যরেখা ফুটে উঠল। ভদ্রলোক ভাবলেন, খাসা! অন্তরের বিদ্রোহের জ্বালা দমন করার কষ্টকর প্রচেষ্টায় শিশু মানিয়ার মুখের রেখায় যে কাঠিন্য ফুটে উঠেছিল—সেটুকু নজর করার মতো চোখ কিংবা মন এই লোকটির ছিল না। 'আচ্ছা বল তো সম্মানের কোন্ বিশেষ পদবীতে আমাদের জার পরিচিত।'

'ভিএলিচেস্তভো।'

'বল তো আমার খেতাবটি কি!'

'ভায়সো কোরোঙে।'

মেয়েদের অঙ্ক বা বানান জিজ্ঞেস না ক'রে খেতাবের সমুদ্রে নুড়ি ঘেঁটে বেড়াতে লোকটির আনন্দ ছিল বেশী। সম্পূর্ণ আত্মতৃপ্তি চরিতার্থ করার মানসে ভদ্রলোক আবার প্রশ্ন করলেন: 'আমাদের সম্রাট কে?'

ইস্কুলের ডিরেক্টর ও সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট দু'জনেই অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি গোপন করার চেষ্টায় সামনে খোলা রেজিষ্টারের খাতার ওপর ঝুঁকে পড়লেন। জবাব আসতে দেরী হচ্ছে। হের্নবারা বিরক্ত হয়ে গলার স্বর চড়িয়ে আবার জিজ্ঞেস করেন: 'আমাদের সম্রাট কে?'

অতিকষ্টে মানিয়া উচ্চারণ করে: 'সর্বত্র পরিব্যাপ্ত সাম্রাজ্যের অধিকর্তা শ্রীরাজচক্রবর্তী দ্বিতীয় আলেকজান্দার।' বেচারীর মুখখানা কাগজের মতো সাদা হয়ে উঠেছে।

এইখানেই শেষ হলো। রাজ কর্মচারী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং মাথার ইঙ্গিতে সন্তোষজনক ভাব ব্যক্ত ক'রে পরের ক্লাসের দিকে এগিয়ে গেলেন, পেছনে মাদমোয়াজেল সিকোর্স্কা। এতক্ষণে টুপসিয়া মাথা তুলে চাইলেন।

'ছোট সোনা মানিক আমার এদিকে এস।'

নিজের জায়গা ছেড়ে মানিয়া শিক্ষয়িত্রীর কাছে এগিয়ে যায়; তিনি তার শিরচুম্বন ক'রে ছেড়ে দেন। ক্লাসের মধ্যে সবে প্রাণ সঞ্চার হ'তে শুরু করেছে এমন সময় শিশুটি উত্তেজনার শেষ প্রান্তে পৌঁছে নিজেকে হারিয়ে আকুল হয়ে কেঁদে ওঠে।

'আজ ইন্‌স্পেক্টর এসেছিল, ইন্‌স্পেক্টর এসেছিল।' ইস্কুল ছুটির পর শিশুদের মা, বাবা, অন্যান্য অভিভাবকরা তাদের নিতে এসেছেন। হৈ-হৈয়ের মধ্যে খবরটা তাঁদের কানে পৌঁছে যায়। মেয়েদের গলায় মাফলার, বড়দের গায়ে ফারের জামা। বছরের প্রথম তুষারপাত হয়ে গেছে। ছোট ছোট দলে

ভাগ হয়ে সারা পথটুকু জুড়ে ছড়িয়ে পড়লেন এঁরা, গলার স্বর খাদে নামিয়ে এঁরা কথা বলছেন। হয়তো বা পুলিশের কোন গোয়েন্দা সার্সির গায়ে সাজানো দ্রব্যসম্ভার পরীক্ষা করার অছিলায় এদের কথা শুনছে।

মাদাম মিকালোভস্কা ওরফে লুসী পিসী দুই বোনকে নিতে এসেছিলেন। হেলা তাঁকে সকালের ঘটনা বলল : 'হর্নবারা মানিয়াকে প্রশ্ন করেছিলেন, ও খুব সুন্দর গুছিয়ে সব উত্তর দিয়েছে, তারপর কি যে হলো! বেচারা ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে ফেলল। মনে হচ্ছে কোন ক্লাসেই ভদ্রলোক কোন খুঁৎ পান নি।' হেলা মহানন্দে বকবক ক'রে চলেছে, কিন্তু মানিয়ার মুখ একেবারে বন্ধ। ইন্‌স্পেক্টর চলে যাবার পর এতগুলো ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, কিন্তু এখনও তার বিচলিতভাব কাটে নি। হঠাৎ হঠাৎ এই ভয়, এই অপমানকর ঘটনাগুলো ওর ছোট মনকে বিতৃষ্ণায় ভরিয়ে তোলে। কেন! কেন এমন হবে! কেন এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে যেখানে মিথ্যাচরণ ভিন্ন উপায় নেই? আজ হর্নবারার এই আগমন তার ক্ষুদ্র জীবনে দুঃখের বোঝা বাড়িয়ে দিয়েছে। হাসি খুশি হাল্কামনের শিশু কবে যে সে ছিল, সেকথা যেন এরই মধ্যে সে ভুলেই গেছে। শ্‌ক্লোদোভস্কি পরিবারের ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে চলেছে। গত চার বছর মানিয়ার জীবনে দুঃস্বপ্নের মতো কত ঘটনাই না ঘটে গেছে।

অসুস্থা মাদাম শ্‌ক্লোদোভস্কি যোসিয়াকে নিয়ে যেদিন রওনা হলেন, মানিয়া সেদিন জানল, মা এবার সম্পূর্ণ ভাল হয়ে ফিরবেন। এর একবছর পরে শিশু যখন মা'কে দেখে, তখন মৃত্যু-পথযাত্রী মহিলাকে মা বলে চিনতে তার কষ্ট হয়েছিল।

১৮৭৩ সালে ছুটির পর বাড়িতে ফিরে এক নাটকীয় ঘটনার সম্মুখীন হয় এরা। সপরিবারে বাড়ি ফিরে শ্‌ক্লোদোভস্কি তাঁর ডেস্কের ওপর একখানা সরকারী খাম দেখতে পান। তার ভেতরের চিঠিখানা হলো :

'এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, অতঃপর তিনি অর্ধেক মাহিনা পাইবেন, বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাঁহার উপর হইতে অপসারিত করা হইল, সুতরাং নির্ধারিত বাসগৃহ তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে এবং সহ-পরিচালক পদ হইতেও তিনি বরখাস্ত হইলেন।'

কর্মক্ষেত্রে এর চেয়ে অপমানকর আর কি হতে পারে! অধ্যাপকের তরফ থেকে যথেষ্ট চাটুকারিতার অভাব আইভানভের গাত্রদাহ সঞ্চার করেছিল। এ তারই প্রতিশোধের এক নির্মম পন্থা। এতদিনে শত্রুপক্ষের দুরভিসন্ধি সফল হলো।

এরপর এবাড়ি সেবাড়ি ঘুরে শেষ অবধি নোভোলিপকি আর কারমেলাইট রাস্তার মোড়ে এঁরা এক বাড়ি পেলেন। অবস্থা বিপর্যয়ে ক্রমে ক্রমে এ বাড়ির পূর্বতন শান্ত মধুর আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে। অধ্যাপক প্রথমে দু'তিনটি ছেলেকে বাড়িতে এনে রাখেন। এদের থাকা, খাওয়া ও পড়াশোনায় সাহায্যের জন্য অর্থ নিতে বাধ্য হলেন। সবাই ওঁর ছাত্র ছিল। শান্ত গার্হস্থ জীবনের পরিবর্তে দেখা দিল বহুকণ্ঠে উচ্চকিত এক ছাত্রাবাস।

শ্‌ক্লোদোভস্কির অবস্থার পরিবর্তন ও রিভিয়েরাতে তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসার খরচ ছাড়াও আরও একটি কারণে তিনি এই ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর এক ভগ্নীপতি এক অভিনব বাষ্পচালিত গমকল তৈরির ব্যবসায়ে অর্থ নিয়োগ করেন। তাঁরই কথায় শ্‌ক্লোদোভস্কি যথেষ্ট সাবধানী মানুষ হয়েও ভুল ক'রে বসলেন। বহুকষ্টে সঞ্চিত ত্রিশহাজার রুবল্ ঐ ফাঁদে ঢাললেন। তার পর থেকেই শুরু হলো তীব্র অনুশোচনা আর ভবিষ্যতের জন্য দুশ্চিন্তা। বিবেকের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে তিনি সর্বদাই মনে মনে আক্ষেপ করতেন, অকারণে সারা পরিবারের ওপর যেঁচে দারিদ্র্য টেনে আনলেন কেন, মেয়েদের বিয়ের যৌতুক থেকেও বঞ্চিত করলেন তিনি। ঠিক বছর দুই আগে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শোকের সঙ্গে নিষ্ঠুর পরিচয় ঘটল মানিয়ার। তাদের বাড়িতে বোর্ডিংয়ের একটি ছেলের কাছ থেকে ব্রনিয়া আর যোসিয়া টাইফয়েড রোগের ছোঁয়াচ নিয়ে বাড়ি ফেরে। সেই ভয়াবহ দিনগুলোর কথা মনে পড়লে গা শিউরে ওঠে। এক ঘরে রুগ্না মায়ের দুর্দান্ত কাশি চেপে রাখার ব্যর্থ প্রয়াস, আরেক ঘরে দু'টি কিশোরী প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে। এক বুধবার যোসেফ, হেলা ও মানিয়াকে শেষবারের মতো বড় বোনের কাছে নিয়ে এলেন বাবা। সাদা পোশাকে যোসিয়া যেন শবাধার আলো ক'রে শুয়ে আছে, রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখ, তবুও ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির ক্ষীণ আভাস। হাত দুটি প্রণামের ভঙ্গীতে বুকের ওপর জড়ো করা, তার সেই চুলের বাহার কেটে ফেলা হয়েছে, তবু কী রূপ!

মানিয়ার এই প্রথম মৃত্যুদর্শন। কালো কোট পরা ছোট্ট মেয়েটির জীবনে এই প্রথম শেষকৃত্যের সঙ্গে পরিচয়। ব্রনিয়া ভালো হয়ে গেছে, এখন শুধু তার বিশ্রাম আর আরামের প্রয়োজন। কিন্তু দিদির মৃত্যুশোকে বালিশে মুখ গুঁজে অঝোরে কাঁদছে সে। মাদাম শ্‌ক্লোদোভস্কি এখন আর একেবারেই বাইরে যেতে পারেন না। কারমেলাইট ষ্ট্রীটের ওপর দিয়ে তাঁর প্রিয়

-কন্যার শবাধার যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ এ-জানালা সে-জানালার কাছে দুর্বল ·শরীরটাকে টেনে টেনে নিয়ে বেড়ালেন।

'সোনামণিরা এস, আমরা একটু বেড়িয়ে আসি, ঠাণ্ডাটা ভালরকম পড়ার আগেই কিছু আপেল কিনে রাখব।' নভেম্বর মাসের সন্ধ্যা, স্যাক্সনি বাগান জনশূন্যপ্রায়। চমৎকার মানুষ এই পিসীমা, ভাইঝিদের হাত ধরে দ্রুত পা চালিয়ে বাগানটা পেরিয়ে এলেন। রুগ্ণা মায়ের সংসর্গের বাইরে যে-কোন খোলা জায়গায় এই বাচ্চাদের একটু হাওয়া খাইয়ে নিয়ে যেতে চান তিনি। যদি বাছাদের ছোঁয়াচ লাগে! হেলাকে যথেষ্ট সুস্থ বলেই মনে হয়, কিন্তু মানিয়া কেমন যেন ফ্যাকাশে, বড় বেশী মনমরা।

বাগান পেরিয়ে পুরোনো ওয়ার্‌স শহরে পৌঁছলো তারা, মানিয়া এখানেই জন্মেছে। শহরের নতুন দিকের রাস্তাঘাটের চেয়ে এদিকটা ঘিঞ্জি বেশী। স্টারেমিয়াস্টে স্কোয়ারের বাড়িগুলোর সাদা সাদা ঢালু মাথা, সামনের দেয়ালের ধূসর রঙের ওপর অজস্র কারুকাজ, কার্নিসে দেখা যায় খোদাই করা মূর্তিসব, দোকানে বা হোটেলের গায়ে নানারকম জীবজন্তুর বিচিত্র চিত্র।

শীতের হাওয়ায় গির্জা-ঘন্টার নানান সুর ভেসে আসে। সুযোগ পেলেই রবিবারে সেন্টপল গির্জাতে তারা এসে জার্মান ভাষায় উপাসনা শুনে যেত। নোভেমিয়াস্টে স্কোয়ারটার সঙ্গেও মানিয়ার পরিচয় ছিল যথেষ্ট; ইস্কুল ছেড়ে আসার পর ওরা এক বছর এখানে ছিল। প্রতিদিন মা আর দিদিদের সঙ্গে সে গির্জায় যেত; একশো বছরের পুরোনো গির্জা জীর্ণ হয়ে গিয়েছে। লাল পাথরের সিঁড়ি এঁকে বেঁকে চূড়ো পর্যন্ত উঠে গিয়েছে। নদীর জল ছল্ ছল্ শব্দে গির্জার পা ধুয়ে বয়ে চলেছে। আজ এতদিন পরে পিসীর কথায় মেয়েরা গির্জায় ঢুকল। প্রাচীন অপ্রশস্ত দরজা পেরিয়ে মানিয়া হাঁটু গেড়ে বসল। ওর পা দুটো কাঁপছিল। বড় বোন যোসিয়া তাদের চিরদিনের মতো ছেড়ে চলে গেছে, আর মা-জননী কি এক অজানা ব্যথায় ভুগে ভুগে কী কষ্টই না পাচ্ছেন!

শিশু সর্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের কাছে তার সবচেয়ে প্রিয়জন, তার মুমূর্ষু মায়ের জন্য প্রার্থনা করল। পাশে বসে হেলা ও পিসীমা মাথা নুইয়ে চাপা গলায় প্রার্থনা করতে লাগলেন।

গির্জা থেকে বেরিয়ে তারা ভাঙ্গা সিঁড়ি বেয়ে জলের দিকে নামল। ভিশ্‌চুলা নদী সামনে তার বিশাল বপু নিয়ে ছুটে চলেছে। নদীর ঘোলাটে জল

পিঙ্গল বালির চড়া প্রদক্ষিণ ক'রে বয়ে চলেছে। ভাঙ্গাচোরা, তীরে ভিড়িয়ে রাখা, ভাসমান-স্নানাগার বা কাপড় কাচা ধোপার পাটগুলোকে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে। সারা গ্রীষ্মকাল ধরে ভিশ্চুলার ঘোলাটে জলে ছেলের দল নদীর বুকে নৌকো নিয়ে হৈ-চৈ ক'রে ফেরে, এখন সেগুলো নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। এখন শুধু আপেলের নৌকো ঘিরে মানুষের ভীড় আর উত্তেজনা। দু'খানা বেশ বড় ছুঁচলোমুখে মানোয়ারী নৌকো জলের ধারে ভিড়ে আছে।

আপাদমস্তক ভেড়ার লোমে ঢাকা নৌকোর মাঝি একমুঠো খড় সরিয়ে তার মালের নমুনা দেখাল। ওই নরম আবরণের নীচে টকটকে লাল টাটকা তাজা আপেলগুলো ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। হাজার হাজার আপেল। ভিশ্চুলার উজানের শহর সুন্দর কাজমিয়ারজ থেকে এইসব আপেল এখানে এসেছে।

হেলা চেঁচিয়ে ওঠে:

'আমি আপেল বাছব!' তার কথা শুনে মানিয়াও চেঁচায়।

মাথার মাফলার খুলে ঘাড় থেকে ইস্কুলের ব্যাগ নামিয়ে রেখে ওরা আপেল বাছতে ছুটল। এই ভাবে আপেল নিয়ে খেলতে শিশুদের ভারী ভাল লাগে। একটি একটি ক'রে আপেল বেছে হাতের মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যেটি মনে ধরে, সেটিকে ঝুড়ির মধ্যে তারা রাখে। খারাপ ফলটিকে দেহের সর্বশক্তি দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় ভিশ্চুলার জলে, তারপর তারা দেখে কেমন ক'রে সেটি নদীর জলে নাচতে নাচতে চলে যায়। ঝুড়ি ভরে গেলে নৌকো থেকে নেমে এস, সবচেয়ে ভাল ফলটি হাতে তুলে নিয়ে তার হিমেল গায়ে দাঁত বসিয়ে তাড়িয়ে তাড়িয়ে খাওয়া—কি যে মজা! ততক্ষণে পিসীমা দরদস্তুর ক'রে দাম চুকিয়ে দেন। তারপর মুখে ছুলি পড়া একদল রাস্তার ছেলেছোকড়ার মধ্যে কাকে ঝুড়িটা বাড়ি পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে লাগান যায়, সেই কথা নিয়ে পিসীমা ভাবেন।

পাঁচটা বাজে। খাবার ঘরের লম্বা টেবিলখানা পরিষ্কার ক'রে পরিচারকরা পেট্রোলভরা ঝোলানো বাতিটা জ্বালিয়ে দিয়েছে। পড়ার ঘণ্টা পড়ে, ছাত্ররা দু' তিন জনের ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের ঘরে চলে যায়। অধ্যাপকের ছেলেমেয়েরা তাদের বই খাতা বের ক'রে পড়তে বসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা বাড়ি থেকে সমবেত কণ্ঠের একটা গুন্‌গুন্ রব ওঠে। বহুদিন পর্যন্ত এ বাড়িতে এর কোন ব্যতিক্রম হয় নি। ইতিহাসের তারিখ, লাতিন কবিতা আর জ্যামিতির পাঠ না চেঁচিয়ে পড়তে পারে না।

বাড়ির আনাচে কানাচে বসে কেউবা আপন মনে বিরক্তি প্রকাশ করছে, কাউকে বা একই পড়া নিয়ে অসম্ভব পরিশ্রম করতে হচ্ছে...কী অদ্ভুত কাণ্ড কারখানা! মাঝে মাঝে কোন মেধাবী ছাত্র হয়তো একটা দুর্বোধ্য সমস্যা নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে দেখে অধ্যাপক নিজের ভাষায় বিষয়টির সহজ সরল ব্যাখ্যা ক'রে দিতেন, অমনি তা' জলের মতো সহজ হয়ে যেত। অথচ এসব সরকারী রুশ ভাষায় তাদের পড়তে হতো এবং তার ফলে না পারত তারা মানে বুঝতে, না পারত সঠিক উচ্চারণ করতে।

শিশু মানিয়ার এই ধরনের অভিজ্ঞতা তখনও হয় নি। তার বন্ধুবান্ধবদের চোখের সামনে যে-কোন কবিতা দু'বার পড়ে সে গড়গড়িয়ে মুখস্ত বলতে পারত। সবাই অবাক হয়ে যেত, মেয়েটা কি ভেল্কী জানে, না-কি, লুকিয়ে লুকিয়ে অন্য সময়ে শিখে রাখে! তার নিজের পড়া সকলের আগেই শেখা হয়ে যেত, তারপর আর কিছু করার থাকত না ব'লে সে তার সহপাঠিনীদের মধ্যে হয়তো কারুর জ্যামিতির প্রশ্ন সমাধান ক'রে দিত।

কিন্তু মেয়েটির সব থেকে ভাল লাগত প্রকাণ্ড টেবিলের একপাশে একটি বই নিয়ে তার ভেতর ডুবে থাকতে। আজও সে বসেছে কনুইয়ের ওপর ভর রেখে কান দুটো আঙুল দিয়ে টিপে ধরে বইয়ের ওপর মাথাটা ঝুঁকিয়ে। কিন্তু হেলা না চেঁচিয়ে কোন পড়াই মুখস্ত করতে পারে না। তবে এ চেঁচানোতে মানিয়ার খুব যে অসুবিধা হতো তা নয়, কারণ কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বইয়ের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলত, তখন আর তার বাহ্যজ্ঞান থাকত না। ছোট্ট মেয়েটির এই অস্বাভাবিক মনোযোগ তার দিদি ও বন্ধুদের কিন্তু হাসির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। বারবার ব্রনিয়া আর হেলা বোর্ডিংয়ের অন্য ছেলেমেয়েদের জড়ো ক'রে তার চারপাশে হট্টগোলের তুফান তুলে দেখেছে মানিয়া বই থেকে চোখ তুলে একবার তাকিয়েও দেখে নি। আজ তারা তার তপস্যা ভঙ্গ করার বিশেষ আয়োজন করেছে। লুসী পিসীমার মেয়ে হেন্‌রিয়েটা মিকালোভস্কা আজ তাদের দুষ্ট বুদ্ধির জোগানদার। পায়ের বুড়ো আঙুলের ডগায় ভর দিয়ে চুপেচুপে ওরা মানিয়ার চারপাশ দিয়ে চেয়ারের প্রাচীর তুলবে। ওরা চারদিকে দুটো ক'রে পাশাপাশি ও পেছনে একটি—এই ভাবে চেয়ার সাজাবে। এই তিনটির ওপর ভর দিয়ে আরও দুটো, সবশেষে একটি ক'রে চেয়ার থাকবে দুর্গের চুড়োর মতো। কাজ শেষ ক'রে যে যার জায়গায় ফিরে গিয়ে যেন কিছুই হয় নি এই ভাবে পড়ার ভান ক'রে চুপি চুপি অপেক্ষা করতে লাগল।

বেচারিদের সময় আর কাটে না। ফিস্‌ফিসানি, চাপা হাসির শব্দ, মাথার

ওপর স্তূপীকৃত চেয়ারের ছায়া—কিছুই মানিয়ার নজরে পড়ে না। টলায়মান পিরামিডের ভেঙে-পড়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায় আধ ঘণ্টা কাটিয়ে অধ্যায়টুকু শেষ ক'রে সে বই বন্ধ করল। মাথা তোলার সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় শব্দে প্রলয় কাণ্ড ঘটে গেল। মেঝেময় চেয়ার ছড়িয়ে পড়ল, হেলার উচ্চ হাসি, প্রতি আক্রমণের আশঙ্কায় ব্রনিয়া ও হেন্‌রিয়েটার আত্মরক্ষার প্রয়াস ..

মানিয়া কিন্তু নীরবে বসেই রইল, রাগ করতে সে জানে না, তাছাড়া এই তামাশায় সে এত অভিভূত হয়েছিল যে, এর মধ্যে হাস্যকর দিকটা ওর চোখেই পড়ল না। তার ধূসর চোখ দুটিতে ফুটে উঠল ঘুমের ঘোরে ঘুরে-বেড়ানো মানুষের ঘুমভাঙ্গা বিস্ময়। বাঁ-কাঁধে চেয়ারের ধাক্কা লেগেছে, সেখানে একবার হাত বুলিয়ে নিল, তারপর বইখানা কুড়িয়ে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। বড় মেয়েদের পাশ দিয়ে যাবার সময় শুধু বলে গেল ; 'এ আবার কোন্ ধরনের বোকামি !' এই শান্ত মন্তব্যে তারা খুশি হলো না।

বোধ হয় এই আত্মবিস্মৃত মুহূর্তগুলিতে মানিয়া শৈশবের কৌতুকোজ্জ্বল স্মৃতিতে ফিরে যেত। হাতের কাছে যা পেত, সবই সে পড়ে ফেলত—। কবিতা, জ্ঞানগর্ভ পত্রিকা, রোমাঞ্চকর কাহিনী, বাবার লাইব্রেরীর নানা-ধরনের তথ্যগ্রন্থ, সব।

মানসিক তমসা দূর করার তার এই ছিল উপায়, ক্ষণেক অবসরটুকুতে সে ভুলে যেত জারের গুপ্তচরদের উৎপাত, ভুলে যেত হর্নবারার অপমান। অত্যধিক পরিশ্রমে বাবার ক্লান্তিমাখা মুখ, অষ্টপ্রহর বাড়ির তাণ্ডবনৃত্য, ভোরের আলো ফোটার আগে আধঘুমন্ত অবস্থায় বিছানা ছেড়ে ওঠার কষ্ট। এই খাবার ঘরটাতেই তাদের রাত্রে শুতে হতো। ভোররাত্রেই ওদের ঘর ছেড়ে দিতে হতো কারণ বোর্ডিংয়ের ছেলে মেয়েরা সকালের খাবার খায় এই ঘরেই।

অত্যাচারী শাসকের উৎপীড়ন, ধর্মের প্রতি অবিচার, রোগ, মৃত্যু সমস্ত মিলিয়ে তার মনের যে বিভীষিকা ঘিরে থাকত সেসব কথা সে ভুলে যেত। কিন্তু এ শুধু ক্ষণিকের বিশ্রাম। চেতনা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার সব মনের দুয়ারে ফিরে আসত। মায়ের দুরারোগ্য ব্যাধি সারা বাড়ির ওপর বিষাদের কালো ছায়া ফেলেছে। রূপের জন্য যাঁর একদিন খ্যাতি ছিল আজ তিনি ছায়ার মতো পড়ে আছেন। বড়দের সান্ত্বনাবাণী আজ শুধু সত্য-গোপনের চেষ্টায় এসে দাঁড়িয়েছে। সে স্পষ্ট বুঝত যে, তার অন্তরের ভক্তি-

ভালবাসা, আকুল প্রার্থনা কোন কিছুই অবশ্যম্ভাবী শোকের হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে পারবে না।

মাদাম শ্‌ক্লোদোভস্কিও যেন প্রস্তুত হয়েছেন। সংসার-গৃহস্থালীর কোন ক্ষতি না ক'রে, নিঃশব্দে বিদায় নেবার জন্যে যেন তিনি মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নিচ্ছেন। ১৮৭৮ সালের ৯ই মে তিনি ডাক্তারকে বললেন পাদ্রীকে সংবাদ দিতে। একমাত্র সেই পাদ্রীই তাঁর অন্তিম সময়ের আন্তরিক উদ্বেগের সাক্ষী রইলেন :—তাঁর প্রাণাধিক স্বামীর ওপর চারটি সন্তানকে মানুষ করার দায়িত্ব রেখে যাওয়ার কুণ্ঠা, চারটি প্রাণপুত্তলির ভবিষ্যৎচিন্তা, দশ-বছরের কন্যা মান্যুসিয়ার জন্য উৎকণ্ঠা...

ছেলে-মেয়ে-স্বামীর সামনে এতটুকু উদ্বেগ প্রকাশ করলেন না মৃত্যুপথ-যাত্রিনী ; শান্ত, সমাহিত মুখ অন্তিম কালের অপরূপ আভায় মণ্ডিত হয়ে উঠল। কোন প্রলাপ বা বিকার এসে শেষমুহূর্তের শান্তি ব্যাহত করল না। এই ছিল তাঁর শেষমুহূর্তের কামনা—যেন প্রলাপ বা বিকারের মধ্যে তাঁকে পড়তে না হয়।

পরিচ্ছন্ন ঘরের মাঝে স্বামী, পুত্র ও কন্যারা তাঁর চারপাশ আলো ক'রে রইল। তাঁর টানা টানা চোখ দুটি একবার ক'রে প্রত্যেকের মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে এল—যেন এদের এই দুঃখের কারণ ঘটিয়ে নিজেকে অপরাধী বোধ করছেন তিনি।

প্রত্যেকের কাছ থেকে বিদায় নেবার শক্তিটুকু তিনি দেহের মধ্যে কোনমতে ধরে রেখেছিলেন। ধীরে ধীরে দুর্বলতা তাঁর দেহ আচ্ছন্ন ক'রে এল। জীবন-প্রদীপের শেষ শিখাটুকু আর একটি মাত্র ভঙ্গী, একটি মাত্র বাক্যে প্রকাশ পেল। সারাদেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে কম্পিত হস্তে তিনি বাতাসের গায়ে একটি ক্রশ চিহ্ন এঁকে এদের সকলকে আশীর্বাদ করলেন। স্বামী ও সন্তানদের দিকে চেয়ে শেষ কথা বললেন : 'আমি তোমাদের ভালোবাসি।'

কালো পোশাক পরা মানিয়া কারমেলাইট ষ্ট্রীটের বাড়িতে অসহ দুঃখের ভার বুকের মধ্যে বয়ে বেড়ায়। ব্রনিয়া তার পরলোকবাসিনী মায়ের ঘর-খানা ব্যবহার করছে। এখন সে ও হেলা ডিভান্ দুটি ব্যবহার করছে। সংসার দেখাশোনা করার জন্য একজন স্ত্রীলোকের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সে রোজ এসে চাকরদের খবরদারি ক'রে যায়। বোর্ডিংয়ের ছেলেমেয়েরা কি খাবে, বাচ্চারা কি পরবে এ সম্বন্ধে মোটামুটি বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে

চলে যায়। অধ্যাপক শ্‌ক্লোদোভস্কি তাঁর অবসর সময়ের সবখানি সন্তানদের সান্নিধ্যে কাটিয়ে দেন।

জাতীয় জীবনে, তথা ব্যক্তিগত জীবনের রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ার পরিচয় হলো। পরিচয় হলো তার জাতীয় জীবনের অবমাননার সঙ্গে, জানল ব্যক্তিগত অবমাননা কি। মা আজ আর নেই। মায়ের স্নেহ ও দিদির যত্ন থেকে বঞ্চিত শিশু এতটুকু অভিযোগ না ক'রে নিজের মতো বাড়তে লাগল। শিশু বয়স থেকেই গড়ে উঠল প্রখর আত্মসম্মানবোধ আর তারই সঙ্গে দৃঢ়তা। মায়ের সঙ্গে যে ক্যাথলিক চার্চে যেত, সেখানে সে আজও যায়, কিন্তু ভেতরে ভেতরে মন তার বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। সব চেয়ে প্রিয় প্রাণের ভালোবাসার সম্পদগুলি তার পাশ থেকে নিষ্ঠুর হাতে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য শিশুর মনে ভগবানের প্রতি সেই শ্রদ্ধাও আজ আর অবশিষ্ট নেই।

॥ বয়ঃসন্ধি ॥

৩

প্রতি পরিবারের ইতিহাসে এক-একটা মুহূর্ত আসে, যে সময়টা সেই পরিবারের পক্ষে সবকিছু শুভ মনে হয়। তখন পরিবারটি বিশেষরূপে প্রতিভায়, সৌন্দর্যে, স্বাস্থ্যে ও সফলতায় ভূষিত হয়ে ওঠে। চরম দুঃখের ভেতর দিয়ে অতিবাহিত করবার পর আজ যেন এই শ্‌ক্লোদোভস্কি পরিবার এমনি এক শুভকালের দেখা পেয়েছে। পাঁচটি বুদ্ধিদীপ্ত মেধাবী সন্তানের মধ্যে আজ জোসিয়া নেই, জননীও আজ চলে গিয়েছেন ও পণ্ডিত পিতা প্রাণান্তকর পরিশ্রমে জর্জরিত। কিন্তু চারটি ভাই বোনের প্রত্যেকেই আজ অসামান্য প্রতিভার অধিকারী।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের এক সোনালী সকালে খাবার টেবিলের চারপাশে একত্রিত এই পরিবারটিকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। ষোড়শী তন্বী হেলা আজ রূপবতী কন্যা, ব্রনিয়ার উজ্জ্বল মুখখানা ঘিরে আছে সোনালী চুল, মুখখানি

স্ফুটন্ত ফুলের মতো। যোসেফের পরনে ছাত্রের পোশাক, দেখে মনে হয় যেন পটু খেলোয়ার। এতদিনে মানিয়ার গায়ে যেন একটু মাংস লেগেছে। সুশোভন পোশাকের রেখায় রেখায় যে দেহসীমা পরিস্ফুট, তাকে এখন আর ক্ষীণ বলা চলে না। বয়সে সবচেয়ে ছোট এবং রূপের দিক থেকেও সবচেয়ে নিরেসই বলা চলে। কিন্তু বুদ্ধির দীপ্তি ও মাধুর্য, হাল্কা রঙের চোখ চুল ও ত্বক্ সব মিলিয়ে সে পুরোপুরি পোল্যাণ্ডের মেয়ে।

এখন শুধু ছোট দুজনের পরনেই ইস্কুলের সাজ। হেলার জামা আগের মতোই নীল, কিন্তু সরকারী ইস্কুলের ভাল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্থান লাভ করার গৌরবে মানিয়ার গায়ে মেরুণ রঙের জামা। গতবছর এই একই ইস্কুল থেকে মানিয়ার দিদি ব্রনিয়া সগৌরবে স্বর্ণপদক নিয়ে পাশ ক'রে বেরিয়েছে।

ব্রনিয়া ইস্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে এখন 'তরুণী'। সংসারের তত্ত্বাবধানের ভার আজ তার উপর। মাইনে করা বোডিংয়ের লোকদের সে বিদায় করেছে, কাজের লোকদের নিয়ে ঝামেলা বেশী। বইপত্র গুছিয়ে রাখা, বোডিংয়ের ছেলেমেয়েদের দেখা শোনা করা, একাই সে সব সামলায়। নতুন নতুন ছেলেমেয়েরা বোডিংয়ে আসে, কেবল নাম ও চেহারার বদল হয় মাত্র। বড়দের মতো এখন সে খোঁপা বাঁধে, অসংখ্য ছোট ছোট বোতাম, আর লম্বা ঝালর দেওয়া পা-ঢাকা স্কার্ট পরে।

ব্রনিয়ার মতো যোসেফও স্বর্ণপদক পেয়ে ইস্কুলের পড়া শেষ ক'রে এখন মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেছে। যোসেফ হলো এদের একমাত্র ভাই, তার প্রতি বোনদের মনে রয়েছে শ্রদ্ধা আর সেই সঙ্গে বুঝি একটু ঈর্ষাও। ওরা ভাবে দাদার কি ভাগ্য! অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার অধিকারিণী এই বোনেরা মহিলা-সংস্পর্শ-বিবর্জিত ওয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়কে অভিসম্পাত দেয়। 'জারের বিশ্ববিদ্যালয়' যদিও অতি সাধারণ ব্যাপার, তবু তো উদ্যোগী রুশ ও তাঁদের অধীনস্থ পোল শিক্ষকরা সেখানে পড়ান! এ হেন স্থানে তাদের দাদা পড়তে যায়। অবাক বিস্ময়ে তিন বোনে দাদার মুখে সেখানকার সব গল্প শোনে।

কথার ফাঁকে কিন্তু খাওয়ার বিরাম নেই! রুটি, মাখন, জ্যাম, দুধের সর নিমেষে অন্তর্হিত হচ্ছে। যেন কত বড় কাজের কথা সে বলছে এমনি মুখের ভাব ক'রে হেলা বলে: 'আজ রাতে নাচের ইস্কুলে যেতে হবে; সাথী হিসেবে তোমায় আমাদের সঙ্গে যেতে হবে কিন্তু। ব্রনিয়া, আমার এই পোশাকেই চলবে, কি বলিস? না হয় একটু ইস্ত্রি ক'রে নেব'খন।'

দার্শনিকের মতো গম্ভীর স্বর ব্রনিয়ার: 'যেহেতু তোমার আর পোশাক নেই, এইতেই চালাতে হবে। তিনটের সময় বাড়ি ফিরে এস, তারপর দেখা যাবে।'

মানিয়া দৃঢ়স্বরে বলে: 'জামাটা তোমার বাস্তবিকই সুন্দর দিদি।'

'পাকাবুড়ি! তুই এসবের কি বুঝিস!'

প্রভাত-অধিবেশনের সমাপ্তি-সঙ্গীত শোনা গেল। ব্রনিয়া টেবিল পরিষ্কার ক'রে ফেলে, বগলে কাগজপত্র নিয়ে যোসেফ চলে যায়, হেলা আর মানিয়া রান্নাঘরের দিকে তাড়াতাড়ি ছুটে যায়: 'আমার রুটি, মাখন কোথায়? সার্দিল্‌কি কোথায় রে? কই মাখনটা গেল কোথায়?'

প্রচুর প্রাতঃরাশ নিঃশেষ করেও নবীনারা খাবারের কথা ভোলে না। কাপড়ের ব্যাগের মধ্যে পুরে তারা ছুটির খাবার নেয়। রুটি আপেল আর পোলদেশের নামকরা সসেজ 'সার্দিল্‌কি'।

খাবারের থলির মুখ টেনে বন্ধ ক'রে ইস্কুলের ব্যাগের মধ্যে পুরে সবশুদ্ধ পিঠে ফেলে মানিয়া। 'তাড়াতাড়ি কর, তোদের জন্য দেখছি দেরী হয়ে যাবে।' তৈরি হ'তে হ'তে হেলা বলে।

'মোটেই না, এই তো সবে সাড়ে আটটা। আচ্ছা চল।'

সিঁড়িতে বাবার দুই বোর্ডার ছাত্রের সঙ্গে দেখা, ইস্কুলে চলেছে, তবে হেলার মতো এত তাড়া নেই তাদের। শৈশব, কৈশোর জুড়ে শুধু একই ধরনের ক'টি কথার পুনরাবৃত্তি: 'ইস্কুল, বোর্ডিং,...'

অধ্যাপক শ্‌ক্লোদোভস্কি পড়ান। ব্রনিয়া ওখানকার পাঠ শেষ করেছে, মানিয়া সেখানে যেতে শুরু করেছে, হেলা মাদ্‌মোয়াজেল সিকোর্স্কার বোর্ডিং-ইস্কুলে যায়, যোসেফ যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে। এমনকি তাদের বাড়িটাকেও একটা ইস্কুলই বলা চলে। মানিয়া ইতিমধ্যেই বুঝেছে যে সংসারটা মস্ত বড় একটা ইস্কুল, শিক্ষকরা পড়ান, ছাত্ররা পড়ে, আর জীবনের একটি মাত্র উদ্দেশ্য হলো পড়া, শুধুই পড়া।

কার্মেলাইট স্ট্রীটের বাসা বদল ক'রে লেশেন্‌ স্ট্রীটে এসে বোর্ডিংয়ের ছেলেমেয়েরা একটু যেন হাঁফ ছাড়তে পারছে। এ বাড়িটা বেশ সুন্দর। সামনের দিকে একটা বাহার রয়েছে···ছোট্ট একটা বাগান, বাগানে ছাই রঙের পায়রাগুলো বক্‌বকম্‌, বক্‌বকম্‌ ক'রে ঘুরে বেড়ায়। দোতলার ছোট-বড় বারান্দা থেকে ভার্জিনিয়া লতার ঝাড় নেমেছে। বোর্ডিংয়ের

ব্যবস্থা বাদে আরও চারখানা বড় বড় ঘর শ্ক্লোদোভস্কি পরিবার নিজেদের ব্যবহারের জন্য পেয়েছেন। বাড়ির সামনে চওড়া ফুটপাত থাকায় লেশেন্ স্ট্রীট পাড়াটার একটা আভিজাত্য ছিল। শ্লাভ জাতির রুচির প্রকাশ অবশ্য এখানে তেমন আশা করা যায় না। বরং উল্টো পাশ্চাত্য সভ্যতার ছাপ রয়েছে এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে। রিমান্স্কা স্ট্রীটের মস্ত মস্ত থাম দেওয়া ফরাসী প্যাটার্ণের বাড়ির উল্টোদিকে ক্যাল্ভিনিস্ট গির্জাটি পোল্যাণ্ডে নেপলীয় স্থাপত্য প্রভাবের একটি উদাহরণ বহন ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। আজ অবধি এই প্রভাব ওদেশে বর্তমান।

কাউন্ট জামোয়স্কির "নীল প্রাসাদ" লক্ষ্য ক'রে ছুটে চলেছে মানিয়া, পিঠে তার ইস্কুলের ব্যাগ। প্রকাণ্ড লোহার ফটকটা এড়িয়ে, অপেক্ষাকৃত প'ড়ো উঠোনখানা পেরিয়ে সে চলেছে। এদিকটায় একটা ব্রোঞ্জের তৈরি সিংহ যেন পাহারায় বসে আছে। একটু থমকে থেমে দাঁড়াল সে, কই, কেউ নেই তো! স্নেহ-কোমল কণ্ঠে কে যেন তাকে ডাকল: 'মান্যুসিয়া পালিয়ো না, কাজিয়া এই এল বলে।'

'অনেক ধন্যবাদ মাদাম, সুপ্রভাত মাদাম।'

কাউন্ট জামোয়স্কির লাইব্রেরিয়ানের স্ত্রী মাদাম প্রিজিবোরোভস্কি এক-তলার একটা জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালেন। ভদ্রমহিলার মাথা ঘিরে ঘন চুলের বিনুনী। গত দু'বছর যাবৎ তাঁর মেয়ের সাথী এই কিশোরী শ্ক্লোদোভস্কা মেয়েটি। তার নিটোল মুখখানার দিকে স্নেহার্দ্র চোখ মেলে চেয়ে রইলেন।—'আজ বিকেলে আমাদের সঙ্গে চা খাবে—কেমন? তোমার প্রিয় খাবার "পাস্জকি" আর ঠাণ্ডা চকোলেট ক'রে দেব।'

সিঁড়ি দিয়ে দুম্দাম্ ক'রে নেমে এসে বন্ধুর হাতখানা খাবলা মেরে ধরল কাজিয়া।

প্রতিদিন সকালে ইস্কুলের পথে মানিয়া কাজিয়াদের গাড়িবারান্দায় এসে ওর জন্য অপেক্ষা করত। মানিয়া যেদিন এখানে কাউকে দেখতে পেত না, সেদিন সিংহের মুখে পরানো লোহার আংটাটি পেছনে ঠেলে জন্তুটার নাকের ডগায় তুলে দিয়ে ইস্কুলে যেত। কাজিয়া এই আংটা দেখে বুঝতে পারত মানিয়া ইস্কুলে চলে গেছে এবং তাকে ধরার জন্যে পা চালিয়ে যেত।

কাজিয়া মেয়েটি ভারী মিষ্টি। প্রাণবন্ত, ছোট্ট হাসি খুশি মেয়েটির বাপ মা তাকে আহ্লাদ দিয়ে মাথা খাচ্ছিলেন। মসিয়ে ও মাদাম প্রিজিবোরোভস্কিও মানিয়াকে সত্যিই ভালবাসতেন। আহা মা-মরা মেয়েটি যদি মায়ের শোক-

ভোলে। কিন্তু মেয়ে দুটিকে একটু খুঁটিয়ে দেখলেই তফাৎটা চোখে পড়ত। একটির চুল আঁচড়ানো, মাথায় রিবন বাঁধার কায়দার মধ্যে ছিল মায়ের সযত্ন স্পর্শের আভাস। অন্য মেয়েটি মাত্র সাড়ে-চোদ্দ বছর বয়সে সম্পূর্ণ নিজে নিজে এমন এক পরিবেশে মানুষ হচ্ছিল যেখানে কাউকে হাতে ক'রে দেবার কেউ ছিল না।

সঙ্কীর্ণ জাবিয়া স্ট্রীটটা ওরা হাত ধরাধরি ক'রে পেরিয়ে এল। গতকাল বিকেলের পর থেকে দু'জনের দেখা হয় নি, কত দরকারী কথাই না জমা হয়ে আছে! ইস্কুলকে কেন্দ্র ক'রে ওদের অজস্র ছোট-খাট কথার ঢেউ বইত। ক্রাকোভস্কি বুলেভার্ডএর এই রুশ ইস্কুল প্রথমে জার্মান ছেলেমেয়েদের জন্যে তৈরি হয়েছিল এবং আজ অবধি সেখানে জার্মান নিয়মকানুনই চালু আছে। মাদ্‌মোয়াজেল সিকোর্স্কার পোলভাষা-প্রধান ইস্কুলে পড়ার পর সম্পূর্ণ রুশ ভাষা ভিত্তিক ইস্কুলের ছাত্রী হওয়া মানেই বিড়ম্বনার মধ্যে পড়া। এ না ক'রে উপায়ও ছিল না, কারণ এরাই একমাত্র সরকারি মানপত্র দেবার অধিকারী। এখানে ছাত্রীদের তত্ত্বাবধানের ভার ছিল মাদ্‌মোয়াজেল মেয়েরের ওপর। তাঁকে ওরা অত্যন্ত বিতৃষ্ণার চোখে দেখত।

বেঁটে কালো মহিলা, মাথায় তেলচিটে চুল, গুপ্তচরের মতো নিঃশব্দে হাঁটেন; এই মহিলাটির মানিয়াকে কেন জানি প্রথম থেকেই ভাল লাগে নি। মানিয়া প্রতিটি কাজের জন্যে তাঁর কাছে বকুনি খেত। বিশেষ ক'রে মানিয়ার কোঁকড়া চুলের ওপর তাঁর বিদ্বেষটা যেন ছিল বেশী।

দিনের পর দিন এই তিরিক্ষি মেজাজের অবিবাহিতা শিক্ষয়িত্রীটি আর বিদ্রোহী ছাত্রীটির মনের মধ্যে এক নিঃশব্দ মানসিক দ্বন্দ্বের ঝড় চলল। গতবছর এর চরম একদফা হয়ে গেছে। শিক্ষয়িত্রীটি হঠাৎ ক্লাসে ঢুকে দেখেন মানিয়া আর কাজিয়া ডেস্কের ফাঁকে ফাঁকে নেচে বেড়াচ্ছে।—ব্যাপার কি? না,—জার আলেকজান্দার আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছে, সারা দেশ এই আঘাতে তখন শোকাচ্ছন্ন, আর এরা কিনা নাচছে!

রাজনৈতিক অত্যাচারের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে জনসাধারণের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বিদ্রোহের ভাব আসে। শত্রুপক্ষের বিপত্তিতে মানিয়া আর কাজিয়ার মতো ছোট মেয়েরাও যেন খুশী; এ মনোভাব, এ চাপা আনন্দ স্বাধীন দেশের অনেকের পক্ষে কল্পনা করা মুশকিল। স্বাভাবিক কোমল অন্তরের অধিকারিণী হওয়া সত্ত্বেও এই মেয়েদের জীবনধারা যেন একটি বিশেষ নীতি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল, যেখানে মনে হয় ঘৃণাই পুণ্য, বাধ্যতাই দুর্বলতা।

এরই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ওদের প্রিয় সম্পদগুলির ওপর গভীর ভালোবাসার প্রকাশ দেখতে পাই। গণিতের অধ্যাপক সুপুরুষ মঁসিয়ে গ্লাস এবং প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অধ্যাপক মঁসিয়ে স্লোসারস্কির ওপর এদের শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। এঁরা পোলদেশীয় সহৃদয় শিক্ষক। রুশ শিক্ষকদের মধ্যেও অনেক হৃদয়বান অধ্যাপক ছিলেন। যেমন, অধ্যাপক মিকিয়েজিন। যেই দেখলেন একটি ছাত্রী পড়াশোনায় বেশ ভাল, অমনি নিঃশব্দে তার হাতে বিপ্লবী কবি নেক্রাসভের একখানা কবিতার বই গুঁজে দিলেন। হতবাক ছাত্রী সবিস্ময়ে দেখে প্রতিপক্ষ দলের কার্যকলাপ, দেখে তাদের একতা। পুণ্য রুশ দেশে তাহলে প্রত্যেকেই এমন কিছু জার-ভক্ত প্রজা নয়!…

মানিয়ার ক্লাসে পোল, ইহুদি, রুশ, জার্মান—সব দেশের মেয়ে পাশাপাশি নিশ্চেন্তে বসে পড়াশোনা করত। জাতি ধর্মের ভেদাভেদ, তাদের তারুণ্য, তাদের ইস্কুলের প্রতিযোগিতার নীচে সাময়িকভাবে চাপা পড়ে যেত। পরস্পরের পাঠে সাহায্য করা, ছুটির সময়ে তাদের খেলাধুলো দেখলে তাদের মধ্যে যে কোনরকম জাতিগত তফাত থাকতে পারে, তা বোঝাই যায় না। কিন্তু ইস্কুল ছুটির সঙ্গে সঙ্গে যে যার নিজের জাতি ধর্ম ভাষায় ফিরে যেত। অন্যদের চেয়ে পোল মেয়েরাই যেন ছিল বেশী আত্ম-সচেতন, কারণ তাদের দেশে তাদের নিজেদের অবহেলা ও অপমান তাদের আঘাত দিত বেশী ক'রে। তারা ছোট ছোট দলে পরস্পরের চায়ের টেবিলে জটলা পাকাত, এসব ক্ষেত্রে রুশ বা জার্মান মেয়েদের তারা আহ্বান করতো না। এই দল বেঁধে চলার জন্য তাদের অসুবিধা এবং বিপদও হতো বৈকি সময়ে সময়ে।

তাদের চোখে সব কিছুই নিন্দনীয় ঠেকত। হয়তো বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোন বিদেশীনীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল, কিংবা ঘৃণ্য 'সরকারি বিত্তের' জাহাজ ও-তরফের কোন শিক্ষক বিজ্ঞান বা দর্শন খুব ভাল পড়ান, তাঁর পড়ার ধরনে মনটা খুশী হয়ে ওঠে;—কিন্তু তাতে জাতীয়-চেতনায় লাগে আঘাত আর তারই ফলে এ ভালো-লাগাও অপরাধ বলে মনে হয়। এবং এরই নিদর্শন দেখি মানিয়ার একখানা চিঠিতে।

গ্রীষ্মের ছুটিতে মানিয়া কাজিয়াকে চিঠিতে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে একটি লজ্জাকর ব্যাপার স্বীকার করে: 'জানিস কাজিয়া, এসব সত্ত্বেও ইস্কুলটা কিন্তু আমার ভালোই লাগে। তুই আমায় যা' তা' বলবি জানি, কিন্তু তবু না ব'লে পারছি না যে, আমি এই ইস্কুলটাকে সত্যিই ভালোবাসি। এতদিনে এই কথাটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে এর বিরহে আমি মরে যাব, এ কথা ভেবে

নিস না যেন! কিন্তু শিগগিরই আবার ফিরে যেতে হবে ব'লে মোটেই খারাপ লাগছে না। আরও দু'বছর এই ইস্কুলে কাটাতে হবে, আগে একথা ভাবতে যতটা কষ্ট হতো, এখন আর তা' হয় না।'

লাজিন্স্কি পার্কের সঙ্গে লাগোয়া স্যাক্সনি গার্ডেন মানিয়ার প্রিয় বাগান। অবসর পেলে অনেক সময় সে এখানে কাটিয়ে দিত। (···ভবিষ্যতে বহুকাল পর্যন্ত এই শহর সম্বন্ধে উল্লেখ করতে গেলে এই উদ্যানের কথা মনে ক'রে 'আমার প্রিয় ওয়ার্‌স' বলে যা বলতেন।)···লোহার ফটক দিয়ে প্রবেশ ক'রে, দু'পাশে গাছের সারি ঘেরা পথটুকু পেরিয়ে মানিয়া আর কাজিয়া প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চলল। মাস দু'য়েক আগে পর্যন্ত দুই বন্ধু কাদার মধ্যে ছপছপ ক'রে খেলা করেছে।

স্যাক্সনি স্কোয়ারের ঠিক মাঝখানে চারটি পাথরের সিংহ মূর্তি সম্বলিত একটা চৌকোণা স্মৃতিস্তম্ভ আছে। তার চুড়োটা পিরামিডের মতো। গায়ে রুশ ভাষায় খোদাই করা আছে: "সম্রাটের প্রতি বিশ্বস্ত পোলদিগের জন্য।" যে সব পোল স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে উৎপীড়ক সম্রাট-গোষ্ঠীর পদলেহন করতো, জারের তরফ থেকে তাদের প্রতি সম্রাটের এই উপহার স্বাভাবিকভাবেই দেশপ্রেমিকদের মনে পীড়া জাগাত এবং এই আক্রোশে তারা এই সিংহ মূর্তির পাশ দিয়ে যাবার সময়ে এর গায়ে থুতু ফেলে যেত। এবং এটাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্যমনস্কতার জন্য যদি কেউ ভুলে যেত, সে পরে একসময় এসে থুতু ফেলে যেত।

দুই বন্ধুও ভুলে গিয়েছিল এবং যেই মনে পড়ল, তৎক্ষণাৎ নিজেদের ত্রুটি সংশোধন ক'রে নিয়ে নিজেদের কথায় ফিরে গেল।

মানিয়াই প্রথমে কথাটা তোলে। 'ওরা আজ বাড়িতে নাচগান করবে, দেখতে আসবি?'

কাজিয়ার উৎসাহ অনুযোগের সুর পায়: 'নিশ্চয়, আঃ মান্যুসিয়া, কবে যে আমরা নাচবার অনুমতি পাব? আমরা এখনি তো বেশ ওয়াল্‌স্ নাচতে পারি!'

কখন? ইস্কুলের পাঠ শেষ ক'রে বেরিয়ে আসার আগে তো নয়ই। ওরা এখন নিজেদের মধ্যে শুধু অভ্যাস করতে পারে আর ইস্কুলের নাচের শিক্ষকের কাছ থেকে লান্সার্স, পোল্কা, মাজুর্কা আর ওবেরেক্ শেখার অনুমতি পেয়েছে। শ্‌ক্লোদোভস্কিদের বাড়িতে হপ্তায় একদিন ক'রে নাচের ক্লাস হতো, পরিচিত

অনেক বাড়ির ছেলেমেয়েরা এই সময়ে এ বাড়িতে এসে জমা হতো। এদের নাচের সময়ে ছোট্ট ছোট্ট চেয়ারে বাচ্চারা বসে বসে দেখত।

কিন্তু সভায় নাচতে হলে তার আগে এখনও আরো কয়েক মাস অভ্যাস করতে হবে। এতক্ষণে মেয়ে দু'টি ইস্কুলের কাছে এসে পড়েছে। ইতালীয় রেনেসাঁ যুগের সূক্ষ্ম কারুকার্য খচিত বিরাট তেতলা বাড়িটা পরবর্তীযুগের অন্যান্য সাদামাটা বাড়িগুলির মধ্যে গা-ঢাকা দিয়েই যেন দাঁড়িয়ে আছে। ওদের সঙ্গীসাথীর দল এরই মধ্যে গাড়ি-বারান্দায় জমায়েৎ হয়েছে। ঐ তো নীলাক্ষি সেই মেয়েটি, উল্‌ফ না কি নাম! আনিয়া রোতার্ত, জার্মান মেয়ে, ক্লাসে মানিয়ার পরে সেই তো সেরা মেয়ে। আর লিওনি কুনিচকা; সেও তো রয়েছে।

কিন্তু কুনিচকার হলো কি? ওর চোখ দুটো যে কেঁদে কেঁদে ফুলে গেছে! ও তো রোজই কেমন সুন্দর পরিপাটি পোশাক পরে, আজ ওর কাপড়-চোপড়ের এ দুরবস্থা কেন?

মানিয়া আর কাজিয়া হাসি বন্ধ ক'রে বন্ধুর দিকে দৌড়ে গেল। 'কি হলো রে কুনিচকা—ব্যাপার কি?'

কুনিচকার মুখ সাদা ফ্যাকাশে। অনেক কষ্টে সে বলল: 'আমার দাদা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল…ওর পেছনে হুলিয়া ছিল…আজ তিন দিন ধরে আমরা ওকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না…'

কান্নায় ভেঙ্গে প'ড়ে বেচারী কথাটা কোন মতে শেষ করে: 'দাদা বলে ধরা পড়েছে, কাল ওর ফাঁসি হবে।'

ভীত, স্তম্ভিত দুই বন্ধু নানা কথায় এই হতভাগিনীকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছিল, হঠাৎ মাদ্‌মোয়াজেল মেয়ারের খনখনে গলা শোনা গেল: 'এই মেয়েরা, অনেক বক্‌বক্ হয়েছে, এবার পা চালিয়ে এস তো সব।'

দুঃখে অভিভূত হয়ে মানিয়া নিজের জায়গায় চলে গেল। এইমাত্র ও নাচগানের স্বপ্ন দেখছিল! কানের পাশ দিয়ে ভূগোল-পড়া গড়গড়িয়ে এগিয়ে চলেছে, কিন্তু ওর চোখের ওপর ভেসে উঠছে শুধু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একখানা তরুণ মুখের ছবি, ফাঁসি কাঠ, ঘাতক আর একখানা ফাঁসির দড়ি। সেই রাত্রে নাচের ক্লাসে না গিয়ে বছর পনেরোর দু'টি মেয়ে বন্ধু কুনিচকার ছোট্ট ঘরটিতে এসে জড়ো হলো। মানিয়া, হেলা, ব্রনিয়া, কাজিয়া আর তার বোন উলা—ওরা আজ রাতটা কুনিচকার কাছে থেকে ওকে সান্ত্বনা জানাবে।

ক্ষুদে মেয়েদের বিদ্রোহী আত্মা যেন চোখের জলে মুক্তি পায়। বন্ধুর প্রতি

স্নেহ ভালোবাসা উজাড় ক'রে ঢেলে দিল, তার চোখে মুখে জল দিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করল, গরম চা ক'রে খাওয়াল। এই নিদারুণ রাত জেগে ওরা ঘড়ির ঘন্টা শুনল, কখনও দ্রুত, কখনও বা ধীর মন্থর, ঘড়ি যেন চলেছে ওদের মনের সঙ্গে তাল রেখে। ছ'টি বালিকা, তাদের মধ্যে চারটির পরনে ইস্কুলের টিউনিক। প্রত্যুষের যে ক্ষণটি এই ভয়ঙ্কর ঘটনার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল সেই সময়টিতে ভয়ে বিবর্ণ ছয়টি বালিকা হাঁটু গেড়ে ব'সে নিদারুণ আতঙ্কে দুই হাতে মুখ ঢেকে ভগবানের দরবারে শেষ-প্রার্থনা জানাল।

শ্ক্লোদোভস্কি পরিবারে একটি দুটি ক'রে তিনটি স্বর্ণপদক এসে জমা হলো।...তৃতীয়টি মানিয়ার। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন সেকেণ্ডারি ইস্কুল শেষ ক'রে মানিয়া এই পদক নিয়ে এল।

অসহ্য গ্রীষ্মের মধ্যে এই পুরস্কার-তালিকা পড়া হলো। বক্তৃতা, বাদ্যযন্ত্রের সমারোহ, শিক্ষিকাদের অভিনন্দনের মাঝে রুশীপোল্যাণ্ডের শিক্ষা-বিভাগের কর্তা আপুস্তিনের সঙ্গে করমর্দন ক'রে মানিয়ার ইস্কুল-পর্ব শেষ হলো। পরনে কালো পোশাক ··· কোমরের কাছে এক গুচ্ছ গোলাপ ফুল; বালিকা মানিয়া সবার কাছ থেকে বিদায় নিল। বন্ধুদের প্রতিসপ্তাহে চিঠি দেবার প্রতিশ্রুতি দিল, পুরস্কার পাওয়া একরাশ রুশ বই সম্বন্ধে রীতিমত গলা ছেড়েই যা' তা' মন্তব্য ক'রে (—এই তো শেষ দিন, আর ভয় কাকে?) ক্রাকোভস্কি বুলেভার্ডের ইস্কুল থেকে বেরিয়ে এল। সঙ্গে চললেন স্নেহধন্য পিতা···কন্যার গৌরবে তাঁর মন অভিভূত। মানিয়া খুব খেটে খুব ভালো করেছে। অধ্যাপক শ্ক্লোদোভস্কি স্থির করলেন অর্থ উপার্জনের পথ নির্দিষ্ট করার আগে কন্যাকে বছর খানেকের জন্য দেশে পাঠিয়ে দেবেন।

এক বছরের ছুটী!···আপনারা হয়তো মনে করবেন এই প্রতিভাশালী মেয়েটি জীবনের কর্তব্য স্থির ক'রে নিয়ে বিজ্ঞান চর্চা শুরু ক'রে দিল। না, তা নয়। ছোট থেকে হঠাৎ বড় হওয়ার মাঝে এই রহস্যময় সময়টাতে মানিয়ার শারীরিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখখানিও সুন্দর হয়ে উঠল এবং তারই ফাঁকে কেমন এক আলসেমি যেন তাকে পেয়ে বসল। ইস্কুলের বইখাতা ফেলে দিয়ে জীবনে সে এই প্রথম অলসতার নেশায় বুঁদ হয়ে রইল।

অধ্যাপক-কন্যার জীবন-প্রবাহের মাঝে এক সাময়িক বিরতি দেখা দিল। কাজিয়াকে সে লিখল: 'বীজগণিত বা জ্যামিতি নামক কোন বিষয় কোন দিন পড়েছি বলে মনেও পড়ে না। আমি সব কিছু ভুলে বসে আছি।' ওয়ার্স ও

তার ইস্কুল থেকে এখন সে বহুদূরে গ্রাম্য আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পড়ে আছে, তাঁরা তাদের ছেলে মেয়েদের যেমন তেমন একটু পড়াবার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন, সেও থাকা-খাওয়া বাবদ যৎসামান্য কিছু দিয়ে স্রেফ বেঁচে থাকার আনন্দে মজে রইল।

কি অফুরন্ত বিশ্রাম! হঠাৎ এত আনন্দ, এত প্রাণ সে পেল কোথায়? মনে হয় ছেলেবেলায় অন্ধকার ঘেরা দিনগুলো যেন কতদূরে ফেলে এসেছে! শুধু ঘুম আর বেড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে মাত্র একটুখানি শক্তি সে খরচ করতো বন্ধুর কাছে জীবনের এই অফুরন্ত মাধুর্য বর্ণনা ক'রে: 'আমার প্রাণ-প্রতিম ক্ষুদে শয়তান!' কিংবা 'কাজিয়া, প্রাণ আমার!' এই জাতীয় সম্বোধন থাকত চিঠির মাথায়।

এই সময়ে কাজিয়াকে লেখা মানিয়ার চিঠির একটা টুকরো:

'দিনে এক ঘণ্টা ক'রে একটি ছেলেকে পড়ানো ছাড়া আমার আর কোন কাজ নেই রে। যে চিকনের কাজটা শুরু করেছিলাম, তাও ফেলে রেখেছি। কোন নিয়মও আমার নেই। কোন দিন দশটায় ঘুম থেকে উঠি, কোনদিন বা ভোর চারটে কি পাঁচটায় (সন্ধ্যে বেলা নয় অবশ্য!)। কোন গভীর বইয়ের ধার কাছ দিয়েও যাই না, হাল্কা নভেল পড়ি। নিজের এই কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হয় আমার বড় হওয়ার দায়িত্ব আর সম্মান বয়ে আনা ডিপ্লোমাগুলো বৃথাই গেছে। কখনও কখনও নিজের মনেই হাসি এবং বলতে কি, জানিস, আমার মনে হয়, আমার এই সম্পূর্ণ অর্থহীন জীবনধারা আমায় যেন পরম তৃপ্তি দেয়। দল বেঁধে আমরা বনে যাই, চাকা ঘুরিয়ে তার পেছন পেছন লাঠি নিয়ে ছুটি, ব্যাডমিণ্টন খেলি, (যদিও আমি খুব খারাপ খেলি,) চোর-চোর খেলি, পাতিহাস-পাতিহাস খেলি, আরও যে কত রকম খেলা চলে না আমাদের মধ্যে! এখানে স্ট্রবেরি ফলের ছড়াছড়ি। কয়েকটা পয়সা দিলেই প্রচুর পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় স্ট্রবেরির সময় শেষ হয়ে এল। কিন্তু আমার ভয় কি জানিস? আমি যখন ফিরে যাব, তখন আমার ক্ষিদে অসম্ভব রকম বেড়ে যাবে, আমার খাওয়ার পরিমান দেখে তোরা মূর্ছা যাবি।...

'প্রায় সারাদিনই দোলনায় দোল খাই, খুব জোরে জোরে দুলি। নদীতে স্নান করি, মাছ ধরি, কুচো চিংড়ি ধরার জন্যে টর্চ নিয়ে যাই আর সেই সঙ্গে পাদ্রীসাহেবদের সঙ্গেও দেখা ক'রে আসি। তাঁদের মধ্যে দু'জন বেশ হাসি খুশি মজার মানুষ, তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতে খুবই ভাল লাগে।...

'কয়েক দিনের জন্যে আমি আবার জ্যোলায় বেড়িয়ে এলাম। সেখানে এক অভিনেতা মঁসিয়ে কোটার্‌বিন্‌স্কির সঙ্গে বেশ আলাপ হলো। তিনি আমাদের গান শোনালেন, কবিতা শোনালেন, কত মজার মজার গল্প বললেন, আমাদের সঙ্গে গুজবেরি কুঁড়োলেন। ওঁর যাবার দিন পপি, বুনো পিংক আর কর্ন-ফ্লাওয়ার দিয়ে এক প্রকাণ্ড মুকুট তৈরি করলাম। গাড়িটা যেই ছেড়েছে অমনি আমরা ওঁর দিকে সেই মুকুটটা ছুঁড়ে দিয়ে, 'জয়! মঁসিয়ে কোটার্‌বিন্‌স্কির জয়!' ব'লে চেঁচিয়ে উঠলাম। তক্ষুনি তিনি সেটিকে মাথায় পরলেন এবং পরে খুলে সুটকেসে ঢুকিয়ে ওয়ার্‌স অবধি বয়ে নিয়ে গেলেন। আঃ, জ্যোলায় যে কি আনন্দ করেছি না সে আর কি লিখবো! সব জায়গাতেই বহু লোক আর এমন অবাধ মুক্তি, লাগামহীন আজাদী—সে তুই কল্পনাও করতে পারবি না।... আমরা যখন ফিরে আসছি ল্যান্‌সেট কুকুরটা এমন চেঁচাতে লাগল যে, অমঙ্গল আশঙ্কায় মনটা ভারী হয়ে রইল।...'

এই বছরটিতে বেকার মানিয়ার জ্ঞানতৃষ্ণা যখন কিছু পরিমানে শিথিল হয়ে এসেছে, সেই সময়ে বালিকার মধ্যে একটা নতুন কিছুর প্রতি আসক্তি দেখা দিল এবং সে-আসক্তি ক্রমে অনুরাগে পরিণত হয়ে তার সারা জীবনে পরিব্যাপ্ত হয়ে রইল। এ হলো তার দেশের মাটির প্রতি টান।

তার জন্মভূমির বিভিন্ন স্থানে আপনজন ছড়িয়ে আছে। সেই জন্মভূমির বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন ঋতুতে তার চোখের সামনে প্রকৃতি রূপের ডালি সাজিয়ে বসে, সে মন প্রাণ ভরে তাই উপভোগ করে। জ্যোলার শান্ত পরিবেশে বৈচিত্র নেই, আছে প্রসারতা, আছে দিকচক্রবালের বঙ্কিম রেখা—যা ছুনিয়ার আর কোন জায়গাতে বোধহয় এত সুদূর প্রসারী বলে মনে হয় না। জাউইপরজয়স্কে-জমিদারীর চার পাশ ঘিরে প্রকাণ্ড খোলা মাঠ, সেখানে চরে বেড়ায় সাভিয়ে কাকার সেরা জাতের ঘোড়াগুলো। খুড়তুতো বোনদের পোশাক পরে মানিয়া ঘোড়ায় চড়তে শিখল। বেমানান পোশাক কিন্তু তাতে কি এসে যায়? দিব্যি সুন্দর চালে ঘোড়ায় চড়তে শিখল মানিয়া।

কিন্তু কার্পেথিয়ান পাহাড় দেখে মানিয়া একেবারে অভিভূত হয়ে গেল। সমতল ভূমির কন্যা সে, তুষারাবৃত পর্বতচূড়ার চোখ ঝল্‌সানো সাদা রং আর ঐ কালো কালো ফার গাছগুলো তাকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত ক'রে দিল। পায়ের নীচে পাহাড়ী ফলের কার্পেট, পাহাড়ীদের হাতে তৈরি অপূর্ব খোদাই করা কাঠের কুটীরগুলো, চারদিকে পাহাড়ের চুড়োয় ঘেরা ছোট্ট বরফ ঢাকা হ্রদ, আর কি

অপূর্ব নাম তার,—'সমুদ্রের চোখ!'—এই ছবিগুলি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মানিয়ার মনের কোণে আঁকা ছিল। এই তুষার রাজ্যের সীমান্তে স্কালব্‌স্নিয়ার্জ শহরে মানিয়ার কাকা জদ্‌জিস্লাভ গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। সব কিছুতে বেশ হৈ চৈ করা এই পরিবারের অভ্যাস ছিল। এদের মাঝে মানিয়া শীতকালটা কাটিয়ে দিল। বাড়ির কর্তা ভারি হাসিখুশি মানুষ; স্ত্রী, তিন কন্যা সবাই মিলে সারাদিন হাসিতে খুশিতে দিন কাটিয়ে দেয়। এদের মাঝে মানিয়ার ক্লান্তি আসে কোত্থেকে? হপ্তায় হপ্তায় নতুন কোন অতিথির আগমন, ভোজের আয়োজন, হৈ-চৈ লেগেই থাকত। বড়োরা আগামী উৎসবের জন্যে পাখী শিকার ক'রে মশলা দিয়ে জারিয়ে রাখতেন, ছোটরা কেক্ তৈরি করত, কিংবা নিজেদের ঘরে গিয়ে তাড়াতাড়ি রঙবেরঙের জামায় কিছুটা রিবন জুড়ে নিত যাতে সামনের নেমন্তন্নের দিনে তাদের চেনা না যায়।

এই 'কুলিগ' কিন্তু শুধু বল্‌নাচের আসর নয়। কার্নিভালের মতো পাগল-করা উত্তেজনাময় এক উৎসব। সন্ধ্যেবেলা মানিয়া আর তার তিনটি বোন ক্রাকাওর চাষী মেয়ের ছদ্মবেশে দু'খানা স্লেজগাড়ির ছাউনির নিচে আত্মগোপন ক'রে বেরিয়ে পড়ল, মশাল হাতে অপূর্ব সুন্দর গ্রাম্য তরুণের দল চলল ঘোড়ায় চড়ে তাদের সঙ্গে। ফার গাছের ফাঁকে ফাঁকে আরও অনেক মশালের আলো ঝলমলিয়ে ওঠে, শীতের রাত আনন্দের ছন্দে ছন্দে জাগে; বাজনদারদের স্লেজগুলিও সঙ্গ নিল। এল গ্রাম থেকে চার জন ইহুদি। আগামী পুরো ছুটি দিন রাত ধরে ওয়ালস্, ক্রাকোভিয়াক্, মাজুর্কা, ইত্যাদি মন ভোলানো নব সুর এরা বেহালা থেকে বের করবে, আর নিমন্ত্রিতের দল তার সঙ্গে যোগ দিয়ে এক তাণ্ডব নাচের আসর জমিয়ে তুলবে। ইহুদি বাদকরা বাজাতেই থাকবে—ক্রমে ক্রমে আরও তিনটি, পাঁচটি, দশটি স্লেজ এই বাজনা শুনে পাল্টা উত্তর দিতে শুরু করবে এবং অবশেষে এদের সঙ্গে এসে যোগ দেবে। বরফের ওপর দিয়ে স্লেজ কখনও লাফিয়ে চলে, কখনও বা গড়গড়িয়ে অনেক হাত নীচে নেমে যায়, কিন্তু সেদিকে এদের কারোর ভ্রূক্ষেপ নেই, তারা চালিয়ে যায় অবলীলাক্রমে, কখনও এতটুকু তালভঙ্গ হয় না। এই অপূর্ব নাচের অভিযানের সমাপ্তি ঘটে এক বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানে এসে। সেখানে স্লেজ থেকে নেমে এরা এক ঘুমন্ত বাড়ির সদর দরজায় আঘাতের পর আঘাত হেনে ঘুম ভাঙ্গায়। গৃহকর্তা অবাক হবার ভান ক'রে সকলকে ভিতরে আসতে অনুরোধ জানান। তখন এই বাজনদারের দল টেবিল জুড়ে বসে পড়ে, নাচ শুরু হয়। মশালের

আলোয়, আর লণ্ঠনের আলোয় নাচ চলতে থাকে। ইতিমধ্যে আগে থেকে তৈরি সব খাবার সাইডবোর্ডের ওপর দেখা দেয়। একটি বিশেষ সঙ্কেতে নিমেষে বাড়ি খালি হয়ে যায়। মুখোশপরা ছেলেমেয়েরা আর সে-বাড়ির বাসিন্দারা খাবারগুলো নিয়ে, ঘোড়ায় বাধা স্লেজ-গাড়ি চেপে সব বেরিয়ে যায় আর সেই নাচিয়ে দল, সংখ্যায় আরও একটু বেড়ে বন বাদাড় পেরিয়ে আর কারও বাড়িতে গিয়ে চড়াও হয়। এই ভাবে একের পর এক বাড়ি শেষ ক'রে আরও নতুন নতুন নাচিয়ে গাইয়ের দল জোটে। সূর্য ওঠে, আবার অস্ত যায়। বাজনদারের দল ক্লান্ত নাচের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এলোমেলোভাবে মিলেমিশে যে-কোনও গোলাঘরের খড়-গাদার ওপর কোন মতে দু'চোখের পাতা এক ক'রে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু দ্বিতীয় রাত্রে যখন স্লেজগুলো ঝন্ঝন্, ধম্ধম্ শব্দে পাড়ার সব চেয়ে বড় বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ায় (—যেখানে আসল 'কুলিগ' নাচের আসর জমবে—) তখন সেই ক্ষুদে ইহুদিরা প্রাণপণ শক্তিতে বেহালার তারে প্রথম ক্রাকোভিয়াক্এর সুর তুলবে—আর বাদবাকীরা অপূর্ব তনুদেহের হিল্লোল তুলে নাচবার জন্য প্রস্তুত হয়ে সার বেঁধে দাঁড়াবে।

সাদা পশমের ওপর হাতের কাজ করা সুন্দর পোশাক পরা এক তরুণ প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল ষোড়শী তন্বী মানিয়াকে সেরা নাচিয়ে দেখে নৃত্যসঙ্গিনী হতে আহ্বান জানাল। মানিয়ার পরনে লন্-এর খোলা হাতা ভেলভেটের পোশাক, মাথায় কচি শস্য গুচ্ছের মুকুট, তার থেকে রঙ-বেরঙের লম্বা রিবন্,—এ যেন উৎসব বেশে কোন্ পাহাড়ী চাষী মেয়ে! কাজিয়াকে এই উচ্ছ্বাসের অংশ না দিলে চলে? ও লিখল তাকে:

'আমি 'কুলিগ' উৎসব থেকে এই ফিরলাম রে। এ-যে কি আনন্দ তা তুই কল্পনাও করতে পারবি না। কি সব সুন্দর সুন্দর সাজ, আর ছেলেরাও কি সুন্দর পোশাক পরে! আমার নিজের পোশাকটিও খুব সুন্দর হয়েছিল। প্রথম বারের পর আরও একটা কুলিগে আমি যোগ দিয়েছিলাম, সেটাতেও খুব মজা হয়েছিল। ক্রাকাও থেকে অনেক সুন্দর ছেলে এসেছিল—আর কি নাচ সব! এ ধরনের ভাল নাচিয়ে ছেলেমেয়ে সহজে দেখা যায় না। সকাল আটটার সময় আমরা হোয়াইট মাজুর্কা নেচে উৎসব সাঙ্গ করলাম।'

এই অচিন্তনীয় অবসরের একটা চূড়ান্ত পরিণতির প্রয়োজন ছিল।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ওয়ার্সতে মানিয়া ফিরে এলে এক মহিলা তার সঙ্গে

দেখা করতে আসেন। ইনি কোঁতেজ-দে-ফ্লুরি, জনৈক ফরাসী ভদ্রলোকের পোল স্ত্রী, মাদাম শ্ক্লোদোভস্কির প্রাক্তন ছাত্রী। তিনি প্রস্তাব করলেন যে, প্রফেসর-কন্যাদের অবকাশ বিনোদনের কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা যখন হয় নি, তখন তাঁর দেশের বাড়িতে দু'মাসের জন্যে বেড়িয়ে আসতে কোন আপত্তি নিশ্চয়ই এদের হবে না।

এই সময়ে মানিয়া কাজিয়াকে লিখেছিল : 'রবিবার এই ঘটনা ঘটে আর সোমবার সন্ধ্যায় হেলা ও আমি রওনা হলাম। স্টেশনে আমাদের জন্য গাড়ি অপেক্ষা করবে ঠিক ছিল।···কেম্পায় ক'য় সপ্তাহ হলো এসেছি, এখানকার বর্ণনা দেওয়া উচিত, কিন্তু সাহস পাচ্ছি না, তাই শুধু বলব অপূর্ব। নারেভ আর বিয়েব্‌র্‌জা নদীর সঙ্গমে এই নগরী অবস্থিত। নদীতে স্নান, নৌকো চালানোতেই তো আমার যত আনন্দ! আর তার প্রচুর সুযোগও আছে এখানে। নৌকো চালানোয় শিখতে হয় খুব, তাই আমি উঠে পড়ে লেগেছি। এছাড়া স্নানের আনন্দ তো আছেই। আমাদের যা' ইচ্ছে তাই করি, কখনও রাতে ঘুমোই, কখনও বা দিনে, আমরা নাচি আর মধ্যে মধ্যে এমন সব কাণ্ড করি যে পাগলাগারদে স্বচ্ছন্দে আমাদের পুরে রাখা যায়।'

কথাটা সত্যি। দুটো শান্ত রূপোলী নদীর বাঁকে এই সুন্দর বাড়িটির ওপর দিয়ে সারা গ্রীষ্মকাল ধরে নির্মল আনন্দের স্রোত বয়ে গেল। ঘরের জানালা দিয়ে দেখা যায় দিগন্তবিস্তৃত সবুজের সমারোহ আর সীমাহীন জলধারা, পপলার আর উইলো গাছের ছায়ায় ঢাকা দুটি ঢালু নদীতট। মাঝে মাঝে জল উপচে এসে শস্যক্ষেত ডুবিয়ে দিয়ে যায় আর তারই ওপর সূর্যের আলোর সোনালী আভা ঝল্‌মল্‌ করে।

হেলা আর মানিয়া খুব সহজেই কেম্পার ছেলে মেয়েদের বশ ক'রে ফেলল। কর্তা ও গিন্নী দু'জনেই ভারী আমুদে। যেই দু'জনে এক জায়গায় হতেন, অমনি বড় বড় গালভরা উপদেশবাণী আওড়াতেন, ছেলেমেয়েদের অত্যধিক দস্যিপনার বিরুদ্ধে অনেক কড়া কড়া মন্তব্য করতেন। কিন্তু বুড়োবুড়ি দু'জনেই দু'জনের চোখের আড়ালে সন্তানদের হৈহুল্লোড় সমর্থন করতেন এবং সর্বান্তঃকরণে তাদের সঙ্গে যোগ দিতেন।

ওরা এখন কি করবে? ঘোড়ায় চড়বে? বনেবাদাড়ে ঘুরে ঘুরে ব্যাঙের ছাতা খুঁজে বেড়াবে? যাঃ, ওসব তো বাজে খেলা! মাদাম দে-ফ্লুরীর ভাই জ্যা-মনুইজকোকে মানিয়া কোন একটা অজুহাতে শহরে পাঠিয়ে দিল, তারপর দলবল জুটিয়ে ভদ্রলোকের যাবতীয় সম্পত্তি—বিছানা, টেবিল, চেয়ার, বাক্স,

কাপড় জামা কড়িকাঠের সঙ্গে লম্বা ক'রে বেঁধে নীচে ঝুলিয়ে দিল। বেচারা ভদ্রলোক রাত ক'রে ফিরে এসে অন্ধকারে শূন্যে ঝোলানো আসবাবপত্রের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়বেন।... তা-ছাড়া, বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের জন্য চা-পার্টিতে ছোট ছেলেমেয়েদের ভিড় করা নিষেধ কিন্তু তাই বা কেমন ক'রে সহ্য হয়? যতক্ষণ অতিথিরা বাগান দেখে বেড়াচ্ছেন, সেই অবসরে তাবৎ ছেলেমেয়েরা পেস্ট্রী জাতীয় ভাল ভাল খাবার উদরস্থ ক'রে, বাকী কোঁচড়ে ভরে নিয়ে উধাও হয়ে যায়। যাবার আগে টেবিলের অবশিষ্ট খাদ্যের সামনে ভোজনতৃপ্ত কাউন্ট দে-ফ্লুরীর মূর্তি খড় দিয়ে তৈরি ক'রে রেখে যায়।...

সেই মুহূর্তে এই পলাতকের দলকে আর কোথায় খুঁজে বেড়াবেন? অপরাধ করার পর এরা বেমালুম কোথায় যেন হাওয়া হয়ে যায়। যখন তাদের ঘরে থাকার কথা, তখন তাদের দেখবে পার্কের মাঝে ঘাসের ওপর গড়াচ্ছে, আবার যখন তাদের বেড়াবার কথা, তখন দেখবে ভাঁড়ারে ঢুকে কিংবা রান্না ঘর থেকে চুরি ক'রে এক ঝুড়ি গুজবেরি সাবাড় করছে। যদি ভোর পাঁচটায় বাড়িটা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়, তবে ধরে নিতে হবে যে সদল বলে মানিয়া আর হেলা 'সূর্যোদয়ের মুহূর্তে' স্নান করার সঙ্কল্প নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। ওদের একসঙ্গে জড়ো করার একটি উপায় খোলা ছিল,—নাচ গানের জলসার লোভ দেখানো। কোঁতেজ-দে-ফ্লুরী যথাসাধ্য এই পন্থাই অবলম্বন করতেন। আট সপ্তাহের মধ্যে তিনি তিনটি বল্‌নাচ, দুটি চড়ুইভাতি, বন-অভিযান, নৌকা-উৎসব ইত্যাদির আয়োজন করেন।

তিনি এবং তাঁর স্বামী এই অবারিত আতিথেয়তার প্রতিদানে পেয়েছিলেন তরুণদের আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রীতি ও সৌহার্দ্য।

তরুণদের নতুন নতুন আবিষ্কৃত বিস্ময়ের উপাদান দেখে এঁরা অভিভূত হয়ে যেতেন। এঁদের বিহাহের চতুর্দশ বাৎসরিক দিবসে তরুণের দল চল্লিশ পাউণ্ড ওজনের আনাজ দিয়ে তৈরি এক অতি সুন্দর মুকুট উপহার দিল আর সুন্দর চাঁদোয়ার নীচে এঁদের বসতে অনুরোধ করল। দলের সবচেয়ে ছোট মেয়েটি গম্ভীর ভাবে এই অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষভাবে রচিত একটি কবিতা পাঠ করল।

কবিতাটি মানিয়ার রচনা। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে মানিয়া এটি রচনা করেছিল। সে-কবিতার শেষের ক'টি পংক্তি এখানে তুলে দেওয়া হলো:

"সেন্ট লুই-এর স্মৃতিদিবসে
বন ভোজনের মানসে
কতিপয় তরুণ যেন আসে
আমাদের মেয়েদের পাশে।
যেন আপনাদের ক'রে অনুগমন
আমরাও করি উত্তোরণ
যত শীঘ্র সম্ভব
জীবন সোপান।

প্রার্থনা মঞ্জুর হলো। সঙ্গে সঙ্গে ফ্লুরী দম্পতি একটি বল্‌নাচের আয়োজন করলেন। গৃহিণী কেক্‌ মোমবাতি, ফুলের মালার অর্ডার দিয়ে দিলেন। মানিয়া, হেলা জীবনের এই স্মরণীয় রাত্রির জন্য পোশাক তৈরি করতে উঠে পড়ে লাগল।

বেচারী মেয়ে দু'টির পক্ষে এ কাজ বড় সহজ হলো না। সারা বছরে ওদের দু'খানি মাত্র পোশাক বরাদ্দ ছিল, একখানা নাচের জন্য পোশাকী, আরেকটি, সাদা মাটা, ঘরে বসে সাধারণ এক দরজী তাদের এই জামা সেলাই ক'রে দিত। দুই বোন তাদের পুঁজিপাতি জড়ো ক'রে হিসেব কষতে বসল।

মানিয়ার জামার সাটিনটা ভালই আছে, কেবল ওপরের লেস্‌ কাপড়ের বাহারটুকু বদলে নিলে ভাল হয়। শহরে গিয়ে সস্তা হাল্কা নীল-রঙের খানিকটা পাতলা কাপড় কিনে সাটিনের ওপর লাগিয়ে নিলেই হবে। তারপর এখানে একফালি রিবন, ওখানে একটা সস্তা রঙীন চামড়ার খানকয়েক জুতো, কোমরের কাছে এক থোকা ফুল, কেশবিন্যাসে বাগানের গোলাপ—ব্যাস্‌।

সেন্ট-লুই-এর স্মৃতিদিবসে, বাজনদাররা যতক্ষণে তারে সুর বাঁধছে, সুন্দরী হেলা উৎসব-মুখর বাড়ির মধ্যে ছটফট ক'রে বেড়াচ্ছে। সেই অবসরে মানিয়া শেষবারের মতো নিজেকে আয়নায় দেখে নিল। জামায় নতুন কড়া কাপড়ের ঝালর, গালের পাশে বাগানের তাজা ফুল, নতুন জুতো—সব ঠিকই তো আছে। সারারাত নেচে জুতো জোড়ার অবশ্য সুখতলা নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল, তাই রাত-শেষে সেটাকে টান্‌ মেরে ফেলে দিতে হলো।

বহু বছর পরে মা'র মনে এই সব আনন্দের দিনগুলির স্মৃতি জাগিয়ে তুলে আমি সেই সব গল্প শুনতাম। প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবৎ কঠিন পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তায় ক্ষয়ে যাওয়া ম্লান মুখখানির দিকে নির্নিমেশ নয়নে চেয়ে থাকতাম।

॥ জীবিকার অন্বেষণে ॥

৪

মানিয়া শ্ক্লোদোভস্কির শৈশব, কৈশোর, পড়াশোনা, খেলাধুলোর ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছি এতক্ষণ। সুস্থ, সত্যনিষ্ঠ, সচেতন ও প্রফুল্ল ছিল তার অন্তঃকরণ, সে ভাল বাসতে জানতো। তার শিক্ষিকারা সর্বদাই তার সম্বন্ধে 'অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্না মেয়ে'—এই মন্তব্য করতেন। মেধাবিনী ছাত্রী ছিল বটে, কিন্তু এ-যাবৎ যে সব ছেলেমেয়েদের মধ্যে মানুষ হচ্ছিল সে, তাদের থেকে পৃথক কোন বিশেষত্ব তার মধ্যে লক্ষ্য করার কারণ ঘটে নি, তার প্রতিভা বিকশিত হবার কোন অবকাশও ঘটে নি।

আরও একটি ছবি: এক কিশোরী কন্যা, মুখে গাম্ভীর্য পরিস্ফুট। তার জীবন থেকে অতি প্রিয় কয়েকজন পরমাত্মীয় অপসৃত হয়েছেন, শুধু তাঁদের প্রীতির স্মৃতি বছরের পর বছর বুকে ক'রে বেড়ানো ছাড়া তার আর উপায় নেই। তার বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে এখন পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে, সেই বোর্ডিং-ইস্কুল, হাইইস্কুল তার জীবন থেকে সরে গেছে, দৈনিক যোগাযোগে যে বন্ধুত্ব অত্যন্ত প্রবল বলে মনে হয়েছিল, তার বাঁধনও ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে এল। মানিয়ার ভবিষ্যৎ তার প্রাণ-প্রতিম দু'টি চরিত্রের মধ্য দিয়ে এবার এগিয়ে চলল, তাঁরা হলেন তার দুই করুণাময়, সহৃদয় পরমাত্মীয়; একজন পিতা আর একজন জ্যেষ্ঠা ভগিনী।

কিভাবে মানিয়া এই দুই বন্ধুর সাহচর্যে তার নিজের ভবিষ্যতের ছক এঁকে ফেলে, এবার আমি তারই আভাস দেবার চেষ্টা করব।

পুরো একটি বছর ঘুরে বেড়াবার পর, সেপ্টেম্বর মাসে মানিয়া আবার ওয়ারসয় ফিরে এল বাবার কাছে। ইস্কুলের কাছে যে বাড়িতে ছেলেবেলা কাটিয়েছিল সেই বাড়িতেই ফিরে এল।

লেজনো স্ট্রীট ছেড়ে নোভোলিপকিতে ফিরে আসার বেদনা জীবনের পরিবর্তিত ধারায় পরিবর্তিত হলো। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক বাড়ির বোর্ডিং তুলে দিলেন কিন্তু হাইইস্কুলে পড়ানো ছাড়লেন না। মানিয়াদের এই বাড়িটা আগের চেয়ে ছোট। বাড়ির পরিবেশ বা প্রতিবেশী কোনটাই চিন্তা বা কর্মে বাধা সৃষ্টি করার মতো নয়।

অধ্যাপক শ্‌ক্লোদোভস্কিকে প্রথম দর্শনে কড়া প্রকৃতির মানুষ বলে মনে হয়। ত্রিশ বছর সেকেণ্ডারি ইস্কুলে চাকরি করার ফলে এই ছোট-খাট, গোলগাল মানুষটির মধ্যে একটা স্বাভাবিক গাম্ভীর্য এসে গিয়েছে এবং খুঁটিনাটি সহস্র অভ্যাস তাঁকে সরকারি কর্মচারীতে পরিণত করেছে। তাঁর গাঢ় রঙের পরিচ্ছদ সব সময়েই পরিষ্কার। তাঁর ব্যবহার ত্রুটিহীন। তাঁর সাধারণ কথাবার্তায়ও ফুটে ওঠে বক্তৃতায় ধরন। জীবনের প্রতিটি কাজ তাঁর সুনিয়ন্ত্রিত। তাঁর সামান্য একখানি চিঠি পর্যন্ত যুক্তিতে পূর্ণ থাকত, হস্তাক্ষর মুক্তার মতো সুন্দর। ছুটিতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোথাও বেড়াতে গেলে কোন আয়োজনই তিনি শেষমুহূর্তের জন্য ফেলে রেখে নিশ্চিন্ত থাকতেন না। সবাইকে নিয়ে আগে থেকে ছক অনুযায়ী ঘড়ির কাঁটা ধরে যাত্রাপথের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছতেন, তারপর পথের পাশের দৃশ্যাবলির সৌন্দর্য কিংবা স্মৃতিস্তম্ভের ইতিহাস বিবৃত করতে করতে বৃদ্ধ এগিয়ে যেতেন।

অধ্যাপকের স্বভাবের এই সব ছোট খাট বিশেষত্ব কোনদিন মানিয়ার চোখে পড়ে নি। বাবার প্রাত তার অন্তর ছিল ভালোবাসায় পরিপূর্ণ, তাঁকে সে জানত তার একমাত্র রক্ষক, তার পালক হিসেবে। তার বিশ্বাস ছিল যে, দুনিয়ার যাবতীয় জ্ঞানের ভাণ্ডার হলেন তার বৃদ্ধ পিতা। অধ্যাপক শ্‌ক্লোদোভস্কি যে বাস্তবিক জ্ঞানী ছিলেন, সেকথা সত্য। ইউরোপের কোন্ দেশে সামান্য এক অখ্যাত ইস্কুল-শিক্ষক এত পাণ্ডিত্য ধরতেন? সঙ্গতি নেই অথচ এত বড় একটি পরিবারের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে, অতি কষ্টে সংসারের ব্যয় সংকুলান হয়। এরই মধ্যে চেষ্টা ক'রে বৈজ্ঞানিক তথ্যপূর্ণ পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ ক'রে তিনি নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি করতেন। কেমিষ্ট্রি ও ফিজিক্সের প্রগতির সব খুঁটিনাটি খবর তিনি রাখতেন। এদিকে গ্রীক্ লাতিন জানতেন আবার ইংরিজি, ফরাসী, জার্মান ভাষায় সুন্দর কথা বলতে পারতেন (—পোল বা রুশ তো তাঁর ঘরের ভাষা)। বিদেশী সাহিত্যিকদের রচিত গদ্য বা পদ্য অনায়াসে মাতৃভাষায় অনুবাদ করতেন। এছাড়া তাঁর ছাত্রাবস্থার সবুজ ও কাল মলাটের নোট খাতায় সযত্নে নিজের কবিতাগুলো তুলে রাখতেন—"ওগো বন্ধু!" "শুভরাত্রি!" "আমার প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দের প্রতি"। বহুকাল ধরে তিনি ও তাঁর ছেলেমেয়েরা প্রতি শনিবার সারা সন্ধ্যা সাহিত্য-আলোচনা ক'রে কাটিয়েছেন। নিস্তব্ধ বাড়িতে গরম চায়ের পেয়ালা ঘিরে ওরা সাহিত্য নিয়ে কত আলোচনা করেছে। বৃদ্ধ কবিতা আবৃত্তি করেছেন বা গল্প পড়ে শুনিয়েছেন আর সন্তানরা মুগ্ধ-বিস্ময়ে বসে শুনেছে। সামনের

চুল পাতলা হয়ে এসেছে, শান্ত ভরাট মুখের প্রান্তে পরিচ্ছন্ন দাড়ি—মানুষটির কথাবলার ধরনে একটা বিশেষত্ব ছিল। একটির পর একটি শনিবার পেরিয়ে বিগত দিনের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলি পরিচিত কণ্ঠস্বরে মানিয়ার সামনে এসে ভিড় করত। ছেলেবেলায় এই কণ্ঠস্বরই তার মধ্যে পরীরাজ্যের যাদু ঢেলে দিয়েছে—দুরূহ কোন অভিযান, কিংবা হয়তো "ডেভিড কপারফিল্ড"। শ্‌ক্লো-দোভস্কি ইংরিজি বই থেকে একেবারে সঙ্গে সঙ্গে গড়গড়িয়ে গল্প বলে যেতেন। বছরের পর বছর ক্লাসে একটানা বক্তৃতা দেয়ার জন্য তাঁর কণ্ঠস্বর আজকাল কিছুদিন হলো ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঠেকছে, তা সত্ত্বেও শ্লোভাকি, ক্রাসিন্‌স্কি, মিকি-উইক্‌জ -আদি সমসাময়িক বিদ্রোহী পোলদেশীয় রোমান্টিক কবিদের কবিতা তিনি পড়ে শোনাতেন। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি আবার জারের হুকুমে নিষিদ্ধ ছিল। পুরোনো বই নতুন ক'রে লুকিয়ে ছাপা হতো। তাই থেকে অধ্যাপক "ম্যাসর থাডিয়ু"-র মতো জ্বালাময়ী কিংবা "কর্দিয়ান্‌"-এর মতো বিষাদ রসঘন কবিতা পড়ে শোনাতেন।

এই সব সন্ধ্যা মানিয়া ভোলে নি কোনও দিন। তার বয়সী মেয়েদের পক্ষে দুর্লভ এক জ্ঞানসমৃদ্ধ পরিবেশে সে বেড়ে উঠেছিল। এবং সে-পরিবেশ তার বাবাই সৃষ্টি করতেন। যে মানুষটি ছেলেমেয়ের জীবনকে সার্থক ক'রে তোলার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত থাকতেন, তাঁর সঙ্গে কন্যা মানিয়ার ছিল দুশ্ছেদ্য শ্রদ্ধা ও প্রীতির বন্ধন। অধ্যাপকের বাহ্যিক প্রশান্তি ভেদ ক'রে রিক্ত অন্তরের আকুলতা মানিয়ার ব্যাকুল দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। এই বিপত্নীক ভদ্রলোক আপন অন্তরের জ্বালা জুড়োবার অবসরটুকু পর্যন্ত পেলেন না। উৎপীড়িত সরকারি কর্মচারীর প্রতি নির্দিষ্ট অপমানকর কাজের বোঝা বয়ে বেড়াবার গ্লানি তো ছিলই। কিন্তু এই বিবেকসম্পন্ন মানুষটি যৎ-সামান্য সঞ্চিত অর্থ ভুলের বশে অপচয় করার পর থেকে নিজেকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারছিলেন না। 'কি ক'রে আমি টাকা নষ্ট করলাম? তোরা যাতে পড়াশোনার সবরকম সুযোগ পেতে পারিস তারই জন্য আমি জীবনপাত কাজ করলাম, তোদের বিদেশে পাঠাব, দেশ-ভ্রমণে পাঠাব, কতকিছু আমার কল্পনা! আমি নিজ হাতে সব নষ্ট করলাম! আজ আমি নিঃস্ব, তোদের কোন উপকারেই লাগব না। কিছুদিন পর আমিই হয়তো তোদের বোঝা হয়ে দাঁড়াব! তোদের কি উপায় হবে?…'

প্রফেসরের বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস উঠে বাতাসে মিলিয়ে যায়, উদ্বেগে তিনি প্রত্যেকের মুখের দিকে ফিরে তাকান, নিজের অজ্ঞাতে সন্তানদের কাছ থেকে

মনভোলানো প্রতিবাদ ও সান্ত্বনার কথা শুনতে চান। এই সান্ত্বনা ছাড়া তারা আর কি-বা দিতে পারে!'

ছোট্ট পড়ার ঘরে স্নিগ্ধ সবুজ চারাদের ভিড়। তারই মাঝে উঁচু তেলের বাতিটার নীচে গোল হয়ে সব বসে আছে। চারটি খাড়া মাথা চারটি সাহসোজ্জ্বল হাসি-ভরা মুখ তাঁর দিকে চেয়ে আছে। প্রত্যেকের চোখে হাল্কা নীল আর ধূসরের আভা—সব কটি চোখেই ওই এক ভাষা, একই আগ্রহ লেখা :—'আমরা তরুণ। আমরা শক্তিমান। আমাদের জয় হবেই।'

বৃদ্ধ অধ্যাপকের আশঙ্কা অমূলক ছিল না। এই বিশেষ বছরটির ওপর তাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল। এসময়ে তরুণদের অবস্থাও আদৌ সুবিধের ছিল না। সমস্যাটি অতি সাধারণ। গৃহকর্তা কেবলমাত্র বাড়িভাড়া, একটি ভৃত্যের মাইনে আর পেটভরাবার ব্যবস্থাই করতে পারবেন। আর কিছু দিনের মধ্যেই তো সরকারি পেন্সন মাত্র তাদের সম্বল হবে। যোসেফ, হেলেন, মানিয়াকে এখন অর্থোপার্জনের চেষ্টা করতে হবে।

শিক্ষাজীবী পিতামাতার সন্তানদের মাথায় প্রথমেই শিক্ষানবিসীর কথাই জাগে। তারা বিজ্ঞাপন দিল এবং তার ভাষা দাঁড়াল মোটামুটি এই রকম : "চিকিৎসা শাস্ত্রের ছাত্রছাত্রীকে পড়াবার উপযুক্ত গৃহশিক্ষক" কিংবা "ডিপ্লোমা-ধারিণী, তরুণী শিক্ষয়িত্রী—অঙ্ক, জিওমেট্রি ও ফরাসী ভাষা শিক্ষাদানে ইচ্ছুক।'

ছেলে পড়ানোর বাজে কাজে সতেরো বছর পূর্ণ হবার আগেই মানিয়া এই কাজের ক্লান্তি ও গ্লানির পরিচয় পেল। কি শীত, কি বর্ষা, শহরের মধ্যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে বেয়াড়া, অলস ছাত্রীর সম্মুখীন হওয়া, ছাত্রীর গুরুজনের নির্দেশমত হিমশীতল কক্ষে অনন্তকাল অপেক্ষা ক'রে থাকা,—('মাদমোয়াজেল শ্ক্লোদোভস্কাকে অপেক্ষা করতে বলো, আমার মেয়ে মিনিট পনেরোর মধ্যেই যাচ্ছে—') ; কিংবা সম্পূর্ণ চপলতার বশে মাসান্তে সর্ত অনুযায়ী দেয় অর্থ দিতে ভুলে যাওয়া! অথচ এই কয়টি মুদ্রার জন্যে সারা মাস ধরে কী আকুল প্রতীক্ষা করেই না থাকতে হয়। এমনই অবস্থা যে সেদিন সকালে এই টাকার কথা ভাবতে ভাবতেই সে এসেছে।

ক্রমে শীত জমে আসছে। নোভোলিপকি ষ্ট্রীটের জীবনযাত্রা তেমনি বৈচিত্র্য-হীন রয়ে গেল। দিন আসে আর দিন যায়।—

এই সময়ে ম্যানিয়ার লেখা এক চিঠিতে দেখি : 'বাড়িতে আর নতুন কিছু ঘটে না। শুধু ফুলের চারাগুলো সুন্দর বেড়ে উঠেছে। আজালিয়া

গাছে ফুল ধরেছে। কার্পেটের ওপর পড়ে পড়ে লান্‌সেট ঘুমোয়। আমি যে পোশাকটা সেদিন রঙ করালাম, দরজীবুড়ি গুশিয়া সেটিকে নতুন ক'রে বানাচ্ছে, খুব সুন্দর আর মানানসই হবে জামাটা। ব্রনিয়ারটাও চমৎকার করেছে। কাউকেই চিঠি লেখা হয়ে ওঠে না, সময়ও নেই, পয়সাও নেই। বন্ধুবান্ধবদের মাধ্যমে আমাদের খবর পেয়ে এক ভদ্রলোক খোঁজ নিতে এসে যেই শুনলেন ব্রনিয়া একঘন্টা পড়ানোর জন্যে আধ রুবল্‌ ফি চায় অমনি এমন চোঁ চাঁ দৌড় দিলেন, যেন বাড়িতে আগুন লাগার খবর পেয়েছেন !...'

বিবাহ—যৌতুকের অভাব। তাই কর্মক্ষম বুদ্ধিমতী মানিয়ার বর্তমান ধ্যান জ্ঞান যে কেবল ছাত্রী সংখ্যা বাড়ানো—একথা ভাবলে ভুল হবে। প্রয়োজনের তাগিদে সে এই ছাত্রী পড়ানোর কষ্টসাধ্য কাজ হাসিমুখে বরণ ক'রে নিয়েছে। কিন্তু অতি সংগোপনে তার জীবনের ধারা আরও একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে বইতে শুরু করেছে। সেকালের প্রতিটি পোলদেশীয় ছেলেমেয়ের মতো তারও জীবনের স্বপ্ন ছিল উর্ধমুখী। প্রত্যেক তরুণের চোখে তখন একমাত্র স্বপ্ন স্বাধীনতার স্বপ্ন : প্রত্যেক ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর পুরোভাগে, এমনকি ব্যক্তিগত উচ্চাশা, বিবাহ, প্রেম সবার আগে থাকে দেশসেবার দৃঢ় সঙ্কল্প। কেউ চায় প্রাণপণ সোজাসুজি সংগ্রাম, কেউ থাকে ষড়যন্ত্রের চিন্তায় ডুবে, কেউ ভাবে বিপরীতমুখী দুই কর্মপ্রবাহের সংঘাত জনিত আলোড়নের কথা, আবার কেউ বা ধর্ম রহস্যের মাঝে পথ খোঁজে...

মানিয়া এই ধর্মে বিশ্বাস করত না। ঐতিহ্য ও ধর্মাচরণের দিক থেকে খৃষ্টান হলেও মাদাম শ্‌ক্লোদোভস্কির মৃত্যুর পর থেকে তার বিশ্বাসের মূল টলে গিয়েছিল এবং অবশিষ্ট যা ছিল তাও ধীরে ধীরে বাতাসে মিলিয়ে গেল। ধর্মপ্রাণা জননীর প্রভাব তার ওপর যথেষ্ট পরিমানে ছিল সন্দেহ নেই কিন্তু বছর ছয়-সাত যাবৎ নিজের অজান্তে সে পিতার প্রভাবে স্বাধীনচেতা নির্লিপ্ত ক্যাথলিক হয়ে উঠছিল।

বিপ্লবী বন্ধুদের বিপদের সময়ে নিজের পাসপোর্টখানা পর্যন্ত দিয়েও সে তাদের সাহায্য করেছে, কিন্তু তাদের মতো খুন-জখম করা, জারের গাড়ি কিংবা ওয়ার্‌সর গভর্নরকে লক্ষ্য ক'রে বোমা ছোড়া, এ ধরনের কাজ করার কোন স্পৃহা তার মনে ছিল না। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তখন একটা প্রবল আন্দোলন গড়ে উঠছিল—এবং তার উদ্দেশ্য ছিল অলীক ভয়ের বিভীষিকার হাত হতে মুক্তিলাভ, স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে মিথ্যা অবসাদ এবং অসংলগ্ন অনুভূতির বিড়ম্বনা দূর করা। এদের একমাত্র ধ্যান জ্ঞান দাঁড়াল কাজ, কাজ আর কাজ;

পোল্যাণ্ডের এক সাংস্কৃতিক পীঠস্থান গড়ে তুলতে হবে, নিগৃহীত দরিদ্র জনতা, যাদের অন্ধকারের মধ্যে রাখাই সরকারের উদ্দেশ্য, তাদের মধ্যে জ্ঞানের আলোক সঞ্চারিত করতে হবে। তরুণী মানিয়াও এই দলে যোগ দিল।

সে-যুগের দর্শন প্রগতির এই রূপকে একটি বিশেষ খাতে চালিত করল। বেশ কিছুকাল যাবৎ কোঁৎ ও স্পেন্সার-এর পজেটিভিজম্ ইউরোপের চিন্তাধারায় এক নতুন চিন্তাস্রোত সঞ্চারিত করছিল। সেই সময় পাস্তুর, ডারুইন, ক্লড বার্নার্ড বিজ্ঞানের মহিমা বর্ধনে সহায়ক হন। অন্যান্য দেশের মতো ওয়ার্সতেও রোমান্টিক চিন্তাধারা বিদগ্ধসমাজ দ্বারা ধিকৃত হচ্ছিল; সাময়িক ভাবে শিল্পকলা অবহেলার পর্যায়ে নেমে এল। যুগের ধারানুযায়ী নওযোয়ানের দল বিচার-বিবেচনা ক'রে কেমিষ্ট্রি ও বায়োলজিকে সাহিত্যের ওপরে তুলে নিল। লেখকের কলম ছেড়ে তারা বিজ্ঞানের পথ ধরল।

স্বাধীনদেশে এই চিন্তা প্রবাহ অব্যাহত রইল; কিন্তু পোল্যাণ্ডের কপালে অন্য ব্যবস্থা, কারণ এখানে যে-কোন ধারার স্বাধীন চিন্তাকে সন্দেহের চোখে দেখা হতো। নতুন নতুন থিওরি অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো লোকচক্ষুর আড়ালে এসে পৌছল ও ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

ওয়ার্সয় ফেরার অল্প কিছুদিন পরে মানিয়া শ্ক্লোদোভস্কা জনকয়েক দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ পজেটিভিষ্টের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়। মাদ্‌মোয়াজেল পিয়াসেৎকা নাম্নী জনৈকা শিক্ষিকা তার ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করলেন। ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের এই ক্ষীণাঙ্গী গৌরী মহিলা অল্প কাল আগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাজনৈতিক কারণে বিতাড়িত নরব্‌লিন নামে এক ছাত্রের প্রতি অনুরাগী হলেন। এই মহিলা আধুনিক তথ্য সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। প্রথম প্রথম দ্বিধাবিভক্ত অবিশ্বাসী মন নিয়ে শুরু ক'রে অল্প দিনের মধ্যেই এরা এঁর অসমসাহসিক চিন্তাধারায় মুগ্ধ হয়। মানিয়া, তার দিদি ও দিদির বন্ধু মারিয়া রাকোভ্‌স্কা এরা সবাই এঁর "ভাসমান বিশ্ববিদ্যালয়ে" ভর্তি হয়ে গেল। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ ছিল শরীরতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে উৎসাহী যুবক যুবতীদের জ্ঞান দেওয়া। মাদ্‌মোয়াজেল পিয়াসেৎকার বাড়ি কিংবা আর কোন সহৃদয় ব্যক্তির বাড়িতে গোপনে এর অধিবেশন হতো। আট দশজন ছাত্রছাত্রী একত্রিত হয়ে নোট নিত, নিজেদের মধ্যে চটি বই, প্রবন্ধ ইত্যাদির আদান-প্রদান করত। সামান্যতম শব্দে ওরা কেঁপে উঠত, কারণ পুলিশের নজরে পড়লে গারদ-বাস ছিল অবধারিত।

এ সম্বন্ধে ৪০-বছর পরে মারী কুরী লেখেন: সেই সব দিনের সামাজিক,

তথা শিক্ষামূলক সখ্যতার আস্বাদ আজও স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কাজ করার উপকরণের অভাব ছিল, কাজেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যেত না, তবু আমি আজও বিশ্বাস করি যে, আমাদের সেই সময়ের আদর্শ অনুসারে চললে বাস্তবিকই সমাজের মঙ্গল হতে পারত। ব্যক্তির উন্নতি ভিন্ন পৃথিবীর উন্নতি অসম্ভব। এই লক্ষ্য সামনে রেখে আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ উন্নতির শিখরে পৌঁছোবার চেষ্টা করতে হবে, ইতিমধ্যে বিশ্বমানবের প্রতি দায়িত্ব মনে রেখে যাদের আমরা সাহায্য করতে পারি, তাদের প্রতি কর্তব্য করতে হবে।

এই "ভাসমান বিশ্ববিদ্যালয়" কেবলমাত্র সেকেণ্ডারি ইস্কুল থেকে পাশ করা ছাত্রদের শিক্ষা দান করেই ক্ষান্ত ছিল না। এই ছাত্ররাই আবার পরে শিক্ষকের স্থান নিত। মাদ্‌মোয়াজেল পিয়াসেৎকার উৎসাহে মানিয়া গরীব মেয়েদের পড়াবার ভার নিল। প্রথমে সে দরজী মেয়েদের নিয়ে পড়ল। তাদের দোকানে দোকানে গিয়ে বই থেকে পড়ে শোনাল, তারপর ক্রমে ক্রমে শ্রমিক মেয়েদের জন্য এক এক ক'রে অনেক পোল-ভাষার বই জোগাড় ক'রে লাইব্রেরি গড়ে তুলল।

এই সপ্তদশী মেয়েটির কি অসাধারণ উৎসাহ! শৈশবে যখন ফিজিক্সের যন্ত্রপাতির রহস্যের মধ্যে সে কাটিয়েছে তখন বিজ্ঞান এতটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে নি। কিন্তু মানিয়ার উদ্যম অসাধারণ। সে বিশ্বসংসারের জ্ঞানভাণ্ডারের সব রত্ন আহরণ করতে চায়। সে অগুস্ত কোঁৎ ও সামাজিক বিবর্তন সম্বন্ধে পড়ে ফেলল, কেবল কেমিষ্ট্রির মধ্যেই তার স্বপ্ন সীমাবদ্ধ রইল না। প্রাক্তন সমাজ-ব্যবস্থার সংস্কার ক'রে জনসাধারণকে জ্ঞানের আলো দান করার প্রচণ্ড ইচ্ছা তার মধ্যে জাগরিত হলো। প্রগতিশীল আদর্শ ও স্নেহপ্রবণ অন্তর তাকে প্রকৃত সমাজকর্মীর কাজে নামাল বটে কিন্তু পোল্যাণ্ডের সমাজতন্ত্রবাদী ছাত্রদের সঙ্গে সে যোগ দিল না। তার স্বাধীন বিবেচনাশক্তি নিয়ে সে দলগত মনোবৃত্তির ওপর ভরসা করতে পারে নি, অথচ স্বদেশ-প্রীতির আধিক্যে সে মার্কস্‌বাদী আন্তর্জাতিকতাকেও ঠিক অন্তর থেকে গ্রহণ করতে পারছিল না।

এক সময়ে যে তাকে এইসব স্বপ্নের মধ্য থেকে পথ বেছে নিতে হবে তার চিন্তা এখনও তার মাথায় আসে নি। তার স্বদেশপ্রেম, মানবজাতির প্রতি কর্তব্যবোধ ও জ্ঞানার্জনের আকাঙ্ক্ষা সব একই উচ্চগ্রামে বাঁধা প'ড়ে কেমন যেন জট পাকিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু এতসব মতামত ও এত উত্তেজনা সত্ত্বেও মানিয়া আশ্চর্যরকম মধুর স্বভাবের মেয়ে হয়েই রইল। উদার শিক্ষা সে পেয়েছে, কৈশোরে যে পরিবেশে

সে মানুষ হয়েছে, তারই ফলে আতিশয্যের হাত থেকে সে মুক্তি পেল। তার প্রকৃতির মধ্যে ছিল এক শান্ত, সমাহিত গম্ভীর ভাব—তার আকাঙ্ক্ষা, তার সবকিছুকে ঘিরে ছিল গভীর এক আত্মসংযমের আবরণ। কোন অহঙ্কার বা অভদ্র কোন ব্যবহার তার মধ্যে কখনও দেখা যায় নি। সামান্য একটু ধূমপানের ইচ্ছাও তার মধ্যে কখনও কেউ লক্ষ্য করে নি।

টিউশানি ও বায়োলজির ক্লাসের অবসরে সে নিজের ঘরে গিয়ে দুয়ার দিত। কিন্তু ছেলেবেলাকার সেই 'নিরীহ আশ্চর্য ছোটগল্প' পড়ার দিন পার হয়ে গেছে। এখন সে ডস্টয়েভস্কি, গনচারভ ও বোলেস্লাভ প্রুস্-এর 'দি-ইমান্সিপেটেড' পড়ে যার মধ্যে তারই মত সংস্কৃতি-পাগল ছেলে মেয়েদের কথা লেখা আছে। সেই সময়ে লেখা তার নোটখাতায় তরুণী মানিয়ার মতো মেয়েদের দ্বিধা-দ্বন্দ্বপূর্ণ মনের অস্থিরতার পরিচয় পাওয়া যায়। দশ-পৃষ্ঠা জুড়ে ফন্‌টেনের 'কাহিনী'গুলি সযত্নে পেন্সিলের রেখা-চিত্রে সে ধরে রেখেছে। জার্মান ও পোলিশ কবিতা মাস্ক নর্‌দোর 'দি কন্‌ভেন্‌শনাল লাই'র কিছুটা, ক্রাসিন্‌স্কি, স্লোভাকি, হেইন্—সবেরই কিছু কিছু ওর নোটবইয়ে পাওয়া যাবে। রেননের 'যীশুর জীবনী' থেকে তিন পৃষ্ঠা, "তাঁর মত এমন ক'রে কেউই পার্থিব অহংকারের ঊর্ধ্বে মানব সমাজের হিতসাধনকে প্রাধান্য দেয় নাই···", রুশীয় দার্শনিক প্রবন্ধ; লুই ব্লাংক-এর একটি পদ, ব্রানদেসের এক পৃষ্ঠা; ফুল, জন্তুর ছবি; আবার হেইন্, মুসে, সালী, প্রুধো আর ফ্রঁসোয়া কোপেয়; পোল ভাষায় অনূদিত মানিয়ার কবিতা—সব আছে তার নোটখাতায়।

কারণ, কি দারুণ বৈষম্য!—যে "স্বাধীন বালিকা" চাপল্যের চিহ্ন কেশরাশী নির্মূল ক'রে কেটে দেয়, পরমুহূর্তে সে গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বড় বড় সুন্দর, হয়তো বা একটু দুর্বোধ্য কবিতা নকল করতে বসে:

"ও-ই নীলাক্ষি কৃষ্ণে!
যদি আমি বলি তোমায় ভালোবাসি,
কেবা জানে কি কহিবে হাসি।"

'এ্যাডিউ সুজান্' কিংবা 'দি ব্রোকেন্ ভাস,' যে তার ভাল লাগে, সে-কথা মানিয়া বন্ধুদের কাছে চেপে যায়। সে শুধু নিজের কাছেই এ লজ্জা স্বীকার করতে পারে। পরনে বাহুল্য বর্জিত পোশাক,কপালের ওপর ছোট ছোট কোঁকড়া চুল এসে পড়ে, চরিত্রের গাম্ভীর্য প্রকট না ক'রে মুখখানা একেবারে বালিকা সুলভ কোমল ক'রে তুলেছে। এইভাবে সে একটার পর একটা সভায় উত্তেজিত হয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াত। বন্ধুদের সামনে কবিতা বলতে হলে সে আস্‌নিক্-

এর রচনা থেকে আবৃত্তি করত। এই ভদ্রলোক বড় সাহিত্যিক না হলেও এমন হৃদয়গ্রাহী জ্বালাময়ী রসের সৃষ্টি করতেন যে, এইসব উক্তিগুলি মেয়েদের মুখে মুখে গান হয়ে দাঁড়িয়েছিল :

"সত্য আলোর সন্ধান করো
অচিন্ পথে যাত্রা করো
আজকের পরে মানব দৃষ্টি যদিও অনেক খুলবে,
দৈব কখনও পিছে না চলবে।
যুগে যুগে নব স্বপ্নের গুঞ্জন
অতীতের গ্লানি দিয়ে বিসর্জন
জ্ঞানের মশাল বহন করো
শতাব্দীর যত পণ্ড শ্রমের মাঝে
নতুন কিছু করো,
সাথে সাথে গড়' নতুন প্রাসাদ
ভবিষ্যৎ নবতর।..."

এমন কি মারিয়া রাকোভ্স্কাকে ব্রনিয়ার সঙ্গে তোলা তার মিষ্টি ছবিটা উপহার দেবার সময়েও ছবির গায়ে স্পষ্টাক্ষরে বিশ্বাসের বাণী লিখে দিতে ভুল হলো না—"আদর্শ পজেটিভিষ্টকে দুই পজেটিভ আদর্শবাদীর উপহার।"

এখন আমাদের এই দুই "পজেটিভ আদর্শবাদী" বহু সময়ে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের একটা ছক্ এঁকে ফেলার চেষ্টা করত। দুর্ভাগ্যবশতঃ আস্নিক্ বা ব্রান্দেস্ কেউই এই শহরে বসে উচ্চতর শিক্ষার পথ নির্দেশ দিতে সক্ষম হলেন না, কারণ এখানে মহিলাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ার রুদ্ধ। অপর পক্ষে ঘণ্টায় আধ রুবল্ হারে শিক্ষানবিসী ক'রে কি উপায়ে হঠাৎ বড়লোক হওয়া যায় এমন ভেল্কিবাজীর কথাও এই সাহিত্যিকদের কাছে শোনা গেল না। পথ না পেয়ে মানিয়ার কোমল হৃদয় মনোবেদনায় কাঁদে। তার মনের কোণে কোথায় যেন নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড-কুকুরের মতো কৃতজ্ঞতাবোধ লুকিয়ে আছে। পিতা ও তার বয়োজ্যেষ্ঠ ভাইবোনদের মঙ্গলের জন্য সে নিজেকে দায়ী মনে করত। সৌভাগ্যক্রমে যোসেফ ও হেলা তার দুর্ভাবনার কারণ ঘটায় নি। যোসেফ ডাক্তার হলো ব'লে। সুন্দরী হেলা টিচার হবে, না, গায়িকা বৃত্তি অবলম্বন করবে, বুঝতে না পেরে সপ্তম

সুরে গান গেয়ে বেড়ায়, ডিপ্লোমা পায় আর একই সঙ্গে বিবাহের একাধিক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

কিন্তু ব্রনিয়া? তাকে কি ক'রে সাহায্য করা যায়? চার বছর আগে ইস্কুল ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব তার ঘাড়ে এসে পড়েছে। বাজার করে, খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করে, রক্ষণীয় খাদ্য দ্রব্যের ওপর তদারক করে, এবং এমনি ক'রে কালে কালে সে সুদক্ষ গৃহিণী হয়ে উঠল—কিন্তু কেবল মাত্র এই গৃহিণীপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে তার দম বন্ধ হয়ে এল। ফ্রান্সে গিয়ে চিকিৎসা শাস্ত্রে ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে ডাক্তারি করার অদম্য আগ্রহ যে স্নেহশীলা দিদির বুকে লুকিয়ে আছে, এবং এই না-পারার জন্য তার মনের সংগোপন দুঃখ মানিয়া বোঝে। বেচারা কিছু টাকা জমিয়েছে, কিন্তু বাইরে যাওয়ার খরচ যে অনেক—! কত মাস, কত বছর ধরে তাকে অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে কে জানে।

মানিয়ার চরিত্রের গঠন এমনই ছিল যাতে সে দিদির এই প্রত্যক্ষ উদ্বেগ ও হতাশার কথা মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারত না, বরং তার নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এর নীচে চাপা পড়ে গেল। সে ভুলতে বসল যে একই আশাকুহকিনী হাজার মাইল দূর থেকে সরবনে তাকে টানছে। সেখানে সে তার জ্ঞানতৃষ্ণা নিবৃত্ত করবে; অমূল্য বিদ্যা অর্জন ক'রে ওয়ারসয় ফিরে এসে দেশবাসীদের মধ্যে বসবাস করবে। দিদির ভবিষ্যৎ চিন্তাই যদি তার মনপ্রাণ জুড়ে থাকে, তবে বুঝতে হবে যে, কেবল মাত্র রক্তের সম্বন্ধই তার কারণ নয়। মা'র মৃত্যুর পর থেকে দিদির যে অজস্র স্নেহধারা মায়ের অভাব দূর করতে সতত উন্মুখ হয়ে থাকতো, তার সঙ্গে সূক্ষ্মতর এক সূত্রে মানিয়া বাঁধা পড়েছিল। একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে এই দু'টি প্রাণী পরস্পরের নিকটতম সান্নিধ্যে এসেছিল। উভয়ের প্রকৃতিও পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। দিদির অভিজ্ঞতা ও বাস্তবমুখিতায় মানিয়া মুগ্ধ, ফলে তার দৈনিক জীবনের সমস্যা-গুলি সহজে দিদির সামনে মেলে ধরতে সে পারত। আবার একাধারে দৃপ্ত ও ভীরু এই ছোট্ট বোনটির মধ্যে ব্রনিয়া এমন একজন সমব্যথীকে পায় যে যার প্রীতির সঙ্গে মিশে থাকে একটা চাপা অস্পষ্ট কৃতজ্ঞতাবোধ।

একদিন ব্রনিয়া বসে বসে এক টুকরো কাগজে তার পুঁজির হিসেব কষছিল, এমন সময়ে মানিয়া এসে বলল: 'আমি অনেক ভেবেছি দিদি, আর বাবাকেও বলেছি, একটা রাস্তা পাওয়া গেছে।'

'রাস্তা?'

মানিয়া দিদির গা ঘেঁষে বসল ; তার প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে কিনা সে-বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ নয়, তাই কথাটা ওজন ক'রে ধীরস্থির ভাবে বলা দরকার।

'এস একটা হিসেব কষি। তোমার যে টাকা আছে তাতে তুমি কত মাস পারীতে থাকতে পারবে ?'

'এই ধর, গাড়ি ভাড়া আর ফ্যাকাল্‌টিতে এক বছর পড়ার খরচ আমার আছে। কিন্তু তুই তো জানিস ডাক্তারী শেষ করতে হ'লে পাঁচ বছর পড়তে হয়।'

'হ্যাঁ। কিন্তু দিদি ঘণ্টায় আধ রুবল্‌ যদি আমাদের আয়ের হার হয়, তবে আমরা এ রাস্তায় কোনদিনও লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব না।'

'তবে— ?'

'সে-কথাই তো বলছি। দু'জনে যদি একা একা খাটি, তবে কারুরই কিছু করা হয়ে উঠবে না। কিন্তু তুমি যদি আমার কথা শোন, তবে কয়েক মাসের মধ্যেই, হয়তো শরৎ কালের মধ্যেই, তুমি পারী রওনা হতে পারবে।'

'মানিয়া, পাগলী—!'

'না। প্রথমে তুমি তোমার টাকা খরচ করো, তারপর আমি আর বাবা দু'জনেই কিছু কিছু তোমায় পাঠাতে থাকব, আর সেই সঙ্গে আমার ভবিষ্যতের পড়ার খরচ-চালানোর নিশ্চয়তা হয়ে যাবে, কারণ তুমি ডাক্তার হয়ে ফিরে এলে আমি যাব। তখন তুমি আমায় সাহায্য করবে।'

ব্রনিয়ার চোখ দুটি জলে ভরে এল। এত বড় আত্মত্যাগের মাহাত্ম্য তার অন্তরকে অভিভূত করল, কিন্তু মানিয়ার প্রস্তাবের সবটুকু পরিষ্কার হলো না।

'আমি কিছু বুঝতে পারছিনে রে ! তোর নিজের খরচ, আমার খরচের কিছুটা মিটিয়েও তুই টাকা জমাতে পারবি কি ক'রে ?'

'ঠিক পারব !' নির্লিপ্তভাবে মানিয়া জবাব দেয় : 'আমি তো সেই চাকরির ব্যবস্থাই করছি। থাকা, খাওয়া, ধোপার খরচ সব দেবে, উপরি বছরের শেষে চারশ' রুবল্‌ মাইনে দেবে, বেশীও হ'তে পারে। এবার বুঝেছ ব্যাপারটা ?'

'মানিয়া, আমার ছোট্ট মান্যুৎসিয়া—' চাকরির মর্যাদাহীনতা ব্রনিয়াকে দুঃখ দিতে পারে নি, কারণ বোনটির মতো সেও সামাজিক সংস্কার মুক্ত ছিল। সে কথা নয়। তবু সে বিচলিত না হয়ে পারল না, কারণ তার কথা ভেবেই তো মানিয়া এই রকম বাজে একটা কাজ নিয়ে বছরের পর বছর নিষ্ঠুর প্রতীক্ষায় দগ্ধে মরবে। এ হ'তে পারে না।

'আমি আগে যাব কেন? এর উল্টোটাও তো হতে পারে। তোর এত গুণ, হয়তো আমার চেয়েও তোর প্রতিভা অনেক বেশী। তুই খুব তাড়াতাড়ি উন্নতি করতে পারবি।'

'ওঃ দিদিভাই! এবার কিন্তু তুমি বোকার মতো কথা বলছ। বুঝতে পারছ না, তুমি তো বড় হয়ে যাচ্ছ, তোমার বয়স হলো কুড়ি আর আমার সতেরো। তুমি এতদিন ধরে অপেক্ষা ক'রে বসে আছ। আর আমার এখনও অনেক সময় আছে। বাবাকে আমি তাই বুঝিয়েছি এবং তিনিও আমার কথাই ঠিক মনে করেন। দিদি, তুমি আগে যাবে, এতো সহজ কথা। তুমি যখন রোজগার করবে, তখন না হয় আমায় সোনা দিয়ে মুড়ে দিও! সত্যি বলতে কি, আমি সেই ভরসাতেই আছি কিন্তু। শেষ অবধি বুদ্ধিমানের মতো একটা পথ ঠাহর করা গেল, কাজের কাজ এইবার হবে, দেখে নিও।'

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শান্ত এক মেয়ে চাকুরি বিভাগের প্রতীক্ষা-কক্ষে অপেক্ষা ক'রে আছে। তার দু'খানি পোশাকের মধ্যে যেটা পরলে বেশী গম্ভীর দেখায়, সেই খানি সে পরে এসেছে। মাথার চুল টেনে কালো টুপির নীচে শক্ত ক'রে আটকে নিয়েছে। পজেটিভিষ্ট হলেও গভর্নেসের চুল না-কাটার রীতি তাকে মানতে হয়েছে।

দরজা খুলে গেল। রোগা ফ্যাকাশে এক মহিলা, মুখখানায় রাজ্যের হতাশার ছাপ ফুটে উঠেছে, চৌকাঠ পেরিয়ে এসে হাতের ইশারায় মানিয়াকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন। সহকর্মী? একটু আগে ঘরের একমাত্র আসবাব বেতের চেয়ারে পাশাপাশি বসে পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিল।

মানিয়া উঠল। হঠাৎ তার ভয় করতে লাগল। হাতের ভিতর এক বাণ্ডিল কাগজপত্র ছিল, তাই জোর ক'রে চেপে রইল। পাশের ঘরে স্থূলাঙ্গী এক মহিলা ছোট্ট ডেস্কের পিছনে বসে আছেন দেখা গেল।

'মাদ্‌মোয়াজেল, তুমি কি ধরনের কাজ চাও?'

'গভর্নেস-এর কাজ যদি পাই—'

'তোমার কাছে কোন পরিচয়-পত্র আছে?'

'হ্যাঁ, আমি ছাত্রী পড়িয়েছি! এই দেখুন ছাত্রীদের গার্জেনদের লেখা প্রশংসা-পত্র। এই যে আমার ডিপ্লোমা।'

বিভাগের অধিকর্ত্রী সম্পূর্ণ পেশাদারী চোখে মানিয়ার কাগজপত্র পরীক্ষা

করলেন। হঠাৎ তিনি যেন সোজা হয়ে বসলেন, কৌতূহলী চোখ তুলে মেয়েটিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন।

'জার্মান, রুশ, ফরাসী, পোল আর ইংরিজী ভাষার ওপর তোমার সমান দখল আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। ইংরিজীটা হয়তো অন্য ভাষাগুলোর তুলনায় অতো ভাল হবে না। তবু সরকারি ইস্কুলে যেটুকু পড়ানো দরকার, সেটুকু জানি। আমি স্বর্ণপদক নিয়ে ইস্কুল থেকে বেরিয়েছি।'

'তাই নাকি? তা তোমার কত হলে চলবে?'

'বছরে চারশ রুবল্ আর আমার ব্যক্তিগত খরচপত্র।'

মৌখিক অভিব্যক্তির সামান্যতম পরিবর্তন দেখা গেল না মহিলার হাবেভাবে। তিনি বললেন: 'চারশ'? তোমার বাবা মা— ?'

'আমার বাবা সেকেণ্ডারি ইস্কুলের শিক্ষক।'

'বেশ। আমি খবর নেব। তোমার একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে আশা করি। কিন্তু তোমার বয়স?'

'সতেরো,' বলে ফেলে মানিয়া লজ্জায় পড়ে চট ক'রে কথাটা ঘুরিয়ে নিল: 'শিগগিরই আমি আঠেরোয় পা দেব।'

মানিয়ার দরখাস্তের কাগজ খানা বের ক'রে ভদ্রমহিলা পরিষ্কার ইংরিজীতে লিখে নেন: 'মানিয়া শ্ক্লোদোভস্কা, যোগাযোগ ভাল, সক্ষম, গভর্নেসের পদপ্রার্থী। মাহিনা—বাৎসরিক চারশ' রুবল্।' মানিয়ার কাগজ পত্র ফিরিয়ে দিয়ে বললেন: 'ধন্যবাদ মাদ্‌মোয়াজেল শ্ক্লোদোভস্কা। খবর পেলে তোমাকে জানাব।'

৫

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১০-ই ডিসেম্বর মানিয়া তার আত্মীয়া মিকালোভস্কাকে এক চিঠি লেখে: 'প্রিয় হেনরিয়েটা, তোমাদের কাছ থেকে চলে আসার পর আমার অবস্থা দাঁড়িয়েছে ঠিক যেন এক বন্দিনী। এতদিন বোধ হয় শুনেছ যে আমি এক আইনজীবী পরিবার 'খ'-দের সঙ্গে বাস করছি। আমার শত্রুরও যেন এমন নরকে ঠাঁই পেতে না হয়। শেষ অবধি মাদাম 'খ'য়ের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা এমন শীতল হয়ে এল যে, আমি তাঁকে একদিন সেকথা বলতে বাধ্য হলাম। আমার সম্বন্ধে তাঁরও একই রকম উৎসাহ থাকায় পরস্পরকে বুঝতে বিশেষ কষ্ট হয় নি। এ এক ধরনের বড় লোকের বাড়ি যেখানে তারা লোকদেখানো ফরাসী বলে, ভাষাটা অবশ্য ঝাড়ুদারদের মতোই অমার্জিত। এরা ছয় মাস পর্যন্ত মাইনে দেয় না, বাতি জ্বালানো তেলের কড়ি দিতে এদের যত কিপটেমি! এদিকে খেয়াল হলে পয়সা নিয়ে জানালা গলিয়ে ফেলে দিতেও বাধে না। এদের পাঁচটা চাকর। এরা স্বাধীন মতাবলম্বীর ভান দেখায়, অথচ ভেতরে ভেতরে অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে আছে। এর ওপর মধু মাখানো সুরে অনগল পরচর্চা আর নোংরা কথার চূড়ান্ত করে, আর এমন এমন সব আলোচনা করে যার ওপর শালীনতার কোন আবরণ থাকে না। এদের সঙ্গে থেকে আমি মানুষ সম্বন্ধে যেন এক নতুন ধরনের পরিচয় পেলাম। নাটক নভেলে পড়া মানুষ যে এই দুনিয়াতেই আছে, একথা পরিষ্কার হয়ে গেল এদের সঙ্গে বাস ক'রে। আরও একটা জ্ঞান আমার হলো যে, এই জাতীয় লোক, অর্থ যাদের মাথার মণি, তাদের সঙ্গে আদৌ মেশা উচিত নয়।'

এই ছবিটুকুতে এতটুকু বাড়াবাড়ি নেই। দ্বেষ ঈর্ষামুক্ত মানিয়ার এই চিঠিখানি মানিয়ার সরলতা ও স্বপ্নে ঘেরা মনের পরিচয় দেয়। বিপদে প'ড়ে অবস্থাপন্ন পোল পরিবারের আশ্রয়ে এসে সে ভেবেছিল হাসি খুশি শিশুর দল ও তাদের সহৃদয় পিতামাতার সান্নিধ্য পাবে। ভালোবাসা দিয়ে পরকে আপন করার আশা করেছিল সে,—তাই তার হতাশা এত তীব্র।

গভর্নেসের এই চিঠিগুলি থেকে এও বোঝা যায় কী অপূর্ব পরিবেশ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন হ'তে হয়েছিল। সামান্যবিত্তের যে জ্ঞানী-গুণীদের গণ্ডি মানিয়ার চারধারে গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে কোন নীচ স্বার্থপর মানুষ, আত্ম-সম্মানজ্ঞানহীন কোন লোক তার চোখে বিশেষ পড়ে নি। পারিবারিক বাদবিসংবাদ বা ঈর্ষাপূর্ণ মন্তব্য শ্ক্লোদোভস্কি পরিবারে বিভীষিকা সৃষ্টি করতো। সুতরাং যতবারই কোন নির্বুদ্ধিতা, নীচতা বা অসভ্যতা চোখে পড়েছে, ততবারই এই বালিকার অন্তর বিস্ময় ও বিদ্রোহে ভরে উঠেছে।

অসম্ভবও সম্ভব হয়। মানিয়ার বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণবন্ত সঙ্গীসাথীরাই খুব সম্ভব এই জটিল ধাঁধার উত্তর দিতে পারবে। এ কী ক'রে সম্ভব হয় যে, এ পর্যন্ত এই বালিকার অসাধারণ কৃতিত্ব, অসামান্য প্রতিভা কারুর চোখে পড়ল না! প্যারীতে না পাঠিয়ে গভর্নেসের চাকরি গ্রহণ করতে কেন তাকে দেওয়া হলো!

তার কারণ হলো আরও তিন-তিনজন ডিপ্লোমা ও পদকধারী, মেধাবী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, তারই মতো উদ্যমশীল ভাইবোনদের মাঝে মানুষ হওয়ার দরুন ভবিষ্যৎ কালের বিখ্যাত মারী কুরীকে সেই সময়ে অসাধারণ বলে মনে হয় নি। প্রতিভার ক্ষেত্র যদি সঙ্কুচিত হয় তবে বিস্ময়কর গুণাবলী সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু এক্ষেত্রে একই বাড়িতে যোসেফ, ব্রনিয়া, হেলা ও মানিয়া জ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টায় পরস্পরের সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল। এই জন্য ছোট-বড় কেউই এদের মধ্যে বিশেষ একজনের প্রতিভা কিংবা বুদ্ধির দীপ্তি প্রথমে লক্ষ্য করে নি। ভাই যে বোনদের থেকে ভিন্ন কিছু—তার সামান্যতম ইঙ্গিতও কিছু বোঝা যায় নি। মানিয়া নিজেও সেকথা ভাবে নি। এই পরমাত্মীয়দের তুলনায় সে নিজেকে এত ছোট মনে করত যে, তাকে বিনয় না বলে অন্য কিছু বলা উচিত। কিন্তু নতুন কর্মসূত্রে যেসব মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে তার যাতায়ত শুরু হলো, সেখানে তার শ্রেষ্ঠত্ব গোপন রইল না। একথা মানিয়া নিজেই বুঝল। আর মনে মনে খুশিও হলো এই দেখে যে এদের উচ্চ বংশ, ধন-সম্পদের কোন মূল্যই তার কাছে নেই। ঈর্ষা তাকে কোন দিনই স্পর্শ করে নি। তার নিজের পিতৃগৌরব, নিজেদের পরিবারের শিক্ষা-দীক্ষা তার মনের মধ্যে গর্ববোধ এনে দিল। যে সব বাড়িতে সে চাকরি করেছিল, সেই সব বাড়ির গৃহকর্তা ও গৃহিনীদের মধ্যে বিতৃষ্ণা, সরলতার অভাব ও অহঙ্করের ভাব পরিস্ফুট। মানব-চরিত্র সম্বন্ধে মানিয়ার এই প্রথম অভিজ্ঞতা

এক দার্শনিক গবেষণার গণ্ডির মধ্যে, অথবা 'অর্থের দ্বারা বিনষ্ট মানব সমাজ'-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। সে বুঝল যে, ব্রনিয়াকে যা অতো সহজে বোঝাতে পেরেছিল, বাঁচতে হলে সেই কর্মপদ্ধতির পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে।

মানিয়ার আশা ছিল যে ওয়ারসতে বসে টাকা রোজগার করলে দূরে বসবাসের কষ্টটা লাঘব হবে। শহরে থাকা মানেই কিছুটা মনঃকষ্ট কম পাওয়া। বাড়ির কাছে থাকা চলবে, প্রতিদিন বাবার সঙ্গে দেখা ক'রে, কথা ব'লে মনটা হাল্কা করা যাবে। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ চলতে পারবে, 'ফ্লোটিং ইউনিভার্সিটি'র সঙ্গে যোগাযোগ রাখাও চলবে, সন্ধ্যাবেলা পড়াশোনাও করা যাবে।

স্বার্থত্যাগের স্বাদ যারা পেয়েছে, তারা মাঝ পথে থামতে পারে না। মানিয়ার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হতে এখনও অনেক দেরী : অর্থোপার্জন হচ্ছে না, উপরন্তু খরচও সে একটু বেশীই করে। দৈনিক ছোট খাট কেনাকাটা ক'রে মাসের শেষে অল্পই উদ্‌বৃত্ত থাকে। মারিয়া রাকোভ্‌স্কার সঙ্গে ব্রনিয়া পারীতে দরিদ্র লাতিন পল্লীতে বাসা নিয়েছে। তাকে শিগগিরই টাকা পাঠানো দরকার। উপরন্তু অধ্যাপক শ্‌ক্লোদোভস্কির চাকরি থেকে অবসর নেবার সময়ও হয়ে এল। তাঁকেও সাহায্য করা প্রয়োজন।

বেশীদিন দ্বিধার মধ্যে পড়ে থাকা মানিয়ার স্বভাব নয়। দু' তিন সপ্তাহ আগে দেশগাঁয়ে গভর্নেসের একটা লোভনীয় পদ খালি হওয়ার কথা সে শুনেছে। দূরেই সে যাবে, হোক না অজানা। তার প্রিয় পরিবার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হবে। তাতেই বা কি? মাইনেটা ভালো, আর নাম-না-জানা গ্রামে খরচ নেই বললেই চলে। মানিয়া নিজেকে বোঝালো : 'তাছাড়া খোলা মেলা আমি এত ভালোবাসি! আরও আগে আমার ভাবা উচিত ছিল। আত্মীয়াকে সে খবরটা জানিয়ে লিখল :

'আমার স্বাধীনতা ঘুচতে দেরী নেই, কারণ সামান্য দ্বিধার পর আমি দেশেই একটা কাজ নেব ঠিক করেছি। জানুয়ারিতে যোগ দেব বলে কাল পাকা কথা দিয়ে আসব। জায়গাটা 'প্লক্' সরকারের অধীনে। বছরে পাঁচশ' রুবল্ পাওয়া যাবে। কিছুকাল আগে এই চাকরির খবর শুনেছিলাম, কিন্তু তখন আমল দিই নি। ওই পরিবারে এখন যে গভর্নেস আছে, তাকে ওদের মনে ধরছে না, ওরা আমাকে চাইছে। তবে আমিও যে তাদের খুশি করতে পারব সেকথা মনে হয় না।'

১৮৮৬-র ১লা জানুয়ারি দারুণ শীতের মধ্যে মানিয়া যাত্রা করল। তার

জীবনে সেই দিনটি নিষ্ঠুর অক্ষরে লেখা হয়ে রইল। সাহস ক'রে বাবার কাছে বিদায় নিল; বারবার তার নতুন ঠিকানা বাবাকে স্মরণ করিয়ে দিল :

মাদ্‌মেয়োজেল মারিয়া শ্‌ক্লোদোভস্কা,
ম'সিয়ে ও মাদাম 'ক'-র বাড়ি,
স্‌জস্থকি, প্রজাস্‌নিজের কাছে।

ট্রেনে উঠে মুহূর্তের জন্য প্রফেসরের গোলগাল চেহারাটা চোখে পড়তে মৃদু হেসে বাবার দিকে তাকাল। তারপর গাড়ির বেঞ্চে বসে পড়ে নিজেকে বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ মনে হলো। তার আঠার বছর জীবনে আজই সে সর্বপ্রথম একা জীবনপথে বেরোল। একা—জীবনে এই প্রথম সে সম্পূর্ণ একা! কেমন একটা আতঙ্ক যেন মনকে ছেয়ে রাখে। একেবারে অপরিচিত বাড়ির দিকে যে ট্রেনটা তাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার মাঝে জীবনটা কেমন কাটবে! একটা সঙ্কোচ ও আতঙ্কে সে অভিভূত হয়ে পড়ল। যদি এই নতুন মনিব পুরোনো মনিবের মতোই হয়? যদি তার অনুপস্থিতিতে বাবার অসুখ করে? আর কি জীবনে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে! 'হঠাৎ বোকার মতো কাজ করে বসলাম না তো!' জানালার গা' ঘেঁষে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসেছে সে। কত সব প্রশ্ন জাগছে মনে। চোখের জলের ধারা নেমেছে গাল বেয়ে। যত মোছে ততই আবার অঝোরে নামে। বাইরে তুষারাবৃত স্তব্ধ পৃথিবী।

শীতের থমথমে নিশুতি রাত্রে তিন ঘণ্টা ট্রেনযাত্রার পর চার ঘণ্টা স্লেজযাত্রা! ওয়ার্‌স থেকে একশ কিলোমিটর উত্তরে প্রিন্স জারতোরিস্কির জমিদারীর কিছু অংশ ম'সিয়ে ও মাদাম 'ক' ভোগ করেন। বরফে জমে গিয়ে মানিয়া যখন ক্লান্ত শরীরে তাঁদের বাড়ি পৌঁছল, তখন গৃহকর্তার বিশাল বপু, গৃহিণীর অস্পষ্ট মুখ, ছেলেমেয়েদের ছানাবড়া চোখ কিছুই ভাল ক'রে লক্ষ্য করার অবস্থা তার ছিল না।

গরম চা আর মিষ্টি কথায় গভর্নেসকে অভ্যর্থনা করা হলো। তারপর দোতলায় উঠে মাদাম 'ক' মানিয়াকে তার ঘর দেখিয়ে দিয়ে বেচারীর যৎসামান্য জিনিস পত্রের মধ্যে সেখানে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন।

১৮৮৬-র ৩রা ফেব্রুয়ারী হেনরিয়েটাকে মানিয়া লিখেছে: 'মাস খানেক ম'সিয়ে ও মাদাম 'ক'-এর সঙ্গে কাটালাম, কাজেই নতুন জায়গায় নিজেকে এত দিনে অভ্যস্ত ক'রে এনেছি। এখন পর্যন্ত মন্দ লাগছে না। এরা মানুষ খুব ভাল। এদের বড় মেয়ে ব্রন্‌কার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলেছি, এবং কিছুটা শান্তিও পেয়েছি। আমার ছাত্রী আঁজিয়া শিগগিরই দশ বছরে পা

দেবে। বাচ্চাটি অবাধ্য নয়; তবে আদরে ওর মাথাটি খাওয়া হয়েছে, তাই বড় এলোমেলো স্বভাবের, তবে সবকিছুই মনের মতো পাওয়া যাবে এ আশা নিশ্চয়ই করা উচিত নয়।···এদেশে কেউ কাজ করে না, আমোদ করে। যেহেতু এ-বাড়িতে আমরা সাধারণের থেকে অন্য রকম ক'রে ভাবি, তাই লোকে আমাদের বিষয়ে চর্চা ক'রে কূল পায় না। এদেশে পৌঁছোবার ঠিক এক সপ্তাহের পর লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, কেন আমি কাউকে চিনি না, কেন আমি এখানকার পরচর্চা কেন্দ্র 'শরভাজ'-এ বলনাচে যোগ দিলাম না ইত্যাদি।··· আমার একটুও দুঃখ হয় নি, কারণ, 'ক' পরিবারের কর্তা গিন্নী পরদিন বেলা একটার সময়ে সেখান থেকে ফিরে এলেন। ধৈর্যের এই অহেতুক পরীক্ষার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে আমি বেঁচে গেলাম—বিশেষতঃ বর্তমানে শরীরটাও খুব জুৎসই যাচ্ছে না।···

'টুয়েল্‌ফথ নাইটে এখানে একটা বড় রকম বল্‌নাচের আয়োজন হলো। কার্টুনিষ্টের তুলির উপযুক্ত জন কয়েক অতিথিকে দেখে দারুন হেসেছি মনে মনে। এদেশের যুবসমাজ একেবারেই মিনমিনে, মেয়েদের মধ্যে একদল স্রেফ পাতিহাঁস, মোটে ঠোঁট দুটো ফাঁক করে না, আরেক দল আবার তেমনি ঝগড়াটে। এরই মাঝে আর সকলের থেকে ভিন্ন একদলকে বেশ বুদ্ধি রাখে বলে মনে হলো। কিন্তু সুবুদ্ধি ও জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান আমার ব্রনূকার মধ্যে এত পরিস্ফুট যে তাকে দুষ্প্রাপ্য রত্ন বলেই মনে হয়।···

'আমায় দিনে সাত-আট ঘণ্টা খাটতে হয়। আঁজিয়ার সঙ্গে চার ঘণ্টা, ব্রনূকার সঙ্গে তিন ঘণ্টা; যথেষ্ট বেশী। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। উপর তলায় আমার ঘর। বেশ বড়, নিরালা, পছন্দসই ঘরখানি। 'ক' পরিবারে একদল ছেলে মেয়ে আছে: ওয়ার্‌সতে তিন ছেলে (একজন ইউনি-ভার্সিটিতে, দু'জন বোর্ডিংস্কুলে), বাড়িতে ব্রনূকা (আঠার বছর), আঁজিয়া (দশ বছর), স্তাস্ (তিন বছর), মারিষ্কা (ছ'মাসের বাচ্চা)। স্তাস্ ভারী মজার ছেলে। ওর ঝি বুড়ি শিখিয়েছে ঈশ্বর সব জায়গায় আছেন, অমনি সে কাঁদো কাঁদো মুখে জিজ্ঞেস করে: 'তিনি কি আমায় ধরতে আসছেন? তিনি কি আমায় কামড়ে দেবেন?' ও আমাদের সবাইকে দারুণ হাসায়!···'

মানিয়া চিঠির মাঝখানে থেমে যায়, লম্বা টানা জানালার পাশে লেখার ডেস্কটা টেনে এনেছে। পরনে শুধু একটা পশমের জামা, তবু সে শীত অগ্রাহ্য ক'রে ঝোলা-বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বাইরে এসে যা' দেখল, তাতে তার ভারী হাসি পেল। শহর থেকে দূরে গ্রামের দৃশ্য, ফাঁকা মাঠ, বনবাদাড় আশা ক'রে

এসে ঘরের জানালা খুলে প্রথমেই চোখে পড়ছে কারখানার উঁচু চিমনি দিয়ে ধোঁয়ার রাশ তাল তাল হয়ে ছড়িয়ে সারা আকাশ ময়লা ক'রে দিচ্ছে।...

চারপাশে বহুদূর পর্যন্ত মাঠ, জঙ্গলের লেশটুকু চোখে পড়ে না। সমস্ত এলাকা জুড়ে কেবল বিট আর বিট। শরতে এই সব বিট গরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে কারখানায় যায়। সেখানে চিনি তৈরি হয়। গ্রাম্য চাষীরা বীজ বোনে, মাটি কোপায়, ফসল তোলে শুধু কারখানার জন্যে। ক্রাসিনিয়েক-এর গ্রাম্য ছোট ছোট কুটিরগুলো এই টকটকে লাল ইঁটের বাড়ির চারপাশে ভিড় ক'রে থাকে। এমন কি নদীটা পর্যন্ত যেন এই কারখানার বাঁদী, তার ঝলমলে রূপ নিয়ে কারখানায় ঢুকে ময়লা, কালো, তেলচিটে হয়ে বেরিয়ে আসে।

চাষবাস সম্বন্ধে ধুরন্ধর ব'লে নামে আছে এই 'ক' বাবুর। চাষের নতুন কায়দা-কানুন শিখে এসে দুশো একর জমিতে বিট ফলাবার ছক কাজে পরিণত করছেন তিনি। পয়সা করেছেন ভদ্রলোক, কারখানার মস্ত অংশী-দারও বটে, কাজেই গাঁয়ের আর সব বাড়ির মতো এবাড়িরও ধ্যান-জ্ঞান শুধু কারখানাটিকে নিয়ে।

অবশ্য এর ভেতর উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব কিছুই নেই। যতই এঁরা কার-খানাকে নিয়ে মাথা ঘামান না কেন, অন্যান্য ডজন ডজন কারখানার মতোই এও একটি অতি সাধারণ ঘটনা। সৃজস্থকি এস্টেট ছোটই; যেদেশে বড় বড় এস্টেটের ছড়াছড়ি সেদেশে এটা এমন একটা কিছু নয়। 'ক'-দের অবস্থা সচ্ছল কিন্তু ঠিক ধনী বলা যায় না।—যদিও প্রতিবেশী এস্টেটের বাড়িগুলোর চেয়ে এদেরটা অনেক বেশী সুন্দর, তবু একে কেউ প্রাসাদ বলবে না। নেহাৎ সেকেলে ধরনের বাড়ি, হাল্কা পলেস্তারার ওপর ঝুঁকে-পড়া নীচু ছাদ, জাফরির গায়ে লতানো ভার্জিনিয়া, কাঁচের বারান্দায় হাওয়া আটকায় না।

এখানে একমাত্র সুন্দর জায়গা 'আনন্দ উদ্যান'। গ্রীষ্মকালে এর মাঠটুকু, গাছ-গাছালি, সুন্দর ক'রে ছাটা সারি সারি এ্যাস্ গাছ ছাওয়া ক্রোকে-খেলার মাঠ—সব মিলিয়ে অপূর্ব হয়ে ওঠে। বাড়ির ওপাশে ফলবাগান, আরও পেছিয়ে লালছাতের গোলাঘর, চারটে আস্তাবল, গোয়াল, চল্লিশটা ঘোড়া, ষাটটা গোরুর বাথান। তার বাইরে যতদূর চোখ যায় আদিগন্ত শুধু বিট আর বিট।

মানিয়া নিজের মনকে সান্ত্বনা দেয়: 'এসে ভালই করেছি। কারখানাটা সুন্দর নয় সত্যি, কিন্তু এই কারণেই এখানে উত্তেজনার অভাব হয় না।

ওয়ার্স্ থেকে নিত্যই লোকজন যাতায়াত করছে। চিনির ফ্যাক্টরিতে ইঞ্জিনিয়ার আছে, ডিরেক্টর আছে, তাই বা মন্দ কি? ওখান থেকে বই পত্র ধার করা যেতে পারে। মাদাম 'ক' রগচটা মানুষ, কিন্তু মনটা সাদা। আমার সঙ্গে উনি সর্বদাই সাবধানে দূরত্ব রেখে চলেন, কারণ উনি নিজেই এককালে গভর্নেস্ ছিলেন, হঠাৎ টাকা পয়সার মুখ দেখেছেন। স্বামীটি চমৎকার মানুষ, বড়মেয়ে দেবকন্যা, বাচ্চাগুলো অসহ্য নয়। আমার বরাত-জোর আছে বৈকি!'

চক্চকে পোর্সেলিনের মস্ত বড় একটা স্টোভ ঘরের প্রান্তে মাটি থেকে ছাদ পর্যন্ত খাঁজ কাটা জায়গার মধ্যে বসানো। মানিয়া হাত দুটি গরম ক'রে নেয়; যে পর্যন্ত না কোন গম্ভীরস্বর দেয়ালের ওধার থেকে দরজা ভেদ করে 'মাদ্‌মোয়াজেল মারিয়াকে' জরুরী তলব দেয়, সেপর্যন্ত সে নিশ্চিন্ত। শুধু শহর থেকে খবর পাবার লোভেই নিঃসঙ্গ গভর্নেস্ অনেক চিঠি লিখতে পারে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস কেটে গেল। মানিয়া তার সহস্র কাজের বিবরণ দিয়ে আত্মীয়-স্বজনকে চিঠি লেখে। বাবাকে, যোসেফকে, হেলাকে, স্নেহময়ী ব্রনিয়াকে, ইস্কুলের বন্ধু কাজিয়াকে সে চিঠি দেয়। হেনরিয়েটার বিয়ে হয়ে লুভেতে বাসা বেঁধেছে। এখনও সে দারুণ পজেটিভিষ্ট রয়ে গেছে। তারই কাছে মানিয়া তার যাবতীয় সমস্যা, আশা, আশঙ্কা মেলে ধরে।

৫ই এপ্রিল ১৮৮৬, হেনরিয়েটাকে লেখা মানিয়ার একটা চিঠিতে আমরা দেখি: 'আমি আমার নিজের জায়গায় বেশ আছি, এদের এড়িয়ে নিজেও একটু পড়াশোনা করি; কিন্তু সমানে নতুন অতিথির ভিড়ে আমার বড় বেশী সময় নষ্ট হয়। মাঝে মাঝে এর জন্য দারুণ বিরক্তি আসে। আমার আঁজিয়া পড়াশোনায় ফাঁকি দেবার এতটুকু কারণ ঘটলে উল্লসিত হয়ে ওঠে। তখন তাকে রোখে কার সাধ্য। আজ কিছুতেই সময়মত ঘুম থেকে উঠবে না, তাই নিয়ে এক হুলুস্থুল কাণ্ড। শেষ অবধি কোন কথা না বলে তাকে বিছানা থেকে টেনে তুললাম। রাগে গা জ্বলে যাচ্ছিল। এরকম হাজার রকমের খুঁটিনাটি বোকার মতো কাণ্ড ঘটে যাবার পর বহুক্ষণ পর্যন্ত আমার শরীরের অস্বস্তি যায় না। কিন্তু তাকে আমার শোধরাতেই হবে।...

'এখানে আলোচনার বিষয়বস্তু হলো পরচর্চা, কেবল পরচর্চা। প্রতিবেশী, নাচ, পার্টি—এ ছাড়া আর বলবার কিছু নেই। এদেশের অল্পবয়সী মেয়েরা পর্যন্ত এতো ভালো নাচে যে তেমন নাচ সহজে চোখে পড়ে না। প্রত্যেকে নিখুঁত ভাবে নাচতে পারে। আসলে এরা খারাপ নয়; কয়েকজনকে বেশ বুদ্ধিমতী বলেই মনে হয়, তবে লেখাপড়ার অভাবে মানসিক বিকাশের

পথ পায় নি, উপরন্তু সামনে বড় বড় নেমন্তন্নের চাপে বুদ্ধিভ্রংশ হ'তে বসেছে। ছেলেদের মধ্যে কয়েকজনকে বেশ ভাল ব'লে মনে হয়, বুদ্ধিমানও বটে। ছেলে মেয়েদের ভেতর 'পজেটিভিজম্' বা 'লেবার কোয়েশ্চন'—এগুলি অপরিচিত শব্দ, কেউ কেউ যদি বা শুনে থাকে, তবে উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনে ঘৃণার ভাব জেগে ওঠে। 'ক' পরিবারটি এদের থেকে বেশী শিক্ষিত। মঁসিয়ে 'ক' সেকেলে মানুষ হলেও যথেষ্ট সুবুদ্ধি রাখেন, যথেষ্ট দরদী ও যুক্তিবাদী মানুষও বটে। এঁর স্ত্রীর সঙ্গে বাস করা সহজ নয়, তবে একবার চিনে নিলে মানুষটিকে ভালই লাগে। বোধহয় আমায় উনি যথেষ্ট পছন্দও করেন।...

'হায়, আমার মতো এমন আদর্শ মেয়েটিকে তুমি তো এই পরিস্থিতিতে দেখতে পেলে না! প্রতি রবিবার ও ছুটির দিনে মাথাধরা বা সর্দি ক্যাশির অজুহাত না দিয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মতো গির্জায় যাই। উচ্চ নারী-শিক্ষার বিষয়ে কখনও কথা বলি না। এক কথায় বলতে গেলে আমার বর্তমান অবস্থায় যা' যা' করনীয় কর্তব্য, সে সবই ক'রে থাকি।—'

বেচারী মানিয়া নিজের আদর্শ চরিত্র সম্বন্ধে ব্যঙ্গ ক'রে লিখলেও, তার ভেতরের মহত্তর সত্তা বেশীদিন গতানুগতিক জীবনের চাপের নীচে পড়ে থাকতে পারল না। পজেটিভিষ্ট আদর্শ অনুসারে সে চাইত কাজ করতে, চাইত যুদ্ধ করতে।

একদিন কয়েকজন ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরা চাষার ছেলেমেয়েদের দড়ি পাকানো চুল আর সাহসে-ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে মানিয়ার হঠাৎ খেয়াল হলো ছোট্ট সৃজসুকি শহরের মাটিতে কেনই বা সে তার কাজ শুরু করতে পারবে না? গত বছর সে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্কল্প করেছিল, আজ হাতের সামনে এমন সুযোগ পড়ে আছে! বেশীর ভাগ গ্রামের ছেলের অক্ষর পরিচয় পর্যন্ত হয় নি। যদি এদের মধ্যে কারুর ইস্কুল যাবার সৌভাগ্য হলো তো, সেখানে শুধু রুশ ভাষাই শিখল। গোপনে এই ছোট ছোট মস্তিষ্কের ভেতর স্বদেশীভাষা আর দেশের ইতিহাসের বীজ বোনা কি যায় না?

গভর্নেস মানিয়া তার প্রিয় ছাত্রী কুমারী 'ক' কে সব কথা খুলে বলল, সঙ্গে সঙ্গে সমর্থনও পেল। প্রচণ্ড উৎসাহ সংযত করার চেষ্টায় মানিয়া বলল: 'খুব ভাল ক'রে ভেবে দেখ। তুমি জানো এ খবর বাইরে প্রকাশ পেলে আমাদের কপালে কিন্তু সাইবেরিয়া!'

কিন্তু দুঃসাহসের মতো সংক্রামক মনোভাব তো আর কিছু নেই। ব্রনকার উৎসাহ আর দৃঢ়সংকল্প মানিয়ার দৃষ্টি এড়াল না। এখন বাকী রইল শুধু

বাড়ির অভিভাবকদের ছাড়পত্র ; তা হলেই ওরা চাষীদের ঘরে গিয়ে কাজ শুরু করতে পারে।

১৮৮৬-র ৩রা সেপ্টেম্বর, হেনরিয়েটাকে মানিয়া লেখে : 'এই গ্রীষ্মে একটা ছুটি পাওনা ছিল, কিন্তু কোথায় বা যাব, সেই কথা ভেবে সৃজস্থকিতেই রয়ে গেলাম। কার্পেথিয়াতে গিয়ে টাকা খরচ করতে ইচ্ছে হলো না। আঁজিয়াকে অনেকক্ষণ পড়াই, ব্রন্‌কাকে নিয়ে একসঙ্গে পড়ি, এখানের এক শ্রমিকের ছেলেকে ইস্কুলের জন্যে তৈরি ক'রে দিচ্ছি, তার সঙ্গে প্রতিদিন ঘণ্টাখানেক ক'রে খাটি, তাছাড়া ব্রন্‌কা আর আমি কৃষাণ ছেলেদের দৈনিক তু'ঘণ্টা ক'রে পড়াই। মোটামুটি একটা ক্লাসই বলা যায়—কারণ এর মধ্যেই আমাদের দশজন ছাত্রছাত্রী জুটে গেছে। এরা খুব খুশি হ'য়ে পড়াশোনা করে, তবে মাঝে মাঝে কাজটা কঠিন ঠেকে। একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, ক্রমে ক্রমে ফল ভাল পাচ্ছি। অবশ্য নিজের পড়াশোনা কিন্তু কম-বেশী আমি চালিয়ে যাচ্ছি।'

হেন্‌রিয়েটাকে লেখা মানিয়ার আর একখানা চিঠি : 'বর্তমানে আমার ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা আঠোরো। সবাই একসঙ্গে আসে না, কারণ সেরকম ক'রে পড়ানো সম্ভব নয়, তবে মোটমাট তু'ঘণ্টা লাগে। বুধবার আর শনিবার আমি এদের একটু বেশী সময় দিতে পারি। এক নাগাড়ে পাঁচ ঘণ্টা। আমার ঘরটা দোতলায়, উঠোন দিয়ে আলাদা সিঁড়ি আছে, কাজেই 'ক'দের কোন অসুবিধা হয় না। এই সব শিশুরা আমার আনন্দ ও সান্ত্বনার খোরাক জোগায়।...'

কাজেই আঁজিয়াকে একঘেয়ে পড়ানো, ব্রনকাকে সাহায্য করা, ছুটিতে বাড়ি ফেরা, জুলেখ যাতে পড়ার সময়ে ঘুমিয়ে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখা—মানিয়া অনেক কাজ ক'রে যায়। বাড়ির কাজ সেরে নিজের ঘরে গিয়ে এই তুঃসাহসী মেয়ে সিঁড়িতে ছাত্রদের জুতোর শব্দের প্রতীক্ষায় কান খাড়া ক'রে থাকে। লিখতে সুবিধে হবে বলে একখানা পাইন কাঠের টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার জোগাড় ক'রে ফেলল সে। অর্জিত টাকা থেকে অনেকটাই এদের বই খাতা কিনতে খরচ করল। ওরই কেনা কলম দিয়ে অতি কষ্টে ছোট ছোট আঙুল দিয়ে আড়ষ্ট ভাবে এরা লেখে।

শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরা মানিয়ার কালো পোশাক আর সুন্দর চুলের চার-পাশে ভিড় ক'রে থাকত। এরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে পারত না, এদের গা থেকে সুবাসও ঝরতো না। কেউ বা অন্যমনস্ক, কারো বা গোমড়া মুখ। কিন্তু বেশীর ভাগ ছাত্রের উজ্জ্বল চোখেমুখে লেখাপড়া শেখার অদম্য ইচ্ছা ফুটে উঠত। সাদা কাগজের গায়ে বড় বড় কালো হরফে যখন অর্থপূর্ণ শব্দ ফুটে

উঠত, তখন এই শিশুদের উল্লাসধ্বনি, আর ঘরের একপ্রান্তে নীরবে অপেক্ষমান অশিক্ষিত পিতামাতার মুখে শ্রদ্ধার ভাব জাগত। কিন্তু মানিয়ার মনে আশা জাগত না, মনে হতো এসবই ব্যর্থ যাবে। এই সব বঞ্চিত হতভাগ্যদের মাঝে না জানি কত শক্তি লুকিয়ে আছে! অজ্ঞানতার সমুদ্রের সামনে নিজেকে বড় দুর্বল, বড় অসহায় মনে হতো।

॥ দীর্ঘ প্রতীক্ষা ॥

৬

গাঁয়ের এই ক্ষুদে কৃষাণরা কল্পনাও করতে পারত না যে মাদমোয়াজেল মারিয়া নিজের অজ্ঞতা সম্বন্ধে কত দুশ্চিন্তিত। তারা জানত না যে, এই স্বল্পবয়সী মেয়েটির আসলে শিক্ষা দেওয়ার থেকে জ্ঞান আহরণ করাতেই আগ্রহ বেশী।

জানালা দিয়ে কারখানমুখী বিট বোঝাই গোরুর গাড়ির সারির দিকে চেয়ে মানিয়া ঠিক এই মুহূর্তে কল্পনা করে কত হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রী বার্লিন, ভিয়েনা, পিটস্‌বুর্গ ও লণ্ডন শহরে পড়াশোনা করছে, বক্তৃতা শুনছে, ল্যাবরেটারিতে, মিউজিয়ামে, হাসপাতালে কাজ করছে। আর সব দেশের চেয়ে মারিয়ার পারীতে যাবার ইচ্ছেই বেশী, ফ্রান্সের সম্মানে তার চোখ ঝলসে যায়। বার্লিন ও পিটস্‌বুর্গ পোল্যাণ্ড অত্যাচারী শাসকের অধীন। কিন্তু ফ্রান্সের লোক স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়: সকল বিশ্বাস, সকল অনুভূতিকে সম্মান দেয় আর নিপীড়িত লোক,—দেশ-বিদেশ নির্বিচারে সেখানে স্থান পায়। সত্যিই কি কোনদিন পারীতে যাবার সৌভাগ্য তার হবে?

সব আশাই সে ত্যাগ করেছে।...বারোটি মাস বাইরে কাটিয়ে তার ভবিষ্যতের স্বপ্ন মিলিয়ে এল; কারণ জ্ঞানার্জনের অদম্য তৃষ্ণা ও আশা হৃদয়ে পোষণ করা সত্ত্বেও অলীকের পেছনে ছোটা তার স্বাভাববিরুদ্ধ। চিন্তা করতে বসে মানিয়া আশা অঙ্কুরিত হবার কোন লক্ষণই তার সামনে দেখতে

পায় না। ওয়ারসয় বাবা আছেন, শিগগিরই তাঁকে সাহায্য করার দরকার হবে। পারীতে ব্রনিয়া আছে। তাকে এখনও বহু দিন টাকা পাঠাতে হবে—আর এখানে সৃজস্থকি এস্টেটে সে নিজে গভর্নেস্ হয়ে পড়ে আছে। এক-সময়ে টাকার যে কল্পনা সে করেছিল, সে-কথা চিন্তা ক'রে আজ সত্যিই হাসি পায়। সৃজস্থকির মতো জায়গা থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। যে-কোন উনিশ বছরের মেয়ের মতোই নৈরাশ্য আর বেদনায় দগ্ধে মরতে, নিজের মনে নিজেকে খণ্ডন ক'রে দেখতে ভালই লাগে ; একই সঙ্গে সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে পরমুহূর্তে নিজের মনে স্বেচ্ছাকৃত কৃচ্ছ্রসাধনের বিরুদ্ধে প্রাণপন যুদ্ধ করে।

অসম্ভব মনের জোর মানিয়ার, তাই প্রতিদিন রাত্রে কারখানার লাইব্রেরি থেকে সমাজতত্ত্ব আর ফিজিক্সের মোটা মোটা বই নিঃশেষ করে আর চিঠিতে বাবার কাছ থেকে অঙ্কের বিদ্যা ঝালিয়ে নেয়।

এই বিশ্রামের কোন সার্থকতা নেই যেখানে সেখানে মানিয়াকে এই ভাবে ধৈর্য ধরে খেটে যেতে দেখে সত্যিই অবাক লাগে! দেশ-গাঁয়ের বাড়িতে এমন কেউ নেই যার কাছ থেকে এতটুকু সাহায্য বা উপদেশ পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ আন্দাজে জ্ঞানের বূহ্য ভেদ ক'রে চলার পথপ্রদর্শক হিসেবে হাতে আছে গুটিকয়েক সেকেলে পকেট বই। কিন্তু আজকের দিনে সেসবের যোগ্যতা কি আছে? নৈরাশ্যের মুহূর্তগুলিতে তার অবস্থা তার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের মতোই মনে হয়। মাঝে মাঝে তারা পড়াশোনায় জলাঞ্জলি দিয়ে অক্ষরগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয় ; মানিয়া কিন্তু চাষার গোঁ নিয়েই লেগে থাকে।

চল্লিশ বছর পর এক চিঠিতে তিনি লেখেন : '—সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান, সাহিত্য সবই আমি একরকম ভালো বাসতাম। তবু এত দিনের কাজের মধ্যে দিয়ে আমি আমার প্রকৃত প্রিয় বস্তুর সন্ধান করেছি, শেষ অবধি অঙ্ক আর ফিজিক্সের দিকেই ঝুঁকে পড়লাম।…

'নিঃসঙ্গ এই পড়াশোনা সত্যিই খুব কঠিন। আমার ইস্কুলে শেখা বিজ্ঞানের বিদ্যে অসমাপ্ত ছিল। ফ্রান্সে এই বিদ্যে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পাওয়া অসম্ভব। দৈবের কৃপায় যে কটি বিজ্ঞানের বই হাতে পেতাম, তারই সাহায্যে বিজ্ঞান চর্চা করতাম। পথ আদৌ ফলপ্রসূ ছিল না, কিন্তু একা একা কাজ করার অভ্যাসের আমার দরকার ছিল এবং এমন কতকগুলি জিনিস আমি শিখলাম যা ভবিষ্যতে আমার কাজে দিল…'

সৃজস্থকি থেকে একটা চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন হেনরিয়েটাকে :

'আমার সমস্ত কাজকর্ম মিলিয়ে মাঝে মাঝে এমন দিনও আসে যখন সকাল আটটা থেকে সাড়ে এগারটা, আবার দুটো থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত এক মুহূর্ত বিশ্রাম পাই না। সাড়ে এগারটা থেকে দুটো পর্যন্ত হাঁটা তারপর খাওয়া। চায়ের পর্ব চুকে গেলে যেদিন আঁজিয়া লক্ষ্মী মেয়ে হয়, সেদিন পড়াই নইলে গল্প কিংবা সেলাই করি। সেলাইটা অবশ্য পড়বার সময় পাশেই নিয়ে বসি। যদি অঘটন কিছু না ঘটে তবে রাত ন'টার সময় আমার বইপত্তর খুলে বসি। একটু বেশী কাজ করার আশায় ভোর ছ'টায় ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস করেছি, কিন্তু সবদিন সব কিছু ক'রে উঠতে পারি না। একজন দারুণ চমৎকার বুড়ো মানুষ, আঁজিয়ার ধর্মপিতা, এখন এখানে আছেন আর মাদাম 'ক'-এর হুকুমে আমি তাঁর কাছ থেকে দাবা খেলতে শিখেছি। বুড়োকে একটু আনন্দ দেওয়া আর কি! তাসও খেলতে হয় মাঝে মাঝে, এতে বই থেকে মনটা সরে যায়। বর্তমানে যে বিষয়গুলো পড়ছি, তাদের নাম হলো :—(১) দানিয়েলের ফিজিক্সের প্রথম খণ্ড,—শেষ করেছি; (২) স্পেন্সারের 'সমাজতত্ত্ব' (ফরাসীতে); (৩) পল্ বারস্-এর 'শরীরের গঠন ও শরীরতত্ত্ব' (রুশ-ভাষায়)। আমি একসঙ্গে অনেক বিষয় পড়ি। একই বিষয় পড়তে থাকলে আমার বেচারা ছোট্ট মাথাটা ক্লান্ত হয়ে পড়ে; এমনিতে তার বোঝা তো কম নয়! যখন মন দিয়ে পড়া অসম্ভব হয় তখন বীজগণিত আর জ্যামিতির প্রবলেমগুলো নিয়ে বসি, কারণ মন না দিয়ে এপথে এগনো অসম্ভব; ক্রমেই মনটা আপনা থেকে ঠিক পথে ফিরে আসে।

'বেচারী দিদিভাই পারী থেকে লিখেছে যে, পরীক্ষা নিয়ে ওখানের ওরা বড্ড গণ্ডগোল করছে। খাটুনি বেড়েছে খুব, শরীরটাও তাই জুৎ নেই।

'আমার ভবিষ্যৎ কর্মসূচী জানতে চেয়েছ? কিছু নেই, যাও বা আছে তা এত সাধারণ, এত নগণ্য যে, সে-বিষয়ে না-ভাবাই ভাল। যথাসম্ভব ভাল ক'রে উৎরে যেতে চাই, আর যখন কিছু করার থাকবে না, তখন এই কঠিন পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাব। কতটুকু ক্ষতি আর কার হবে, আর পাঁচজনের বেলায় যেমন হয়; তেমন দুঃখের বিশেষ কারণ থাকবে না।

'আপাততঃ আমি নিজের বিষয়ে এইটুকু ঠিক করেছি। অনেকের ধারণা সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও প্রেম নামক ব্যাধির সম্মুখীন হতেই হবে। আমার জীবনধারার নক্সার মধ্যে তার স্থান তো কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না! যদি কোনদিন আমি অন্য কিছু ভেবেও থাকি, সেসব ধোঁয়া হয়ে উবে গেছে, সেসব আমি কবরে পুঁতে দিয়েছি। তালাবন্ধ করেছি, শীলমোহর দিয়ে মন

থেকে সরিয়ে দিয়েছি। তুমি তো জান, দেয়াল যারা ভাঙ্গার কথা চিন্তা করে তাদের চেয়ে দেয়ালের শক্তি কত বেশী…'

এজাতীয় আত্মহত্যার অস্পষ্ট চিন্তা, এই নিদারুণ হতাশা ও প্রেম সম্পর্কে এমন ব্যঙ্গোক্তির কারণ নিশ্চয়ই আছে। কারণটা সহজ ও খুবই স্বাভাবিক। একে এক হতভাগিনী তরুণীর কল্পনাবিলাস বলা যেতে পারে। বহু উচ্ছ্বাসবহুল উপন্যাস ঠিক এই সবের উপরই তো লেখা হয়ে থাকে।

এবং সে-গল্পের শুরু হলো এই ভাবে: মানিয়া শ্ক্লোদোভস্কা রূপসী হয়ে উঠেছে। আরও কয়েক বছর পরে তোলা ছবিতে যেমন রূপের মধ্যে অবাস্তবের ছোঁয়া লেগেছে, ঠিক তেমনটি না হলেও গোলগাল কিশোরী বালিকা এখন যুবতীতে পরিণত হয়েছে। চমৎকার লাবণ্যশ্রী ফুটে উঠেছে তার দেহে, হাতের কব্জি ক্ষীণ, পদযুগল সুগোল। মুখখানা নিখুঁৎ না হলেও অধরের বঙ্কিম রেখা আর ভ্রূর নীচের গভীর দু'টি চোখ বিশ্বজোড়া জিজ্ঞাসায় যেন আরও বিশাল দেখায়।

মঁসিয়ে ও মাদাম 'ক'-এর বড় ছেলে কাসিমির ওরার্স থেকে ছুটিতে বাড়ি ফিরে দেখে যে এক আশ্চর্য গভর্নেস্ তাদের বাড়িতে বাস করছে। এ মেয়ে চমৎকার নাচতে জানে, নৌকো বাইতে পারে, বরফের ওপর স্কেট করতে পারে, অসম্ভব বুদ্ধি রাখে। এর চাল-চলন নিখুঁৎ, গড়গড়িয়ে কবিতা রচনা করে আবার তেমনি সহজে ঘোড়া চড়ে, গাড়ি হাঁকায়। তার পরিচিত সব মেয়েদের থেকে এর কতো তফাৎ! কে এই অসামান্যা যুবতী? কাসিমির তার প্রেমে পাগল হলো। আর মানিয়া? মানিয়া তার বিদ্রোহী আদর্শবাদের নীচে সংগোপনে হৃদয়টি চাপা দিয়ে রাখল। তবু এই সুন্দর ভদ্র যুবকটি কি তাকেও মুগ্ধ করে নি? এখনও তার উনিশ বছর পার হয় নি। যুবক সামান্য কিছু বড়। তারা বিয়ে করবে বলে ঠিক করল।…

এই বিয়ের বিরুদ্ধে যে কোন বাধা থাকতে পারে, তা তাদের মনে হয় নি। যদিও মানিয়া সৃজস্থকির সেই "কুমারী মারিয়া," ছেলেদের গভর্নেস্ মাত্র, তবু প্রত্যেকে তাকে ভালোবাসে: মঁসিয়ে 'ক' তার সঙ্গে বহু দূরে হাঁটতে হাঁটতে যান। মাদাম তাকে মেয়ের মতো ভালোবাসেন। ব্রন্‌কা তো রীতিমত পূজো করে। 'ক'-রা সর্বদাই তার সঙ্গে ভদ্রতা বজায় রেখে চলে। অনেকবার তার বাবা, ভাইবোনদের নেমন্তন্ন ক'রে এনেছে এই বাড়িতে। ওর জন্মদিনে ফল ও নানারকম উপহার দিয়েছে। সেইজন্য বিশেষ কিছু না ভেবে প্রায় নিশ্চিন্ত

হয়েই কাসিমির তার বাপমায়ের অনুমতি চাইতে গেল। উত্তর আসতে দেরী হলো না। ছেলের কথা শুনে বাবা তো ক্ষেপে গেলেন, মারও প্রায় অজ্ঞান হবার দশা। তাদের প্রিয় পুত্র কাসিমির কিনা কপর্দকহীনা এক গভর্নেসকে বিয়ে করতে চায়? বিয়ে করতে চায় এমন মেয়েকে—যাকে পরের বাড়ি খেটে খেতে হয়! যে ছেলে চাইলেই পাড়ার সবচেয়ে বড়ো লোকের সবচেয়ে বড় বংশের মেয়েকে বিয়ে করতে পারে, সে কিনা পাগল হলো এই মেয়ের জন্য!

যে বাড়িতে মানিয়া বন্ধুর মতো ব্যবহার পেয়ে আসছিল, সেখানে মুহূর্তের মধ্যে দুরূহ সামাজিক নিষেধের গণ্ডি সৃষ্টি হয়ে গেল। মেয়েটি যে ভালো বংশের, শিক্ষিতা, সুপ্রশংসিতা, তার অধ্যাপক পিতা যে ওয়ারসতে সসম্মানে বাস করেন—এ সব যুক্তিই মূল্যহীন: 'গভর্নেসকে কেউ কখনও বিয়ে করে?'

বক্তৃতার পর বক্তৃতাতে বেচারা কাসিমিরের মনোবল ভেঙে গেল। তার নিজস্ব মতামতের জোর ছিল না। বকুনি খেয়ে, রাগ দেখে সে ভয় পেয়ে গেল। বেচারী মানিয়া তার চেয়ে অনেক নীচু স্তরের এই মানুষগুলির ঘৃণা ও অবজ্ঞায় সঙ্কুচিত হয়ে একেবারে চুপ হয়ে গেল। জীবনের সুরকে সে ভুলে যাবার সঙ্কল্প করল।

কিন্তু প্রেম যে উচ্চাশার মতো, মৃত্যুতেও তার মরণ নেই।

মানিয়া নিষ্ঠুর সোজা পথটা ধরতে পারল না। স্‌জস্থকি ছেড়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। বাবাকে বিব্রত করতে চায় না সে। উপরন্তু এত ভালো চাকরি ছেড়ে দেবে কি ক'রে? পারীতে দিদির পুঁজি শেষ হয়ে গেছে, তার ডাক্তারি পড়ার খরচ জোগান দেয় সে এখান থেকে টাকা পাঠিয়ে। কখনও পনের, কখনও কুড়ি রুবল। তার মাইনের অর্ধেক প্রতি মাসে সে তাকে পাঠায়। আর কোথায়ই বা এত মাইনে পাবে? 'ক'দের সঙ্গে সোজাসুজি এ বিষয়ে কোন কথা হলো না, কোন জবাবদিহি তাকে করতে হয় নি। নিজের মনে গুমরে মরে সে, কিছুই যেন হয় নি এমন ভাব দেখিয়ে স্‌জস্থকিতে থেকে যাওয়াই সে স্থির করল।

আগের মতোই সব চলতে লাগল। মানিয়া পড়ায়, আঁজিয়াকে বকে, ঘুমকাতুরে জুলেখকে ধরে ঝাঁকানি দেয়, চাষার ছেলেমেয়েদের মধ্যে তার কাজ ঠিকই চলতে থাকে। কেমিষ্ট্রি পড়ে আর নিজের মনে অযথা এই পণ্ডশ্রমের জন্য নিজেকে ব্যঙ্গ করে। দাবা খেলে, ছড়া তৈরি করে, নাচের আসরে যায়, খোলা বাতাসে ঘুরে বেড়ায়।

পরবর্তীকালে কোন একসময় তাঁর' এক লেখায় পাই : 'শীতকালে বরফে ঢাকা পৃথিবীকে বড় সুন্দর দেখায়। আমরা স্লেজে ক'রে লম্বা পাড়ি দিতাম। কোন কোন সময়ে পথ খুঁজে বের করা শক্ত হতো।...

'আমি চালককে বলতাম—চাকার চিহ্নটা কিন্তু হারিও না। সে জবাব দিত : আমরা মাঝ পথে আছি গো দিদিমণি! কিংবা বলতো : 'ঘাবড়িওনা।' সঙ্গে সঙ্গে হয়তো গাড়ি উল্টে পড়ে যেতাম। এতে কিন্তু আমোদ বাড়ত বৈ কমত না। একবার মাঠে বরফ খুব উঁচু হলো—আমরা চমৎকার বাড়ি বানালাম। এর ভেতর বসে সোনালী রঙ ধরা আগাগোড়া বরফে ঢাকা মাঠ দেখা যেত।.. '

ব্যর্থ প্রেম, ব্যর্থ জ্ঞান-সঞ্চয়নের স্বপ্ন, দারুণ অর্থের টানাটানি। মানিয়া সংসারে সাহায্য করতে গিয়ে রিক্ত হয়ে গেছে, হাতে নেই কিছু, সারা জীবন এই নরকে পচতে হবে, একথা সে ভুলতে চায়। পরিবারের দিকে হাত বাড়ায়, সাহায্য চাইতে নয়, দুঃখ জানাতে নয়, প্রতি চিঠি বয়ে আনে উপদেশ, সাহায্যের প্রতিশ্রুতি। এদের জীবন সার্থক হোক।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই মার্চ, যোসেফকে লিখছে মানিয়া :

'আমার মনে হয় তুমি যদি কয়েক'শ রুবল্ ধার করো তবে দেশে না পড়ে থেকে ওয়ার্সয় চলে যেতে পার। প্রথমতঃ, দাদাভাই আমার, বোকার মতো যদি কিছু লিখে ফেলি, রাগ করবে না তো! যা সত্য বলে বিশ্বাস করি তাই শুধু তোমাকে বলব। শুনছো দাদাভাই, সবাই বলে দেশে পড়ে থাকলে তোমার উন্নতি হবে না, গবেষণা করা হবে না। গর্তে পড়ে থাকলে কোন কিছুই করা যাবে না। একটা ওষুধের দোকান, হাসপাতাল আর বইয়ের সংস্পর্শ ছাড়া শুধু সংকল্প নিয়ে বসে থাকলে মানুষ ভোঁতা হয়ে যায়। তোমার ক্ষেত্রে যদি তাই হয়, তবে তুমি বুঝতেই পারছ, কি পরিমান দুঃখের কারণ হবে। আমার নিজের সম্বন্ধে সব আশা আমি বিসর্জন দিয়েছি; এখন তুমি আর দিদিভাই আমাদের সব আশাভরসা। তোমরা দু'জন অন্ততঃ নিজেদের ক্ষমতা অনুসারে জীবনটাকে ঢেলে সাজাতে চেষ্টা করো। আমাদের পরিবারের লোকেদের মধ্যে, আমার ধারণা, মনীষা আছে, ক্ষমতা আছে, এগুলো যাতে নষ্ট হয়ে না যায়, অন্ততঃ দু'একজনের মধ্যেও তা সার্থকতা লাভ যেন করে। আমার নিজের ওপর যতই বৈরাগ্য আসছে, তোমাদের জন্য আমার আশাটা ততই বাড়ছে। হয়তো আমার চিঠি পড়ে হাসছ, বা এমন একটা বক্তৃতা পড়ে কাঁধ দুটো একবার ঝাঁকিয়ে নিলে!

আমি তোমার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে বা লিখতে অভ্যস্ত নই, কিন্তু এ আমার মনের কথা, একেবারে অন্তরোৎসারিত। আমার এ কল্পনা অনেক দিনের, সেই যেদিন তুমি পড়াশোনা শুরু করেছ সেই দিন থেকে।...

'তাছাড়া ভেবে দেখো, তোমায় কাছে পেলে বাবার কত ভাল লাগবে! তোমায় তিনি এত ভালোবাসেন, আমাদের সকলের চেয়ে বেশী ভালোবাসেন। ভেবে দেখো হেলা যদি মঁসিয়ে 'খ'কে বিয়ে করে আর তুমি ওয়ার্স থেকে চলে যাও, তবে বাবার একা একা কি অবস্থা হবে। তাঁর দুঃখের শেষ থাকবে না। কিন্তু তুমি আর বাবা একসঙ্গে থাকতে পারলে কত ভাল হয়। কেবল মাত্র আশ্রয়ের কথা মনে ক'রে একটু জায়গা আমাদের জন্যে রেখো— যদি কখনো আবার ফিরে যাই।'

হেন্‌রিয়েটার একটি মৃত সন্তানের জন্মের খবর পেয়ে হেন্‌রিয়েটাকে মানিয়া লেখে: ১৮৮৭-র ৪ঠা এপ্রিল:

'এত কষ্ট সহ্য করার পর ফল না পেলে মায়ের মনের কী অবস্থা হ'তে পারে? আমি বুঝতে পারছি তোমার দুঃখ। যদি বিশ্বাসী খৃষ্টানের মতো বলতে পারতাম ঈশ্বর ইচ্ছা করেছিলেন—তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক্‌,—তাহ'লে অর্ধেক কষ্ট হয়তো লাঘব হতো। হায়! সে-সান্ত্বনা সকলের জন্য নয়। এখন মনে হয় ঐ রকম ক'রে যারা ভাবতে পারে, তারা কতো সুখী, কিন্তু আশ্চর্য এই যে, যতই আমি তাদের ভাগ্যবান মনে করি, ততই তাদের বিশ্বাসে আমার সন্দেহ জাগে, ততই তাদের সুখের প্রতি আমার বৈরাগ্য জাগে।...

'আমার দার্শনিক তত্ত্বালোচনা ক্ষমা ক'রো। যে শহরে তুমি বাস করো সেখানকার সেকেলে গোঁড়া মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ পড়ে এইসব কথা লিখে ফেললাম। মন খারাপ করো না, কারণ সামাজিক ও রাজনৈতিক গোঁড়ামির ভিত্তি হলো ধর্মের গোঁড়ামি, আর আমার তোমার কাছে যতই দুর্বোধ্য ঠেকুক—শেষেরটিতে শান্তি আছে। কারুর ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টির জন্য স্বেচ্ছায় সহানুভূতি আমি দেখাব না। যতক্ষণ সত্য হিসেবে যে যা গ্রহণ করেছে, ততক্ষণ যার যা বিশ্বাস থাকলই বা! কেবল ভণ্ডামিটা অসহ্য ঠেকে। যথার্থ বিশ্বাস যতই দুর্লভ হচ্ছে ভণ্ডামির মাত্রা ততই বাড়ছে। ভণ্ডামিকে আমি ঘৃণা করি, কিন্তু বিশ্বাস যেখানে খাঁটি, মনোবিকাশের গণ্ডি সেখানে ছোট হলেও, সেখানে আমার শ্রদ্ধা আছে।...'

১৮৮৭-র ২০শে মে যোসেফকে লেখে মানিয়া: 'এখন পর্যন্ত আদৌ বুঝতে পারছি না আমার ছাত্রী আঁজিয়া পরীক্ষা দেবে কিনা, কিন্তু তা নিয়ে

আমার মাথাব্যথার অন্ত নেই। তার মনোযোগিতা ও স্মরণশক্তি দুইই এত অনিশ্চিত! জুলেখও ঠিক তাই। এদের পড়ানোর চেষ্টা বালিতে ঘর-বাঁধার মতো, আজকের পড়া এরা কাল ভোলে। সময়ে সময়ে এ যেন অত্যাচার বলে মনে হয়। তাছাড়া নিজের সম্বন্ধেও আমার আশঙ্কার অন্ত নেই, কারণ সর্বদা মনে হয়, আমি যেন দিন দিন বোকা হয়ে যাচ্ছি। দিনের মতো দিন চলে যায়, আমি যেন কিছুতেই এগোতে পারছি না। এমনকি গ্রামের ছেলেমেয়েদের পড়ার মধ্যেও বাধা এল, মেরী মাতার স্মৃতিতর্পণকালে গোটা একটা মাস নষ্ট হয়ে গেল। তবু মনে হয় আমার অসন্তোষের কোন কারণ নেই, কারুর উপকারে লাগতে পেরেছি, সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারলে শান্তি পেতাম।'

কিছুদিন পরে হেলার বিয়ে ভেঙ্গে গেছে শুনে লেখে: 'হেলার আত্ম-সম্মানে কতখানি ঘা লেগেছে বুঝতে কষ্ট হয় না। বাস্তবিক পুরুষ জাতটা সম্বন্ধে বেশ একটা ধারণা হয়ে যাচ্ছে। যদি তারা গরীব মেয়েদের বিয়ে করতে না চায়—তবে তারা জাহান্নমে যাক্। তাতে কারুর কিছু বলার নেই। কিন্তু নিরীহ একটি মেয়ের শান্তিভঙ্গ ক'রে ওদের লাভ কি?

'...অন্ততঃ তোমার কাছ থেকে যদি কিছু সান্ত্বনা পাওয়া যেত! প্রায়ই আমার জানতে ইচ্ছে করে তোমার ব্যবসা কেমন চলছে, ওয়ার্‌সয় থাকতে তোমার কোন আপত্তি আছে কিনা। আসলে আমার এত দুশ্চিন্তার সত্যি কোন মানে হয় না কারণ তুমি যে ভালো করবেই, এ বিশ্বাস আমার আছে। 'বব'দের * নিয়েই না যত মুস্কিল, তাই না! তবু মাঝে মাঝে আশা হয়, একেবারে কিছুই করতে পারব না, এমনটি বোধ হয় ঘটবে না! কি বল!...'

১৮৮৭-র ১০ই ডিসেম্বর—হেন্‌রিয়েটাকে লিখছে মানিয়া:

'আমার বিয়ের কথা বিশ্বাস করো না, যেহেতু খবরটা অমূলক। এখানে এই কথাটা এমন রাষ্ট্র হয়েছে যে, দেখছি ওয়ার্‌স পৌঁছতেও দেরী হয় নি। যদিও দোষটা আমার নয়, তবু এতে আমার ক্ষতির আশঙ্কা আছে বৈকি। ভবিষ্যতের জন্য আমার যে প্ল্যান, তা' একেবারেই সাদামাটা। বর্তমানে বাবাকে নিয়ে নিরিবিলিতে থাকতে চাই। বেচারা বাবা আমায় ছেড়ে থাকতে কষ্ট পান, উনি চান আমি বাড়িতেই থাকি, সর্বদা আমার পথ চেয়ে থাকেন। স্বাধীনভাবে নিজের বাড়িতে বেঁচে থাকতে পেলে আমি আমার অর্ধেক জীবন উৎসর্গ ক'রে

* ঠাট্টা ক'রে পোল ভাষায় মেয়েদের বলে Babas.

দিতে পারি। কাজেই যদি সম্ভব হয় আমি সৃজস্থকি ছেড়ে যাব। অবশ্য আরও অনেক দিন আমাকে এখানে পচতে হবে, উপায় নেই। যাইহোক আমি ওয়ার্স ফিরে গিয়ে ইস্কুল মাষ্টারি করব আর টিউশানি করব, শুধু এইটুকুই আমার বাসনা। জীবনে এত দুশ্চিন্তা আমার পোষায় না।

১৮৮৮-র ১৮ই মার্চ দাদার কাছে মানিয়া এক চিঠি লেখে: 'প্রিয় দাদাভাই, এই শেষ টিকিট খানি চিঠির ওপর সেঁটে দিলাম, আমার হাতে একটা পয়সাও আর বাকী রইল না। ছুটির আগে আর চিঠি লেখা সম্ভব নয়, যদি না হঠাৎ একটা ডাক টিকিট কপালে জুটে যায়।

'এ চিঠির উদ্দেশ্য হলো তোমার জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানানো। একটু দেরী হয়ে গেল কারণ টাকা বা টিকিট কিছুই জোটাতে পারছিলাম না। মাঝে মাঝে বড় অসুবিধে হয়, কিন্তু আজ অবধি হাত পাততে শিখি নি। প্রিয় দাদাভাইটি আমার, যদি জানতে মাত্র ক'টা দিনের জন্যও ওয়ার্স ঘুরে আসতে পারলে কত খুশি হতাম! জামা কাপড়গুলোর অবস্থা কাহিল হয়ে এসেছে, বদলানো দরকার; কিন্তু সে-কথা বলছি না। ভেতরে ভেতরে আমি নিজে যেন ফুরিয়ে যাচ্ছি! এই নীরব সমালোচনার জগৎ থেকে অল্প কিছুদিনের জন্যেও যদি মুক্তি পেতাম! চব্বিশ ঘন্টা নিজের কথাবার্তা, চালচলনের ওপর কড়া নজর রাখতে গিয়ে যে দম আটকে আসে! শুকনো দিনে স্নানের জন্য শরীরটা যেমন আকুঁপাকু করতে থাকে তেমনি একটু হাঁফ ফেলে বাঁচতে চাই। আরও অন্য অনেক কারণে আমি এখান থেকে যেতে চাই, একটু স্থান পরিবর্তনের দরকার।···

'অনেক দিন হলো দিদিভায়ের চিঠি পাই না। খুব সম্ভব তারও টিকিট ফুরিয়েছে।·· দাদাভাই, যদি তোমার টিকিটের অকুলান না হয়, তবে নিশ্চয়ই ছোট বোনটিকে চিঠি লিখবে। বাড়িতে যা যা ঘটে সব কিছুর বর্ণনা দিয়ে চিঠি লিখো। বাবা আর হেলার চিঠিতে শুধু দুঃখ আর দুঃখ। চিঠি পড়ে ভাবতে বসি, বাস্তবিক অবস্থা কি আমাদের এতই সঙ্গীন! এই দুশ্চিন্তার সঙ্গে এখানকার ভাবনাও বড় কম নেই! সেসব কথা বলে মনটা হাল্কা করতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু আমি তা' করবো না। শুধু দিদিভায়ের কথা ভেবে 'ক'-দের কাছে পড়ে আছি, নইলে এত ভাল মাইনে সত্ত্বেও এই মুহূর্তে কাজে ইস্তফা দিয়ে আর কিছুর জোগাড় দেখতাম।'

১৮৮৮-র ২৫শে অক্টোবর বান্ধবী কাজিয়াকে মানিয়া (—কাজিয়ার বিয়ের পর মানিয়া কয়েকদিন তার সঙ্গে ছিল—) লেখে: 'তুই আমার বিশ্বাস ক'রে

যে কথা বলিস, সেসব কখনও আমি ঠাট্টা বলে উড়িয়ে দিতে পারি? আমায় তুই ছোট বোনের মতো স্নেহ করিস, কাজেই সব ব্যাপারে আমার আন্তরিক সমর্থন থাকাই তো স্বাভাবিক রে, তোর আর আমার মধ্যে তফাৎ কি! আমি নিজে বেশ খোস মেজাজে থাকি, আমার মনের আঁধার হাসি দিয়ে আড়াল ক'রে রাখি। দেখছি তো ঠিক আমার মতো আরও কত মানুষ আছে যারা ঐ রকম তীব্র দহনে জ্বলে মরে, অথচ স্বভাবের ধর্ম ছাড়তে না পেরে বাইরে যথাসম্ভব আত্মগোপন ক'রে চলে। তাই দেখে আমিও এই পথ গ্রহণ করলাম। কিন্তু তোর কি মনে হয় এতে কারুর কোন উপকার হবে? কিছু না। বেশ বুঝতে পারছি আমার এই প্রফুল্লভাব ধীরে ধীরে কমে আসছে আর অনাবশ্যক জোর দিয়ে অনেক কিছু বলে ফেলছি যা হয়তো বলা ঠিক নয়।…

'কাজিয়া, চিঠি পড়েই বুঝতেই পারছিস কিরকম মনটা বিষিয়ে গেছে · কিন্তু তোর চিঠিতে জানলাম তোর জীবনের শ্রেষ্ঠতম কয়েকটি সপ্তাহ তুই কাটিয়ে এসেছিস; আর আমার জীবনে এই কয়টি সপ্তাহ যা গেছে তা' তুই কল্পনাও করতে পারবি না। কয়েকটা দিন দারুণ কষ্ট গেছে, তবে এর ভেতর একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, এত সবের পরেও আমার নিষ্ঠা মরে নি, মাথা উঁচু করেই আমি পরীক্ষা পার হয়ে এসেছি। (আমার প্রতি মাদমোয়াজেল মেয়ারের বিতৃষ্ণার প্রধান কারণ ছিল, আমার মাথা উঁচু ক'রে থাকা…হ্যাঁ রে, সে-মাথা আমি আজও নোয়াইনি।)

'কাজিয়া, হয়তো কিছু ভাবালুতা প্রকাশ ক'রে ফেলেছি; ভয় নেই। আমার প্রকৃতির সঙ্গে এ ঠিক খাপ খায় না, আমি জানি…হয়তো ইদানীং একটু দুর্বল হয়ে পড়েছি। কয়েকজন আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে একটু ক্ষতি আমার করেছে। যাই হোক্, তোর কাছে গেলে আমার মনের আনন্দ ফিরে পাব। পরস্পরের কাছে খুলে ধরার জন্যে কথার ঝাঁপি উপচে উঠছে। আমাদের দু'জনের মুখে আটকাবার মতো কয়েকটা শেকল নিয়ে যাব ভাবছি, নইলে গল্প করতে করতে রাত পুইয়ে যাবে। মাসীমা,—তোর মা—কি আগের মতো আমায় লেমনেড আর চকোলেট খাওয়াবেন?'

১৮৮৮-র অক্টোবর মাস, যোসেফকে লিখেছে মানিয়া: 'ক্যালেণ্ডারের এই তারিখটার দিকে বিষণ্ণ নয়নে চেয়ে আছি। আজ আমার পাঁচটা টিকিট খরচ হলো, চিঠির কাগজের তো কথাই নেই। এখন বেশ কিছুদিনের মতো চিঠি লেখা বন্ধ হলো।

'ভেবে দে[redacted]টা বই থেকে কেমিস্ট্রী পড়তে শুরু করেছি। বুঝতে পারছ এভাবে[redacted]শেখা সম্ভব, কিন্তু উপায়ই বা কি? প্র্যাক্‌টিকাল কাজ বা পরী[redacted]কাজ করার মতো জায়গা কোথায়? দিদিভাই প্যারী থেকে সুন্দর এ[redacted]াম পাঠিয়েছে।...'

১৮৮৮-র ২৫[redacted]ভেম্বর, হেন্‌রিয়েটাকে লিখেছে মানিয়া: 'মন ভারী হয়ে থাকে, কারণ প্রতি[redacted]ন পশ্চিমা বাতাসের স্কন্ধে চেপে আসে বৃষ্টি বন্যা আর কাদার উৎপাত। আজ আকাশটা সামান্য হাল্কা হয়েছে। চিম্‌নির ভেতর দিয়ে বাতাসের গর্জন কিন্তু থামে নি। বরফের নাম মাত্র নেই, স্কেট খেলার জুতো-গুলো মনের দুঃখে দেয়াল-আলমারিতে ঝুলছে। তুমি বোধহয় জাননা তোমাদের গ্যালিসিয়াতে রক্ষণশীলদের মধ্যে বাদানুবাদের যে মূল্য, আমার এই ছোট্ট জায়গাতে তুষারপাত ও তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মতামতের ঠিক ততখানিই মূল্য। ...আমার একমাত্র ভরসা এই যে, আমাদের এই পৃথিবীতে ভাগ্যিস আরও এমন জায়গা আছে, যেখানে মানুষ চিন্তা করে, সামনে এগিয়ে যায়। তুমি যেমন সবরকম আন্দোলনের মধ্যে বাস করছ, আমি তেমনি কেঁচোর মতো এখানকার বদ্ধ ঘোলা জলের মধ্যে বেঁচে আছি। তবে শিগগির এই জড়তা কাটিয়ে উঠবো বলে আশা আছে।

'আবার যখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে, তখন মানব-সমাজে বাস ক'রে আমার সত্যিই কোন উন্নতি হলো কিনা ভেবে তুমি অবাক হবে। সবাই বলে স্‌জস্থকিতে এসে আমার দৈহিক তথা মানসিক যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই, মাত্র আঠারো বছরে আমি এ বাড়িতে পা দিই, তার-পর থেকে আমার ওপর দিয়ে কি লড়াই না গেছে! কয়েকটা সময় আমার জীবনের নিষ্ঠুরতম অধ্যায় বলে লেখা থাকবে। প্রতিটি ব্যাপার আমায় প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়, যেন সারা দেহের ওপর দিয়ে আঘাতটা এসে লাগে, তারপর আমি নিজেকে প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিই, শেষ অবধি মনের জোরেরই জয় হয়, দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটে যায়। প্রথম কথা হলো, ব্যক্তি বা ঘটনা প্রবাহের কাছে কখনো পরাজয় স্বীকার করবে না।

'কবে ছুটি হবে, তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে; তারই হিসেব কষছি সারাক্ষণ। নতুন চিন্তাধারা, পরিবেশের পরিবর্তন, জীবনের অগ্রগতি, প্রত্যেকটি জিনিসের প্রয়োজন আছে। এক এক সময়ে এই চাহিদা আমার বুকের ওপর এমন ভাবে চেপে বসে যে, সাংঘাতিক একটা কিছু অঘটন ঘটাতে ইচ্ছে হয়, যদি তাতে জীবনের এক ঘেঁয়েমি কাটে। ভাগ্যক্রমে কাজের

চাপ এত বেশী যে, খেয়ালের এই আক্রমণ কচিৎ ক[redacted]এখানে আমার এটা শেষ বছর : বাচ্চাদের পরীক্ষায় ভাল ভা[redacted]ত হবে, তাই খাটুনি বেশ বেড়েছে।…

॥ মুক্তি ॥

৭

গভর্নেস্‌ হয়ে আসার পর থেকে তিন বছর কেটে গেছে। তিনটি বৈচিত্র্য-হীন বছরের লাভক্ষতির হিসেব কষলে পাওয়া যায় প্রচণ্ড পরিশ্রম, অর্থাভাব, যৎসামান্য আনন্দ, একটি বড় রকম আঘাত। কিন্তু বর্তমানে অত্যন্ত মন্থর-গতিতে এই তরুণীর জীবনে গতি সঞ্চারিত হতে দেখা গেল। পারীতে, ওয়ার্‌সতে সৃজস্থকিতে কয়েকটি ছোটখাট ঘটনাচক্র আশ্চর্যভাবে মানিয়ার অদৃষ্টের মোড় ফিরিয়ে দিল।

অধ্যাপক শ্‌ক্লোদোভস্কি পেন্‌সেন্‌ পাবার পর অন্যত্র অর্থোপার্জনের চেষ্টা করতে থাকেন। কন্যাদের সাহায্য করার অদম্য ইচ্ছা তাঁর মনে। ১৮৮৮-র এপ্রিল মাসে অত্যন্ত শ্রমসাধ্য কৃতজ্ঞতাহীন চাকরি একটা তিনি পেলেন ওয়ার্‌স থেকে কিছু দূরে স্টুজিনিক্‌ নামক এক স্থানে। কাজ হলো একটি রিফর্ম স্কুলের তত্ত্বাবধান। সেখানকার পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক জীবনধারা অত্যন্ত অস্বস্তিকর, কিন্তু টাকার অঙ্ক অন্যান্য জায়গার তুলনায় কিছুটা ভালো। তার থেকে স্নেহশীল পিতা প্রতি মাসে মানিয়ার জন্য কিছু টাকা আলাদা ক'রে জমিয়ে রাখেন।

এই সময় ব্রনিয়া মানিয়াকে টাকা পাঠাতে নিষেধ ক'রে চিঠি লিখল। সেই সময় থেকে মানিয়ার সঞ্চয় শূন্যের ঘর থেকে জমার ঘরে জমতে আরম্ভ করল।

ডাক্তার-ছাত্রী পারী থেকে আরও সব খবর পাঠাত। সে কাজ শুরু করেছে। পরীক্ষাগুলো ভালোভাবে পাশ ক'রে চলেছে। এছাড়া সে আরও জানাল যে অশেষ গুণ সম্পন্ন মেধাবী এক পোল ছাত্র কাসিমির দ্‌লুস্কির প্রেমে পড়েছে। সেও ডাক্তারি পড়ে। পোল্যাণ্ড থেকে সে বিতাড়িত, দেশে ফিরে গেলে

সাইবেরিয়ায় নির্বাসন অবধারিত। স্জস্থকিতে মানিয়ার কাজ ফুরিয়ে এল। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের সেন্টজন দিবসের পর 'ক'-পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্ক চুকে যাবে। এবার তাকে অন্য জায়গায় কাজের চেষ্টা করতে হবে। এই অল্পবয়সী গভর্নেস্ আগে থেকে ওয়ার্সয় এক ব্যবসায়ী 'ফ' পরিবারের কথা ভেবে রেখেছে। যাইহোক, পরিবর্তন তো বটে। সাগ্রহে সে পরিবর্তনের পথ চেয়ে আছে।

১৮৮৯-র ১৩ই মার্চ কাজিয়াকে মানিয়া লেখে: 'পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে ঈস্টার আসবে, আমার জীবনে এই দিনটির সার্থকতা আছে, কারণ এ দিনটির ওপর আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। 'ফ'-দের চিঠির সঙ্গে আরও একটা প্রস্তাব আছে, আমি দ্বিধায় পড়েছি, কোনটি নেব, কি যে করব বুঝতে পারছি না। শুধু ঈস্টারের চিন্তায় আমার মন ভরে আছে। এত রকম কথা ভাবতে ভাবতে মাথাটা গরম হয়ে ওঠে। আমার যে কি হবে কিছু বুঝতে পারছি না। তুই হয়তো দেখবি তোর মানিয়া জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত দুনিয়ার সেরা মতিচ্ছন্ন মেয়ে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'স্জস্থকি ও দিগন্তবিসারী বিটের ক্ষেত, এবার আমায় বিদায় দাও!'

বন্ধুত্বের হাসি মুখে মেখে মানিয়া 'ক'-দের কাছ থেকে বিদায় নিল। দু'তরফেই সৌজন্যের বহরটা যেন একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। স্বাধীন মানিয়া ওয়ার্সয় ফিরে এসে দেশের হাওয়া পেয়ে যেন বাঁচল। তারপর আবার ট্রেনে চেপে জোপেতের দিকে রওনা হলো। তার নতুন মনিবরা বল্টিকের তীরের এই অখ্যাত শহরের বাসিন্দা।

১৮৮৯-র ১৪ই জুলাই কাজিয়াকে লিখল মানিয়া: 'অনেক দুশ্চিন্তার পর রওনা হয়ে ভালোই করেছি। আমার জিনিসপত্র পথে খোয়া যায় নি। পাঁচ-পাঁচবার ট্রেন বদলাতে হয়েছে, ঠিকমতই বদল করেছি, 'সার্দেল্‌কি' সব খেয়েছি, কেবল মাংসের 'রোল' আর মিষ্টিগুলো খাবার মতো পেটে আর জায়গা ছিল না। সারা পথে উপকারী বন্ধু পেয়েছি অনেক, এঁরা আমায় যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। পাছে খাওয়ার সময়েও সাহায্য করতে আসেন, সেই ভয়ে আমি 'সার্দেলকি' আর টিফিন বাক্স থেকে বার করি নি।

'ম'সিয়ে ও মাদাম 'ফ' ষ্টেশনে আমার জন্যে অপেক্ষা করেছিলেন। দু'জনেই অত্যন্ত ভালো মানুষ আর বাচ্চারা প্রথম সাক্ষাতেই আমায় জয় ক'রে নিয়েছে। স্থতরাং ভালোই লাগছে।'

সাগরতীরের গ্রীষ্মাবাস গুলটস্‌-হোটেলে থাকতে অবশ্য মানিয়ার বিশেষ ভালো লাগে নি। এই সময়ের লেখা মানিয়ার এক চিঠিতে দেখি: 'কুর্হাউসের সর্বত্র ঘুরেফিরে একই লোকদের সঙ্গে দেখা হয়। তাদের যত আলাপ সাজসজ্জা নিয়ে। বাইরে দারুণ ঠাণ্ডা, সবাই বেশীর ভাগ সময় বাড়িতেই থাকে। মাদাম 'ফ', তাঁর স্বামী, তাঁর মা সকলেরই এমন মেজাজ হয়েছে যে, পারলে ইঁদুরের গর্তে লুকিয়ে থাকতাম।'

তারপর মনিব-পরিবারের সঙ্গে গভর্নেস্‌ ওয়ারসয় ফিরে এল, সেখানেই তারা শীতকালটা কাটাবে।

এই বছরটা মোটামুটি এক রকম কাটল। অপূর্ব সুন্দরী এই মাদাম 'ফ' ধনী মহিলা। প্রচুর সংখ্যক ফার আর প্রভূত অলঙ্কারের মালিক তিনি। তাঁর আলমারিতে 'ওয়ার্থ'-এর তৈরি কয়েকটি পোশাক ছিল। সান্ধ্য সাজসজ্জায় সজ্জিত তাঁর একখানা ছবি 'সালোনে' টাঙানো হয়েছিল। এ বাড়িতে এসে অর্থের বিনিময়ে সংগৃহীত বিলাসদ্রব্যের সঙ্গে মানিয়ার প্রথম পরিচয় হলো। তার জীবনে অবশ্য এসব জিনিসের স্থান কোনদিনই হয় নি, বিলাসিতার সঙ্গে তার জীবনে এই প্রথম ও শেষ পরিচয়। মাদাম 'ফ'-র জন্যেই অবশ্য এমনটি সম্ভব হলো। 'অপূর্ব মাদ্‌মোয়াজেল শ্‌ক্লোদোভস্কার গুণমুগ্ধা' এই রমণী মানিয়ার ভূয়সী প্রশংসা করেন আর প্রতিটি চা পার্টিতে, নাচের আসরে তাকে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করেন।

হঠাৎ একদিন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হলো: প্যারীর থেকে চিঠি এসেছে। চৌকো ঘরকাটা কাগজে তাড়াতাড়ি ক'রে লেখা চিঠি। স্নেহময়ী ব্রনিয়া নতুন বছরে, নতুন বাড়িতে থাকার জন্য মানিয়াকে আহ্বান জানিয়েছে।

'যদি সব ঠিকমত চলে তবে আগামী ছুটির প্রারম্ভে আমি বিয়ে করব বলে স্থির করেছি। আমার প্রণয়ী ইতিমধ্যে ডাক্তার হয়ে বেরোবে, আর আমার বাকী থাকবে শেষ-পরীক্ষাটা। তারপর আরও একবছর প্যারীতে থেকে আমরা দেশে ফিরে যাব। আমাদের এই প্ল্যানটা কেমন মনে হচ্ছে তোর? যদি তোর মনে হয়, প্ল্যান ঠিক হয় নি তবে জানাবি। চব্বিশ বছর তো বয়স হলো আমার, অবশ্য খুব বেশী নয়; তবে ওঁর বয়স হলো চৌত্রিশ। আর দেরী করার কোন মানে হয় না।...

'এবার তোর কথা বল, জীবনে একটা কিছু তো করা দরকার। এবছর যদি কয়েকশ' রুবল জমাতে পারিস, তবে সামনের বছর প্যারীতে আমাদের কাছে চলে আয়। খাওয়া, থাকা আমাদের সঙ্গেই হবে, কিন্তু সরবনে

উন্নতি হতে হলে কয়েক শ' রুবল্ চাই-ই চাই। প্রথম বছরটা তো আমাদের সঙ্গেই কেটে যাবে। তারপর আমরা চলে গেলে অসুবিধা হবে ঠিকই, তবে বাবা যে ক'রেই হোক সাহায্য করবেনই, এ ভরসা আমার আছে। তুই মনস্থির ক'রে ফেল। অনেক কাল অপেক্ষা করেছিস। আমি জোর ক'রে বলতে পারি তোর মাস্টার ডিগ্রি দু' বছরেই হয়ে যাবে। ভেবে দেখ। টাকাটা জমা ক'রে একটা নিরাপদ জায়গায় গচ্ছিত রাখ, কাউকে ধার দিয়ে বসিস না যেন আবার। ওটাকে ফ্রাঙ্কে ভাঙ্গিয়ে নিয়ে রেখে দিস, কারণ এখন এক্সচেঞ্জের হার-টা ভাল আছে, ভবিষ্যতে পড়েও যেতে পারে।'

দিদির প্রস্তাবে মানিয়ার রাজী হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু তা হলো না। বহুদিন নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের ফলে এই মেয়েটির মন অতি সাবধানী হয়ে উঠেছিল। সে চাইত না নিজের দিকে তাকাতে, আত্মীয়স্বজনের প্রয়োজনে সে অনায়াসে পারত নিজেকে আড়ালে রাখতে। সে ভাবছিল বাবার সঙ্গে থাকবে বলে, দাদা ও হেলাকে সাহায্য করবার বাসনা তার, তাই সে চট ক'রে যেতে রাজী হতে পারছিল না। দিদিকে সে লিখল ওয়ারস থেকে (১২ই মার্চ, ১৮৯০):

'প্রিয় দিদিভাই, তুমি তো জানোই আমি আগেও বোকা ছিলাম, এখনও আছি, ভবিষ্যতেও থাকব। আধুনিক ভাষায় লিখলে কথাটা এমনি দাঁড়ায়: ভূত-ভবিষ্যত-বর্তমান কোনদিনই সৌভাগ্যের মুখ দেখা আমার কপালে নেই। যে প্যারীকে আমার মোক্ষধাম বলে স্বপ্ন দেখতাম, বহুকাল আগেই আমি সেখানে যাবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছি। এখন যখন সে সম্ভাবনা হলো, আমি বুঝতে পারছি না কি আমার কর্তব্য। বাবাকে একথা জানাতে ভয় পাচ্ছি, আমার ধারণা আগামী বছর আমাকে কাছে পাবেন ব'লে তিনি আশা ক'রে আছেন। বুড়ো বয়সে তাঁকে সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে আমার মন চাইছে না। এদিকে আবার আমার যেটুকু ক্ষমতা আছে, তা নষ্ট করার কথা ভাবলে বুক ভেঙ্গে যায়। আরও একটা কথা আছে, আমি বছর খানেকের মধ্যে হেলাকে বাড়ি ফিরিয়ে এনে ওয়ারসতে চাকরি খুঁজে দেব বলেছি। তুমি ধারণা করতে পারবে না ওর জন্য আমি কি দারুণ মর্মাহত হয়েছি। চিরদিন ও-ই বাড়ির ছোট মেয়ে হয়ে রইল। ওকে দেখা আমাদের কর্তব্য বলে মনে হয়। বেচারীর একটুকু সাহায্যের বড় দরকার।... কিন্তু দিদিভাই, আমি তোমাকে একটা অনুরোধ করব। যথাসম্ভব চেষ্টা ক'রে দাদাভাইর জন্য কিছু একটা করো। মাদাম 'স'-ই দাদাকে এই বন্দী দশা

থেকে মুক্তি দিতে পারেন, তোমার যদি মনে হয় তাঁকে ব'লে কয়ে কোন ব্যবস্থা করার দায়িত্ব তোমার নয়, তবে সেই মনোভাব পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। মোটকথা বাইবেলে পড়েছি,—"আঘাত করো, আপনি দুয়ার খুলে যাবে।" যদি এতে তোমার আত্মসম্মানের কিছু হানিও হয়, কি এসে যায় তাতে? সে-চিঠি কিভাবে লিখতে হয় তা আমি ভালভাবে জানি, তুমি ভদ্রমহিলাকে বুঝিয়ে দেবে যে, বেশী কিছু দরকার নেই, মাত্র কয়েক শ' রুবল্ হলেই দাদা ওয়ার্সতে থেকে একসঙ্গে পড়াশোনা আর ডাক্তারি করতে পারে। ওর ভবিষ্যৎ এই ক'টা রুবল্-এর ওপর নির্ভর করছে। এ নইলে তার এমন মেধা বিফলে যাবে। তুমি এইসব কথা খুলে লিখবে, কারণ তাঁর প্রাণের ব্রনেক্জা টাকা ধার চাইলে উনি বিশেষ গা' করবেন না; এবং সেভাবে কাজও হবে না। তোমার যদি নিজেকে ছোট হতে হয়, তাতেই বা কি এসে যায়? কাজ যদি হয় তবে সবই সয়ে যাবে। তাছাড়া এ তো একটা অনুরোধ মাত্র। অনেক সময় মানুষ কত উৎপাত করে। এই সাহায্যটুকু পেলে দাদা সমাজের কত উপকার করতে পারবে; নইলে গ্রামে পড়ে থেকে ওর ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে।...

'হেলা, দাদা, বাবা আর আমার ঘুণ-ধরা ভবিষ্যতের কাঁদুনি গেয়ে আমি তোমার সময় নষ্ট করলাম। আমার ভেতর এত অন্ধকার, এত ভার যে, আমি বেশ বুঝতে পারি এসব কথা বলে তোমার মনটা বিষিয়ে দিয়ে কত অন্যায় করছি। আমাদের মধ্যে তুমি শুধু কিছুটা ভাগ্যের মুখ দেখেছ। ক্ষমা করো দিদিভাই, কিন্তু ভেবে দেখ এত সব ঘটনা ঘটে গেছে যে তার আঘাত আমার মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে, আমি কিছুতেই হালকা কথা দিয়ে চিঠি ভরাতে পারি না। দূর থেকে তোমাকে আমার আদর জানাই। এর পরে আমি বড় ক'রে সুন্দর চিঠি দেব, কিন্তু আজ আমি দুনিয়াতে বাস্তবিকই বড় একা, বড় দুঃখী। ভালোবেসে আমার কথা মনে করো, আমি এখান থেকে টের পাব।...'

ব্রনিয়া অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করতে লাগল, কিন্তু জোর ক'রে কিছু করার সাধ্য তার ছিল না; ট্রেনের টিকিট কেটে বোনটিকে আনবার মতো টাকা কই? শেষ অবধি এই ঠিক হলো যে মাদাম 'ফ'-র চাকরি শেষ ক'রে মানিয়া আরও একটা বছর ওয়ার্সতে বাবার কাছে থাকবে। সম্প্রতি তার স্টুজিনিয়েকের কাজ ফুরিয়েছে। বাবার কাছে থেকে ছাত্র পড়িয়ে টাকাটা তুলে নেবে, তারপর বিদেশের দিকে পা বাড়াবে।

গ্রাম্য জীবনের একঘেয়েমি আর 'ফ'-পরিবারের উৎসবমুখর জীবনযাত্রার হাত থেকে মুক্ত মানিয়া বহুকাল পরে তার প্রিয় পরিবেশের মধ্যে ফিরে এল।

নিজেদের বাড়িতে বাবার সঙ্গে বসে কত কথা, কত সারগর্ভ আলাপ-আলোচনাই না সে করে! 'ফ্লোটিং ইউনিভারসিটি' আবার তার রহস্যের দুয়ার খুলে তাকে আহ্বান জানায়। এ এক অপূর্ব আনন্দ, তার জীবনের এক বিরাট ঘটনা! জীবনে এই সর্বপ্রথম সে এক ল্যাবরেটারিতে প্রবেশ করল।

৬৬নং ক্রাশেভ্স্কি বুলেভার্ড : তার উঠোনের কোণে লাইল্যাকের সমারোহ, একতলার একখানা ঘর, ছোট ছোট জানালার মধ্য দিয়ে আলো এসে প্রবেশ করে। মানিয়ার এক আত্মীয় যোসেফ বোগুস্কি এখানকার পরিচালক—প্রতিষ্ঠানটির তিনি বেশ গালভরা নাম দিয়েছিলেন—'শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনী'। এই অস্পষ্ট নামের আড়াল কিন্তু রুশ কর্তৃপক্ষের চোখে ধুলো দেবার জন্যই। মিউজিয়ামের ভেতর সন্দেহজনক কীই বা থাকতে পারে? এই মিউজিয়ামে পোল যুবকদের উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

পরবর্তীকালে লেখা মারী কুরীর এক চিঠিতে দেখি : 'এই ল্যাবরেটারিতে কাজ করার অবসর আমার কমই হতো। সন্ধ্যা বেলায় আহার পর্ব শেষ ক'রে, কিংবা রবিবারে আমি সেখানে যেতাম। এ সময়টা আমার অন্য কিছু করার থাকত না। ফিজিক্স আর কেমিষ্ট্রির ওপর রচিত প্রবন্ধগুলি দেখে দেখে আমি নানা রকম পরীক্ষা করতে চেষ্টা করতাম। মাঝে মাঝে ধারণাতীত ফলও পেতাম। কখনও কখনও আশাতিরিক্ত সফলতায় মন উৎসাহিত হয়ে উঠত, আবার কখনও অভিজ্ঞতার অভাবে দুর্ঘটনা ঘটে যেত, তখন নিরাশায় মন ভেঙ্গে পড়ত। মোটকথা এখানে কাজ করতে করতে একটা কথা শিখলাম যে, এ সব ক্ষেত্রে খুব দ্রুত, খুব সহজে সফলতা আসে না, তবু আমার এই প্রথম প্রচেষ্টাগুলো থেকে পরীক্ষামূলক গবেষণার প্রতি আমার আকর্ষণ জন্মাল।'

অনেক রাত্রে ভারাক্রান্ত মনে ইলেক্ট্রোমিটার, টেস্টটিউব, একুরেট ব্যালেন্স সব ফেলে এসে কাপড় ছেড়ে মানিয়া তার অপরিসর বিছানায় আশ্রয় নেয়, কিন্তু ঘুমোতে পারে না; অজানা এক রোমাঞ্চ তার ঘুম কেড়ে নেয়; এতদিনে অনিশ্চিত জীবন-পথ যেন সে খুঁজে পেয়েছে। অন্তরের গহন থেকে যেন এক বাণী তার কানে ভেসে আসছে। 'মিউজিয়ামে' গিয়ে যখনই তার সুন্দর নিপুণ আঙুলের মাঝে টেস্টটিউবগুলো তুলে ধরে, তখনই হঠাৎ ম্যাজিকের মতো যেন শৈশবের স্মৃতি ফিরে আসে। কাঁচের আলমারিতে রাখা বাবার সেই ফিজিক্সের নির্বাক যন্ত্রগুলি যেন কথা বলে ওঠে।

রাত যত উদ্বেগেই কাটুক, দিন আসে তার শান্তির আবরণে মাথা ঢেকে। ভেতরের অদম্য অধীরতা সে গোপন করে। শেষের এই কয় মাস বাবাকে সে

শাস্তি দিতে চায়। দাদার বিয়ের আয়োজন, হেলার চাকরির সন্ধান করতে কোমর বেঁধে লেগে গেল। তাছাড়া বোধহয় তার নিভৃত মনের কোণে একটা ক্ষীণ আশা বিদেশ-যাত্রার দিন স্থির করার পথে বাধা হয়ে আছে। এখনও সে কাসিমিরকে ভুলতে পারে নি। পারী যাবার জন্যে তার অন্তরাত্মা উন্মুখ হয়ে আছে, তবু এত বছরের নির্বাসনের কথা ভাবতে তার বুকের ভেতর টন্ টন্ ক'রে ওঠে।

১৮৯১-র সেপ্টেম্বর মাসে মানিয়া যখন কার্পেথিয়ান পাহাড়ে জাকোপেন শহরে ছুটি কাটাতে গেল, সেখানে তার সঙ্গে কাসিমিরের দেখা করার কথা ছিল। বৃদ্ধ পিতা সেই সময়ে পারীতে ব্রনিয়াকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে লেখেন:

'মানিয়া জাকোপেন থেকে ১৫ইর আগে ফিরবে না, কারণ ওর ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে। একটা বিশ্রী কাশিও লেগে আছে। সেখানকার ডাক্তার বলেছেন ওখানে থেকে অসুখটা সারিয়ে নেওয়া দরকার। দুষ্টু মেয়েটা! নিশ্চয়ই ওর নিজের দোষেই অসুখটা এমন শক্ত হয়ে দাঁড়াল। সাবধান হতে বললে কথা কানে নেয় না, কিছুতেই যথেষ্ট জামা কাপড় পরবে না। আমায় লিখেছে ওর নাকি মন খারাপ হয়ে আছে। আমার মনে হয় ওর নৈরাশ্য আর অনিশ্চিত অবস্থাই এই ক্ষোভের কারণ। তাছাড়া নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ও যেন কিছু একটা ভাবছে। বলেছে ফিরে এসে বলবে। সত্যি বলতে কি, আমি বেশ বুঝতে পারি, কি ও চায়: কিন্তু সেজন্যে খুশি হবো, কি, দুঃখিত হবো, বুঝতে পারছি না। যদি আমার ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির জোর থেকে থাকে, তবে এটুকু বলতে পারি যে, যাদের কাছ থেকে ও একবার আঘাত পেয়েছে, তাদের কাছ থেকে একই ধরনের আঘাত ও যেন আবার পেতে চলেছে। তবু যদি এর ওপর ওর ভবিষ্যৎ নির্ভর ক'রে থাকে আর এটাই যদি ওদের দু'টি জীবনের সুখের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়, তবে এর একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার। কিন্তু আসল কথাটা যে কি আমি তার কিছুই জানি না।...

'তোমার কাছ থেকে পারীতে যাবার আমন্ত্রণ পেয়ে ও অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েছে আর এতে ওর মনের অস্থিরতাও বেড়েছে। বিজ্ঞানের প্রতি যে দুর্বার আকর্ষণ ওকে সমানে টানছে, তার প্রচণ্ডতা অনুভব করা শক্ত নয় কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি তার প্রতিকূল বলেই মনে হয়। সব চেয়ে বড় কথা হলো এই যে, মানিয়া যদি সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়ে ফেরে, তবে আমিই ওকে যেতে দেব না, কারণ আর সব অসুবিধা ছাড়াও পারীর শীতে মেয়েটার দারুণ কষ্ট হবে। বলা বাহুল্য, ওকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে কষ্টকর হবে, তবে সেটা

বড় কথা নয়। গতকাল আমি ওকে উৎসাহ দিয়ে চিঠি লিখেছি। ও যদি ওয়ারশয় এসে কোন চাকরি করতে না পারে, তবে যেমন করেই হোক, বছরখানেক বাপ-বেটির দু মুঠো জোগাড় হয়ে যাবেই। তোমার 'কাসিমির' দিন দিন উন্নতি করছে জেনে বড়ই আনন্দ হলো। তোমরা দুই বোনই দুই 'কাসিমিরে'র প্রেমে পড়লে—এ কিন্তু ভারী আশ্চর্য মনে হচ্ছে!'

বেচারা বৃদ্ধ শ্‌ক্লোদোভ্‌স্কি! তাঁর প্রাণের পুতলি মানিয়াকে বিপুলা ধরণীর মাঝে নিঃসঙ্গ ছেড়ে দিতে আদৌ মন তাঁর চাইছে না। প্রকাশ ক'রে বলতে না চাইলেও মনের কোণে হয়তো তাঁর এই কথাটাই আছে যে যা হোক ক'রে মেয়েটা দেশেই থাক্‌, না হয় কাসিমিরকেই বিয়ে করুক।

কিন্তু জাকোপেন পাহাড়ের গিরিপথে বার কয়েক পায়চারি করার মধ্যেই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে গেল। প্রেমিক ছাত্র তার মানসিক উদ্বেগ ও আশঙ্কা মানিয়ার সামনে মেলে ধরতেই অপর পক্ষের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে গেল। সে বলল: 'সোজা পথ যদি তোমার চোখে না পড়ে, তবে তোমায় আমি এখন শেখাতে বসব না!' দীর্ঘছন্দ অম্লমধুর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে মানিয়ার যে রূপ প্রকাশিত হলো, পরে প্রফেসর তাকে দাম্ভিক গর্বিতা মেয়ে বলেই বর্ণনা করেছিলেন।

সূক্ষ্ম সুতোর আগায় যে বন্ধন এতদিন যুক্ত ছিল, তরুণী স্বেচ্ছায় তা ছিন্ন করল। অন্তরের ব্যাকুলতা সে সংযত করল, এদিক দিয়ে আর কোন চেষ্টাই তার রইল না। প্রাণান্তকর ধৈর্যের মধ্যে এতগুলি বছরের মৃত্যু সে হিসাব করতে বসল। ইস্কুল শেষ করার পর আট বছর, গভর্নেস্‌ হয়ে দু বছর তার জীবন থেকে চলে গেছে। স্বপ্ন চোখে ধরে সারা জীবন কাটিয়ে দেবার কিশোরী বয়স তো আজ আর তার নেই। হঠাৎ তার অন্তরাত্মা আর্তনাদ ক'রে উঠল। সে ব্রনিয়ার সাহায্য চাইল—সে লিখল ব্রনিয়াকে ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে:

'দিদিভাই, এবার আমায় সব ঠিক ঠিক জবাব দাও। বল, তুমি আমায় ঠাঁই দিতে পারবে কিনা, কারণ এতদিনে আমার সময় হয়েছে। নিজেকে খুব বেশী বঞ্চিত না ক'রে যদি তুমি আমায় খাওয়াতে পার, তবে স্পষ্ট ক'রে বল। এই গ্রীষ্মে যে নিষ্ঠুর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছে, আমার সারাজীবনের ওপর তার দাগ থেকে যাবে। তোমার কাছে যেতে পারলে খুব খুশি হবো, আমার মনের অবসাদ কেটে যাবে বলে আশা করি, কিন্তু আমি তোমার ওপর বোঝা হয়ে থাকতে চাই না দিদিভাই।

'তোমার শরীরের এ অবস্থায় হয়তো আমি কিছু সাহায্য করতে পারি। যা হোক, পত্রপাঠ জানিও। আমি যেতে পারব কিনা, কোন্ প্রবেশিকা পরীক্ষা আমায় পাস করতে হবে, ভরতি হবার শেষ তারিখ কবে—সব জানিও। যাবার আশায় মনটা এত অস্থির হয়েছে যে, তোমার চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত আর কোন বিষয়ে মন দিতে পারছি না। দয়া ক'রে যতশীঘ্র সম্ভব চিঠির উত্তর দাও। তোমরা দু জনে আমার আন্তরিক ভালোবাসা জেনো। আমায় যে কোন একটা জায়গায় বন্দোবস্ত ক'রে দিও, আমি তোমাদের উত্যক্ত করব না; তোমাদের ওপর বোঝা হয়ে থাকব না, কোন উৎপাতও করব না। আমার অনুরোধ রইল, খোলাখুলি সব কথার জবাব দিও।…'

ব্রনিয়া টেলিগ্রামে জবাব দিতে পারে নি, কারণ তার খরচ অনেক।

প্রথম ট্রেনটায় চেপে বসা মানিয়ার পক্ষেও সম্ভব হলো না; কারণ পাই পয়সার হিসেব ঠিক ক'রে ওকে যাত্রার আয়োজন করতে হলো। টেবিলের ওপর উপুড় ক'রে সবকটি রুবল্ ঢেলে ফেলল, বাবাও তাঁর যৎসামান্য সঞ্চয় থেকে কিছু দিলেন, তারপর শুরু হলো ওর খরচের হিসাব।

এতটা পয়সা পাসপোর্টের জন্য, এতটা রেলভাড়া: ওয়ার্‌স থেকে পারী পর্যন্ত থার্ড ক্লাসের টিকিট কেনা স্রেফ পাগলামী। রাশিয়া আর ফ্রান্সে অবশ্য তার নীচে টিকিট নেই, তবু রক্ষা যে জার্মানীতে ফোর্থ ক্লাস বলেও একটা ব্যবস্থা আছে। আলাদা কোন কামরা নয়, অনেকটা মালগাড়ির মতো ফাঁকা একখানা গাড়ি। চার দেয়ালে চারটি বেঞ্চ, মাঝখানে ভাঁজকরা চেয়ার পেতে বসে যেতে হয়।

যাত্রার আয়োজন করতে গিয়ে ব্রনিয়ার উপদেশ কেউ ভুলল না। একজন মানুষের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস সঙ্গে নিতে হবে, যাতে পারীতে এসে নতুন কোন খরচের ধাক্কায় না পড়তে হয়। মানিয়ার বিছানার তোশক, বালিশ, চাদর, বিছানা তোয়ালে সব অনেক আগেই মালগাড়িতে রওনা হয়ে গেছে। একটা নতুন দামী কাঠের মজবুত বাক্স কেনা হয়েছে। তারই ভেতর মানিয়ার টেকসই কাপড়ের পোশাক, জুতো, দু খানা টুপি ইত্যাদি ভরা হলো। বাক্সের গায়ে নামের আদ্যাক্ষর দুটি বড় বড় কালো হরফে লেখা হলো: "ম. শ।"

বিছানা মালগাড়িতে পাঠিয়ে বাক্স রেজিস্ট্রী করার পর বাদবাকি কয়েকটি কিম্ভূতকিমাকার প্যাকেট পড়ে রইল সঙ্গে নেবার জন্য: তিনদিনের পথের খাবার, জল, জার্মান-ট্রেনে বসার জন্য ভাঁজকরা চেয়ার, বই, মিষ্টির ছোট্ট প্যাকেট, একটা লেপ।

মাল রাখবার জালের মধ্যে এইসব গুছিয়ে রেখে শক্ত কাঠের বেঞ্চে নিজের জায়গা ঠিক ক'রে নিয়ে মানিয়া প্ল্যাটফর্মে নেমে এল। সস্তা কোট গায়ে তাকে একেবারে ছেলেমানুষ দেখাচ্ছিল। দুটি গালে, দুটি ধূসর-ছোঁয়া চোখে উত্তেজনার আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে। বাবার জন্য মনটা কেঁদে ওঠে। বাবাকে চুমু খেয়ে সোহাগ ক'রে অনেক অসংলগ্ন কথা বলতে শুরু করে :

'আমি বেশী দেরী করব না···দু বছর, বড়জোর তিনবছর। পড়া শেষ ক'রে কয়েকটা পরীক্ষা দিয়েই তোমার কাছে চলে আসব। তোমায় ছেড়ে আর কোন দিন যাব না।'

মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরা গলায় প্রফেসর বলতে থাকেন : 'হ্যাঁ গো আমার মান্যুসিয়া মা, তাড়াতাড়ি ফিরে এস বুড়ো ছেলের কাছে। প্রাণপণ পরিশ্রম করো। তুমি ভাগ্যবতী হও।'

রাত্রে হুইস্‌ল দিতে দিতে লৌহবর্ত্মে ঝন্‌ঝনা শব্দ তুলে ট্রেনের ফোর্থ ক্লাস কামরাটি ছুটে চলেছে জার্মানির ভেতর দিয়ে। নিজের চার পাশে জিনিসপত্র গুছিয়ে চেয়ারের ভাঁজ খুলে বসেছে মেয়েটি। মাঝে মাঝে গুণে দেখছে সব ঠিক আছে কিনা। পা দুটো ভাল ক'রে ঢাকা দিয়ে বসে মানিয়া অপার্থিব আনন্দ-সাগরে ডুবে যায়। ফেলে-আসা অতীত, বহু প্রত্যাশিত এই যাত্রা, ভবিষ্যতের কল্পনা, একের পর এক তার মনের ওপর ছায়াপাত ক'রে যায়। সে ভাবতে থাকে কাজ সমাপনান্তে শিগগিরই সে আবার দেশে ফিরে আসবে, নিরালায় একটা ইস্কুল-মাষ্টারি খুঁজে নেবে।···

এই ট্রেনই যে তাকে তমসা থেকে জ্যোতিতে, দৈনন্দিন ক্ষুদ্রতা থেকে বৃহত্তর, মহত্তর জীবনের পাদদেশে পৌঁছে দেবে, একথা তখন তার স্বপ্নেরও অগোচর।

দ্বিতীয় খণ্ড

॥ পারী ॥

৮

'লাভিলে' ও 'সরবন্'-এর মধ্যস্থিত পারী আদৌ সমৃদ্ধ স্থান নয়। তাছাড়া পথটিও বড় সুগম নয়। ব্রনিয়া ও তার স্বামীর বাসা রু-দালমাঞ থেকে তিন-ঘোড়ায় টানা, ঘোরানো সিঁড়িওয়ালা একটি দোতলা বাস গার হ্ব লেস্ত পর্যন্ত যায়: এই ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে রাজসিক দোতলায় উঠতে মাথা ঘুরে যায়। গার হ্ব লেস্ত থেকে রু-দেক্কেকল পর্যন্ত আরও একটি বাস চালু আছে। স্বভাবতই চারদিক খোলা, ঝড়বাদলের ঝাপটা খাওয়া এই রাজকীয় দোতলার ব্যবস্থায় খরচ কম! 'ফ্লোটিং-ইউনিভারসিটি'তে ব্যবহার করা, বহু পুরোনো ক্ষয়ে-যাওয়া, চামড়া-ওঠা ব্যাগ হাতে মানিয়া সোজা ওপরে উঠে যায়। অল্পবয়সী মেয়েটি ঘাড় কাত ক'রে এই চলন্ত মান-মন্দিরের ওপর থেকে আকুল আগ্রহে পারী নগরীর রূপ দর্শন করে। হিমেল হাওয়ায় তার গালের চামড়া ফেটে শক্ত হয়ে যায়। এই সীমাহীন রু-লাফায়েৎ-এর একঘেয়ে চেহারা কিংবা বুলেভার্ড সিবাস্তোপোল-এর সারি সারি ঘুপচি দোকানগুলোর মধ্যে ও কি রস যে খুঁজে পায়! এই ছোট ছোট দোকানপাট, ডোরাকাটা এল্ম্ গাছের সার, এই জন-সমুদ্র, ধুলোর গন্ধ—এই সব নিয়েই তো পারী; শেষ পর্যন্ত এই তো তার স্বপ্নের পারী!

পারীতে এসে তরুণী মনের মধ্যে কত জোর যে পেল, আশায় আনন্দে কেঁপে উঠল, কেঁপে উঠল। ছোট্ট পোলদেশী মেয়েটির মনে স্বাধীনতার কি অপূর্ব অনুভূতি!

দীর্ঘ ক্লান্তিকর যাত্রা-শেষে গার নর্-এর ধোঁয়ায় ভরা প্ল্যাটফর্মে নামা-মাত্র মানিয়া টের পেল যেন তার চিরপরিচিত দাসত্বের শৃঙ্খল শিথিল হয়ে গেছে, কাঁধ দুটি চিতিয়ে সে দাঁড়াল, তার ফুসফুসের ক্রিয়া, হৃদযন্ত্রের গতি, সহজ হলো। জীবনে এই প্রথম সে স্বাধীন দেশের হাওয়া পেল। উৎসাহের আতিশয্যে তার চোখে সবই অপরূপ দেখায়। ঐ যে পথচারী নিজের ইচ্ছেমত ভাষায় কথা বলে গেল, ঐ যে-বইওয়ালা সারা দুনিয়ার বই বিক্রি করছে—সবই যেন ওর কাছে অপূর্ব ঠেকে। দু পাশে গাছের ছায়ায় ঢাকা যে-পথ শহরের

বুকের দিকে গড়িয়ে গেছে, তার ওপর দিয়ে মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত দ্বারের দিকে এগিয়ে চলেছে। অভিভূত হয়ে যায় ও। আর এ-কি যে-সে বিশ্ববিদ্যালয়? বিশ্ববিখ্যাত এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে তো যুগ যুগ আগে উল্লেখ করা হয়েছে 'বিশ্বের বিন্দু' ব'লে। মার্টিন লুথার এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধেই তো মন্তব্য করেছিলেন: 'একমাত্র পারীতে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বপ্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের দেখা পাই, যার নাম সরবন্।' দূর পোল্যাণ্ড থেকে আগত মানিয়ার এই অভিযান রূপকথার গল্পের মতোই মনে হয়। মন্থর গতি, হিমশীতল, বিশৃঙ্খল এই বাস্ যেন এক মায়ারথ; অভাগিনী, সুন্দরী রাজকন্যাকে তার স্বপ্নের প্রাসাদে পৌঁছে দিতে ছুটে চলেছে···।

সীন্ নদী পার হবার সময় মানিয়ার সে কি আনন্দ! কুয়াশা ঢাকা নদীর দুই বাহুর মধ্যে মায়া-ঘেরা দ্বীপগুলি···স্মৃতিস্তম্ভের সারি···চৌমাথা ছাড়িয়ে বাঁয়ে নতের্দাম-এর চূড়াগুলো পেরোলেই বুলেভার্ড সেণ্টমাইকেল। এখানে উঠে দাঁড়াতে হলো নামবার জন্য; ঘোড়ারা ঢিমে চালে হাঁটতে থাকে। মানিয়া তার ব্যাগটা তুলে নিয়ে ভারী পশমের স্কার্টের ভাঁজগুলো একবার ঠিক ক'রে নিল, তাড়া-হুড়ো করতে গিয়ে আশে পাশে কার সঙ্গে যেন ধাক্কা খেল। লজ্জায় পড়ে সসঙ্কোচে ফরাসী ভাষায় ক্ষমা চাইল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে নেমে রাস্তায় পড়েই বিরাট সৌধের লৌহতোরণ অভিমুখে দৌড়ে চলল।

১৮৯১ সালে এই জ্ঞানসৌধের আকৃতি ছিল অপূর্ব, ছ'বছর যাবৎ এই সরবনের মেরামতি কাজ চলেছিল। মনে হতো বিশাল এক অজগর সাপ যেন ছাল ছাড়িয়ে পড়ে আছে! নতুন লম্বা ধাঁচে গড়া ধবধবে সাদা সদরের ঠিক পেছনেই রিশেল্যুর সময়কার নোনাধরা প্রাসাদের ভগ্নাংশ, কারিগরদের এবড়ো খেবড়ো বসতিগুলোর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে আর সেদিক থেকে অনর্গল বাটালি খোঁদার শব্দ ভেসে আসছে। ছাত্রজীবনে এই অব্যবস্থা বেশ এক মজার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। মেরামতি কাজের সঙ্গে ক্লাসগুলোও এঘর থেকে ওঘর নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। রু-স্যাঁ জাক্-এর পুরোনো অব্যবহৃত অংশে সাময়িকভাবে কয়েকটা ল্যাবরেটারি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতে কি এসে যায়, অন্যান্য বছরের মতো এ বছরেও দরোয়ানদের ঘরের কাছে দেয়ালের গায়ে আঁটা শুভ্র প্রাচীরপত্রে পরিষ্কার পড়া যায়:

"ফরাসী প্রজাতন্ত্র।"

বিজ্ঞান বিভাগ—প্রথম পর্যায়

৩রা নভেম্বর হইতে সরবনে পাঠ আরম্ভ হইবে।

কথা কয়টির মধ্যে কি যাদু, কি রোমাঞ্চ!

একটি একটি কপর্দক সঞ্চয় ক'রে আজ ও এই প্রাচীরপত্রে মুদ্রিত জটিল পাঠ-তালিকার মধ্যে ইচ্ছেমত, যে-কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। ল্যাবরেটারিতে উপদেশ ও নির্দেশ অনুসারে কয়েকটি প্রবেশিকা পরীক্ষায় বেশ সহজ ভাবেই পাশ ক'রে যায়। মানিয়ার কি আনন্দ! এখন যে ও বিজ্ঞান-বিভাগের ছাত্রী! এখন আর ও মানিয়া নয়, মারিয়াও নয়, কার্ডে ফরাসী কায়দায় এখন ও লেখে: 'মারী শ্ক্লোদোভ্স্কা!' কিন্তু ওর সহপাঠীরা ঐ প্রচণ্ড শ্ক্লোদোভ্স্কী উচ্চারণ করতে পারে না, অথচ শুধু মারী নাম কিছুতেই ও বরদাস্ত করবে না; কাজেই সহপাঠীদের কাছে রহস্যময়ী অনামাই ও রয়ে গেল। মেয়েটির পোশাক আর হালকা রঙের চুলের দিকে চেয়ে গ্যালারীর তরুণের দল পরস্পরকে জিজ্ঞেস করে: 'কে এই মেয়েটি?' সঠিক উত্তর কেউ দেয় না, তবে দু একজন বলে: 'অনুচ্চার নাম্নী বিদেশিনী! ফিজিক্স ক্লাসে প্রথম বেঞ্চে বসে, কথা কয় না মোটে।' করিডোর-পথে বিলীয়মান সুদৃশ্য দেহরেখার দিকে চেয়ে ছেলেরা মন্তব্য করে: 'সুন্দর চুল!' সরবনের ছাত্রদের কাছে বহুদিন পর্যন্ত এই হালকা রূপোলী চুলে ভরা স্লাভ-গঠনের মাথাটাই এই ভীরু সহপাঠিনীর একমাত্র সংজ্ঞা হয়ে রইল।

কিন্তু এই মুহূর্তে তরুণ সহপাঠীদের প্রতি এই মেয়ের বীতরাগের অন্ত নেই। কিন্তু গম্ভীর অধ্যাপকদের কাছ থেকে জ্ঞানের ভাণ্ডার ভরে নিতেই ওর আগ্রহ বেশী। সেকালের ভদ্রতার নিয়মানুযায়ী এঁরা সাদা টাই আর সান্ধ্যপোশাক পরেন। অবশ্য চকের দাগে সারা পোশাকটা সর্বদা বিচিত্রিত হয়ে থাকে।

গত পরশু হয়তো মঁসিয়ে লিপমান এক বক্তৃতা দিয়ে গেছেন। গতকাল মঁসিয়ে বাউটির দিন ছিল। মারীর ইচ্ছে করে সব ক্লাসে গিয়ে দুনিয়ার যাবতীয় জ্ঞান আহরণ ক'রে নিতে, ইচ্ছে ক'রে প্রাচীর পত্রে উল্লিখিত তেইশজন প্রফেসরের সঙ্গে আলাপ করতে। মনে হয় জ্ঞানের এই অনন্ত তৃষ্ণা যেন ওর মেটে না।

প্রথম কয়েক সপ্তাহে অভাবিত বাধা এসে ওর পথরোধ ক'রে দাঁড়াল। ওর ধারণা ছিল যে ফরাসী ভাষাটা ওর ঠিক জানা আছে কিন্তু সে-ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। তাড়াতাড়ি বললে লাইনকে-লাইন ওর বোধগম্য হয় না। ও ভেবেছিল ইউনিভারসিটির পাঠ অনুধাবন করার মতো যথেষ্ট বিদ্যা ওর আছে কিন্তু এখানে এসে বুঝল যে পারীর গ্রাজুয়েশন্ ডিগ্রির পক্ষে তা যথেষ্ট

নয়। মারী ওর অঙ্ক আর ফিজিক্স জ্ঞানের মধ্যে প্রচুর ফাঁক আবিষ্কার করল। দিবারাত্র ও বিজ্ঞানের মাস্টার ডিগ্রির স্বপ্ন দেখে, তার জন্য ওকে কি অসম্ভব পরিশ্রমই না করতে হবে!

আজ অধ্যাপক পোল্‌আপ্পেল্ পড়াচ্ছেন। ভদ্রলোকের বোঝাবার ক্ষমতা কি সুন্দর, বলার কায়দাটাই বা কি চমৎকার! প্রথম কয়েকজনের সঙ্গে মারীও এসে ক্লাসে বসেছে; ধাপে ধাপে গ্যালারীর বেঞ্চের সারি নেবে এসেছে। ডিসেম্বর মাসের যৎসামান্য আলো পড়েছে ক্লাসে। মারী প্রফেসরের চেয়ারের কাছে জায়গা বেছে নিয়েছে। ছাই রঙের মলাট দেওয়া খাতা, কলম, পেন্সিল—সব গুছিয়ে নিয়ে বসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুন্দর ঝরঝরে অক্ষরে তার নোটের খাতার পাতা ভরে যাবে। আগে থেকেই সে মনটাকে প্রস্তুত ক'রে নিয়ে নিবিষ্টচিত্ত হয়ে বসে, প্রফেসর আসার আগে ঘরের প্রচণ্ড হট্টগোল তার কানেও ঢোকে না।

প্রফেসর ঘরে ঢোকামাত্র সবাই চুপ ক'রে যায়। এতক্ষণে প্রফেসর আপ্পেল্ পড়াতে আরম্ভ করেছেন। বুদ্ধিজীবী, সুশ্রী, অল্প বয়সী অধ্যাপক, ক্রমাগত মস্তিষ্ক-চালনায় শীর্ণ দেহ, কুব্জ-পৃষ্ঠ। ইকোয়েশন্‌গুলি প্রফেসর বোর্ডে তুলে নিলেন। অতিরিক্ত আগ্রহশীল জনকয়েক ছাত্রের মাত্র ক্লাসে সমাবেশ হয়েছে।

টেল্‌কোট পরা চৌকো দাড়িওয়ালা এই ভদ্রলোকের দেহ অত্যন্ত সুগঠিত। গম্ভীর স্বরে, আল্‌সসে্ প্রদেশের ভারী উচ্চারণে প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট শোনায়। তাঁর বোঝাবার শক্তি এমনি অসাধারণ যে সমস্ত জট আপনি খুলে আসে, মনে হয় দুনিয়াটা তাঁর হাতের মুঠোয়। শক্তিমান, শান্ত পুরুষ জ্ঞানের দুর্গম রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেন, কল্পনাশক্তির দৈন্য তাঁর নেই, তাই একটা মালিকানার দম্ভ যেন তাঁর অত্যন্ত স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের ভেতর দিয়ে ক্লাসের ওপর ঝরে পড়ে।

'এই আমি সূর্যকে নিলাম, আর এই ছুঁড়ে দিলাম!'

বেঞ্চে বসে পোল দেশের মেয়েটির গায়ে কাঁটা দেয়, উল্লাসে সে হেসে ওঠে। প্রশস্ত কপালের নীচে পাণ্ডুর দুটি চোখ উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করে। বিজ্ঞানের মধ্যে লোকে রস পায় না কি ক'রে? বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যে অলঙ্ঘ্য নিয়মাবলীর দাস, তার মতো রোমাঞ্চকর আর কি হতে পারে? যে মানবীয় বুদ্ধি এই জ্ঞানের আবিষ্কর্তা তার মতো অপূর্ব কি আছে? বাহ্য-বিশৃঙ্খলার অন্তরালে পরস্পরের ওপর একান্ত নির্ভরশীল প্রকৃতির সুনিয়ন্ত্রিত যে ধারা, তার তুলনায় উপন্যাস কত শূন্যগর্ভ, রূপকথা কত অসার! প্রেমের মতো শক্তিশালী এক অনুভূতি

এই মেয়েটির অন্তর হতে নির্গত হয়ে অনন্ত জ্ঞানের প্রতিটি বিষয় ও তার নিয়মাবলীর প্রতি ধাবিত হয়।

'এই আমি সূর্যকে নিলাম, আর এই আমি ছুঁড়ে দিলাম!—'

ধীর গম্ভীর বৈজ্ঞানিকের মুখের এই বাণীটুকু শোনার জন্যে এত দূর থেকে এত বছরের পরিশ্রম সহ্য ক'রে আসা সার্থক হয়েছে। মারীর মনে আনন্দের সীমা নেই।

অধ্যাপক শ্‌ক্লোদোভ্‌স্কীকে এই সময়ে কাসিমির দ্‌লুস্কি লেখে :

'শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

'এখানে আমরা সকলে ভালই আছি। মাদ্‌মোয়াজেল মারী প্রচণ্ড পরিশ্রম করছে, প্রায় সারাদিন সরবনেই থাকে, কেবল রাত্রে খাওয়ার টেবিলে আমাদের দেখা হয়। অত্যন্ত স্বাধীনচেতা মেয়ে সে, যদিও আপনি এটর্নির মাধ্যমে আমাকে তার অভিভাবক নির্বাচন করেছেন, তবু সে আমার প্রতি আদৌ শ্রদ্ধা রাখে বলে মনে হয় না। আমার কথাও বিশেষ শোনে না, উপরন্তু আমার অভিভাবকত্বে কোনরূপ গুরুত্বও আরোপ করে না। আমি তাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করি, কিন্তু এ পর্যন্ত আমার সকলপ্রকার উপদেশই ব্যর্থ হয়েছে। এসব সত্ত্বেও আমরা পরস্পরকে যথার্থই চিনেছি এবং আমাদের মধ্যে সদ্ভাবের অভাব নেই।

'ব্রনিয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা ক'রে আছি। তার বাড়ি ফেরার কোন তাগিদই নেই দেখছি, অথচ এখানে তার থাকা বিশেষ প্রয়োজন। আমরা সবাই তার জন্যে সাগ্রহে প্রতীক্ষা ক'রে আছি। মাদ্‌মোয়াজেল মারী সুস্থ আছে, চেহারাও ফিরেছে।

'আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করুন।'

ব্রনিয়া কয়েক সপ্তাহের জন্য পোল্যাণ্ডে আটকে আছে, এই অবসরে ডাক্তার দ্‌লুস্কি তার ছোট শালীটিকে রু-দাল্‌মাএ নিয়ে এসেছে। শ্যালিকার বিষয় ভদ্রলোকের এই প্রথম চিঠি। বলা বাহুল্য এ-হেন আমুদে ভদ্রলোকের কাছ থেকে মারী চমৎকার অভ্যর্থনা পেল। পোল্যাণ্ড থেকে নির্বাসিত যে সব তরুণ পারীতে কায়ক্লেশে দিন কাটাচ্ছিল, তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুপুরুষ, সবচেয়ে মেধাবী আর সবচেয়ে আমুদে ছেলেটিকেই ব্রনিয়া বেছে নেয়। আর কী অসাধারণ কর্মক্ষমতা! কাসিমির পিটর্সবুর্গ, ওডেসা আর ওয়ার্‌সর ছাত্র ছিল। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে সে রাশিয়া ছাড়তে বাধ্য হয়। পরে জেনেভায় এসে বিপ্লবী সংবাদ

প্রচারকের কাজ নেয়। তারপর পারীর রাজনৈতিক বিষয়ের ছাত্র থেকে একেবারে চিকিৎসা শাস্ত্রের মধ্যে ডুবে যায়। পোল্যাণ্ডের কোন এক ধনী পরিবারে তার জন্ম। জারের পুলিশ তার নামে একটা দলিল ফ্রান্সের বিদেশী মন্ত্রী-বিভাগে পাঠায়। তার ফলে পারী শহরের পাকাপাকি বাসিন্দা হবার পথও তার রুদ্ধ হয়ে যায়।

পারীতে ফিরে এসে ব্রনিয়া তার স্বামী ও ভগ্নীর সাগ্রহ অভ্যর্থনা পেল। অভিজ্ঞ গৃহিণী সে। পোঁছোবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রু-দাল্‌মাঞ্চ-এর গাছ-পালার মুখোমুখী মস্ত বারান্দাওয়ালা ছোট্ট ফ্ল্যাটটুকুতে শৃঙ্খলা ফিরে এল। রান্নায় স্বাদ পাওয়া গেল, গৃহের আনাচে-কানাচের ধুলো অদৃশ্য হলো, ফুলদানি ফুলে ফুলে ভরে উঠল, ব্রনিয়ার অসাধারণ দক্ষতায় সাংসারের শ্রী আবার ফুটে উঠল।

তারই বুদ্ধিতে ওরা পারীর মাঝখান থেকে লাভিলে বাৎশোমোঁ পার্কের কাছে বাড়ি নিল। সামান্য কিছু ধার ক'রে কদিন নিলামের দোকানগুলো ঘুরে দেখল। তারপর একদিন সকাল বেলা ফ্ল্যাটটিকে ভেনিসীয় আসবাব, পিয়ানো, সুন্দর পরদা দিয়ে সাজিয়ে ফেলল। বাড়ির আবহাওয়া পাল্টে গেল। ক্ষুরধার বাস্তববুদ্ধি রয়েছে ব্রনিয়ায়। প্রত্যেকের কাজের সময় ভাগ ক'রে দিল সে। দিনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা ডাঃ কাসিমির অফিস ঘরটি ব্যবহার করে। তার প্রথম রোগী আসে কসাইখানা থেকে; অন্য সময়ে ব্রনিয়া মেয়েদের রোগের চিকিৎসার জন্য ঘরটি ব্যবহার করে। স্বামী-স্ত্রী দুজনে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে, বাড়ি বাড়ি ঘুরে রোগী দেখে বেড়ায়।

কিন্তু সন্ধ্যা নামলে, আলো জ্বললে ওরা দুশ্চিন্তার হাত থেকে ছুটি নেয়। কাসিমির অত্যন্ত আমুদে মানুষ। প্রচণ্ড পরিশ্রম কিংবা দারুণ অভাবেও তার স্ফূর্তি নষ্ট হয় না। দীর্ঘ ক্লান্তিকর দিনের শেষে থিয়েটরের সস্তা টিকিট কিনে নিয়ে আসে। পয়সা না থাকলে বাড়িতে নিজেই পিয়ানোতে বসে যায়, নিজেও চমৎকার বাজাতে পারে। কিছুদিনের মধ্যেই বাড়িতে বন্ধুবান্ধবের ভিড় জমতে লাগল। পোলবাসীদের কলোনী থেকে তরুণ দম্পতিরা বেড়াতে আসে, কারণ তারা জানে যে, দ্‌লুস্কি-দম্পতিকে সব সময়ে পাওয়া যায়, গৃহিণী যদি বাড়িতে নাও থাকে তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবে। ধোঁয়ানো চা, সিরাপ, কিংবা শুধু জলের সঙ্গে কয়েকটি কেক পরিবেশন তারা করবেই। ডাক্তার-গিন্নি দুজন রোগী দেখার ফাঁকে হয়তো সেদিন বিকেলে এটুকু ক'রে রেখেছে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ির এক প্রান্তে ছোট্ট ঘরটিতে বইয়ের ওপর ঝুঁকে মারী নিরালায় তার রাতের পড়ার তোড়জোড় করছে, এমন সময়ে হুড়মুড় ক'রে তার ভগ্নীপতি ঘরে ঢুকে বাধা দিল। 'শিগগির টুপি আর কোট চাপিয়ে নাও, আমি ফ্রী-টিকিট পেয়েছি, আমরা তিনজনে এখনই কনসার্টে যাব।'

'কিন্তু—'

'না, কিন্তু-টিন্তু নয়। সেই পিয়ানো বাদক যার গল্প তোমাদের কাছে করেছি, তারই কনসার্ট। মাত্র কখানা টিকিট বিক্রি হয়েছে। অন্তত হল্ ভরাবার জন্যেও আমাদের যাওয়া উচিত। একদল শ্রোতা আমি জোগাড় করেছি আর যতক্ষণ না হাতে ব্যথা হয়, ততক্ষণ সমানে হাততালি দিতে হবে। ব্যাপারটা সার্থক হয়েছে এটুকু অন্তত শিল্পীর মনে হওয়া দরকার। বাস্তবিক ভদ্রলোক ভালো বাজান।'

কালো দাড়িওয়ালা লম্বা চওড়া লোকটির অনুরোধ এড়ানো অসম্ভব, খুশিতে কালো চোখ দুটি থেকে যেন আলো ঠিক্‌রে পড়ছে! মারী বই বন্ধ করে, ঘরের দরজা বন্ধ করে, তারপর তিনজন হুড়মুড় ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে প্রাণপন ছোটে বাস্ ধরতে।

অল্পক্ষণ পরে সালেরাদ্ হল্-এ বসে মারী লক্ষ্য করল একটি রোগা লম্বা লোক মঞ্চে এসে দাঁড়াল। চুলের রঙ লাল্‌চে, তামাটে; আশ্চর্য মুখখানা ঘিরে যেন জ্যোতি বেরোচ্ছে। অবশ্য হল্-এর চার ভাগের তিনভাগ খালি। কালো পিয়ানোর কাছে গিয়ে লোকটি বসল। সুদক্ষ অঙ্গুলীস্পর্শে লিৎস্, সুমান আর সোপ্যাঁ পুনর্জীবন লাভ করলেন। মুখের ভাবে একাধারে আত্মপ্রত্যয় ও বিনয় পরিস্ফুট; দৃষ্টি মোহাবিষ্ট। প্রায় শূন্য হল্-এ জীর্ণ কোট গায়ে, এই আশ্চর্য শিল্পীর অনুষ্ঠান মেয়েটিকে মুগ্ধ করল: এ যেন নতুন কোন শিল্পীর মঞ্চে প্রথম আবির্ভাব নয়, এ যেন কোন সম্রাট, কিংবা কোন দেবতা।

এরপর এই ভদ্রলোক কয়েকবার সন্ধ্যার দিকে সুন্দরী মাদাম্ গোস্কীর সঙ্গে রু-দাল্‌মাঞ বেড়াতে এলেন। এই মহিলা শিল্পীর প্রেমে পড়ে তাঁকে বিয়ে করেন। তাঁর রিক্ততা, নিঃস্ব ব্যর্থ জীবন-সংগ্রামের কাহিনী তিনি সহজ ভাবেই বলে গেলেন। বহুদিন আগে একবার ব্রনিয়া মার চিকিৎসার জন্য ষোল বছর বয়সে মাদাম গোস্কীর সঙ্গে বাইরে গিয়েছিল—সে-কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। হাসতে হাসতে তিনি বললেন: 'ওয়ারসয় ফিরে এসে তোমার মা বলেছিলেন—তোমাকে আর কখনও কোথাও তিনি নিয়ে যাবেন না, কারণ তুমি বড় বেশী সুন্দরী ছিলে!'

অগ্নিশিখার মতো কেশদাম শোভিত সঙ্গীত-পাগল যুবকটি সবরকম কথাবার্তা থামিয়ে দিয়ে পিয়ানোয় ঘা দেন। যাদুবলে দুলুন্সিদের সামান্য পিয়ানোর সুর মুহূর্তে এক স্বর্গীয় মূর্ছনায় রূপান্বিত হয়।

অর্ধভুক্ত, অপূর্ব এই শিল্পী-প্রেমিক, ভীরু-প্রকৃতির মানুষ; আনন্দ ও নিরানন্দের মধ্যে তাঁর দিন অতিবাহিত হয়। ভবিষ্যতে তাঁর শিল্প-প্রতিভা বিশ্ববিশ্রুত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে নতুনগড়া পোল্যাণ্ডের তিনি প্রধান-মন্ত্রীও নির্বাচিত হয়েছিলেন। এঁর নাম ইগনেল্ পাদেরুস্কি।

হাতের কাছে যে-কাজ পায় মারী তার মধ্যেই ডুবে যায়। পাগলের মতো পরিশ্রম ক'রে চলেছে সে। ইউনিভারসিটিতে একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে সহপাঠীদের মধ্যে যে সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে, ক্রমে ক্রমে ও এখন সেই বন্ধুত্বের আনন্দ পাচ্ছে। কিন্তু এখনও ফরাসী বন্ধুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব যেন জমাট বাঁধছে না, ওর দিক থেকে কেমন যেন সঙ্কোচ ঠেকে, এখনও ওর নিজের দেশের ছেলে-মেয়েদের মধ্যেই ওর ঘনিষ্ঠতা জমে আছে। দুজন অঙ্কের ছাত্রী মাদ্‌মোয়াজেল্ ক্রাস্‌কোভ্‌স্কা আর দিদিন্‌স্কা; ডাক্তার মোজ; বায়োলজির ছাত্র দানিজ: স্তানিস্লাভ্ জালে—(ইনি পরে হেলাকে বিয়ে করেন); তরুণ ওয়োজসিচোভ্‌স্কি —(ইনি ভবিষ্যতে পোল্যাণ্ড প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন)—ল্যাতিন কোয়ার্টারে এঁদের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে মারীর বন্ধুত্ব হয়।

এই সব গরীব ছাত্ররা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে বড়দিনের ভোজের আয়োজন করল। রাঁধুনীর দল ওয়ার্‌সর বিশেষ রান্না রাঁধল: পারিজাত ফুলের রঙধরা পোড়ানো বার্শ্‌, ব্যাঙের ছাতা দিয়ে বাঁধাকপি, মসলা ভরা পাইক মাছ, পপির বীজ ছড়ানো কেক্, সামান্য একটু ভদ্‌কা, আর প্রচুর চা। ওরা নাটক অভিনয় করল, সেখানে সখের অভিনেতারা নাট্যরস ও হাস্যরসের তত্ত্ব আলোচনা করল। এইসব সান্ধ্য আসরের কর্মসূচী পোল ভাষায় বিতরণ করা হলো। তার ওপর বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত দিয়ে ছবি আঁকা হলো: ছবির ওপর দিকে তুষারাবৃত সমভূমির ওপর ছোট একটি কুটির; নীচের দিকে চিলে-কুঠুরিতে বই পত্রের ওপর ঝুঁকে-পড়া স্বপ্নালু একটি ছেলে! ফাদার ক্রীস্‌মাস্ চিমনির ভেতর দিয়ে ল্যাবরেটারিতে বিজ্ঞানের পত্র-পত্রিকা ঢেলে দিচ্ছেন। সামনে একটি শূন্যগর্ভ পার্স···ইঁদুরেরা কামড়ে খাচ্ছে।···

এই সব হৈ হুল্লোড়ে মারী যোগ দিল। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ ক'রে পার্ট মুখস্ত করার সময় তার ছিল না। কিন্তু ভাস্কর ওয়াস্‌ডিনেকোভ্‌স্কি এক

স্বদেশী আসরের আয়োজন করেন, সেখানে "স্বাধীনতা সংগ্রামে পোল্যাণ্ড" নামক কয়েকটি "জীবন্ত চিত্রের" সমাবেশ করা হলো। তার মধ্যে প্রধান ভূমিকায় নামল মারী। সে-রাত্রে আর ওকে চেনার উপায় ছিল না। সেকেলে টিউনিকের ওপরে, স্বদেশী রঙের বিচিত্র ওড়না গায়ে, কাঁধের ওপর ছড়িয়ে-পড়া এলোচুলে, ও যেন এক অচেনা মেয়ে। স্বচ্ছ ত্বকের ওপর বেদানা রঙের কাপড়ের ভাঁজ, রূপোলী চুলের বাহার, দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখশ্রী—সব মিলিয়ে নির্বাসিত পোলবাসীদের কাছে মারীকে সেদিন মাতৃভূমির জীবন্ত প্রতিমূর্তি মনে হচ্ছিল।

এতদূরে নির্বাসিত হয়ে থাকা সত্ত্বেও মারী বা ওর দিদি কেউই ওয়ারসকে ভুলে যায় নি। নিজেদের অজ্ঞাতসারেই ওরা গার দ্যু নর্ আর ফ্রান্স অভিমুখে ধাবিত ট্রেনগুলোর কাছাকাছি শহরের এক প্রান্তে রু-দাল্‌মাঞ্চ বাসা নিয়েছে, কারণ ফরাসী জীবনের মধ্যে ঢোকার সাহস যেন তাঁদের নেই। সহস্র বন্ধনে ওরা মাতৃভূমির সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তার মধ্যে বৃদ্ধ পিতার পত্রগুলো ছিল জীবন্ত সংযোগ। সুশিক্ষিতা, সুরুচিসম্পন্না কন্যারা বাবাকে প্রথম পুরুষে * চিঠি লিখত আর প্রতি চিঠির শেষে লিখত আমার বাবামণির হাতে চুমু দিলাম। এই চিঠিগুলো বৃদ্ধের কাছে মেয়েদের জীবনের ছবি বয়ে আনে, আর আনে ছোটখাট আব্দারে ভরা ফরমাশ। একথা ওদের মাথাতেই আসে না যে, ওয়ারসর বাইরে চা কেনা যায়, কিংবা সুবিধেমত দামে ফ্রান্সেও 'ইস্ত্রি' কেনা সম্ভব ···

এই সময়ে লেখা বৃদ্ধ শ্ক্লোদোভ্স্কির কাছে ব্রনিয়ার চিঠিতে আমরা দেখি :

'আমার পরম আদরের বাবামণি, আমায় তুই রুবল্ কুড়ি ফ্রাঙ্কে দুই পাউণ্ড চা পাঠিয়ে দিও।···এ ছাড়া আমাদের আর কোন অসুবিধে নেই, মানিয়ারও নেই। আমরা খুব ভাল আছি, মানিয়ার চেহারা ফিরেছে, ও ভীষণ পরিশ্রম করছে, তবে তার জন্য শরীর ওর কিছুমাত্র খারাপ হয় নি···'

বৃদ্ধ লেখেন ব্রনিয়াকে: 'ব্রনিয়া মা, তোমার ইস্ত্রিটা ভালো কাজ দিচ্ছে জেনে খুব খুশি হলাম। আমি নিজেই দেখেশুনে কিনলাম, তাই ভয় হচ্ছিল পাছে তোমার পছন্দ মতো জিনিস না হয়। এসব জিনিস যে কোথায় পাওয়া যায় সে-হদিস তো আমার নেই। এসব মেয়েদের কেনা-কাটার জিনিস, তাই ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও খুঁজেছি।···'

স্বভাবতই ভাস্করের ই্টুডিওর অনুষ্ঠানের কথা মারী বাবাকে লিখল আর

---

* পোলভাষার প্রথম পুরুষে চিঠি লেখাই ভদ্রতা।

সেই সঙ্গে পোলোনিয়ার ভূমিকায় নিজের সাফল্যের খবরটাও জানাল। কিন্তু এ খবরে বৃদ্ধ অধ্যাপক যে বিশেষ খুশী হয়েছিলেন মনে হয় না। তিনি লিখলেন :

'প্রিয় মানিয়া, তোমার চিঠিখানা পড়ে আশঙ্কিত হলাম। থিয়েটার অনুষ্ঠানের সঙ্গে তুমি ব্যক্তিগত ভাবে জড়িত থাকবে এ আমার আদৌ পছন্দ নয়। যদিও সমস্ত ঘটনাটা অত্যন্ত সরল মনেই করেছ, তবুও আমার আশঙ্কা হয়, নজরে তুমি ঠিকই পড়ে যাবে। তোমার প্রতিটি চালচলন লক্ষ্য করার মতো লোক পারীতে আছে, একথা তোমার অজানা নয়। এরা প্রগতিশীল প্রতিটি ব্যক্তির নাম-ধাম টুকে নিয়ে এখানে খবর পাঠিয়ে দেয়। এতে অনেক গোলমালের আশঙ্কা থেকে যায়, এমন কি বিশেষ বিশেষ লোকের কাছে জীবনের বিশেষ বিশেষ পথও বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং ভবিষ্যতে ওয়ারস্য ফিরে এসে যাদের চাকরি করতে হবে, তাদের নিরিবিলিতে থাকাই বিধেয়। কয়েকটি সংবাদপত্র বিদেশে অনুষ্ঠিত কনসার্ট, বল-নাচের খবর সব জোগাড় করে, তাতে প্রত্যেকের নামও উল্লেখ করা হয়। যদি তোমার নাম কোনরকমে জানাজানি হয়ে যায়, তবে আমি মর্মাহত হবো। এই কারণে এর আগের চিঠিতে কয়েকটি বিষয়ের সমালোচনা ক'রে তোমায় উপদেশ দিয়েছিলাম।...(৩১শে জানুয়ারী, ১৮৯২-র চিঠি।)

হয় মসিয়ে শ্ক্লোদোভ্স্কির কঠোর উপদেশ, নয় মানিয়ার শুভবুদ্ধি আপনা থেকেই এ জাতীয় নিষ্ফল আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। ও বুঝল যে এইসব নিরীহ হৈচৈ ওর কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। তাদের কাছ থেকে ও সরে এল। থিয়েটারে অভিনয় করতে তো ও ফ্রান্সে আসে নি। পড়াশোনা থেকে যে মুহূর্তটি ও সরে আসে, সেই ক্ষণটিই ওর লোকসানের খাতায় লেখা হয়ে থাকে।

আর-একটি সমস্যাও দেখা দিল। রু-দাল্‌মাঞার জীবন সত্যিই সুন্দর, কিন্তু এখানে ও পড়াশোনায় সম্পূর্ণ মন দিতে পারছে না। কাসিমিরের পিয়ানো, বন্ধু-বান্ধবদের আসা-যাওয়া, কঠিন একটা ইকোয়েশনের মধ্যে যখন ও ডুবে থাকে, ঠিক সেই সময়ে ঘরের মধ্যে হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়া, বাড়িতে নবীন ডাক্তার-দম্পতির রোগীদের ভীড়, কোনটাই তো ঠেকানো সম্ভব নয়। মাঝ-রাতে হঠাৎ কলিং-বেলের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে শোনে : কসাইয়ের বৌর প্রসব বেদনা উঠেছে, ব্রনিয়াকে এক্ষুণি যেতে হবে। এর মধ্যে কীভাবে পড়ায় মন দেওয়া যায় !

উপরন্তু লাভিলে থেকে সরবনে যেতে পাক্কা একটি ঘণ্টা সময় নষ্ট হয় আর

মাস গেলে দুটো বাস্-খরচও নেহাৎ কম হয় না। ব্রনিয়া আর দ্লুস্কির-সুদ্ধে একটা খণ্ড বাক-যুদ্ধের পর স্থির হলো যে মারী ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটারি আর লাইব্রেরিগুলোর কাছে লাতিন-কোয়ার্টারে বাসা নেবে। দ্লুস্কি জোর ক'রে বাড়িবদলের খরচটুকু ওর হাতে গুঁজে দিল।

কসাইখানার পাশের ছোট্ট ফ্ল্যাটটুকু ছেড়ে আসতে মানিয়ার কষ্ট হয়েছিল বৈকি। কারণ অতি বাস্তব পরিবেশের ভেতরেও এ বাড়িতে সর্বদা স্নেহ-ভালোবাসা ও দরদ বিরাজ করতো। মারী ও কাসিমিরের মধ্যে যে ভাইবোনের সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল, তা চিরকাল বর্তমান ছিল। মারী ও ব্রনিয়া—দুই বোনের মধ্যে বহুদিন যাবৎ এক অপূর্ব স্নেহের সম্বন্ধ ছিল যার ভিত্তি স্বার্থত্যাগ, পরস্পরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস আর পরস্পরের সাহায্যের উপর গড়ে উঠেছিল।

সন্তান সম্ভাবনায় ভারী দেহ নিয়েও ব্রনিয়া ছোট বোনটির যৎসামান্য জিনিসপত্র বেঁধে ছেঁদে ঠেলাগাড়ির ওপর গুছিয়ে দিল। তারপর সেই বিখ্যাত বাসের "রাজকীয়" আসন বদল ক'রে অন্য আরেকটি বাস ধরে কাসিমির ও ব্রনিয়া ছোট বোনটিকে তার নতুন ছাত্রাবাসে পৌঁছে দিয়ে এল।

॥ মাসে চল্লিশ রুবল ॥

১

বাস্তবিকই, মারীর জীবন আরও রিক্ত আরও নিঃস্ব হলো : নতুন আবাসে এবার ও নিঃসঙ্গ জীবনের মধ্যে ডুবে গেল। পথ চলতে পাশের দেয়ালে অজান্তে যেমন হাত লাগে, চারপাশের লোকদের সঙ্গে যেমন আলতো ছোঁয়া লাগে, ওর জীবনের ঘড়ির ঘণ্টাগুলো তেমনি আলতোভাবে নিবিড় নীরবতা দিয়ে ও ভরে রাখে, তার ওপর আশেপাশে সাধারণ কথাবার্তার দাগ বসে না। পুরো তিনটি বছর ওর সম্পূর্ণ একা একা পড়াশোনার মধ্যে কাটে : এ ওর বহু-কালের স্বপ্ন! আশ্রমের ব্রহ্মচারীদের জীবনের মতো এই আদর্শ জীবনের স্বপ্নই তো ও দেখত!

ব্রহ্মচারিণীর অনাড়ম্বর জীবন যেন ওর কপালের লিখন। দ্যুস্কি পরিবারের সুব্যবস্থা স্বেচ্ছায় ত্যাগ ক'রে এসে নিজের খরচ চালাবার দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে ও নিয়েছে। ওর আয় বলতে কষ্টে জমানো টাকার সঙ্গে বাবার পাঠানো যৎসামান্য মিলিয়ে মোটমাট মাসে চল্লিশ রুবল দাড়াল।

১৮৯২-র প্যারী। ঘরভাড়া, খাওয়া-পরা, বইখাতা ও ইউনিভারসিটির খরচ চালিয়ে চল্লিশ রুবল্-এ একটি মেয়ের ভদ্রভাবে চলে কি ক'রে? কিন্তু সমস্যার সমাধান করতে মারীর কোনদিনই আটকায় নি।

১৮৯২-র ১৭ই মার্চ মারী লিখল যোসেফকে: 'বাবার কাছে লেখা চিঠিতে নিশ্চয় জেনেছ যে, আমি ছাত্রাবাসের এলাকায় উঠে এসেছি; নানা কারণে, বিশেষতঃ এই সময়ে এই ব্যবস্থার নিতান্ত দরকার। আমার প্ল্যান কার্যকরী হয়েছে; বস্তুতঃ আমার নতুন বাসা, ৩নং রু-ফ্ল্যাটার্স থেকেই তোমাকে চিঠি লিখছি। ঘরটা ভাল আর ভাড়াও সস্তা। এখান থেকে কেমিষ্ট্রি-ল্যাবরেটারি পনের মিনিটের আর সরবন্ কুড়ি মিনিটের পথ। অবশ্য দ্লুস্কির সাহায্য ছাড়া এমন ক'রে গুছিয়ে নিতে পারতাম না।

'এখানে এসে প্রথম প্রথম যতটা করতাম, এখন তার সহস্র গুন বেশী পরিশ্রম করছি। রু-দাল্‌মাএ থাকতে আমার জামাইবাবু যখন-তখন আমার পড়ার ব্যাঘাত সৃষ্টি করতেন। আমি যতক্ষণ বাড়িতে থাকতাম, ততক্ষণ শুধু ওঁর সঙ্গে বসে বসে আড্ডা মেরে সময় কাটানো ছাড়া আর কিছু করি এ ওঁর সহ্য হতো না। মাঝে মাঝে এ বিষয় নিয়ে ওঁর সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হতাম। সেদিন ব্রনিয়া আর দ্লুস্কি এখানে এসেছিল, হৈ হৈ ক'রে আমরা চা খেলাম, তারপর কাছেই 'স'দের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

'বৌদির খবর কি, আমায় যেমন কথা দিয়েছিল সেইমত বাবাকে দেখাশোনা করছে তো? ওকে বলো বাড়িতে আমায় যেন একেবারে খরচের খাতায় লিখে না রাখে! বাবা ওর সম্বন্ধে ইদানীং যেমন বেশী বেশী মিষ্টি ক'রে কথাবার্তা লেখেন,—ভয় করে শিগগিরই বাবা আমায় ভুলে যাবেন!...'

লাতিন-কোয়ার্টারে একমাত্র মারীই কেবল মাসে একশ' ফ্রাঙ্কের ওপর ভরসা ক'রে দিন কাটায় না, ওর অধিকাংশ পোলদেশী বন্ধুবান্ধবের অবস্থাও প্রায় ওরই মতো। তিন চারজন হয়তো একটা ঘরে থেকে, একসঙ্গে খেয়ে দিন কাটায়, অন্যেরা প্রতিদিন অনেকটা সময় পরের বাড়ির তদ্বির করে,

বেঁধে, সেলাই ক'রে, নিজের নিজের বুদ্ধিমত যেখানে সেখানে খেয়ে অল্পবিত্তরা জুতো জামার সংস্থান ক'রে নেয়। ব্রনিয়াও এসে প্রথমে এই পথই ধরেছিল,— বন্ধুবান্ধবদের মহলে উৎকৃষ্ট রাঁধুনী হিসেবে তার নামও হয়েছিল।

কিন্তু এ ব্যবস্থায় মানিয়ার মন ওঠে না। প্রথমতঃ দু'একজনকে সঙ্গে নিয়ে থাকলে ঘরের শান্তি ভঙ্গ হয়, সেটা ও সহ্য করতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ এত কাজের মধ্যে নিজের কথা ভাববার সময় কই? সত্যিই যদি এ চেষ্টা ও করত, কতদূর কার্যকরী হতো, সেটা বলা যায় না। সতরো বছরে যে মেয়ে গভর্নেসের চাকরি করেছে, দিনে সাত আট ঘণ্টা ছাত্র পড়িয়েছে,— সংসারে কাজ শেখার অবকাশ তো তার হয় নি। পিতৃগৃহে সুগৃহিণী হিসেবে ব্রনিয়া যা' কিছু শিখেছে, মানিয়া তো তাও শেখে নি। পোল-কলোনীতে একটা কথা রাষ্ট্র হয়ে গেল: 'মারী কি ক'রে সুপ রান্না করতে হয়, তাও জানে না!' বাস্তবিকই ও জানে না, জানার আগ্রহও ওর বিশেষ নেই। সকালের যে অমূল্য সময়টুকুতে ফিজিক্সের অনেকগুলো পৃষ্ঠা পড়ে ফেলা যায়, কিংবা ল্যাবরেটারিতে একটা নতুন কিছু পরীক্ষা করা যায়, সে সময়টুকু "ব্রথ" রান্নার রহস্যের সন্ধান ক'রে কেন সময় নষ্ট করবে ও?

দুর্বার ইচ্ছাশক্তির জোরে ও ওর কর্মতালিকা থেকে এতটুকু বিচ্যুত হয় না। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেশে না, লোকজনের সংশ্রবে ও বিশেষ আসতে চায় না। ও মনস্থির ক'রে ফেলল যে বাইরের জীবনের কোন মূল্যই ওর কাছে নেই,— বস্তুতঃ সে-জাতীয় জীবন বলে কিছু হয় না—এই ওর ধারণা; অমানুষিক কৃচ্ছ্রসাধন শুরু ক'রে দিল। রু-ফ্ল্যাটার্স, বুলেভার্ড পোর্তরয়াল, রু-দ্য-ফ্যাইসাঁতিন···সব জায়গাতেই সস্তা ভাড়ায় ঘর মারীর জুটে যায়। সস্তা আসবাবে সাজানো একটা বাড়িতে ছাত্র, ডাক্তার, সেনাবিভাগের অফিসার ভাড়াটে প্রতিবেশীদের ঠেলাঠেলির মাঝে মারী প্রথমে একখানা ঘর পেল। পরে নিরিবিলির আশায় মধ্যবিত্ত এক পরিবারের চিলে কুঠরিতে ভৃত্যদের ঘরের মতো একখানা খুপরি পেল। ভাড়া মাসে কুড়ি ফ্রাঙ্ক। ঘরটার ছাদ ঢালু, মাঝে গর্ত, তাই দিয়ে ঘরে আলো আসে, আকাশের এক চিলতে ওই পথে দেখা যায়। আগুন, বাতি বা জলের কোন ব্যবস্থাই নেই।

এইটুকু ঘরের মধ্যে মারী ওর নিজের সমস্ত সম্পত্তি বোঝাই করল— একখানা ভাঁজকরা খাট, দেশ থেকে বয়ে-আনা তোশক, ষ্টোভ, একটা সাদা কাঠের টেবিল, মুখ ধোবার পাত্র; দু'পেনি দামের ঢাকনা-দেওয়া পেট্রোলের বাতি, জলের কুঁজো (—রোজ সিঁড়ি দিয়ে নামার মুখে একটা কল থেকে জল

ভরে রাখতে হয়,)—ডিসের মাপের একটা ছোট্ট হিটার (—পরবর্তী তিন বছর ধরে এতে সে রান্না করেছে—), দু খানা প্লেট, একটা কাঁটা, ছুরি, একটা চামচ, একটা পেয়ালা, একটা স্টু্ র াঁধার বাসন, একটা কেটলি, তিনটে গেলাস। পোলদেশের ভদ্রতা অনুসারে দ্লুস্কিরা দেখা করতে এলে ও এই গেলাসে তাদের চা ঢেলে দেয়। কখনও কখনও মারী অতিথি আপ্যায়ন করে, সে-সময়ে ওর অতিথি সৎকারের দায়িত্ব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ও স্টোভ ধরায়; ঘরের কোণ থেকে বিরাট ব্রাউন রঙের ট্রাঙ্ক বের ক'রে অতিথিদের বসতে দেয়।

অবশ্য ঝি চাকর রাখার কোন প্রশ্নই ওঠে না, দিনে একঘণ্টার জন্য লোক লাগিয়ে ঘর পরিষ্কার করানোও ওর পক্ষে সম্ভব নয়। যাতায়াতের খরচ একেবারে নেই, কারণ সরবনের পথটুকু ওর হাঁটাপথ। কয়লা যথাসম্ভব কম খরচ করে, নেহাৎ শীতে কাবু হয়ে পড়লে এক বা দুই বস্তা এনে কাজ চালায়। রাস্তার মোড়ে কয়লাওয়ালার কাছ থেকে কিনে, এক-এক বালতি ক'রে নিজেই ছ'তলার ছাদে টেনে তোলে। এক-একটা তলা পৌঁছে একবার ক'রে দম নেয়। বাতির খরচের বেলাও তাই। সন্ধ্যে হবামাত্র সেণ্ট জেনেভিয়েভের লাইব্রেরিতে আশ্রয় নেয়। গ্যাস্ জ্বলে ব'লে সর্বদা জায়গাটা গরম থাকে। প্রকাণ্ড চৌকো টেবিলে দুই হাতের ভেতর মাথা চেপে ধরে রাত দশটায় দরজা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত ও বসে বসে পড়ে। তারপর রাত দুটো পর্যন্ত নিজের চিলেকোঠায় বাতি জ্বেলে পড়াশোনা করতে যথেষ্ট তেল খরচ হয়। অবশেষে ক্লান্তিতে চোখ ঢুললে বই রেখে বিছানায় গা ঢেলে দেয়।

সংসারের কাজ বলতে ও একটি মাত্র জিনিসই জানে—এবং তা হলো সেলাই করা। সিকোর্স্কি বোর্ডিং ইস্কুলে হাতের কাজের ক্লাসে শেখা আর দীর্ঘ-কাল ছাত্রী পড়াবার সময় সেলাই করার যে অভ্যাসটা আয়ত্ব করেছিল, তাই এখনও ও বজায় রেখেছে। পোশাকের যত্ন নিতে ও জানে। সর্বদা কেচে সেলাই ক'রে রাখে। অত্যধিক পড়াশোনা ক'রে ক্লান্তি বোধ হলে সময় কাটাবার জন্যে কাপড়গুলো কাচতে বসে।

ক্ষুধা বা শীতবোধের কাছে নতি স্বীকার ও করে না। কয়লা কিনবে না বলে, আর খানিকটা অন্যমনস্কতার জন্যও বটে, ও প্রায়ই স্টোভ জ্বালাতে ভুলে যায়। অঙ্ক আর ইকোয়েশন কষতে গিয়ে আঙুলগুলো যে কালিয়ে যাচ্ছে, কাঁধদুটো ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে শুরু করেছে, এ খেয়ালই ওর থাকে না। গরম স্যুপ বা একটুকরো মাংস পেলে ভালো লাগে বটে কিন্তু স্যুপ রাঁধবে কে! এক ফ্র্যাঙ্ক খরচ করাও যেমন সম্ভব নয় তেমনি রাঁধতে বসে

একঘণ্টা নষ্ট করাও তো অর্থহীন। মাংসের দোকানে ও ঢোকে না, হোটেলেও যায় না, বড্ড খরচ যে! হপ্তার পর হপ্তা শুধু চা আর মাখন রুটি খেয়ে কাটিয়ে দেয়। যেদিন মুখ বদলাবার সখ হয় সেদিন লাতিন-কোয়ার্টারের দুধ ঘি মাখনের দোকানে ঢুকে দু'টো ডিম, একটুকরো চকোলেট আর কিছু ফল কিনে আনে।

ক'মাস আগে যে মেয়ে ওয়ার্স থেকে সুস্থ সবল দেহ নিয়ে এদেশে এসে নেমে ছিল, এই খাবারের কৃপায় সে রক্তহীন ফ্যাকাশে হয়ে পড়ল। প্রায়ই টেবিল ছেড়ে দাঁড়াবার সময় মাথাটা কেমন যেন ঘুরে ওঠে। কোনরকমে বিছানায় পড়েই অজ্ঞান হয়ে যায়। জ্ঞান হলে ভাবতে বসে কেন এমন হলো? ভাবে বুঝি রোগে ধরেছে, দুর্বলতাই যে এর কারণ, উপবাসই যে ওর রোগ, একথা ওর মাথায় আসে না।

স্বভাবতই বেঁচে থাকার এই 'অপূর্ব ধারা' ও দ্লুস্কিদের কাছ থেকে গোপন করে। তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেই তারা রান্নাবাড়া দৈনিক খাবারের ব্যবস্থার কথা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে; ও হাঁ, না ক'রে জবাব দেয়। ভগ্নীপতি শরীর সম্বন্ধে অভিযোগ তুললে ও অত্যধিক পড়াশোনার অজুহাত দেয়। আর ক্লান্তির একমাত্র কারণ হিসেবে এই কথা ও নিজেও বিশ্বাস করে। পরমুহূর্তে এই দুশ্চিন্তা মন থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য ব্রনিয়ার মেয়ের সঙ্গে খেলতে বসে, বাচ্চার প্রতি ওর দুর্বলতার যেন শেষ নেই।

কিন্তু একদিন মারী যখন ওর এক সহপাঠীর সামনে অজ্ঞান হয়ে পড়ল, তখন সেই বন্ধুটি রু-দাল্‌মাঞ্চ ডাক্তার-দম্পতিকে খবর দিতে ছুটল। ঘণ্টা দুই পরে কাসিমির হাঁপাতে হাঁপাতে ছ'তলার চিলেকুঠরিতে পৌঁছে দেখে পাণ্ডুর মুখে মারী এরই মধ্যে উঠে ব'সে পরের দিনের পাঠ তৈরি করছে। সে প্রথমে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শালীকে লক্ষ্য করল, তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরিষ্কার প্লেটগুলি, খালি স্টু-র বাসন নজর ক'রে দেখল। সারা ঘরে এক প্যাকেট চা ভিন্ন খাদ্য বস্তুর চিহ্ন মাত্র নেই। গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করল কাসিমির:

'কি খেয়েছ?'

'আজ? ঠিক মনে নেই। একটু আগেই তো খেলাম—'

কাসিমিরের গলার স্বরে অসন্তোষ ঝরে পড়ে: 'কি খেয়েছ?'

'কয়েকটা চেরী আর, আর—, ঐ জাতীয় কিছু—'

শেষ পর্যন্ত মারী স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে, আগের দিন সন্ধ্যা থেকে এ পর্যন্ত কয়েকটা গাজর আর আধপাউণ্ড চেরী চিবিয়ে কাটিয়েছে। রাত্রে

তিনটে পর্যন্ত জেগেছে, মাত্র চার ঘণ্টা ঘুমিয়েছে। তারপর সরবনে গিয়েছিল। ক্লেয়ার পর গাজরগুলো খেয়েছিল—এটুকু মনে আছে। তারপর কখন যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে জানে না।

ডাক্তার প্রচণ্ড চটেছে। ক্লান্ত ধূসর চোখ সরল হাসি মাখা মারীর ওপর তার রাগ যেন ফুঁসে উঠতে চায়। নিজেকেও সে ক্ষমা করতে পারছে না। শ্বশুর মশাই না তারই উপর এই বাচ্চা মেয়েটার ভার দিয়েছেন? সে কেন এতদিন মেয়েটার দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখে নি? শ্যালিকার কোন আপত্তিতে কান না দিয়ে তার হাতে টুপি আর কোট তুলে দিয়ে আগামী সপ্তাহের প্রয়োজনীয় বইপত্র গুছিয়ে নিতে বলল। তারপর নিঃশব্দে, অসন্তুষ্ট ভারাক্রান্ত অন্তরে তাকে লাভিলে নিয়ে চলল। বাড়ির চৌকাঠে পা দিয়েই ব্রনিয়াকে এমন জোরে হাঁক দিল যে, ভীত ব্রনিয়া রান্নাঘর থেকে ছুটে এল।

কুড়ি মিনিট ধরে মারী কাসিমিরের নির্দেশ মতো পথ্য গিলল; আধ সের মাংসের সঙ্গে একপ্লেট মুচমুচে আলুভাজা।

যেন যাদু লেগে মানিয়ার গালের রঙ ফেরে। রাত্রি এগারোটার সময়ে ছোট্ট ঘরের বাতি ব্রনিয়া নিজে এসে নিবিয়ে দিয়ে গেল। বেশ কিছুদিন ভাল খেয়ে, যত্নে থেকে মানিয়া সেরে উঠল। গায়ে জোর পেল। তারপর আগামী পরীক্ষার দুর্ভাবনায় অস্থির হয়ে ওর চিলেকুঠরিতে ফিরে গেল। যাবার সময় শপথ ক'রে গেল, ভবিষ্যতে আর এমন বোকার মতো কাজ ও করবে না।

এর পরের দিন থেকেই কিন্তু আবার শুরু হলো হাওয়া খেয়ে বাঁচা!

কাজ আর কাজ! পড়াশোনার মধ্যে ডুবে গেল, এগিয়ে যাওয়ার নেশা ওকে পেয়ে বসল। ওর মনে হয়, মানুষের আবিষ্কৃত যাবতীয় জ্ঞান ও আয়ত্ত করতে পারবে। অঙ্ক, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রির পাঠ ও ধারাবাহিকভাবে নিতে আরম্ভ করল। হাতে কাজ করা, আর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সূক্ষ্মতম নির্ভুল ফলাফলে উপনীত হওয়া ক্রমে ক্রমে ওর কাছে সহজ হয়ে এল। ফলে প্রফেসর লিপমান্ যখন ওকে একটা গবেষণার কাজে আহ্বান করলেন, তখন ও সানন্দে ওর কর্মকুশলতা আর মানসিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিল। সরবনের উঁচু ও চওড়া ফিজিক্স গবেষণাগারের ভেতরের গ্যালারীতে পৌঁছনো যেত দুটি ছোট সিঁড়ি বেয়ে। এই ঘরে মারী ওর যোগ্যতার প্রথম প্রমাণ দিল। এই ঘরের স্তব্ধ, একাগ্র 'আবহাওয়া'র প্রতি এক দুর্বার আকর্ষণ জন্মাল ওর মনে। সেই দিন থেকে আজীবন অন্য সমস্ত ঘরের তুলনায় এই ল্যাবরেটারির ঘরখানা ওর প্রিয়

হয়ে রইল। চব্বিশ ঘণ্টা ও থাকে পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে। কখনও ওক কাঠের টেবিলের সামনে প্রিসিশন্ যন্ত্রপাতি হাতে, কখনও বা যেখানে বকযন্ত্রে প্রচণ্ড তাড়নে কোন রাসায়নিক পদার্থ টগবগ ক'রে ফুটছে, সেই যন্ত্রের সামনে। চুনট কাপড়ের পোশাকে মানিয়াকে 'ব্লো-পাইপ' আর অন্যান্য যন্ত্রপাতির ওপর ঝুঁকে-পড়া একাগ্র তরুণ ছাত্রদের মধ্যে আলাদা ক'রে চেনা শক্ত। এদেরই মতো এই ঘরের ধ্যানগম্ভীর পরিবেশকে ও শ্রদ্ধা করে, এতটুকু শব্দ, একটা অনাবশ্যক কথাও এখানে কেউ বলে না।

একটা মাস্টার ডিগ্রিতে ওর মন ভরল না; ও আরও একটা ডিগ্রি পাবার জন্য মনস্থির করল। অঙ্কে একটা, ফিজিক্সে একটা। একসময়ের সামান্য পরিকল্পনা অতিশীঘ্রই এমন ব্যাপক রূপ নিল যে, বাবাকে জানাবার সময় বা সাহস কোনটাই ওর হলো না, কারণ ও জানে বৃদ্ধ পিতা কী আকুল আগ্রহেই না ওর দেশে ফিরে যাবার দিন গুনছেন। যে মেয়ে এতদিন একান্ত নির্ভরশীল ছিল, হঠাৎ তার এই বেপরোয়া ভাব দেখে পিতার মনে আশঙ্কা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অতদূর থেকেও তিনি তার আভাসও দিলেন।

১৮৯৩-র ৫ই মার্চ বৃদ্ধ পিতা ব্রনিয়াকে লিখলেন: 'এই প্রথম তোমার চিঠিতে জানলাম যে মানিয়া অন্য বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি নিতে চায়। আমি বরাবরই তাকে প্রশ্ন ক'রে দেখেছি, সে এবিষয়ে কোন কথাই লেখে না। কবে নাগাদ এই পরীক্ষা হবে। মানিয়া কতো দিনে পাশ ক'রে বেরোবে, পরীক্ষার ফী কত আর ডিপ্লোমার মূল্যই বা কি, সব খবর দিয়ে আমাকে চিঠি লিখো। আমায় আগে থেকে প্রস্তুত হতে হবে, যাতে মানিয়ার দরকারের সময়ে কিছু টাকা পাঠাতে পারি; আর সেই মতো আমার কর্তব্যও স্থির করতে পারি।...

'...আগামী বৎসর পর্যন্ত আমি এই বাসাতেই থাকতে চাই, কারণ মানিয়া ফিরে এলে ওর আর আমার এই বাড়িতেই হয়ে যাবে। ক্রমে ক্রমে ওর ছাত্র-সংখ্যা বাড়বে, ইতিমধ্যে আমার যা আছে তা দু'জনে ভাগ ক'রে নেব, দিব্যি চলে যাবে।'

যতই লাজুক মেয়ে হোক না কেন, নিত্য বহুলোকের সঙ্গে মারীর দেখা হয়। কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতাও হলো। সরবনে বিদেশী মেয়েদের সম্মান আছে। বহু দূর দূর দেশ থেকে এই সব গরীব মেয়েরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে (—গঁকুরের ভাষায় 'জ্ঞান-ভাণ্ডারের জননী'—) ছুটে আসে। এদের প্রতি ফরাসীদের সহানুভূতি আছে। পোল মেয়েটি লক্ষ্য করল যে, ওর সহপাঠীরা

অনেকেই অধিকাংশ সময় পড়াশোনা নিয়ে মেতে থাকে, তারা ওকে সম্মানও করে, সাহায্য করতেও চায়, কখনও বা তরুণদের কেউ কেউ বেশী কিছু দিতে চায়। সুন্দরী তন্বী মেয়ে মারী:। ওর বন্ধু মাদ্‌মোয়াজেল দিদিন্‌স্কা স্বেচ্ছায় ওর দেহরক্ষীর ভার নিল। একদিন এই ভদ্রমহিলা মারীর গুণমুগ্ধ একদল তরুণকে ছাতা নিয়ে তাড়া করল।

ওর সম্বন্ধে তরুণদের অতি-উৎসাহ দমনের ভার মাদ্‌মোয়াজেল দিদিন্‌স্কার ওপর ছেড়ে দিয়ে এই অসামান্যা মেয়েটি সহজ স্বাভাবিক মানুষদের কাছাকাছি এল। কারণ এই লোকেরা ওর রূপের প্রশংসা করেন না, কাজের কথা বলেন। ফিজিক্সের পাঠ শেষ ক'রে ল্যাবরেটারির ঘণ্টার আগে প্রফেসর পল্‌ গিঁল্যভের সঙ্গে ও কথা বলে। শার্লমরেন কিংবা ড্যাঁপেরিন, যাঁরা ভবিষ্যতে ফরাসী বিজ্ঞানের শীর্ষস্থানীয় বলে গণ্য হয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে। এই বন্ধুত্বের মধ্যে ব্যবধান থাকে। নিবিড় সখ্যতা বা প্রেমের অবসর কোথায় ওর জীবনে? অঙ্ক আর ফিজিক্সকে যে ও মন প্রাণ দিয়ে বসে আছে!

ওর মাথা এত ভাল, বুদ্ধি এমন প্রখর যে শ্লাভ জাতের মধ্যে যে এলো-মেলো ভাব দেখা যায়, সেসব ওর মধ্যে দেখা যায় না এবং সেই কারণে ওর কোন প্রচেষ্টাই বিফল হয় না। বজ্রকঠিন ইচ্ছাশক্তি, কাজ সম্বন্ধে দারুণ খুঁত-খুঁতে মন আর অস্বাভাবিক জেদ—এই হলো ওর বৈশিষ্ট্য। নিজের পথে এমনি করেই ও দ্বিধাহীন চিত্তে এগিয়ে চলে: ফিজিক্সে ও মাস্টার ডিগ্রি নিল ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে এবং ১৮৯৪ সালে পেল অঙ্কে।

ও বুঝল ফরাসীভাষা শেখা একান্ত প্রয়োজন। পোলদেশের আর সব ছেলে-মেয়েদের মতো বছরের পর বছর টেনে টেনে ভুল ফরাসী না ব'লে ভাষাটাকে পুরোপুরি আয়ত্ব করাই স্থির করল। নির্ভুল বানানে বাক্যরচনা থেকে শুরু ক'রে সঠিক উচ্চারণ শিখে তবে নিশ্চিন্ত হলো। একটা উচ্চারণের ত্রুটি থেকে গেল: 'র'-এর বাহুল্য রয়ে গেল: এটুকু অবশ্য ওর চাপা মিষ্টি-মধুর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে দিব্যি মানিয়ে গেল।

মাসে চল্লিশ রুবলে ও যে শুধু বেঁচে রইল তা নয়, মাঝে মাঝে একটু বিলাসিতাও ক'রে নেয়। এক সন্ধ্যায় হয়তো থিয়েটার দেখল, কোনদিন বা শহরের বাইরে ঘুরে এল, সঙ্গে আনল বুনো ফুল যা কদিন ওর টেবিল আলো ক'রে রইল। ওর মধ্যের সেকালের ছোট্ট চাষী-মেয়েটির যেন মৃত্যু হয় নি, বিশাল নগরীর বুকে হারানো এই মেয়েটি আজও গাছে গাছে

পাস্তারের জন্মের দিন গোনে, হাতে একটু পয়সা আর অবসর জমলে সব ছেড়ে ছুড়ে হরিতশ্রী অরণ্যের মাঝে ছুটে যেতে চায়।

১৮৯৩-র ১৬ই এপ্রিল, বাবাকে মারী লিখল।

'গত রবিবার পারীর কাছে সেরেন্ডিন নামে সুন্দর এক জায়গায় ঘুরে এলাম। লাইল্যাক্, নানা জাতের ফল গাছ, এমনকি আপেল গাছগুলো পর্যন্ত ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে। বাতাস ফুলের সুবাসে ভারাক্রান্ত।

'পারী শহরে এপ্রিল মাস পড়তে না পড়তে গাছে সবুজের সমারোহ শুরু হয়। এখন গাছে গাছে পাতা, বাদাম গাছে ফুল। গ্রীষ্মকালে দিব্যি গরম পড়ে, চারদিক সবুজে ছেয়ে যায়। আমার ঘরটা এর মধ্যে ভেপসে উঠেছে। আমার ভাগ্য ভাল যে জুলাই মাসে, আমার পরীক্ষার সময়ে, এঘরে থাকতে হবে না, কারণ ৮ই জুলাই পর্যন্ত এ ঘরটা নেওয়া আছে।

'যতই পরীক্ষা ঘাড়ের ওপর এসে পড়ছে ততই মনে হচ্ছে কিছুই পড়া হয় নি। নেহাৎ অসম্ভব দেখলে নভেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, কিন্তু তাতে আমি রাজী নই, সারা গ্রীষ্মকালটাই তাহলে ব্যর্থ যাবে। দেখি শেষপর্যন্ত কি হয়।...'

জুলাই মাস। চরম উত্তেজনা, প্রচণ্ড তাড়া, প্রাণান্তকর অবস্থা। পরীক্ষার ঘরে ত্রিশজন ছাত্রের সঙ্গে বন্দী হয়ে মারী এত নার্ভাস হয়ে পড়ে যে, কয়েক মিনিট পর্যন্ত ছাপার অক্ষরগুলো ওর চোখের ওপর নাচতে থাকে।...

এরপরে দিনের পর দিন কাটে ফলাফল জানার পরম প্রতীক্ষায়।

একখানা অর্ধচন্দ্রাকার ঘরের ভেতর পরীক্ষার্থীর দল ও তাদের আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের ভিড় জমেছে, যোগ্যতানুসারে পর পর নাম পড়া হবে। ঠেলাঠেলির মধ্যে মারী কোন মতে নিজের ক্ষীণদেহ গলিয়ে দিয়ে অধীর আগ্রহে ঘোষকের জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে। হঠাৎ স্তব্ধ ঘরের মধ্যে ও শোনে প্রথমেই ওর নাম : 'মারী স্ক্লোদোভস্কা'।

মারীর উত্তেজনা কল্পনাও করা যায় না। বন্ধুবান্ধবের অভিনন্দন ও উল্লাস-ধ্বনি ছাড়িয়ে ও পালিয়ে এল।

এতদিনে ছুটির সময় হলো, এবার ও দেশে ফিরে যাবে। গরীব পোলবাসীদের দেশে ফেরার একটা প্রচলিত রীতি ছিল—মারী তার খুঁটিনাটি পালন করল। তার এক বন্ধু গ্রীষ্মকালেও ঘর ভাড়া দিতে প্রস্তুত জেনে মারী নিজের আসবাব বিছানা, স্টোভ, বাসনপত্র সব তার ঘরে রেখে এল।

বন্ধোয়ানের সঙ্গে আর দেখা হবে না, তাই তাকে ও বিদায় জানিয়ে এল। পথের জন্য কিছু খাবার কিনল। তারপর বাকী পয়সা হিসেব ক'রে এক মস্ত দোকানে ঢুকে ছোটখাট সৌখিন সস্তা গয়না, স্কার্ফ নেড়েচেড়ে দেখল। এক বছরের মধ্যে এই ওর প্রথম এ-জাতীয় কেনাকাটা।

ওদের দেশে পয়সা পকেটে বাড়ি ফেরা লজ্জার কথা। সুরুচি ও রীতি অনুযায়ী পরিবারের সকলের জন্য উপহার কিনে সব পয়সা খরচ ক'রে, কপর্দকহীন অবস্থায় গার দ্য নর্-এ ট্রেনে উঠে বসাই এদের নিয়ম। দু'হাজার কিলোমিটর দূরে রেলপথের আরেক প্রান্তে পড়ে আছেন বাবা, দাদা, বৌদি আর হেলা। আছে এক দরজীবুড়ি—যার হাতে সামান্য কিছু ফেলে দিলে দিব্যি সুন্দর সুতির জামা, পশমের বড় বড় পোশাক তৈরি হয়ে যায়। নভেম্বর মাসে আবার সরবনে ফিরে এসে মারী বুড়ির তৈরি পোশাক পরেই কাটাবে।

দেশে ফিরে তিনমাস ধরে সব আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি বাড়ি নেমন্তন্ন খেয়ে ওকে বেড়াতে হলো ; ওর ঐ শীর্ণ চেহারা দেখে তাঁরা ক্ষেপে যান।

এর পর যখন ও পারীতে আবার ফিরে এল, তখন ওর মেজাজ খুব খুশি, গায়ে কিছু মাংসও লেগেছে, বরং বলা যায় একটু মেদাধিক্যই হয়েছে। সামনে পড়ে আছে ছাত্র-জীবনের আরও একটা বছর—পড়াশোনা, পরীক্ষার খাটুনি, আবার রোগা হওয়া।

কিন্তু প্রতি বছর গ্রীষ্মের শেষাশেষি মারীর দুশ্চিন্তা কি ক'রে পারীতে ফেরা যায়। প্রতি মাসে চল্লিশ রুবল্-এর ধাক্কায় ওর পুঁজি যে শেষ হতে চলল! ওকে সাহায্য করার জন্য বাবাকে যে সুখ-সুবিধেগুলো ছাড়তে হয়, সে-কথা ভেবে ও লজ্জায় মরে যায়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে অবস্থা এমন সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াল যে পারীতে ফেরার আশা বুঝি ছাড়তে হয়। ঠিক এই সময়ে একটা ঘটনা ঘটল। সেই মাদ্‌মোয়াজেল দিদিন্‌স্কা, যে গত বছর ছাতা পেটানোর ভয় দেখিয়ে মারীকে তরুণদের অযাচিত বন্ধুত্বের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল, সে-ই এবার ওর সাহায্যে এগিয়ে এল। মারীর সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পড়ে আছে, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে এই বান্ধবী ওর জন্য 'আলেকজান্দ্রোভিচ জলপানির' জন্য সারা ওয়ার্‌স তোলপাড় ক'রে ফেলল। যেসব মেধাবী ছাত্র দেশের বাইরে গিয়ে বেশী পড়াশোনা করতে চায়, তাদের জন্য এই জলপানির ব্যবস্থা ছিল।

ছয়শ' রুবল্! পনের মাস পড়া চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট! মারী অন্যের

উপকার করতে লোকের কাছে হাত পাততে কসুর করে না, কিন্তু নিজের জন্যে একথা ও ভাবতেই পারে না। দিদিনুস্কার বন্ধুত্ব ও ভুলতে পারবে না। মুক্ত হৃদয়ে ও আবার ফ্রান্সের পথে পা বাড়াল।

পারীতে ফিরে এসে ১৮৯৩-র ১৫ই সেপ্টেম্বরে দাদাকে মারী লিখল :

'আমার সুবিধে মতো পরিচ্ছন্ন ভদ্রপাড়ায় ছ'তলায় একখানা ঘর পেয়েছি। আমি আগে যেখানে ঘর ভাড়া নেবার কথা ভেবেছিলাম, সেখানে বিনা পয়সায় কিছুই হয় না। এই ঘরটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। জানালাটা চেপে বন্ধ করলে ঠাণ্ডা লাগবার কথা নয়, বিশেষতঃ মেঝেটা টাইলের নয়, কাঠের। গত বছরের আস্তানার তুলনায় এটাকে যথার্থই একখানা ঘর বলা চলে। বছরে এর ভাড়া একশ' আশি ফ্রাঙ্ক। বাবা যে টাকার মধ্যে বলেছিলেন, তার চেয়ে ষাট ফ্রাঙ্ক কমেই হলো। বলা বাহুল্য পারীতে ফিরতে পেরে আমি খুব খুশি হয়েছি। বাবার কাছ থেকে চলে আসতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু আমি দেখলাম তিনি সুস্থই আছেন, আমাকে ছাড়াও তাঁর চলে যাবে, বিশেষতঃ তুমি যখন ওয়ারসয় আছো। আর আমার সামনে সারা জীবনের সমস্যা! কাজেই ভেবে দেখলাম, বিবেকের দংশন এড়িয়েই 'আমি এখানে এখন থাকতে পারব।

'ক্লাস আরম্ভ হলে বুঝতে কষ্ট না হয়, সেইজন্য আমি প্রাণপণ অঙ্ক কষছি। যে পরীক্ষা আমি সবে পাশ ক'রে বেরিয়েছি, আমার এক ফরাসী বন্ধু তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সপ্তাহে তিন দিন তাকে পড়াতে যাই। বাবাকে ব'লো এ কাজে আমার হাত বেশ পাকছে। প্রথম প্রথম যত কষ্ট হতো, এখন আর তা হয় না। তাই আমি এটা ছাড়তে চাই না। আজ আমার ছোট ঘরটা গোছাতে শুরু করেছি, যদিও সামান্যই গোছাতে হবে। আমায় নিজেই সব করতে হবে, কারণ জিনিসের যা দাম এখানে! আমার আসবাবপত্র গুছিয়ে ফেলব, অবশ্য সমস্ত আসবাব মিলিয়ে বোধ হয় কুড়ি ফ্রাঙ্কের বেশী দাম হবে না।

'আমি শিগগিরই যোসেফ বোগুস্কিকে তাঁর ল্যাবরেটারির খোঁজ নিতে চিঠি লিখব। আমার ভবিষ্যৎ কর্মসূচী তাঁর ওপর নির্ভর করছে।'

দাদাকে লেখা আর-একখানা চিঠি (১৮৯৪, ১৮ই মার্চ) :

'এত একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন আমার জীবন যে, সে-সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর দেওয়া অর্থহীন। কোথাও কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাই না। কেবল দুঃখ হয় এই ভেবে যে, দিনগুলো এত ছোট আর এত তাড়াতাড়ি এরা ছুটে চলে! কতটা

কাজ করা গেল, সেকথা মনে থাকে না, কি করা হলো না, শুধু সেটুকুই চোখে পড়ে। এর ওপর যদি অপছন্দ মতো কাজ হয়, তবে হতাশ অবশ্যম্ভাবী।

'আমার ইচ্ছে, তুমি তোমার ডাক্তারী পরীক্ষাটা পাশ করো। দেখা যাচ্ছে আমাদের কারুর জীবনই সহজ নয়। কিন্তু তাতে কি এসে যায়? আমাদের মধ্যে ধৈর্য, বিশেষতঃ, নিজেদের ওপর বিশ্বাস থাকা দরকার। আমাদের এই ধারণা বদ্ধমূল হওয়া দরকার যে, প্রত্যেকের ভেতর কোন না কোন দিকে প্রতিভা আছে আর যেমন করেই হোক তার ফল পেতেই হবে। সম্ভবতঃ যখন আমরা মোটেই কিছু আশা করছি না, সেই সময়ে হঠাৎ সব ঠিক হয়ে যবে।...'

'আলেকজান্দ্রোভিচ জলপানি' পাওয়া দৈবপ্রাপ্তিই বলা যেতে পারে। চূড়ান্ত কৃপণের মতো হিসেব ক'রে মারী সেই ছয়শ' রুবল্ একটি একটি বের ক'রে খরচ চালায় যাতে সরবন আর কেমিষ্ট্রির ল্যাবরেটারির স্বর্গে আরও বেশী দিন সে থাকতে পারে। পরবর্তীকালে "জাতীয় শিল্প সম্প্রসারক সমিতি"র পক্ষ থেকে হাতে কাজ শেখার ভার পেয়ে মারী তার প্রথম রোজগার থেকে জমিয়ে ছয়শ' রুবল্ একত্রিত ক'রে আলেকজান্দ্রোভিচ প্রতিষ্ঠানের বিমূঢ় কর্তৃপক্ষের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছিল। এই কমিটির ইতিহাসে জলপানির টাকা ফিরিয়ে দেওয়া এই প্রথম। মারী সেই জলপানিকে তার প্রতি বিশ্বাস ক'রে দেওয়া সম্মানের ঋণ বলেই ধরে নিয়েছিল। একমুহূর্তের জন্যও সে এই অর্থকে নিজের বলে গ্রহণ করতে পারে নি। এ অর্থ অন্য কোন গরীব ছাত্রীর জীবন-সমুদ্রে সাময়িক নোঙর হিসেবে কাজে লাগানোই বাঞ্ছনীয়।

পোলভাষায় লেখা এই সময়ের জীবনের ওপর রচিত মা'র একটি কবিতা পড়ে আর নিজের ছাত্রী-জীবনের একখানা ছবির দিকে চেয়ে হাসি-ঠাট্টার ছলে মা আমায় যে কথা বহুবার বলেছেন, তাতে আমার এই ধারণাই হয়েছে যে, এই সব উত্তেজনাময় কৃচ্ছ্রসাধনের দিনগুলি তাঁর জীবনে সবচেয়ে প্রিয় ছিল। মা'র ছাত্রী-জীবনের এই ছোট্ট ফটোতে চোখদুটি ভারি উজ্জ্বল, মুখের ভাবে সাহস ও দৃঢ়তা পরিস্ফুট। কবিতাটি হলো :

কঠোর কঠিন ছাত্রী-জীবনে হায়
মধু বসন্ত বিফলে বহিয়া যায়।
চৌদিকে সবে যৌবন মদে মত্ত
তরুণ হৃদয় মধুলোভী উন্মত্ত।

তবু এ নিবিড় নির্জন নিরালায়,
অজ্ঞাত বাসে শান্তিতে দিন যায়।
ছোট নীড়খানি প্রাণ-উত্তাপে ভরা
হৃদয় পূর্ণ; বিশাল বসুন্ধরা।
কালের প্রবাহে সুখ-নিশি হলো ভোর
বিজ্ঞান হতে ছিঁড়িয়া বাঁধন ডোর
বাহিরি আসিল অন্ন অন্বেষণে
জীবনের এই ধূসর রণাঙ্গনে।
বার বার তবু ক্লান্ত হৃদয় নীড়ে,
খুঁজে ফেরে সেই বিগত জীবনটিরে
যেথায় নিভৃতে অনাবিল অনুরাগে
সঙ্গীবিহীন কঠিন কর্ম-যাগে,
অতীতের কত হারা সুরে বাঁশী বাজে।

ভবিষ্যতে মারী সম্পূর্ণ অন্য ধরনের আনন্দের স্বাদ পেয়েছিল বৈকি! কিন্তু পরম অনুরাগের মুহূর্তে, এমনকি যশের উচ্চশিখরে পৌঁছেও সে ততখানি তৃপ্তি পায় নি, যা তার দারিদ্র্যজীর্ণ কুটিরে নিঃসঙ্গ প্রচেষ্টার দিনগুলি ভরিয়ে তুলেছিল। দারিদ্র্যের অভিমান, বিদেশে স্বাধীনভাবে একা একা বাঁচার অহঙ্কার তার ছিল।

জীর্ণ ঘরে বাতির নীচে কাজ করতে করতে তার মনে গুনগুনিয়ে উঠতো, হয়তো কোন অপূর্ব রহস্য জালে পরম শ্রদ্ধাস্পদ গুণীজ্ঞানীদের কাজের সঙ্গে সে জড়িত হয়ে পড়বে।

মারীর জীবনে এই চারটি বছর সুখের না হলেও সবচেয়ে সার্থক বলে মনে হয়। কারণ যে-আদর্শ, মানব-জীবনের যে গিরিশিখরে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, তার পাদদেশে সে পৌঁছতে পেরেছে।

ছাত্রীজীবনে একা-একা পড়াশোনায় যখন ডুবে থাকতো, তখনকার আর্থিক অসচ্ছলতা তো অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু জীবনের এই সময়েই মানুষ পরিপূর্ণ-ভাবে বাঁচে। ছাব্বিশ বছরের এই মেয়ে জানে কি ক'রে দারুণ অভাবে পার্থিব দুঃখকষ্টকে হেয় জ্ঞান ক'রে, নিঃস্ব, রিক্ত জীবনকে সার্থক ক'রে তোলা যায়। পরবর্তী জীবনে ভালোবাসা, মাতৃত্ব, স্ত্রী ও জননীর যাবতীয় দুর্ভাবনা, প্রাণান্তকর পরিশ্রম—সব মিলে এই কল্পনাময়ীকে বাস্তবে টেনে এনেছিল। কিন্তু ছাত্রীজীবনের এই মুহূর্তে, তার জীবনের সবচেয়ে দারিদ্র্যের মধ্যেও, মারী

যেন একেবারে শিশুর মতো বেপরোয়া! সে অন্য জগতে অনায়াসে ভেসে চলে যায়, তার কল্পনাপ্রবণ মন এই বিজ্ঞানের জগৎকে একমাত্র শুদ্ধ, একমাত্র ধ্রুব বলে জানে!

এই জীবন-অভিযানের প্রত্যেকটি দিন তো আর সমান যেতে পারে না। মাঝে মাঝে এক-একটি ঘটনা ঘটে যায় যার ফলে সব গোলমাল হয়ে যায়। মাঝে মাঝে ক্লান্তি, কখনও বা সামান্য অসুস্থতা, আবার কখনও হয়তো বিশ্রী সব কাণ্ড ঘটে যায়। একজোড়া মাত্র সুকতলা-ক্ষয়ে যাওয়া জুতো হঠাৎ একসময়ে পা থেকে খসে পড়ে যায়। তখন জুতো না কিনে উপায় থাকে না। এর ফলে পরবর্তী কয়েক সপ্তাহের খরচের হিসেব একেবারে উল্টে ফেলতে হয়। যেমন করেই হোক্ এই খরচ পুষিয়ে নিতে হবে, কাজেই, হয় খাবারে, নয় বাতির তেলের ওপর দিয়ে একে পূরণ করতে হয়।

কোন কোন বছর শীত যাই-যাই করেও যেতে চায় না। ছ'তলার চিলে-কুঠরি হিমেল হাওয়ায় যেন জমে থাকে। এত ঠাণ্ডায় মারীর ঘুম আসে না, ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপে, দাঁতে দাঁত লেগে যায়। পোল দেশের মেয়ে পারীর শীতকে ভয় পাবে? আলো জ্বেলে মারী ঘরের মধ্যে আর-একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। মোটা ট্রাঙ্ক খুলে তার সমস্ত পোশাক বের ক'রে যতটা সম্ভব গায়ে পরে নেয়, বাকী জামা-কাপড়, বিছানার চাদর ইত্যাদি একটিমাত্র লেপের ওপর চাপিয়ে তার ভেতর ঢুকে পড়ে। কিন্তু এতেও শীত বাগ মানে না। বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে চেয়ারখানা টেনে স্তূপীকৃত জামা কাপড়ের ওপর চাপিয়ে ওজনের সঙ্গে উত্তাপ জড়িয়ে নিজের মনকে প্রবোধ দেয়, একটুও না নড়ে ঘুমের প্রতীক্ষা করে। ইতিমধ্যে জলের পাত্রে বরফ জমে ওঠে।

১০

জীবনের খাতার পাতা থেকে প্রেম ও বিবাহের পৃষ্ঠাগুলো মারী বাদ দিয়েছিল।

অবশ্য সেটা কোন নতুন কথা নয়। বেচারী প্রথম-প্রেমে ব্যর্থ হবার পর দ্বিতীয়বার প্রেমে পড়বে না ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছিল। তাছাড়া জ্ঞানমার্গের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী মেয়েটি জীবনের আদর্শ পালন করবে ব'লে, মেয়ে-জীবনের পরাধীনতা, সুখ দুঃখ বিসর্জন দেবার সঙ্কল্প করেছে। যুগ যুগ ধরে যেসব মেয়ে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী কিংবা সঙ্গীতজ্ঞ হতে চেয়েছে, তারা সাধারণ প্রেম বা মাতৃত্বকে ঘৃণা ক'রে এসেছে। এদের মধ্যে যাদের স্বপ্ন সফল হয় নি, তারাই অগত্যা সংসার করতে রাজী হয়েছে; কিংবা তারা জীবন থেকে তাদের মানবিক প্রবণতাগুলো বিসর্জন দিয়েই আদর্শ সম্পূর্ণ করতে চেয়েছে।

বিজ্ঞান সাধনা সে করবে জীবন ভোর। পরিবারের প্রতি ভালোবাসা, পরাধীন অত্যাচারিত স্বদেশের প্রতি দরদ,—সব তাকে তীব্রভাবে নাড়া দেয়। এ পৃথিবীর এই তো চেহারা, কিন্তু তার জীবনকে সীমিত রাখতে হবে ঐ দরদ-বোধের পর্যায়ের মধ্যেই। এর বাইরে কিছুরই কোন অস্তিত্ব, কোন মূল্য দেবার জন্য তো সে যেতে পারছে না। ছাব্বিশ বছরের নিঃসঙ্গ সুন্দরী, সরবনের ল্যাবরেটারিতে কত তরুণ ছেলেদের সঙ্গে নিত্য যার দেখা, সে নিজেকে বিজ্ঞান সাধনার সীমার মধ্যে বেধে ফেলার জন্য ডিক্রি জারি ক'রে বসে রইল।

মারী নিজের স্বপ্নে নিজে বিভোর হয়ে আছে। অভাবের তাড়নায় আর অতিরিক্ত পরিশ্রমের ক্লান্তিতে বিপর্যস্ত হয় সে। অহঙ্কার, ভয় আর অবিশ্বাস —সে যেন রক্ষাকবচ করেছে। যেদিন 'ক' পরিবার তাকে পুত্রবধূ পদ প্রত্যাখ্যান করে, সেদিন থেকে তার মনে অস্পষ্ট এই ধারণা জন্মেছে যে গরীব মেয়েরা পুরুষ মানুষের স্নেহ-ভালোবাসা পেতে পারে না। সে প্রাণপণ শক্তিতে নিজের স্বাধীনতাকে আঁকড়ে পড়ে থাকে। কিন্তু এই সময়ে এক অসাধারণ মেধাবী ফরাসী বৈজ্ঞানিক এই পোলবাসিনীর জন্যেই যেন নিজের অজান্তে প্রতীক্ষা ক'রে ছিলেন। মারী যখন একেবারে ছেলেমানুষ, নোভোলিপকি

স্ট্রীটের বাসায় থেকে সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার স্বপ্ন দেখছিল, সেই সময়ে সরবনে পিয়ের-কুরী আবিষ্কারক হিসেবে পরিচিত। সে-সময়ে একদিন বাড়ি ফিরে ভদ্রলোক তাঁর দিনপঞ্জীর পাতায় লিখেছিলেন :

…'শুধু বাঁচার জন্যে বাঁচার সাধ ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অনেক বেশী : পৃথিবীতে প্রতিভাসম্পন্না স্ত্রীলোক বিরল। কাজেই, যখন রহস্যময় প্রেমে আবদ্ধ হয়ে আমরা অস্বাভাবিক পথে পরিচালিত হই, যখন আমরা কোন কাজে লিপ্ত হয়ে আশেপাশের মানুষকে দেখতে পাই না, তখনই আমাদের স্ত্রী-জাতির সঙ্গে বিরোধ বাধে। ছেলেদের পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেলেও মা চান সন্তানের ভালোবাসা। প্রেমিকা চায় প্রণয়ীকে সম্পূর্ণ আয়ত্বে রাখতে—আর প্রেমিকের সঙ্গলাভের বিনিময়ে জগতের দুর্লভতম প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটাতে সে দ্বিধা করে না। বিসম এই দ্বন্দ্বে নারীর স্থান কল্যাণের দিকে : জীবনের নামে, সৃষ্টির নামে তারা আমাদের টেনে রাখতে চায়।'

বছরের পর বছর পার হয়ে গেছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উৎসর্গপ্রাণ পিয়ের কুরী বিয়ে করেন নি। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স তাঁর। কাউকেই তিনি ভালোবাসেন নি।

১৮৯৪ সালে তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মারী এই ভাবে বর্ণনা দিয়েছেন :

'আমি যখন ভেতরে এলাম, পিয়ের কুরী তখন খোলা-বারান্দার মুখে দরজার লাগোয়া একটা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখন তাঁর পঁয়ত্রিশ বছর বয়স, তবু আমার চোখে তাঁকে অনেক ছোট বলেই মনে হলো। দীর্ঘ দেহ সুপুরুষ। চোখে উজ্জ্বল দৃষ্টি, কোন্ সুদূরে সে-দৃষ্টি যেন ভেসে চলেছে …আমি বিস্মিত হলাম। তাঁর ধীরে ধীরে চিন্তা ক'রে কথা বলা, তাঁর সরলতা, একাধারে গম্ভীর ও ছেলেমানুষি মৃদু হাসি আমার মনে ভরসা জাগাল। খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলবার পর আমরা বন্ধুত্বের পর্যায়ে পৌঁছলাম ; বিজ্ঞানের কয়েকটি প্রশ্ন সম্বন্ধে আমি তাঁর মতামত জানতে চাইলাম।…'

'ফ্রীবুর্গ ইউনিভারসিটি'র মঁসিয়ে কোভাল্স্কি পোল্যাণ্ডের মানুষ। ফিজিক্সের প্রফেসর এই ভদ্রলোক তাঁর নব পরিণীতা স্ত্রীসহ পারীতে এসেছেন মধুচন্দ্রিমা আর বৈজ্ঞানিক অভিযান, দুই-ই একসঙ্গে সারতে। পারীতে তিনি কয়েকটি বক্তৃতা দিলেন আর নিজে 'ফিজিক্স সোসাইটি'র অধিবেশনগুলোতে যোগ দিলেন। এদেশে এসে তিনি মারীর খোঁজ নিলেন—মেয়েটি

কেমন আছে? মারী তাঁর কাছে নিজের অসুবিধাগুলো বলল: স্বদেশের "শিল্প সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠান" তাকে বিভিন্ন স্তরের ইস্পাতের চুম্বক শক্তিসম্পন্ন পদার্থগুলির ওপর গবেষণা ক'রে ফলাফল নির্ণয়ের জন্য গবেষণা করতে অনুরোধ করেছে। মারী প্রথমে প্রফেসর লিপমানের ল্যাবরেটারিতেই কাজ শুরু করেছিল, কিন্তু বিভিন্ন খনিজ পদার্থ আর বিভিন্ন গোষ্ঠীর ধাতুর নমুনা বিশ্লেষণের জন্য মস্ত বড় এক যন্ত্রের দরকার—আর ল্যাবরেটারির এই ঠাসাঠাসির মধ্যে ঐ বিরাট যন্ত্রটির স্থান হওয়া অসম্ভব। এ অবস্থায় মারী কি করবে? কোথায় গিয়ে সে তার গবেষণা চালাবে?

কয়েক মিনিট চিন্তা ক'রে যোসেফ কোভাল্‌স্কি বললেন: 'দাঁড়াও, আমি একটা উপায় ভেবেছি। এক অসাধারণ কীর্তিমান বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। এই ভদ্রলোক রু-লমোঁতে এক ফিজিক্স ও কেমিষ্ট্রির ইস্কুলে কাজ করেন। বোধহয় তাঁর কাছে খোঁজ করলে একখানা ঘর পাওয়া যেতে পারে। যাই হোক, তিনি তোমায় অন্তত এ বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারবেন। কাল সন্ধ্যাবেলা আমাদের ওখানে এস, সেখানেই চা খাবে। আমি সেই ভদ্রলোককেও নিমন্ত্রণ করব। বোধ হয় তুমি তাঁর নাম শুনে থাকবে—পিয়ের কুরী।'

এক বোর্ডিং-হাউসে তরুণ দম্পতির ঘরে সেই শান্ত সন্ধ্যায় ফরাসী পদার্থবিদ ও পোল ছাত্রীটির মধ্যে সহজেই সহানুভূতি সঞ্চারিত হলো। গাম্ভীর্য ও সহজাত মাধুর্য এই বৈজ্ঞানিকের চরিত্রে এক স্বাভাবিক আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল।

দীর্ঘকায় পুরুষ; সেকেলে ছাঁটের পর্যাপ্ত কাপড়ে তৈরি পোশাক তাঁর দীর্ঘ অঙ্গে কেমন যেন ঢিলেঢালা মনে হয়; কিন্তু তাঁকে এই বেশেই বেশ মানিয়েছে। দীর্ঘ অনুভূতিপ্রবণ দু'খানি হাত। সুগঠিত ভাবলেশহীন ঈষৎ লম্বাটে মুখখানা শ্মশ্রুশোভিত, শান্ত দুটি চোখে গভীর ও বাস্তব জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন এক অতুলনীয় দৃষ্টি।

অত্যন্ত চাপা প্রকৃতির যেন মানুষটি, উচ্চ গ্রামে কথা বলতে জানেন না, তবু তাঁর অনন্যসাধারণ বুদ্ধি ও স্বাতন্ত্র্য বাইরের লোকের চোখে চাপা থাকে না। যে সভ্যতায় মানুষের প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক মূল্যের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া মুশকিল, সেখানে পিয়ের কুরী যেন মানবতাবোধের এক অতি সুন্দর নিদর্শন। দৃঢ়তা ও বিনয়ের সংমিশ্রণে তাঁর চরিত্র অপরূপ বললে অত্যুক্তি হয় না।

এই স্বল্পভাষিণীর প্রতি প্রথম দর্শনে যে-আকর্ষণ তিনি অনুভব করেন তার প্রতি তাঁর কৌতূহল ক্রমেই বাড়তে থাকে। মাদ্‌মোয়াজেল শ্‌ক্লোদোভ্‌স্কা এক আশ্চর্য মেয়ে বলেই তাঁর মনে হয়েছে।…সুদূর ওয়ার্‌স থেকে সরবনে এসে গত বছর ফিজিক্সের প্রথম পরীক্ষা সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়ে, আগামী মাসের মধ্যে গণিত পরীক্ষা দেবার জন্য সে প্রস্তুত হচ্ছে।…তার ধূসর দুটি চোখের মাঝে চিন্তার যে ক্ষীণ রেখাটুকু ফুটে উঠেছে সেটা কি চুম্বকশক্তি পরীক্ষার যন্ত্রটির স্থান সংকুলানের সমস্যার জন্যেই হয়েছে?

প্রথম দিকের সাধারণ কথাবার্তা অল্প সময়ের মধ্যেই বৈজ্ঞানিক আলোচনায় মোড় নিল। সসঙ্কোচে এবং সসম্মানে মারী প্রশ্ন করছে আর পিয়ের-এর মন্তব্য শুনছে। আর পদার্থবিদ তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার আভাস দিলেন, স্ফটিকের গঠনতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করলেন। পদার্থের এই দিকে তাঁর আগ্রহের অন্ত নেই, এ সময়ে তিনি এই বিষয়টি নিয়েই গবেষণা করছেন। পদার্থবিদ নিজেই অবাক হচ্ছেন এই ভেবে যে এক সুন্দরী তরুণীকে তাঁর নিজের প্রিয় বিষয়বস্তুর উপর ব্যাপক আলোচনা, পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার, জটিল সমস্যার অবতারণা ক'রে এত কেন বোঝাচ্ছেন! এবং এ আলোচনা গড়িয়ে চলল আরও দু-একটি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনায়। কী মধুরই না এই অভিজ্ঞতা!

তিনি মারীর মাথার চুলের রাশ, প্রশস্ত কপাল ও ল্যাবরেটারির এসিড আর ঘরের কাজে রুক্ষ হয়ে আসা হাত দু'খানি লক্ষ্য করলেন। সম্পূর্ণ আয়াস-বর্জিত মেয়েটির রূপমাধুরী তাঁকে মুগ্ধ করল। বৈজ্ঞানিককে নিমন্ত্রণ করার সময়ে কোভাল্‌স্কি এ মেয়েটির যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, পিয়ের সে-কথাগুলি মনে মনে নাড়াচাড়া ক'রে দেখলেন: পারীতে আসার জন্য বহুকাল এ মেয়েটি দেশে চাকরি করেছে, এখানে অর্থাভাবে এক বাড়ির চিলেকোঠায় ঠাঁই নিয়েছে…

নিজের অজান্তে তিনি প্রশ্ন করলেন: 'আপনি কি বরাবর ফ্রান্সে থাকবেন?'

মারীর মুখের ওপর দিয়ে কিসের যেন ছায়া পড়ে, মধুর কণ্ঠে সে জবাব দেয়:

'না, যদি মাষ্টার ডিগ্রিটা পেয়ে যাই তবে আগামী গ্রীষ্মকালেই ওয়ার্‌সয় ফিরে যাব, আবার শরতে ফিরে আসার ইচ্ছে আছে, কিন্তু সম্ভব হবে কিনা জানি না। পরে পোল্যাণ্ডে গিয়ে মাষ্টারি করব, দেশের কাজে লাগব। দেশ ত্যাগ করা তো চলবে না!'

এরপর কোভাল্‌স্কি-দম্পতি জার-অত্যাচারিত স্বদেশের বেদনাময়

আলোচনার অবতারণা করলেন। তিনটি প্রবাসী পোল আপন দেশের স্মৃতি-সাগর মন্থন করে; আত্মীয়-বন্ধুদেরর খবরাখবর নেয়। বিস্মিত ও কিছুটা অসন্তুষ্ট মনে পিয়ের কুরী বসে বসে মারীর দেশপ্রেম ও সামাজিক কর্তব্যের কথা শুনলেন।

যাঁর ধ্যান-জ্ঞান শুধু বিজ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেই পদার্থবিদ কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলেন না, কি ক'রে এই আশ্চর্য প্রতিভাসম্পন্না মেয়েটি বিজ্ঞান-জগতের বাইরে আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে! কেন এই মেয়েটি তার অসীম ক্ষমতা জারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অপচয় করবে? তিনি আবার তার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন।

পদার্থবিদ পিয়ের কুরী কিন্তু নিজের দেশ ফ্রান্সে তখনও প্রায় অপরিচিত অথচ বিদেশে বৈজ্ঞানিক মহলে পরিচিত এবং সম্মানিত।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে পারীর রু-কুভিয়ে গলির এক বাড়িতে তাঁর জন্ম হয়। পিতা ডাঃ ইউজিন কুরী ছিলেন চিকিৎসক। পিয়ের তাঁর দ্বিতীয় পুত্র। আল্‌সাশিয়ান গোষ্ঠীভূত, প্রটেস্টাণ্ট ধর্মাবলম্বী এই কুরীপরিবার এককালে মধ্যবিত্ত জমিদার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। ক্রমে এঁরা বুদ্ধিজীবী ও বৈজ্ঞানিক হন। জীবাণু নিয়ে গবেষণা করার দিকে ডাঃ ইউজিনের ঝোঁক ছিল। কিছুকাল তিনি পারীর প্রকৃতি-বিজ্ঞানের মিউজিয়ামে যে গবেষণাগার আছে তাতে কাজ করেন এবং যক্ষ্মা রোগের ওপর তথ্যমূলক প্রবন্ধ লেখেন।

ছেলেবেলা থেকেই তাঁর দুই ছেলে জ্যাক ও পিয়ের-এর ঝোঁক বিজ্ঞানের দিকে। পিয়ের-এর স্বাধীন কল্পনাপ্রবণ মন কোনরকম ধারাবাহিক নিয়মের মধ্যে বাঁধা পড়ে থাকতে চাইত না, ফলে ইস্কুলে পাঠ গ্রহণ তাঁর হয়ে ওঠে নি। ডাঃ ইউজিন বুঝেছিলেন যে তাঁর এই কল্পনাপ্রবণ পুত্রটি কখনও ভাল ছাত্র হিসেবে উতরবে না, তাই নিজেই তিনি একে পড়াতে আরম্ভ করলেন। পরে মঁসিয়ে বজিলে নামক এক কৃতী শিক্ষকের হাতে ছেড়ে দিলেন। স্বাধীন শিক্ষার ফল ফলল। মাত্র ষোল বছর বয়সে পিয়ের কুরী বি.এসসি এবং মাত্র আঠারো বছর বয়সে ফিজিক্সে 'মাষ্টার' ডিগ্রি পেলেন। উনিশ বছর বয়সে 'ফ্যাকাল্‌টি-অব সায়েন্স'-এর প্রফেসর দেসেঁর ল্যাবরেটারির সহকারী হয়ে পাঁচ বছর এখানে কাজ করেন। তাঁর দাদা জ্যাকও ডিগ্রি পেয়ে সরবনের ল্যাবরেটারিতে কাজ করতে আসেন—তার সঙ্গে তিনি গবেষণার কাজেও যোগ দেন। দুই তরুণ বৈজ্ঞানিক "পিজোইলেক্‌ট্রিসিটি"-র বিশেষ গুণাবলী আবিষ্কার করেন আর

এই গবেষণাকালে একটি অতি প্রয়োজনীয় নতুন যন্ত্র "পিজোইলেক্‌ট্রিক্‌ কোয়ার্টস্‌" আবিষ্কার করেন, যা দিয়ে অতি সামান্ত পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তিও সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায়।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও দুই ভাইকে বিচ্ছিন্ন হতে হলো। জ্যাক কুরী 'মোঁপ্যেলিয়ের প্রফেসর' নির্বাচিত হলেন। আর পিয়ের যোগ দিলেন পারী নগরীর ফিজিক্স ও কেমিষ্ট্রি শিক্ষাকেন্দ্রের প্রধান গবেষণাগারিক হয়ে। ছাত্রশিক্ষায় অনেক সময় অতিবাহিত করেও তিনি 'ক্রিস্টালাইন ফিজিক্স'-এর উপর তাঁর তত্ত্বমূলক কাজ বন্ধ করলেন না। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি প্রতিসাম্য বা সিমেট্রির যে মূলসূত্র উদ্ভাবন করেন, তা আধুনিক বিজ্ঞানের মূল ভিত্তির একটি।

এই গবেষণার সূত্র ধরেই পিয়ের কুরী একটি অতি-সুবেদী (আলট্রা-সেন্সিটিভ) তুলাদণ্ড তৈরি করেন—যা "কুরী-স্কেল" নামে পরিচিত। এরপর চুম্বকশক্তির উপর গবেষণা ক'রে নিয়মের এক মূল সূত্র বার করেন যার নামকরণ হয়েছে "কুরীর নিয়ম"।

এই জাতীয় সার্থক প্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ এবং ত্রিশটি ছাত্রের প্রতি যে অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে তিনি কাজ ক'রে যাচ্ছেন তার স্বীকৃতি দিলেন ফরাসী সরকার ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে পিয়ের কুরীর জন্য মাসিক তিন শ' ফ্র্যাঙ্ক পারিশ্রমিক নির্ধারিত ক'রে। যে-কোন কারখানার দক্ষ কারিগরের মাইনের সমান হলো এই টাকা!

কিন্তু বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন পারীতে এসে ফিজিক্স সোসাইটিতে কেবলমাত্র পিয়ের কুরীর বক্তৃতা শুনেই তৃপ্ত হলেন না, বয়স ও পদমর্যাদায় অনেক বড় বৈজ্ঞানিক হওয়া সত্ত্বেও এই তরুণ পদার্থবিদকে চিঠিতে নিজের গবেষণার বিষয় জানিয়ে একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে পিয়ের কুরীকে লর্ড কেলভিন লিখলেন:

'প্রিয় মঁসিয়ে কুরী, আপনার ও আপনার ভ্রাতার আবিষ্কৃত অপূর্ব 'পিজো-ইলেক্‌ট্রিক কোয়ার্টস্‌'-এর ব্যবস্থা করার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। এক্ষেত্রে আপনি আমার অগ্রগামী এই সংবাদ আমি ফিলজফিকাল ম্যাগাজিনে প্রকাশ করতে বলেছি। অক্টোবরের সংখ্যায় যদি না বেরোয় তো নভেম্বরের সংখ্যায় এ সংবাদ অতি অবশ্যই প্রকাশিত হবে।...'

৩রা অক্টোবর তিনি আবার লেখেন:

'প্রিয় মঁসিয়ে কুরী, আমি আগামীকাল প্যারীতে পৌঁছব ; এই সপ্তাহের মধ্যে আপনার সুবিধেমত কোন সময়ে আপনার ল্যাবরেটারিতে দেখা করতে চাই। অনুগ্রহ ক'রে সময়টা জানালে বাধিত হবো।'

এই যোগাযোগের পর, তুই বৈজ্ঞানিক ঘন্টার পর ঘন্টা বিজ্ঞান আলোচনায় ডুবে থাকতেন। প্যারীতে প্রায়-অপরিচিত পিয়ের কুরীর মতো প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিককে যৎসামান্য বেতনে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পরিশ্রম করতে হয় দেখে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিনের বিস্ময়ের সীমা রইল না। তিনি পিয়ের কুরীকে বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত বলেই মনে করতেন।

শুধু যে পদার্থবিদ্যায় পিয়ের কুরীর অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল, তাই নয়। তাঁর সম্মানবোধও ছিল অত্যন্ত প্রখর। একবার একটি উচ্চতর পদের জন্য দরখাস্ত করতে বলায় তিনি উত্তর দেন :

'শুনলাম একজন অধ্যাপক পদত্যাগ করবেন, আর আমাকে তাঁর পদের জন্যে দরখাস্ত করতে বলা হয়েছে। প্রথমতঃ, কোন একটি পদের জন্যে উমেদারি করা যথেষ্ট আপত্তিজনক বলে আমি করি, তাছাড়া এ জাতীয় ব্যাপারে আমি আদৌ অভ্যস্ত নই। আমার কাছে এ ভাবে পদপ্রার্থী হওয়া অতীব হীন বলে মনে হয়। আপনাকে এ বিষয়ে অবহিত করতে হলো বলে আমি আন্তরিক দুঃখিত। আমার ধারণা নিজেকে এই জাতীয় কাজে এই ভাবে নিয়োগ করলে মনের স্বাস্থ্যহানি ঘটে সাংঘাতিকভাবে।'

'স্কুল অব ফিজিক্স'-এর অধ্যক্ষ তাঁকে 'লোপাল্ম্ আকাদামিক' উপাধি দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। সেই সংবাদ শুনে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন :

'মাননীয় সভাপতি মহাশয়,—

'জানতে পারলাম যে, আপনি আবার মঁসিয়ে মুজেতের কাছে সম্মানপত্রের জন্য আমার নাম উত্থাপন করেছেন। আমার একান্ত অনুরোধ আপনি এ কাজ থেকে নিরস্ত হোন। আমার জন্যে আপনি এই বিশেষ সম্মান অর্জন করলে, বাধ্য হয়েই আমায় তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে, কারণ, আমি এ ধরনের কোন বৈশিষ্ট্যে বিভূষিত হবো না বলেই মনস্থির করেছি। আশা করি আপনি আমায় এ অবস্থা থেকে অব্যাহতি দেবেন, যা প্রকাশ্যে হলে হয়তো বহু লোকের চোখে বিসদৃশ ঠেকবে।

'আমার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করাই যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, সে-উদ্দেশ্য ভালভাবেই সফল হয়েছে। আমাকে নির্বিঘ্নে কাজ করবার অবকাশ দিয়ে আপনি যে উপকার করেছেন, তার জন্য আমি সত্যিই কৃতার্থ।'

তিনি ছিলেন লেখক, হয়তো সুলেখকও হতে পারতেন। তাঁর শিক্ষা হয়েছে বিচিত্র পথে এবং তাঁর লেখাও সুখপাঠ্য, জোরালো এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

'কল্পনাবিলাসী মনের কবাট সশব্দে বন্ধ করো।'*

'বায়ুপ্রবাহের বিভিন্ন গতির ক্ষীণতম সংঘাতে, এমন কি নিঃশ্বাস প্রবাহেও, আমার এই দুর্বল মন যাহাতে বেপথুমতী না হয়, সেই কারণে—হয় আমার পারিপার্শ্বিক জগৎকে নিশ্চল হইতে হইবে, নতুবা লাটিমের ন্যায় আপন গতিতে আপনি মগ্ন হইয়া প্রচণ্ড শক্তিতে বিঘূর্ণিত হইতে হইবে।

'যখনই আমি সামান্য "কিছু-না" হইতে একটি কথা, একটি কাহিনী, একটি সংবাদ অথবা কাহারও আগমনকে কেন্দ্র করিয়া আপনার মনে আপনি মন্থর গতিতে ঘুরিতে থাকি, তখনই আমার গতি রুদ্ধ হয়, আমার মধ্যের লাটিম অথবা গাইরোস্কোপের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। যে ব্রাহ্ম মুহূর্তে জগৎ-সংসারের অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করিয়া আপনার মধ্যে আপনি বিকশিত হইবার শক্তি অর্জন করিব মনে করি, তাহা বিলম্বিত হইয়া যায়, অমূল্য সময় পার হইয়া যায়।

'আহার, নিদ্রা, আলস্য, প্রণয়—এমনি সব জীবনের যাবতীয় মধুর কর্তব্য-গুলি সমাধা করিতে আমরা বাধ্য, কিন্তু তাহাতেই মাত্র নিমজ্জিত হইয়া, অস্বাভাবিক চিন্তাধারা অক্ষুন্ন রাখিয়া, কল্পনার দুরতিক্রম্য পথ পার হইয়া আসিলেই তো চলিবে না। জীবনকে স্বপ্নে ও স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করা যে অবশ্য কর্তব্য।...'

সর্ব শেষে, তাঁর মধ্যে ছিল প্রকৃত কবি ও শিল্পী-মনের অনুভূতি ও কল্পনা-প্রবণতার সঙ্গে জড়িয়ে এক হতাশা ও বেদনাবোধ।

'ভবিষ্যতে আমি কি হইব ?' (১৮৮১-তে তাঁর দিনপঞ্জীতে দেখি তিনি লিখেছেন :) 'কচিৎ কদাচিৎ আমি সম্পূর্ণ আমাতে বর্তমান থাকি। স্বভাবতঃ আমার একাংশ নিদ্রিত থাকে। প্রতিদিন আমার মানসিক অবস্থা অধিকতর বিপর্যস্ত হইয়া আসিতেছে। পূর্বে আমি বিজ্ঞান বা ভিন্নতর কার্যকলাপের মধ্যে অনায়াসে আত্মনিয়োগ করিতাম, বর্তমানে এই সকল বিষয়ে যৎসামান্য মনোযোগ দেই মাত্র, ইহাদের মধ্যে আমার আত্মবিলুপ্তি ঘটে না। অথচ আমার করণীয় কতই না বিষয় রহিয়াছে। ইহা হইতে কি এইরূপ সিদ্ধান্তেই

* ভিক্‌তর য়্যুগো : Le Rois' amuse

উপনীত হইব যে, মানসিক দুর্বলতা আমার দেহের সীমা ছাড়াইয়া যায়! অক্ষম মনকে কি কেবলমাত্র চিন্তাশক্তির দ্বারা পরিচালিত করা সম্ভব নহে? অতঃপর ইহার মূল্য কতটুকু! দম্ভ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা কোনটাই কি আমার ভিতরে গতি সঞ্চার করিতে পারে না? অথবা এই একই ভাবে জীবনের গতি স্থগিত হইয়া থাকিবে? আপনাকে এই গহ্বর হইতে উদ্ধার করিতে পারিলে মনে মনে কতই না নিশ্চিন্ত হই! কল্পনার মোহে মুগ্ধ মন আমার তাহাতে ভর করিয়া ভাসিয়া যায়। তথাপি-ভয় হয়, এই কল্পনাশক্তিটুকু পর্যন্ত না হারাইয়া বসি!...'

মারী শ্ক্লোদোভ্স্কা পিয়ের-এর কবি-মন সহজেই জয় করলেন; বৈজ্ঞানিক কুরী এই তরুণীর অনন্যসাধারণ প্রতিভায় মুগ্ধ হলেন। মুগ্ধ পিয়ের চাইলেন তরুণীর সঙ্গে বন্ধুত্ব গাঢ় ক'রে গড়ে তুলতে। সে সময়ে মারী ফিজিক্স সোসাইটির অধিবেশনগুলিতে নতুন নতুন গবেষণার ওপর বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের মতামত ও সমালোচনা শুনতে যায়। পিয়ের-এর সঙ্গে বার দুই-তিন তার দেখা হয়েছে। পিয়ের তাঁর নতুন বই On Symmetry in Physical Phenomena: Symmetry of an Electric Field and of a Magnetic Field-এর এক কপি তাকে বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ পাঠিয়ে দিলেন। বইটির প্রথম পৃষ্ঠায় আঁকা-বাঁকা হাতের লেখায় লিখে দিলেন: "মাদমোয়াজেল শ্ক্লোদোভ্স্কাকে—লেখকের শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতাসহ নিবেদন," ...লিপমানের ল্যাবরেটারিতে মস্ত জামা গায়ে নিঃশব্দে যন্ত্রপাতির ওপর ঝুঁকে-পড়া মারীর চেহারা তিনি যেন দেখতে পান।

এরপর তিনি লিখলেন মারীকে তার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চেয়ে। মারী ১১নং রু-দে-ফ্যইয়াঁতিনে তার বাসার ঠিকানা দিল। প্রীতি ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে তার ছোট্ট ঘরে অতিথিকে অভ্যর্থনা করল। মেয়েটিকে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে দেখতে পেয়ে পিয়ের কুরীর অন্তর বেদনায় আপ্লুত হলেও মারীর চরিত্র ও পরিবেশের সূক্ষ্ম সামঞ্জস্য উপলব্ধি করতে তাঁর অসুবিধা হলো না। প্রায় শূন্য চিলেকুঠরিতে জীর্ণ বেশে চারিত্রিক দৃঢ়তায় পরিপূর্ণ মারীর মুখখানি তাঁর কাছে অপরূপ মনে হলো।

কয়েকমাস পর তাঁদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও নির্ভরশীলতার সঙ্গে সঙ্গে সৌহার্দ্য ও অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি পেল। প্রখর বুদ্ধিমতী এই পোলবালা পিয়ের কুরীকে বিমোহিত করল। মন থেকে অবসাদ ঝেড়ে ফেলে চুম্বকশক্তির ওপর তাঁর নিজের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল নিয়ে সুসংবদ্ধ এক গবেষণা-

পত্র রচনা ক'রে ডক্টরেট-এর জন্ম প্রস্তুত হবার অনুপ্রেরণা যোগাল এই মেয়েটি।

এখন পর্যন্ত মারীর ধারণা যে, সে মুক্ত স্বাধীন মেয়ে। যে শেষ কথাটুকু পিয়ের বলি বলি ক'রেও এখনও বলতে পারছেন না, সেটুকু শুনতে সেও যেন এখনও রাজী নয়। রু-দে-ফ্যইয়াঁতিনে তার ঘরটিতে এই নিয়ে বোধহয় তারা বার দশেক মিলিত হলো। জুনের এক সন্ধ্যা-শেষে—দিনটি বেশ গরম—টেবিলের ওপর অঙ্কের বই খোলা পড়ে আছে, সামনে পরীক্ষা, তারই প্রস্তুতি চলেছে। কোথায় যেন পিয়ের-এর সঙ্গে মারী বেড়াতে গিয়েছিল। সেখান থেকে কিছু শুভ্র ডেজি এনে একটা গেলাসে সাজিয়ে রেখেছে। ছোট্ট স্পিরিট স্টোভটিতে চা তৈরি করল মারী।

কি একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে পদার্থবিদ ব্যস্ত, তারই আলোচনা হচ্ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ এক নিঃশ্বাসে পিয়ের বলে ফেললেন: 'আমার ইচ্ছে করে বাবা মা'র সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই; চমৎকার মানুষ ওঁরা।' তিনি তাঁর বাবার গল্প বললেন: লম্বা সাধারণ চেহারার মানুষ, চোখ দুটি উজ্জ্বল নীল, প্রখর বুদ্ধিমান, চঞ্চল, খেয়ালী প্রকৃতি, হঠাৎ টগবগিয়ে জ্বলে ওঠেন, কিন্তু অন্তরটি ভারী কোমল। বয়সের সঙ্গে মা'র শরীরে ভাঙন ধরেছে, কিন্তু আজ অবধি সুদক্ষ গৃহকর্ত্রীর সমস্ত দায়িত্ব অবলীলা ক্রমে ক'রে যান তিনি। ছেলেবেলায় দাদা জ্যাকের সঙ্গে বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ানোর গল্প করেন।

মারী বিস্মিত হয়। অবস্থা ও ব্যবস্থার এমন আশ্চর্য সাদৃশ্যও ঘটে দুনিয়ায়! এদিক-ওদিক ছোটখাট ঘটনার হেরফের ক'রে কুরীর বাড়িখানাকে ওয়ার্‌সয় এনে ফেললে শ্ক্লোদোভস্কি পরিবার আর কুরী পরিবার যে হুবহু মিলে যায়! ডাঃ ইউজিন কুরী স্বাধীন মতাবলম্বী, ধর্মে বিশ্বাস নেই বলে ছেলেদের তিনি দীক্ষা পর্যন্ত দেন নি। এটুকু বাদ দিলে একই রকম বিচক্ষণ, সৎ, কৃষ্টি-সম্পন্ন, বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত দুটি পরিবারের সন্তান ও পিতামাতার মধ্যে একই ধরনের সখ্যতা ও প্রকৃতির প্রতি অনুরাগে পূর্ণ ছোট্ট গণ্ডির ভেতর মারী ও পিয়ের যেন বেড়ে উঠেছেন। মারী আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠে পোল দেশের গ্রাম্য পরিবেশে ছুটির দিনগুলোয় কি অনির্বান আনন্দ উপভোগ করেছে সেই গল্প শোনাল, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তো সে আবার সেখানে ফিরে যাবে!

'কিন্তু অক্টোবরে তুমি তো আবার ফিরে আসছ, তাই না? আমাকে

কথা দাও, বলো তুমি ফিরবে? পোল্যাণ্ডে থেকে তোমার পড়াশোনা হওয়া অসম্ভব। এ অবস্থায় বিজ্ঞানকে তুমি নিশ্চয়ই বিসর্জন দিতে পারো না।'

সামান্য কয়টি কথায় উদ্বেগ ঝরে পড়ে। মারী বোঝে যে পিয়ের আদতে 'বিজ্ঞানকে বিসর্জন দিতে পার না' বলে 'আমাকে বিসর্জন দিতে পার না।'—বলতে চাইছেন।

কয়েক মুহূর্ত দুজনেই চুপ ক'রে বসে রইল। তারপর মারী ধূসর রঙের নরম চোখ দুটি পিয়ের-এর দিকে তুলে দ্বিধাজড়িত স্বরে উত্তর দিল:

'আমার মনে হয় তোমার কথাই ঠিক। ফিরে আসার ইচ্ছে আমারও খুব—হ্যাঁ, খুব।'

পিয়ের বহুবার ভবিষ্যতের কথা বলেছেন। মারীকে নিজের স্ত্রী হিসেবে পেতে চেয়েছেন, কিন্তু জবাবটা সুখকর হয় নি। চিরদিনের জন্য নিজের পরিবারবর্গের সংসর্গ ত্যাগ ক'রে ফ্রান্সে বিয়ে ক'রে স্বদেশের যাবতীয় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ থেকে অব্যাহতি চাওয়া প্রতারণা ছাড়া আর কি বলা যাবে? এ কাজ তার দ্বারা সম্ভব নয়, হওয়া উচিতও নয়। সগৌরবে পরীক্ষা সে উত্তীর্ণ হয়েছে, এবার দেশে ফেরার পালা—অন্তত গ্রীষ্মের ছুটিতে যাবে, হয়তো আর কোন দিন ফেরাই হবে না। হতাশ বৈজ্ঞানিককে শুধুমাত্র বন্ধুত্বের আশ্বাস দিয়ে, প্রত্যাবর্তনের কোনরকম প্রতিশ্রুতি না দিয়ে সে ট্রেনে উঠে পড়ল।

কিন্তু এখন আর পিয়ের-এর এটুকুতে মন ভরে না। মনে মনে তিনি মারীর সঙ্গ নিলেন। কথা ছিল মারীর বাবা আসবেন সুইটজারল্যাণ্ডে; সেখানে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে দুজনে পোল্যাণ্ডে ফিরে যাবেন। পিয়ের ভাবলেন, তিনিও তো মারীর সঙ্গে যেতে পারতেন সুইটজারল্যাণ্ডে, পোল্যাণ্ডে! কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। এই দেশটার ওপর মনে মনে বৈজ্ঞানিক যেন চটে যান।...

সুতরাং দূর থেকে তিনি তাঁর আর্জি পেশ ক'রে চললেন। সারা গ্রীষ্মের ছুটিতে মারী যে যে জায়গায় গেল—ক্রেতাজ, লেম্বার্গ, ক্র্যাকো, ওয়ার্স—সর্বত্র তাঁর লেখা চিঠি 'স্কুল-অব-ফিজিক্স' এই শিরোনামা মাথায় নিয়ে মারীর অনুগামী হলো: চিঠির বক্তব্য হলো—তাকে ফিরিয়ে আনা আর পিয়ের কুরী নামক এক ব্যক্তি তার পথ চেয়ে আছে এই বিশেষ তথ্যটি যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া।

১৮৯৪-র ১৩ই আগষ্ট মারী শ্‌ক্লোদোভ্‌স্কাকে পিয়ের কুরী লিখলেন:

'মারী তোমার খবরের চেয়ে আনন্দের আমার আর কিছু নেই। দুই

মাসের জন্যে তোমার সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার দুশ্চিন্তা আমায় পীড়া দিচ্ছিল : তোমার ছোট্ট চিঠিখানি পেয়ে বাস্তবিকই অত্যন্ত খুশি হয়েছি। আশাকরি প্রচুর মুক্তবায়ু সেবন ক'রে অক্টোবরে আবার আমাদের কাছে ফিরে আসবে। আমি নিজে বাইরে কোথাও যাব না ; দেশের বাড়িতে আমাদের বাগানে, কিংবা খোলা জানালার ধারে বসে সময় কাটিয়ে দেব।

'আমরা নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বের চুক্তি করেছি—মনে আছে তো ! অবশ্য যদি না তোমার মত বদলায় ! কারণ কোন শর্তই তো বাস্তবিক বন্ধন হতে পারে না, এ বস্তু বায়না দিয়ে পাওয়া যায় না। তবু আমার বিশ্বাস যে, পরস্পরের সান্নিধ্যে থেকে তোমার দেশপ্রেম, আর আমাদের উভয়ের মানবতার স্বপ্ন দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবন কাটাতে পারলে চমৎকার হয়।

'আমার মনে হয়, এই সব স্বপ্নের মধ্যে শেষেরটি যথার্থ ন্যায়সঙ্গত। সামাজিক বিবর্তন আনা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যদিবা আমাদের সাধ্যায়ত্ত হয়, তবু আমরা জানি না, কি আমাদের কর্তব্য, যে-পথেই অগ্রসর হই না কেন, অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনকে ধাক্কা দিয়ে ভালোর চেয়ে মন্দ করব না—তারই বা স্থিরতা কি ? অথচ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা কিছু একটা করতে পারি, এক্ষেত্রে ভিত্তি মজবুত হওয়ায় যতটুকুই আমাদের অবদান থাক না কেন, সেটা হবে অর্জিত জ্ঞান।

'দেখ তবে অবস্থা কি দাঁড়ায় : আমরা বন্ধুত্বের শর্তে আবদ্ধ আছি ; কিন্তু তুমি যদি এক বছরের মধ্যে ফ্রান্স ত্যাগ করো তবে ক্রমশ আমাদের বন্ধুত্ব আধ্যাত্মিক রূপ নেবে। এর চেয়ে বরং তুমি আমার সঙ্গে থাক না কেন ? আমি জানি, এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে তুমি চটে যাও, কথা বলতে চাও না।—তবে আমি কোনদিক থেকেই বোধহয় তোমার যোগ্য নই।

'ভেবেছিলাম ফ্রীবুর্গে তোমার সঙ্গে 'হঠাৎ' দেখা করার অনুমতি চাইব। যদি আমার ভুল না হয়, তবে তুমি মাত্র একদিন সেখানে কোভলস্কিদের অতিথি হয়ে থাকবে।

তোমার একান্ত অনুগত

পিয়ের কুরী।'

'তুমি অক্টোবরে অবশ্যই ফিরে আসবে, এ খবর দিয়ে নিশ্চিন্ত করো। সোজা সো'-এ লিখলে তাড়াতাড়ি চিঠি পাব। পিয়েরী কুরী, ১০ রু-দ্য-সাব্রেঁা-সো (সিন্)।'

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট, মারী শ্ক্লোদোভ্স্কাকে পিয়ের কুরী লিখলেন :

'তোমার সঙ্গে গিয়ে দেখা করব কিনা স্থির করতে পারি নি; একদিন সারাদিন ধরে ভেবে শেষ পর্যন্ত না যাওয়াই স্থির করলাম। তোমার চিঠি পড়ে প্রথমে মনে হলো যে, আমার যাওয়া তোমার কাছে বাঞ্ছনীয় নয়। দ্বিতীয়তঃ, বুঝলাম করুণা পরবশ হয়ে তুমি আমায় তোমাদের সঙ্গে তিনটে দিন কাটিয়ে আসতে লিখেছ। আমিও রওনা হতাম। কিন্তু কেমন লজ্জা হলো এই ভেবে যে তোমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তোমায় আমি বিরক্ত করছি কেন? শেষ পর্যন্ত আমার মনে হলো যে, আমার উপস্থিতি তোমার বাবাকে হয়তো পীড়া দেবে, তোমার সান্নিধ্যে তোমার বৃদ্ধ পিতা যে আনন্দ পান, তা হয়তো নষ্ট হবে।

'এখন যখন সময় পার হয়ে গেছে, তখন আফসোস হচ্ছে কেনই বা গেলাম না। তিনটে দিন পরস্পরের কাছে থাকতে পারলে আমাদের বন্ধুত্বের বুনিয়াদ আরও পাকা হতো, আড়াই মাসের বিচ্ছেদ পরস্পরকে মনে রাখার শক্তি যোগাত, তাই না?

'ভাগ্য বিশ্বাস করো তুমি? মি-ক্যারাম*র দিনটি মনে আছে? ভীড়ের মধ্যে তোমায় হারিয়ে ফেললাম! আমার মনে হয় এমনি একদিন দুজনের অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক হারিয়ে যাবে। ভাগ্য আমি বিশ্বাস করি না, কিন্তু হয়তো এ আমাদের স্বভাবের একটি অঙ্গ। ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করা আমার স্বভাব নয়।

'সেইজন্য এটা তোমার দিক থেকে এক রকম ভালোই হলো, কারণ, কেন জানি না, তোমায় তোমার আত্মীয়স্বজন, তোমার দেশ থেকে কেড়ে এনে ফ্রান্সে আটক করার জন্যে আমি যেন ক্ষেপে গেছি, অথচ তোমার এত বড় স্বার্থত্যাগের বিনিময়ে কিই বা আমি তোমায় দিতে পারি?

'তুমি যে সম্পূর্ণ স্বাধীন, এ কথার মধ্যে কি একটুও ছলনা নেই? বাস্তবিক আমরা স্নেহভালোবাসার কাঙাল, যাদের ভালোবাসি তাদের সম্বন্ধে অন্ধ, এর ওপর থাকে আমাদের জীবিকা অর্জনের তাগিদ। কাজে কাজেই আমরা যন্ত্রের দাস হ'তে বাধ্য…ইত্যাদি, ইত্যাদি…

'সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, যে-সমাজের মধ্যে আমরা বাস করি তার সংস্কারের কাছে অনেক সময়ে আমাদের আত্মাহুতি দিতে হয়; আপন আপন শক্তি বা দুর্বলতা অনুসারে প্রত্যেককে প্রায়ই একাজ করতে হয়। যদি যথেষ্ট না দিই, তবে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য, আবার যদি দানের মাত্রা অত্যধিক হয়,

* The mid-Lenten carnival.

তবে আমাদের মন বিদ্বেষে পূর্ণ হয়—নিজেদের প্রতি বিতৃষ্ণা আসে। দশ বছর আগে আমি যে ধারণা পোষণ করতাম, তা থেকে আজ বহুদূরে সরে এসেছি। তখন আমি ভাবতাম চরম পন্থাই পরম পন্থা, ঘটনা প্রবাহের দরুণ কোনরকম বিচ্যুতিই আমার সইবে না। ভাবতাম দোষগুণের মাত্রা বাড়ানোতেই বুঝি বাহাদুরি। সাধারণ মজুরদের মতো আমি তখন শুধু নীল জামা পরতাম। এমনি আরও কত কি। তবেই দেখো, আমি কত বুড়ো হয়ে গেছি, আর নিজেকে বড় অসহায় বোধহয়। আশা করি তুমি খুব আনন্দে আছ।

একান্ত তোমারই বন্ধু

পিয়ের কুরী।'

১৮৯৪-র ৭ই সেপ্টেম্বর মারী শ্‌ক্লোদোভ্‌স্কাকে পিয়ের কুরী লেখেন :

'…বুঝতেই পারছ কেন তোমায় বিশেষভাবে অনুরোধ করছি, তুমি অক্টোবরেই পারীতে ফিরে এস। তুমি এবছর না ফিরলে আমার দুঃখের সীমা থাকবে না। কিন্তু স্বার্থপর বন্ধুত্বের খাতিরে তোমায় আমি আসতে বলছি না। কেবল আমার মনে হয়, তুমি এখানে এলে কাজের সুবিধে হয়, আর আমার মনে হয় বাস্তবিক কিছু গ'ড়ে তোলা সম্ভব।

'যে-মানুষটি পাথরের দেয়ালে মাথা খুঁড়ে ভাবে দেয়ালটা উল্টে ফেলা যায়, তাকে তুমি কি ভাবতে পারো? যে কোন কারণেই সে করুক না কেন, তার এই মাথা খোঁড়া দেখে কিন্তু লোক হাসবে। আমার বিশ্বাস কতকগুলি প্রশ্নের সমাধান সাধারণ ভাবেই হওয়া উচিত, আজকের দিনে কোন বিশেষ স্থানীয় চৌহদ্দির মধ্যে ফেলে তার বিচার করতে গেলে ভুলই হবে। আর এরপর কেউ যদি এমন কিছু অবলম্বন করে, যার ফলের ঘরে থাকবে একটি শূন্য, সেক্ষেত্রে সে মারাত্মকভাবে নিজেরই ক্ষতি সাধন করবে। চারদিকে যা দেখছি তাতে আমার ধারণা হয়েছে যে, এ দুনিয়ায় ন্যায়বিচার ব'লে কিছু নেই ; সুতরাং যা সবচেয়ে শক্তিমান, কিংবা যার মূল্য সবচেয়ে সস্তা, তারই জয়জয়কার। মানুষ দিনান্ত খেটে মরছে, ব্যর্থ জীবনভার বয়ে বেড়াচ্ছে : উঃ এ একেবারে অসহ্য, কিন্তু তা বললেই তো আর এর অবসান ঘটবে না। এর অবসান ঘটবে এই কারণেই যে মানুষ হলো যন্ত্রী আর অর্থনীতির দিক থেকেও এ যন্ত্রের সুবিধে এই যে, একে জোর ক'রে চালাতে হয় না, এ তার নিজের গতিতেই কাজ ক'রে যায়।

'স্বার্থপরতা' কথাটির অর্থ তুমি যা করেছ তা সত্যই অভিনব। কুড়ি বছর বয়সে আমার জীবনে এক সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটে ছিল। সেদিন এক নিদারুণ

অবস্থার মধ্যে আমার এক বান্ধবীর জীবনাবসান ঘটেছিল। তোমায় গুছিয়ে বলার সাহস আমার হয় নি। একটা বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে আমার দিন কাটছিল, আর সে-সময়ে নিজেকে শাস্তি দিয়েই যেন আমি শান্তি পেতাম। মনে মনে স্থির করেছিলাম, আমি যাজকের মতো জীবন কাটাব, আর নিজেকে এবং মানব-সমাজকে বাদ দিয়ে শুধু তত্ত্ব চিন্তা করব। তারপর থেকে আমি অনেকবার প্রশ্ন করেছি, এই যে ত্যাগ, এ শুধু নিজেকে ভুলিয়ে রাখার একটা অজুহাত কিনা!

'তোমাদের দেশে চিঠি লেখার স্বাধীনতা আছে কি? কেমন যেন সন্দেহ হয় আমার। এরপর থেকে সম্পূর্ণ দার্শনিক হ'লেও চিঠিতে কোন তত্ত্বালোচনা না করাই বোধহয় ভাল হবে। হয়তো বা ভুল বুঝে তোমার ক্ষতি হয়ে যাবে। যদি ইচ্ছে হয় আমার ১৩ নম্বর রু-খ্য সল্লোতেই চিঠি দিও।...

তোমার অনুগত বন্ধু

পি. কুরী।'

১৮৯৪-এর ১৭ই সেপ্টেম্বর মারীকে পিয়ের কুরী লেখেন:

'তোমার চিঠি সত্যিই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে; বুঝতে পারছি তুমি খুবই দুশ্চিন্তিত এবং কোন সিদ্ধান্তেই আসতে পারছ না। ওয়ারস্ থেকে তোমার লেখা চিঠি আমায় কিছুটা সান্ত্বনা দিয়েছে; আশা করি তুমি তোমার মনের শান্তি ফিরে পেয়েছ। তোমার ফটোটা আমাকে পরম আনন্দ দিয়েছে। ফটো-খানা পাঠিয়ে সত্যিই খুব ভাল করেছ। আমার অন্তর থেকে তোমাকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

'তুমি যে পারীতে ফিরে আসছ, তাতে আমি আনন্দাপ্লুত। আমি চাই যে আমাদের বন্ধুত্বের মধ্যে যেন কোন সময়েই ছেদ না আসে। আমার মনের এই বাসনার সঙ্গে কি তোমার বাসনাও মিলবে না?

'ফরাসী মেয়ে হলে এদেশে তোমার পক্ষে সেকেণ্ডারি ইস্কুল কিংবা নরমাল ইস্কুলের প্রফেসর হতে খুব অসুবিধে হতো না। এ জাতীয় চাকরি কি তোমার পছন্দ?

তোমার একান্ত অনুগত বন্ধু

পিয়ের কুরী।'

'পুনঃ, আমার দাদাকে তোমার ছবিখানা দেখালাম। কিছু অন্যায় হলো কি? সে খুব প্রশংসা ক'রে বললে: 'মেয়েটির চেহারায় আত্মপ্রত্যয়, না, তার চেয়েও বেশী দৃঢ়চিত্ততার ভাব পরিস্ফুট।'

অক্টোবর এল। আনন্দে পিয়ের-এর বুক ভরে উঠল। মারী পারীতে

ফিরে এসেছে। সরবনে বক্তৃতা-গ্যালারীতে, লিপমানের ল্যাবরেটারিতে তার সঙ্গে আবার দেখা হবে। কিন্তু ফ্রান্সে এই তো তার শেষ বছর, অন্তত পিয়ের তাই জানে। লাতিন-কোয়ার্টারের বাসা মারী তুলে দিল। ৩৭নং রু-দ্য শাতোদাঁয় ব্রনিয়া রোগী দেখার জন্য একখানা চেম্বার খুলেছে, তারই লাগোয়া ঘরটি বোনের জন্য সে ঠিক ক'রে রেখেছে। দ্লুস্কি-দম্পতি লাভিলের বাসাতেই থাকে, শুধু দিনের বেলায় ব্রনিয়া তার চেম্বারে এসে কাজ সেরে বাড়ি ফিরে যায়। কাজেই মারীর কাজে কোন ব্যাঘাত হয় না।

এই অন্ধকার ঘুপসি ঘরে পিয়ের কুরী আবার তাঁর হৃদয়ের আর্জি নিয়ে উপস্থিত হলেন। মারীর মতো তাঁরও জীবন ছিল আদর্শ, অবিমিশ্র অখণ্ড এক আদর্শ। পিয়ের-এর জীবনের একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল—বিজ্ঞান। মারীর প্রতি তাঁর তুর্নিবার আকর্ষণের মধ্যে আছে প্রেম ও অপরিহার্য কার্যকারণের প্রেরণা।

সাধারণভাবে সুখ বলতে যা বোঝায় তাও তিনি তাঁর একমাত্র সুখের কারণে বিসর্জন দিতে রাজী আছেন। তিনি মারীর কাছে এমন একটি প্রস্তাব করলেন, যা হঠাৎ শুনলে বিস্ময় জাগায়। যদি তাঁর প্রতি মারীর কোন তুর্বলতা না থাকে, তবে সে কি সম্পূর্ণ বন্ধুত্বের শর্তে একটি কাজে রাজী হবে? তাঁর রু-মুফেতার্দ-এর বাসায় একটি বড় ঘরকে তু ভাগে ভাগ করা যায়, ঘরখানার জানালা খুললেই বাগান দেখা যায়। সেখানে মারী কি তাঁর সঙ্গে কাজ করতে রাজী আছে? সেখানে সে ইচ্ছে করলে থাকতেও পারে।

অথবা যদি পিয়ের কুরী পোল্যাণ্ডে কাজ নিয়ে যান, তবে কি সে তাঁকে বিয়ে করবে? তিনি ফরাসী ভাষা শেখানোর চাকরি নিতে পারেন, তারপর কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা হয় তা দিয়ে তুজন বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাতে পারবেন।...

পোল জমিদার-পরিবারে ধাক্কা-খাওয়া গভর্নেস্-এর সামনে এত বড় প্রতিভাবান মানুষটি বিনীত প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

দিদি ব্রনিয়ার কাছে তুশ্চিন্তিত মারী চাইল পরামর্শ। তার জন্য পিয়ের তাঁর দেশও ত্যাগ করতে চাইছেন! এত বড় ত্যাগ গ্রহণ করার কোন অধিকার কি তার আছে? পিয়ের তাকে এত ভালোবাসে বলেই না এতবড় ত্যাগের কথা ভাবতে পারছেন।

পিয়ের যখন শুনলেন যে, দ্লুস্কিদের সঙ্গে মারী তাঁর কথা নিয়ে আলাপ করেছে, তখন তিনি সোজা ব্রনিয়ার কাছে হাজির হলেন। ব্রনিয়াকে জয় করতে তাঁর সময় লাগল না। মারীর সঙ্গে ব্রনিয়া যাবে সো'য় পিয়ের-এর বাবা মার সঙ্গে আলাপ করতে। দশটি মাস লাগল মারীর বিয়ে সম্বন্ধে

সিদ্ধান্তে পৌঁছতে। বুদ্ধিজীবীর জীবন ও কর্তব্য সম্বন্ধে কত রকম ধ্যানধারণাই না তার মনে বাসা বেঁধে আছে। তার কতক একেবারে ছেলেমানুষী, আর কতক সুন্দর, উদার।

পিয়ের বুঝেছিলেন যে মারীর এইসব ধারণার মধ্যে বিশেষত্ব কিছু নেই, আর পাঁচ জন মানুষের ধারণার মতোই সেসব। মারীর নিষ্ঠা, তার সাহস আর বিনয়ই তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, মুগ্ধ করেছিল এই লাবণ্যময়ী তরুণীর চরিত্রের গুণাবলী যা মহান ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায়।

আদর্শ! বহুকাল তো পিয়ের নিজেই আদর্শ অবলম্বন ক'রে চলেছেন। কিন্তু জীবনের মধ্যেই তো এর অসঙ্গতি দেখেছেন। বিয়ে তিনি আর করবেন না বলেই স্থির করেছিলেন, বিজ্ঞানের জন্য উৎসর্গীকৃত জীবনে বিয়ের স্থান হতে পারে না বলেই তাঁর ছিল বিশ্বাস। প্রথম যৌবনের সেই ভালোবাসা হারানোর ব্যথা তাঁকে অন্তর্মুখী করে এবং এযাবৎ তিনি মেয়েদের সান্নিধ্য থেকে নিজেকে দূরেই সরিয়ে রেখেছিলেন। নতুন ক'রে ভালোবাসতে তিনি চান নি এবং সেই কারণে অতি সাধারণ বিবাহবন্ধনে তিনি এতকাল জড়িয়েও পড়েন নি। তিনি যেন প্রতীক্ষা করছিলেন সেই আশ্চর্য মেয়েটির জন্য—যে শুধু তাঁর জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি অপেক্ষা করছিলেন যেন এই পোলদেশীয় মেয়েটির জন্য। এই পোল বৈজ্ঞানিক মেয়েটিকে তাঁকে পেতেই হবে। হারানো 'আদর্শ'কে তিনি আর পথ আঁকড়িয়ে থাকতে দিতে পারেন না।

মারীর সঙ্গে পিয়ের কথা বলেন, তাকে বোঝান। তাকে তিনি সাহায্য করতে চান, চান তার মঙ্গল। এমনি ক'রে তিনি প্রতিদিন মারীর পাশে উপস্থিত থেকে তাঁর সেই ত্যাগী যুবকের জীবন থেকে ধীরে ধীরে রক্তমাংসের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার জীবনে ফিরে এলেন।

১৮৯৫-র ১৪ই জুলাই মারীর দাদা যোসেফ পরিবারের তরফ থেকে স্নেহ-পূর্ণ চিঠি লিখল মারীকে :

'মঁসিয়ে কুরীর ভাবী বধূ হিসেবে তোকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমার এবং যাঁরা তোর অপূর্ব অন্তর আর চরিত্রের কথা জানেন, তাঁদের সকলের হয়ে কামনা করি জীবনে তোরা সুখী হ'।

'...আমি মনে করি হৃদয়ের নির্দেশ পালন ক'রে তুই ঠিকই করেছিস। কেউ তোকে এজন্য দুষবে না। তোকে তো আমি জানি, তাই জোর দিয়েই বলতে পারি যে, তুই অন্তরে পোল্যাণ্ডেরই মেয়ে থাকবি, থাকবি আমাদেরই পরিবারের একজন হয়ে। আমরাও তোকে চিরদিন ভালোবাসব, তোকে

আমাদেরই একজন বলে জানব। বরং তুই সুখে শান্তিতে বেঁচে থাক, সারা জীবন কৃচ্ছ্রসাধন আর শূন্য কর্তব্যবোধের দাস হয়ে ভগ্ন হৃদয়ে দেশে ফিরে এসে কোন লাভ নেই। আমরা শুধু চাইব যে, যা কিছু ঘটুক না কেন, আমাদের যোগাযোগ দেখা-সাক্ষাৎ যেন প্রায়ই হয়।

'আমার আদরের মানিয়া, আমার সহস্র চুম্বন গ্রহণ কর। আরেকবার তোর সুখ, সৌভাগ্য, আনন্দ আমরা অন্তর থেকে কামনা করি। তোর প্রেমাস্পদকে আমার প্রীতি-নমস্কার জানাস। তাঁকে বলবি আমাদের পরিবারের ভবিষ্যৎ সভ্য হিসেবে আমি তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছি। তাঁর প্রতি আমার সীমাহীন বন্ধুত্ব আর সহানুভূতি রইল। আশা করি আমিও তাঁর সৌহার্দ্য ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবো না।'

কয়েকদিন পর মারী তার ছেলেবেলার বন্ধু কাজিয়াকে চিঠি লিখে তার সিদ্ধান্ত জানায় :

'তুই যে সময়ে এ চিঠিখানা পাবি ততক্ষণে তোর মানিয়ার পদবী বদলে যাবে। গত বছর ওয়ারসয় গিয়ে তোকে যাঁর কথা বলেছিলাম, ইনি সেই ভদ্রলোক। চিরদিন প্যারীতে থাকার দুঃখ আমায় কাঁটার মতো বিঁধবে, কিন্তু উপায় কি ? ভাগ্য আমাদের পরস্পরকে অত্যন্ত কাছে এনে ফেলেছে, এখন আর বিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভব নয়।

'আমি এতদিন তোকে কিছু লিখি নি কারণ মাত্র দিন কয়েক আগেই সব ঠিক হয়ে গেল। এক বছর ধরে আমি দ্বিধা আর সংশয়ে দিন কাটিয়েছি, কিন্তু মন স্থির করতে পারি নি। শেষ পর্যন্ত এখানে বসবাস করাই স্থির করলাম। নীচের ঠিকানায় উত্তর দিস—মাদাম কুরী, স্কুল অব্ ফিজিক্স এণ্ড কেমিষ্ট্রি, ৪২ নং রু-লমোঁ।

'এখন থেকে আমার নাম ঠিকানা এই হলো। আমার স্বামী এই স্কুলের অধ্যাপক। আসছে বছর আমি ওঁকে পোল্যাণ্ডে নিয়ে গিয়ে আমার দেশের সঙ্গে ও আমার সখীটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব, আর আশা করব তোর প্রীতিও তিনি পাবেন।...'

২৬শে জুলাই, রু-দ্য শাতোদাঁ'র বাসায় মারীর আজ শেষ দিন। মারীর মুখখানা একটা চাপা উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত। আজ থেকে সে মাদাম পিয়ের কুরী হবে।

মারী চুল বেঁধে বিয়ের জামাটি গায়ে দিল। কাসিমির দ্লুস্কির বৃদ্ধা মা

ইদানীং তাঁর ছেলের কাছেই বাস করছেন। তিনি মারীকে বিয়ের যৌতুক হিসেবে এই পোশাকটি উপহার দিলেন। মারী শুধু বলেছিল: 'যে জামাটি আমি ব্যবহার করছি, সেটি ছাড়া আমার দ্বিতীয় পোশাক নেই। যদি আমার পোশাক দিতে চান তবে একটা গাঢ় রঙের জামাই দেবেন, যাতে ভবিষ্যতে ল্যাবরেটারিতে পরেও কাজ করতে পারি।'

রু-দাঁকো'র এক সামান্য দরজী মাদাম গ্লেৎ ব্রনিয়ার নির্দেশে গাঢ় নীল রঙের পশমের স্কার্ট, নীল ব্লাউসের ওপর হালকা নীলের ডোরা কাটা এক পোশাক তৈরি ক'রে দিলেন। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল মারীকে এই নতুন পোশাকে। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বিয়ের কল্পনা ছিল মারীর। সাদা পোশাক, সোনার আংটি, বিয়ের ভোজ, কোন অনুষ্ঠানই মানা চলবে না। ধর্মানুষ্ঠানটুকু পর্যন্ত বাদ গেল, কারণ পিয়ের স্বাধীন মতের মানুষ, আর মারীরও ধর্মের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। উকিলের প্রয়োজন হলো না কারণ বর-কন্যা কারুরই দুনিয়াতে সম্পত্তি নামক পদার্থের সঙ্গে সংস্রব নেই। কোন এক আত্মীয় বিয়ের উপহারস্বরূপ কিছু টাকা পাঠিয়েছিলেন; তাই দিয়ে আগের দিন দু'খানা নতুন সাইকেল কেনা হয়েছে,—তাই চেপে সামনের গ্রীষ্মের বন্ধে দু'জনে গ্রামের দিকে বেড়াতে যাবে। এ এক অভিনব বিয়েই বটে! 'সো'-এর সিটি হল্ এ আর রু-দ্য-সাব্লোঁ'য় পিয়েরদের বাড়ির বাগানে ব্রনিয়া, কাসিমির, ইউনিভারসিটির কয়েকজন বিশেষ বন্ধু-বান্ধব, ওয়ার্স থেকে অধ্যাপক শ্‌ক্লোদোভ্‌স্কি আর হেলা উপস্থিত থাকবে। অধ্যাপক ভেবেছিলেন, ডাক্তার কুরীর সঙ্গে বিশুদ্ধ ফরাসী ভাষায়ই কথা বলবেন। ধীর কণ্ঠে তাঁকে তিনি তাঁর অন্তরের কথাটি জানাবেন: 'মারীর মধ্যে আপনারা পাবেন স্নেহ-প্রীতির মূর্তিময়ী কন্যাটিকে। পৃথিবীতে আসার পর থেকে ও আমায় কখনও কোনও দুঃখ দেয় নি।'

পিয়ের এসে মারীকে নিয়ে গেলেন। লুক্সেমবুর্গ ষ্টেশনে ট্রেন ধরে 'সো'য় যেতে হবে, সেখানে বাবা মা অপেক্ষা করবেন।

সোনালী আলো-ঝল্‌মলে সকালে দোতলা বাসের ওপরের সীটে বসে তাঁরা বুলেভার্ড সেন্ট-মাইকেল পর্যন্ত গেলেন আর জয়রথের উচ্চাসন থেকে নীচে পরিচিত স্থানগুলি লক্ষ্য করতে করতে চললেন।

সরবনে 'ফ্যাকাল্‌টি অব সায়েন্স'-এর তোরণ পার হয়ে যাবার সময় মারীর করস্পর্শে পিয়ের ফিরে তাকায় দয়িতার পানে, পরস্পরের স্মিত মুখের উজ্জ্বল শান্ত দৃষ্টিতে হাসি উছলে ওঠে।

॥ তরুণ দম্পতি ॥

১১

দায়িত্বপালনে মারী কোনদিনই পরাঙ্মুখ নয়। বিবাহ ব্যাপারেও এর অন্যথা হলো না। বিয়ের আগে বৎসরাধিক কাল তাঁর দ্বিধার মধ্যে কেটেছে। বিয়ের পর তাঁর দূরদৃষ্টি ও স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে এক অপূর্ব দাম্পত্য-জীবন তিনি রচনা করতে বসলেন।

বিবাহিত-জীবনের প্রথম দিকে পিয়ের ও মারী দুজনে দুখানি সাইকেলে চেপে 'ইল-দেঁ-ফ্রাসেঁ'র রাস্তাগুলি চষে বেড়াতেন। ব্যাগের মধ্যে কিছু জামাকাপড় আর বর্ষার দিনে দুখানা রবারের বর্ষাতি—এই থাকত তাঁদের সঙ্গে। বুনো মাঠের শষ্পের ওপর বসে রুটি, পনির, পিচ আর চেরিফল খেতেন। সন্ধ্যায় নাম-না-জানা কোন হোটেলের কাছে এসে থামতেন। সেখানে খানিকটা ঘন গরম স্যুপ আর একটা ঘর জুটে যেতই। মোমবাতির আলো সেই দেয়ালের গায়ে ছায়াছবি আঁকত। ক্ষণে ক্ষণে সারমেয়-সঙ্গীত, পাখীর কাকলী, বেড়ালের অবিরাম অভিযোগ আর কাঠের বাড়ির বিচিত্র শব্দ-বিড়ম্বিত নৈশ-প্রান্তরের স্তব্ধতার মাঝে শুধু তাঁরা দুজনে!

বনের ভেতর দিয়ে কিংবা পাথর-ছড়ানো মাঠের ওপর দিয়ে ওঁরা পায়ে হেঁটে চলতেন। গ্রামাঞ্চলের প্রতি পিয়ের-এর ছিল দুর্বার আকর্ষণ। দীর্ঘ নীরব এই অভিযানগুলি তাঁর প্রতিভা বিকাশের সহায়ক ছিল, পায়ে চলার ছন্দে বৈজ্ঞানিকের চিন্তাধারায় নবতর উদ্যম সঞ্চারিত হতো। বাইরে কোন বাগানে পা দিয়ে তিনি আর স্থির থাকতে পারতেন না। বিশ্রামের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। আগে থেকে বন্দোবস্ত ক'রে নির্দিষ্ট ভ্রমণ তিনি পছন্দ করতেন না। সময়ের বাঁধনে তিনি বাঁধা পড়তে রাজী নন। ভ্রমণ শুধু দিনের বেলায় কেন, রাত্রেও চলতে পারে। ঘড়ির কাঁটা ধরে কেনই বা খেতে হবে? অতি অল্প বয়সেও কখনও সকালে, কখনও বিকালে হঠাৎ তিনি খেয়ালমত বাইরে চলে যেতেন, ফিরতে এক ঘণ্টা হবে, কি তিন ঘণ্টা হবে সে-হিসেব থাকত না। সেইসব দিনের নিরুদ্দেশ-যাত্রার সাথী তাঁর দাদার সঙ্গে সেসব দিনগুলির স্মৃতি তাঁর মনে গাঁথা ছিল:

'...আর! পারী নগরীর বিরক্তিকর ক্ষুদ্রতা হতে বহুদূরের সেই নিবিড়

নীরবতাময় দিনগুলি আমাকে আকর্ষণ করে।···না, আমার সেই বাইরে প্রকৃতির মাঝে কাটানো রাত অথবা সঙ্গীবিহীন দিনগুলির জন্য আমি কখনও অনুতাপ করব না : অবসর পেলে আমি সানন্দে তখনকার দিবাস্বপ্নের কথা লিখে রাখতে পারি, নানা জাতের বিভিন্ন বৃক্ষলতার সুবাসে আমাদের সেই অপরূপ উপত্যকার বর্ণনা দিতে পারি। ঠাণ্ডা স্যাঁৎসেঁতে সুন্দর অরণ্যের মধ্য দিয়ে বিভর্ নদীর সেই কুলকুল ধ্বনি তুলে বয়ে যাওয়া, সারি সারি লবঙ্গ-লতায় ছাওয়া রূপকথার রাজ্য, ফুলে ফুলে রঙিন পাথুরে টিলার ওপর আমরা কি আনন্দই না করেছি! হ্যাঁ, 'লামিনিয়ের'-এর গ্রাম্য ছবি আমার মন থেকে কখনও মুছবে না। যেসব জায়গায় আমি সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছি, তার মধ্যে এইটেই আমার সবচেয়ে প্রিয়। প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা আমি সেখানে পালিয়ে যেতাম, আর মাথার মধ্যে ডজনখানেক নতুন নতুন চিন্তার খোরাক নিয়ে ফিরতাম···

১৮৯৫ সালের গ্রীষ্মকালে—"বিবাহ অভিযান"-টিই সবচেয়ে উপভোগ্য হয়েছিল ; প্রেমের স্পর্শে তাঁদের বাস্তব জগৎ স্বপ্নময় হয়ে উঠেছিল। গ্রামের পর গ্রাম সাইকেল চালিয়ে যাওয়া আর সামান্য অর্থের বিনিময়ে গ্রামের আবাসে রাত্রি যাপন—চমৎকার সুন্দর দিনগুলো নিজেদের মধ্যে এইভাবে পাওয়া!—নিরবচ্ছিন্ন শান্তিপূর্ণ তরুণ দম্পতির কাছে সত্যিই মনোহারী।

একদিন এক কৃষাণের বাড়িতে সাইকেল দুটি রেখে পিয়ের ও মারী বড় রাস্তা ছেড়ে নাম-না-জানা পথে পা বাড়ালেন, সঙ্গে নিলেন ছোট একটি দিকনির্ণয় যন্ত্র আর কিছু ফল। পিয়ের আগে, মারী পেছনে। শালীনতা বর্জন ক'রে স্কার্ট গুটিয়ে নিয়েছেন মারী, হাঁটতে সুবিধা হবে ব'লে। মাথায় রইল না কিছু, গায়ে সুন্দর সাদা ব্লাউস, পায়ে ভারী জুতো, কোমরে চামড়ার কোমর-বন্ধের ভেতরে একখানা ছুরি, সামান্য কিছু টাকা আর একটি হাতঘড়ি।

পিয়ের-এর মাথায় এল সেই স্ফটিকের চিন্তা; সরব চিন্তা ; পেছন ফিরে স্ত্রীর দি'ক তাকিয়েও দেখছেন না। মারী যে সব বোঝে সে তো জানা কথা আর সে যা উত্তর দেবে, তা হবে সারগর্ভ ও সম্পূর্ণ নিজস্ব বুদ্ধিলব্ধ নতুন তথ্য! আগামী বৎসর ইউনিভারসিটিতে সে মস্ত কিছু একটা করার আশা রাখে। 'সদস্য-বৃত্তি'-পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে, সুজেন্‌বার্জার-এ স্কুল-অব্-ফিজিক্সের অধিকর্তা তাঁকে অবশ্যই পিয়ের-এর সঙ্গে একই ল্যাবরেটারিতে গবেষণার কাজ করার অনুমতি দেবেন। এই ব্যবস্থায় দুজনে সর্বদাই পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ পাবেন।

চলতে চলতে তাঁরা নলখাগড়ার জঙ্গলে ঘেরা এক পুকুর ধারে এসে উপস্থিত হলেন। পিয়ের-এর বৈজ্ঞানিক মন সহজেই এই ঘুমন্ত জলাশয়ের পুষ্প লতা ও প্রাণী সম্পদের মধ্যে ডুবে গেল। জল, বাতাস, জীব, জন্তু, টিকটিকি, রাক্ষুসে মাছি, কেন্নো, শামুক প্রভৃতি সম্বন্ধে পিয়ের অনেক খবর রাখেন। যে সময়টুকু তাঁর মারী পুকুর পাড়ে গা' এলিয়ে বিশ্রাম করছেন, সে সময়ে তিনি চুপিসারে এক পোড়ো গাছের গুঁড়ি বেয়ে নেবে হলুদ রঙের আইরিস্ ও হালকা রঙিন জলজলিলি তুলে আনলেন।

শান্তিতে মারীর চোখে তন্দ্রা নেমেছে, আধ বোঁজা চোখে হালকা ভাসা ভাসা মেঘের দিকে চেয়ে আছেন। হঠাৎ, মেলে-দেওয়া হাতের ওপর কি যেন ঠাণ্ডা, ভেজা জিনিসের স্পর্শে চমকে চিৎকার ক'রে উঠলেন। কি? না, পিয়ের ভালোবেসে স্ত্রীর হাতের পাতায় একটা সবুজ ব্যাঙ্ ছেড়ে দিয়েছেন। পরিহাস ক'রে এ কাজ তিনি করেন নি। সদাসর্বদা ব্যাঙ ঘেঁটে ঘেঁটে বৈজ্ঞানিকের কাছে এ প্রাণী ঘৃণার জীব নয়।

শিশুর মতো ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠেন মারী: 'পিয়ের···পিয়ের!'

বৈজ্ঞানিক হতভম্ব হয়ে যান: 'সে কি গো, তুমি এদের পছন্দ কর না?'

'তা কেন করব না? কিন্তু আমার হাতের মধ্যে নয় নিশ্চয়ই!'

অবিচলিত স্বামী জবাব দিলেন: 'তুমি মস্ত ভুল করছ, ব্যাঙদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে আমার খুব ভাল লাগে। আস্তে মুঠিটা খুলে ফেল। এবার দেখ কি সুন্দর!'

তিনি প্রাণীটিকে নিজের হাতে তুলে নিলেন। মারী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর পুকুর পাড়ে নাবিয়ে তাকে মুক্তি দিলেন। আবার সামনের দিকে পা বাড়ালেন। বুনো আইরিস্ ও পদ্মের অপরূপ আভরণ অঙ্গে নিয়ে মারী চললেন সঙ্গে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পিয়ের আবার বনবাদাড়, আকাশ, ব্যাঙ, পুকুরের কথা সব ভুলে গেলেন।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অতি দুরূহ গবেষণার কথা, স্ফটিকের দুর্ভেদ্য রহস্যের কথা চিন্তা করতে করতে চলেছেন বৈজ্ঞানিক। নতুন গবেষণার জন্য কেমন যন্ত্র গড়বেন তার বর্ণনা দিলেন; আর এবারেও মারীর ভরসাপূর্ণ কণ্ঠস্বর, বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নাবলি ও সুচিন্তিত উত্তর তাঁর কানে এল।

এমনি ক'রে দিনের পর দিন তাঁদের মধ্যকার সম্পর্ক এক আনন্দরসে সিঞ্চিত হলো, সুদৃঢ় হলো। দুটি হৃদয় একই ছন্দে স্পন্দিত হলো, দুই দেহ

মিলিত হলো, দুই অনন্যসাধারণ জ্ঞানীর চিন্তাধারা একই খাতে প্রবাহিত হলো। মারী আর পিয়ের দুজন দুজনকে পেয়ে ধন্য, তাদের বিয়ে সত্যিই সার্থক।

সুন্দরী স্নেহশীলা মারীকে পেয়ে পিয়ের খুশী; শিশুসুলভ সরলতা নিয়ে এই রমণী একাধারে বৈজ্ঞানিকের প্রিয় সখী, ভার্যা, প্রিয়া এবং কর্মসঙ্গিনী। আগস্টের মাঝামাঝি জীবনের এই মধুমাস উদযাপনের সুখক্লান্তিতে মন পূর্ণ ক'রে তরুণ-দম্পতি শাঁতিলির কাছে হিন্দ্ নামক এক পল্লীভবনে এসে ডেরা বাঁধলেন। এ জায়গাটির সন্ধানও ব্রনিয়াই তাঁদের দিয়েছিল, কয়েক মাসের জন্য সে এই শান্তির নীড়ে সপরিবারে বাস করেছিল। সেখানে বৃদ্ধা মাদাম্ দলুস্কা, কাসিমির, ব্রনিয়া ও তাদের কন্যা হেলেন (—ডাক নাম-'লু'), প্রফেসার শ্ক্লোদোভ্স্কি ও হেলার সঙ্গে পিয়ের ও মারী এসে যোগ দিলেন। সকন্যা প্রফেসর ফ্রান্সে আরও কিছুদিন থেকে গেলেন। ভবিষ্যতে এঁরা অনেকেই পরস্পরকে আর কোনও দিন দেখতে পান নি। এঁদের এই যোগাযোগ স্মৃতির পাতায় সোনার অক্ষরে উজ্জ্বল হ'য়ে লেখা হয়ে রইল। বিচিত্র সুন্দর বন-মোরগ আর খরগোশে ভরা, লিলি ফুলের কার্পেট বিছানো নিঃসঙ্গ সেকেলে বাড়িখানি বনের মধ্যে মূর্তিমতী কবিতার মতো এঁদের সকলের মনে হতো।

পিয়ের তাঁর নতুন আত্মীয়দের জয় ক'রে ফেললেন। শ্বশুর শ্ক্লোদোভ্স্কির সঙ্গে তাঁর বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা চলত আর মিষ্টি, ছোট্ট মায়াবিনী, তিন বছরের লু'র সঙ্গে আলাপ করতে হতো রীতিমত গম্ভীর ভাবে। মাঝে মাঝে সো' থেকে ডাক্তার কুরী সস্ত্রীক শাঁতিলিতে চলে আসতেন। সে সময়ে মস্ত টেবিলে বাড়তি দুখানা প্লেট পড়ত, রসায়ন থেকে শুরু ক'রে চিকিৎসা শাস্ত্র, শিশুশিক্ষা, সামাজিক বিধিনিষেধ, ফ্রান্স ও পোল্যাণ্ডের যাবতীয় সমস্যা নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা হতো।

বর্তমানে, আমাদের সমসাময়িক দুনিয়ায় বিদেশীর প্রতি যে সহজাত অবিশ্বাস দেখা যায় পিয়ের ছিলেন সেসব থেকে মুক্ত। বরং দলুস্কি ও শ্ক্লোদোভ্স্কি পরিবার সহজেই তাঁর মন জয় ক'রে নিল। স্ত্রীর কাছে ভালোবাসার প্রমাণ দেবার উৎসাহে তিনি কষ্ট ক'রে দুরূহ পোল ভাষা শিখতে আরম্ভ করলেন; নিজেদের দেশেও সে-ভাষা ব্যবহারের অভাবে অচল হয়েই ছিল, সেই জন্য মারী সানন্দে বার বার প্রতিবাদ করেন কিন্তু পিয়ের তা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেই শিখতে থাকেন।

ছিল এ পিয়ের বাস করার সময়ে গোলবাসীর হাবভাব রপ্ত ক'রে ফেলেন, আর সেপ্টেম্বরে মারীকে যখন সো'য় নিয়ে এলেন, তখন মারীর ফরাসী দেশের আচার আচরণ আয়ত্ত করার পালা এল। তাঁর কাছে অবশ্য এর চেয়ে বেশী কাম্য কিছুই ছিল না। শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি পুত্রবধূর আন্তরিকতার অভাব ছিল না আর হেলাকে নিয়ে বাবা ওয়ারসয় ফিরে যাবার পর আত্মীয়-বিচ্ছেদ ব্যথা এঁদেরই সাহচর্যে লাঘব হলো।

লাতিন কোয়ার্টারে চিলে কুঠরিতে আবিষ্কার করা গরীব বিদেশী মেয়েটিকে ঘরের বৌ ক'রে আনায় পিয়ের-এর বৃদ্ধ পিতামাতা আদৌ বিস্মিত হন নি। প্রথম দর্শনেই তাঁরা মেয়েটিকে ভালোবেসে ফেললেন। স্লাভ মেয়েদের 'স্বাভাবিক সৌন্দর্য' এর কারণ নয়, বুদ্ধিমতী পুত্রবধূর চারিত্রিক সৌন্দর্যই শ্বশুরশাশুড়ীর প্রশংসা অর্জন করল।

সো'এর এই পরিবারে এসে শ্বশুর ও তাঁর অনুরাগী বন্ধুদের রাজনীতির প্রতি দুর্বার আকর্ষণ লক্ষ্য ক'রে মারী অবাক হলেন। ডাঃ কুরী তখন পর্যন্ত ১৮৪৮ সালের আদর্শ আঁকড়ে ধরে বসে ছিলেন; র‍্যাডিক্যাল পন্থী আঁরী ব্রিসঁর সঙ্গে তাঁর গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল। তিনি ছিলেন সংগ্রামী। শৈশবে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে ধূমায়িত বিদ্রোহ, তথা সামাজিক আদর্শবাদের প্রতি আস্থাসম্পন্ন পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়ে মারী ফরাসীবাসীর স্বভাবপ্রিয় রাজনৈতিক দ্বন্দ্বপ্রবাহের অর্থ সহজেই উপলব্ধি করলেন। দীর্ঘ বাদানুবাদ এবং জ্বালাময়ী ভাষায় রাজনৈতিক বিশ্লেষণ তিনি সাগ্রহে শুনতেন। সামান্য ক্লান্তি বোধ করলে স্বামীর নীরব স্বপ্নরাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। রু-স্তঁ-সাবঁর রবিবাসরীয় আলোচনায় বন্ধুমণ্ডলী পিয়েরকে টানতে চেষ্টা করলে বৈজ্ঞানিক সবিনয়ে উত্তর দিতেন: 'মেজাজ হারাতে বাপু আমি রাজী নই।'

সক্ষম রাজনীতিতে পিয়ের নামতে পারতেন না। (মারী পরে লিখেছিলেন) গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল, কোন বিশেষ দলগত মতের দ্বারা পরিচালিত হতে তাঁর আপত্তি ছিল। ··· ব্যক্তিগত জীবনে হোক কিংবা বাইরের কোন মতের ক্ষেত্রেই হোক হিংসার প্রতি তাঁর আস্থা ছিল না।

যে দু-একটি বিশেষ ক্ষেত্রে পিয়ের তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য ভেদ ক'রে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন, তার মধ্যে একটি হলো ড্রেফুস্ মামলা। এক্ষেত্রেও দলীয় রাজনীতির জন্য নয়—নিরীহ উৎপীড়িতের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক সহানুভূতির জন্যই তাঁর এই উত্তেজনা। ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ ছিলেন বলেই অবিচারের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর মন। অক্টোবর মাসে ২৪নং

রু-দে লা প্লেসিয়েরের ফ্ল্যাটে এই তরুণ-দম্পতি বাসা নিলেন। জানালা খুললেই সামনে এক মস্ত বাগান। এছাড়া এ বাড়িটিতে আর বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না, না ছিল অন্য কোন আরামের ব্যবস্থা।

ছোট্ট তিনখানি ঘর। সাজাবার মতো বিশেষ কিছু নেই। ডাঃ কুরী আসবাব পাঠাতে চাইলেন কিন্তু নব দম্পতি আপত্তি জানালেন। কারণ প্রত্যেকদিন সকালে তো এই সব সোফা আর আসবাব ঝাড়পোঁছ করা, পালিশ করার জন্য যথেষ্ট সময় মারীকে দিতে হবে। সে-সময় কোথায় তাঁদের ? তাছাড়া তাঁরা বন্ধুবান্ধবদের আপ্যায়নের জন্য যখন সময়ও নষ্ট করতে পারবেন না তখন সোফা-চেয়ারের প্রয়োজনই বা কি। তবুও যদি কেউ তরুণ দম্পতিকে বিরক্ত করার ইচ্ছে নিয়ে চারতলার সিঁড়ি ভেঙে তাঁদের মহলে আসে, তবে ঘরে ঢুকে দেয়ালঠাসা বই আর সাদা কাঠের টেবিলের চেহারা দেখে তাকে ফিরে আসতে হবে। টেবিলের এক প্রান্তে মারীর চেয়ার, অন্য প্রান্তে পিয়ের-এর। ফিজিক্সের ওপর রচিত অসংখ্য তথ্য প্রবন্ধাদি, একটি পেট্রোলিয়ম বাতি, এক থোকা ফুল—ব্যাস্ ! ঘরে দুখানি চেয়ার মাত্র, তৃতীয় চেয়ার নেই। মারী ও পিয়ের-এর বিনম্র, বিস্মিত দৃষ্টির সামনে অপ্রয়োজনীয় আগন্তুকের পক্ষে স্থান ত্যাগ করা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না।

প্রিয়তমা পত্নী, কেবল বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যাঁর জীবনের সার্থকতা, তাঁর পাশে থেকে বিজ্ঞান চর্চা করাই ছিল পিয়ের-এর একমাত্র সাধনা। মারীর জীবন-সংগ্রাম অপেক্ষাকৃত কঠিন ছিল, কারণ নারীর নিজস্ব যেসব ক্লান্তিকর দায়িত্ব রয়েছে তার হাত থেকে পরিত্রাণ তো তিনি পান নি। ছাত্রী অবস্থায় সর্‌বনে তিনি যে চরম কৃচ্ছ্রসাধন ও আত্মবিস্মৃতির মধ্যে কাটিয়ে ছিলেন, এখন আর তেমন ক'রে বাস্তব জীবনকে তো অবহেলা করা সম্ভব নয়। ছুটির শেষে ফিরে এসে প্রথমেই একখানি খাতা কেনা হলো, মলাটের ওপর সোনার জলে বড় বড় হরফে লেখা : 'হিসাবের খাতা।'

এ সময়ে পিয়ের কুরী 'স্কুল-অব-ফিজিক্সে' পাঁচশ' ফ্র্যাঙ্ক মাইনে পেতেন। যতদিন পর্যন্ত না মারী ইউনিভারসিটির সদস্য হিসাবে অনুমতিপত্র পেয়ে ক্লাসে শিক্ষকতা করতে পারছেন, ততদিন এই পাঁচশ' ফ্রাঙ্কই তাঁদের একমাত্র আয় হয়ে রইল।

অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন অতিবাহিত করতেন তাঁরা, কাজেই এই টাকাতেই তাঁদের চলে যেত। তা ছাড়া ব্যয় সঙ্কোচ করতে মারী জানতেন। চব্বিশ ঘণ্টা তাঁকে কাজ করতে হতো।

স্বামীর স্কুলের ল্যাবরেটারিতে সারাটা সকাল আর বিকেল তাঁর কাটতো। এটুকু তো তাঁর প্রিয় কাজ। এর পর বাড়ি ঝাঁট দেওয়া, বিছানা পাতা, পিয়ের-এর পোশাক পরিচ্ছদের, আহারের তদারক করা। ঝি রাখাও সম্ভব ছিল না।...

সুতরাং মারী ভোরে উঠে বাজার করতেন আর স্বামীর হাত ধরে সন্ধ্যাবেলা স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে প্রায়ই মুদিখানায় বা গয়লাবাড়ি পিয়েরকে টেনে নিয়ে যেতেন। সকালে ল্যাবরেটারিতে যাবার আগে দুপুরের আনাজ কুটে রাখতেন। হায়! যেকালে মাদ্‌মোয়াজেল্ শ্ক্লোদোভ্স্কাকে সুপের মালমসলার কথা চিন্তা করতে হয় নি, সে দিনগুলো কোথায় হারিয়ে গেল?

মাদাম কুরী এ সব গৃহস্থালীর কাজ শেখা অবশ্য কর্তব্য মনে করলেন। বিয়ের ঠিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বৃদ্ধা মাদাম দ্লুস্কা ও দিদির কাছে রান্নার পাঠ নিতে গেলেন। মুরগীর সঙ্গে আলুভাজার রান্নাটি শিখে নিয়ে সযত্নে স্বামীকে সেসব তৈরি ক'রে পরিবেশনই করতেন; কিন্তু বৈজ্ঞানিক পিয়ের এত অন্যমনস্ক যে, স্ত্রীর এই সযত্ন প্রয়াসটুকু তাঁর চোখেও পড়ত না।

অপরিণত বয়সের দম্ভ মারীকে এ বিষয়ে প্রেরণা যোগাত, যদি কোন দিন অম্‌লেট রান্নার ত্রুটি ফরাসী শাশুড়ীর চোখে ধরা পড়ে যায়, তিনি হয়তো সরবে আক্ষেপ করবেন: 'ওয়ার্‌সতে মেয়েদের কেমন ধারা শিক্ষা দেয় বাপু?' এই আশঙ্কায় মারী রান্নার বইখানি বার বার ক'রে পড়তেন আর নির্ভুল বৈজ্ঞানিকের ভাষায় বইয়ের পাতার কিনারে কিনারে তাঁর প্রচেষ্টার ফলাফল টুকে রাখতেন।

ধীরে ধীরে সংসার সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা বাড়তে লাগল। প্রথম প্রথম গ্যাসের উনুনে প্রায়ই মাংসের রোস্ট পুড়ে নষ্ট হতো, পরে আর তা হতো না। বেরোবার আগে বৈজ্ঞানিক-নিপুণতার সঙ্গে মারী উনুনের তাপ নিয়ন্ত্রণ ক'রে 'স্টু'-র পাত্রখানা বসিয়ে মনে দুশ্চিন্তা নিয়ে সিঁড়ির দরজা বন্ধ করতেন। তারপর দৌড়ে নীচে নেমে স্বামীর কাছে পৌঁছে ইস্কুলের দিকে পা বাড়াতেন। মিনিট পঁচিশের মধ্যেই তাঁকে অন্যান্য বিচিত্র পাত্রের ওপর ঝুঁকে পড়ে ল্যাবরেটারির বার্নারের তাপ তেমনি সাবধানে নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা যেত।

আট ঘণ্টাব্যাপী বৈজ্ঞানিক গবেষণার ওপর দু-তিন ঘণ্টা সংসারের কাজেও যথেষ্ট হতো না। প্রতি সন্ধ্যায় হিসাবের খাতায় ঘটা করে—'কর্তার হিসাব,' 'গিন্নীর হিসাব' চিহ্নিত জায়গায় দৈনিক খরচপত্র কলাও ক'রে লিখে রেখে তবে

মারী কুরী টেবিলে বসে ইউনিভারসিটির সদস্য-পদ প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত হতেন। বাতির অপর দিকে পিয়ের 'স্কুল-অব-ফিজিক্সে'র নতুন ধারার কর্মপদ্ধতি প্রস্তুতে ব্যস্ত। প্রায়ই যখন মনে হতো স্বামী তাঁর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন, তখন চোখ তুলে নিবিড় শ্রদ্ধা-ভালোবাসার এই অভিব্যক্তি অন্তরে গ্রহণ করতেন। পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত এই নারী ও পুরুষ নীরব স্মিত হাস্যে পরস্পরকে অভিষিক্ত করতেন। রাত দু-তিন প্রহর অবধি এঁদের ঘরের জানালা দিয়ে আলো দেখা যেত আর ব্যগ্র হাতে এঁদের বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টানো আর কলমের খস খস শব্দ পাওয়া যেত।

১৮৯৫-র ২৩শে নভেম্বর যোসেফকে লেখা মারীর চিঠিতে দেখি:

'আমাদের সব ভালোই চলেছে, কুশলেই আছি, জীবনের দক্ষিণ হস্ত যেন আমাদের দিকে প্রসারিত! ক্রমে ক্রমে আমাদের ছোট্ট বাড়িখানি গুছিয়ে নিচ্ছি। একা হাতে সামলাতে হয় ব'লে বেশী বাড়াতে চাই না, তাতে ভারি দুশ্চিন্তা আর যত্ন প্রয়োজন। দিনে এক ঘণ্টার জন্যে একটি ঝি এসে বাসন ক'টা মেজে দুটো ভারী কাজ ক'রে দিয়ে যায়। রান্না আর ঘরের কাজ নিজেই করি।

'ক'দিন অন্তর আমরা সো'য় আমার শ্বশুর শাশুড়ীর কাছে যাই, এতে আমাদের কাজের ক্ষতি বিশেষ হয় না। সেখানে দোতলায় দু'খানা ঘর আমাদের জন্য সাজানোই থাকে, দরকার মতো সবকিছু হাতের কাছে পাই। সেখানে নিজের বাসায় থাকার আরাম তো পাইই, তা ছাড়া যে কাজগুলো ল্যাবরেটারিতে করা সম্ভব নয়, সেগুলো এখানে সেরে নিই।

'দিন পরিষ্কার থাকলে আমরা সাইকেলেই যাই, পথে বৃষ্টি নামলে শুধু ট্রেনে চাপি। 'মোটা মাইনের' চাকরি এখনও আমার ঠিক হয় নি। ল্যাবরেটারি নিয়েই থাকতে হবে—এমন একটা কাজের কথা চলছে। মাষ্টারি করার চেয়ে এ-জাতীয় আধা-বৈজ্ঞানিক, আধা-শিল্পীক কাজই কিন্তু আমার পছন্দ বেশী।...'

মারীর লেখা আর-একখানা চিঠি তাঁর দাদার কাছে—১৮.৩.৯৬ তারিখে:

'আমাদের দিনগুলো একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। দ্লুস্কি-পরিবার আর সো'য় আমাদের শ্বশুরবাড়ির লোকদের ছাড়া আমরা বড় একটা কাউকে চিনি না। থিয়েটার কদাচিৎ যাওয়া হয়। তাছাড়া নিজেদের সাধ-আহ্লাদ বড় একটা নেই। ইচ্ছে আছে ইস্টারের ছুটিতে আমরা বেড়াতে বেরোব।

'হেলার বিয়েতে উপস্থিত থাকতে পারলাম না বলে আন্তরিক দুঃখিত। যদি

আমাদের মধ্যে আর কেউ ওয়ার্‌সতে না থাকত তাহলে হয়তো কোনরকমে টাকা জোগাড় ক'রে চলে যেতাম। তবে হেলা একেবারে একা নেই। এখানকার প্রয়োজনে শুভদিনের আনন্দটুকু থেকে আমার নিজেকে বঞ্চিত করতেই হোল।

'কয়েক সপ্তাহ ধরে এখানে দারুণ গরম পড়েছে। গ্রামাঞ্চলে চারদিক সবুজ হয়ে আছে। সো'য় ফেব্রুয়ারি মাসেই ভায়লেট ফুল চোখে পড়েছিল, এখন তা চারদিক ছেয়ে গেছে, বাগানেও প্রচুর হয়েছে। প্যারীর পথে ঘাটে প্রচুর ফুল বিক্রি হয়, খুব সস্তা, আমাদের বাড়িতে সর্বদাই এনে রাখি।...'

দাদা ও বৌদির কাছে লেখা মারীর আর-একখানা চিঠি (২৬ই জুলাই, ১৮৯৬):

'প্রীতিভাজনেষু, এবছর বাড়ি ফিরে তোমাদের দু'জনকে কাছে পেতে কী যে ইচ্ছে করছে না, তা কি ক'রে প্রকাশ করি! কিন্তু ইচ্ছে হলেই বা উপায় কি! হাতে না-আছে টাকা, না আছে সময়। আমি যে ফেলশিপের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি তার পরীক্ষা আগস্ট মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলবে বলে মনে হয়।'

'সেকেণ্ডারি এডুকেশন'-এর সদস্য বৃত্তির পরীক্ষায় মাদাম কুরী প্রথম স্থান অধিকার করলেন। কোন কথা না বলে পিয়ের মারীকে তাঁর দুই বাহুর নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে টেনে নিলেন; দু'জনে হাত ধরে রু-দে লা গ্লেসিয়েরে চলে গেলেন; সেখানে সাইকেল দুটির চাকায় হাওয়া ভ'রে আর থলির ভেতর দরকারী টুকিটাকি কিছু জিনিস ভ'রে নিয়ে অভার্নের পথে বেরিয়ে পড়লেন। কি অফুরন্ত তাঁদের উত্তম!

পরে মারী লিখেছিলেন:

'এক রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের কথা মনে পড়ে; অনেকক্ষণ ধরে একটা উঁচু চড়াই পার হয়ে হঠাৎ আমরা এত ওপরে ওব্রাকের সবুজ ক্ষেত পেয়ে গেলাম! আরেক দিন ট্রুয়েরের খাদে সন্ধ্যে বেলা বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ কানে এল দূরে নদীতে এক মাঝি গান গেয়ে নৌকো বেয়ে চলেছে। ভুল পথে নেবে বাড়ি পৌঁছতে রাত শেষ হয়ে গেল। কয়েকটা মালগাড়ির ঘোড়া সাইকেল দেখে ভড়কে গেল, ফলে সাইকেল শুদ্ধ আমাদের চষা ক্ষেতে নেবে পড়তে হলো। তারপর পাহাড়ী জ্যোৎস্নার আবছা আলোয় চড়াই পথ বেয়ে চললাম। গোরু-গুলো তাদের খাটাল থেকে আমাদের দিকে ড্যাব ড্যাব চোখে চেয়ে রইল।'

বিয়ের পর দ্বিতীয় বছর। মারী সন্তানসম্ভবা। স্বাস্থ্যের ওপর তার প্রভাব পড়েছে। সন্তান চেয়েছিল মারী ঠিকই, কিন্তু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সামনে

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ইস্পাতের চুম্বকশক্তি পরীক্ষা করায় যখন শারীরিক অসুস্থতা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল, তখন বিরক্ত হয়ে অনুযোগ করলেন। এ অনুযোগ আমরা দেখি বান্ধবী কাজিয়াকে লেখা চিঠিতে (২. ৩. ১৮৯৭):

'প্রিয় কাজিয়া, জন্মদিনের চিঠিখানা দিতে দেরী হয়ে গেল, কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহ হলো আমি বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়ায় চিঠি লিখবার মত শারীরিক ও মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম।

'আমি মা হতে চলেছি কিন্তু এর বহিঃপ্রকাশ বড় নিষ্ঠুর। দু'মাস যাবৎ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমানে আমার মাথা ঘোরে। সহজেই ক্লান্তি আসে, আর বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছি, বাইরে থেকে বেশী বোঝা যায় না বটে, কিন্তু কাজ করতে পারছি না ব'লে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে থাকে। ঠিক এই সময়ে শাশুড়ী ঠাকরুণও খুব অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় নিজের-এ অবস্থার ওপর দারুণ রাগ ধরে যাচ্ছে।...'

১৮৯৭-র ৩১শে মার্চ মারী লেখেন দাদা যোসেফকে: 'এখানে নতুন কোন খবর নেই। আমার সারাক্ষণ শরীর খারাপ লাগে অথচ বাইরে থেকে বোঝবার জো নেই। আমার শাশুড়ীর অসুখ এখনও সারে নি আর সারবার কোন উপায়ও নেই (বুকে ক্যান্সার), কাজেই সবাই মুষড়ে পড়েছে: উপরন্তু আমার আশঙ্কা হয় যে, আমার সন্তান জন্মাবার সময়ে সময়ে তাঁরও মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে। তাই যদি হয়, বেচারা পিয়েরকে তাহলে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হবে।'

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে পিয়ের ও মারীকে বিচ্ছিন্ন হতে হলো। গত দুই বছর তাঁরা এক ঘণ্টার জন্যও পরস্পরকে ছেড়ে থাকেন নি। প্রফেসর শ্ক্লোদোভস্কি গ্রীষ্মের ছুটিতে ফ্রান্সে এসে পোর্ট ব্লাংকের ছোট্ট 'হোটেল-অব-দি-গ্রে-রক্‌স্‌'-এ মেয়েকে নিয়ে গেলেন। কথা ছিল পিয়ের পারীর কাজ সেরে এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেবেন।

১৮৯৭-র জুলাই মাসে মারীকে চিঠি লিখলেন পিয়ের: 'আমার ছোট্ট সোনা মিষ্টি প্রিয়া, আজ তোমার চিঠি পেয়ে ভী-ষ-ণ খুশি হয়েছি। এখানে নতুন খবর কিছু নেই, শুধু তোমায় ছেড়ে থাকার কষ্টটুকু ছাড়া; তোমার সঙ্গে আমার মনকে বেঁধে নিয়ে চলে গেলে...'

অতি কষ্টে দুরূহ পোলভাষায় এই ক'টি মধু ঢালা কথা দিয়ে ভরা চিঠিখানি বৈজ্ঞানিকের সযত্ন রচনা। পোলভাষাতেই খুব সহজ ক'রে, যাতে নতুন পড়ুয়ার বুঝতে অসুবিধা না হয়, সেইভাবে মারী উত্তর দিলেন:

'প্রিয়তম, এখানে সবই সুন্দর: রোদ-ঝলমলে গ্রীষ্মের দিন। তোমার

বিহনে আমার মনে সুখ নেই। তাড়াতাড়ি চলে এস, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার পথ চেয়ে থাকি, কিন্তু তোমার দেখা পাই না···আমি ভালোই আছি, যথাসম্ভব কাজ করি ; কিন্তু যতটা ভেবেছিলাম, এখন দেখছি আমার পোয়ঁ্যাকারের বইখানা তার চেয়ে কঠিন। তোমার সঙ্গে আলোচনার বিশেষ দরকার। যে সব জায়গা বেশী দরকারী আর দুর্বোধ্য মনে হয়েছে, সে-জায়গাগুলো একসঙ্গে পড়ব।···'

পরে ফরাসী ভাষায় পিয়ের "আমার তরুণী প্রিয়া"কে সো'-এর খবরাখবর আর বছরের শেষে নিজের কাজের হিসেব দিয়ে চিঠি লিখেছেন। যে শিশু আসছে তার জন্য জামা আর আনুষঙ্গিক কাপড়-চোপড়ের বিষয়ে গুরুগম্ভীর ভাষায় লিখেছেন :

'আজ তোমার নামে ডাকযোগে একখানা পার্শেল পাঠালাম। তার ভেতর দু'খানা পশমের জ্যাকেট পাবে, বোধহয় মাদাম পি'-র কাছ থেকে এসেছে। একটি সবচেয়ে ছোট ; আরেকটি তার পরের মাপের। প্রথমটা এমন ভাবে বোনা হয়েছে যাতে ইচ্ছে মতো বাড়ানো-কমানো যায়, কিন্তু এছাড়া একখানা বড় লিনেন কিংবা সুতী-কোটের দরকার। দু'রকম মাপেরই জামা হাতে রাখা ভালো···'

এরপরে হঠাৎ অনুরাগে ভাষা গাঢ় হয়ে এসেছে : 'বোধহয় আমার প্রিয়তমা আর আমি দু'জনেই কোন নতুন উদ্যমের সন্ধানে চলেছি। এখন, যখন আমি আমার সর্বান্তঃকরণে তোমাতেই ডুবে আছি, তখন তোমায় আমি ভালো ক'রে চিনতে চাই, তোমার কার্যকলাপের সঙ্গে তাল রাখতে চাই, আর সেই সঙ্গে এও ইচ্ছে হয় যে আমার গভীর ভালোবাসা তুমি অনুভব করো, কিন্তু কিছুতেই আমি নিজেকে স্পষ্ট ক'রে বোঝাতে পারছি না।'

আগস্ট-এর গোড়াতেই পিয়ের পোর্ট ব্লাংক-এ চলে গেলেন। স্বভাবতই এই ধারণা করা যেতে পারে যে, আট মাস গর্ভবতী মারীর শারীরিক অবস্থা দেখে স্বামীর মন গলে যাবে আর স্ত্রীর পাশে শান্তভাবে গরমের ছুটির ক'টা দিন কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু তা হলো না। পাগলের মতো—হয়তো বা বৈজ্ঞানিকের মতো—অবিবেচক এই দম্পতি সাইকেল্ ক'রে ব্রেস্ট-এর দীর্ঘ পথে পাড়ি দিলেন। মারী বললেন তাঁর কোন ক্লান্তি নেই, পিয়েরও সেকথা বিশ্বাস করলেন। পিয়ের ভাবতেন যে মারী সাধারণের ঊর্ধ্বে। বাঁধাধরা কোন নিয়মই তাঁর স্ত্রীর ওপর খাটে না।

কিন্তু এবার আর মারীর শরীর বইল না। অত্যন্ত লজ্জায় পড়ে মারী মাঝ

পথে ছেদ টানতে বাধ্য হলেন। সেখান থেকে প্যারীতে গিয়ে ১২ই সেপ্টেম্বর এক কন্যা প্রসব করলেন। অত্যন্ত সুন্দরী এই কন্যা আইরিন ভবিষ্যতে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন।

পারিবারিক জীবন কিংবা বৈজ্ঞানিক-জীবন কোন্‌টি বেছে নেবেন, এ প্রশ্ন নিয়ে মারী কোনদিন মাথা ঘামান নি। প্রেম, মাতৃত্ব ও বিজ্ঞান—একাধারে তিনটিকে জীবনে গ্রহণ করবেন, কাউকেই বঞ্চিত করবেন না, এই ছিল তাঁর সঙ্কল্প। ভালোবাসা আর দৃঢ় সঙ্কল্প—এই ছিল তাঁর সফলতার মূলে।

১৮৯৭-র ১০ই নভেম্বর মারী লেখেন অধ্যাপক শ্‌ক্লোদোভস্কিকে :

'আমার ক্ষুদে রাজরানীকে আমি এখনও ভরপেট দুধ দিতে পারি, কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে যে আর বেশীদিন পারব না। সপ্তাহ তিনেক আগে বাচ্চার ওজন কমে গিয়েছিল। আইরিনকে অসুস্থ, খিন্‌খিনে, নির্জীব মনে হচ্ছিল। দিন কয়েক হলো সে-ভাবটা কেটেছে। বাচ্চার ওজন যদি ঠিকমত বাড়তে থাকে, আমি ওকে খাইয়ে যাব। যদি না বাড়ে তবে ধাত্রী রাখতেই হবে। খরচটাও কিছু বাড়বে, তা হোক, বাচ্চার যত্ন তো নিতেই হবে। এখানে এখন বেশ রোদ ওঠে, গরম ভাব রয়েছে। আমার সঙ্গে কিংবা ঝিয়ের সঙ্গে আইরিন বেড়াতে যায়। আমি ওকে একটা ছোট্ট গামলায় স্নান করাই।'

এরপরে শিগগিরই ডাক্তারের নির্দেশে বাচ্চাকে দুধ দেওয়া বন্ধ করতে হলো। বাচ্চাকে স্নান করানো, সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যা চারবেলা জামা বদলানো—সব নিজে হাতে করতেন। আয়া বাচ্চাকে তার ঠেলাগাড়িতে ক'রে পার্কে নিয়ে যেত, ততক্ষণে এই নতুন মা ল্যাবরেটারির কাজ সেরে নিয়ে একটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকার জন্য চুম্বকের ওপর তাঁর প্রবন্ধটি শেষ ক'রে রাখতেন।

এই ভাবে কন্যার জন্মের তিন মাসের মধ্যে মারী তাঁর প্রথম গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করতে সমর্থ হলেন।

মাঝে মাঝে জীবনের এই অসাধারণ গতি টেনে চলা অসম্ভব মনে হতো। সন্তান সম্ভাবনার পর থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল। কাসিমির দ্লুস্কি ও কুরী পরিবারের গৃহ চিকিৎসক ডাঃ ভদিয়ে মারীর বাঁ ফুসফুসে যক্ষ্মার আশঙ্কা করেন। মারীর মা যক্ষ্মায় মারা গেছেন শুনে তাঁরা বেশ কয়েক মাস মারীকে স্যনাটরিয়ামে বিশ্রাম নিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু এই একরোখা বৈজ্ঞানিক ডাক্তারের উপদেশ কানেই তুললেন না।

কি ক'রেই বা তিনি যেতে পারেন ?

ল্যাবরেটারি, তাঁর স্বামী, তাঁর সংসার, তাঁর মেয়ে—এদের ছেড়েই বা তিনি

থাবেন কি ক'রে? দাঁত ওঠার সময়ে ছোট্ট আইরিনের কান্না, ঠাণ্ডা লাগা বা এ ধরনের অসংখ্য ছোট খাট ঘটনায় বাড়ির শান্তিভঙ্গ হতো আর দুই বৈজ্ঞানিক বিনিদ্র রজনী যাপন করতেন। কাজ করতে করতে হঠাৎ মারী হয়তো গবেষণাগার থেকে পার্কের দিকে ছুটলেন:

'বাচ্চাটাকে আয়া হারিয়ে ফেলেনি তো? নাঃ! বাঁচা গেল। ঐ তো বাচ্চার গাড়িটা ঠেলে নিয়ে বেড়াচ্ছে আয়া। বাচ্চার সাদা জামাটাও এখান থেকে দেখা যাচ্ছে।'

এদিক দিয়ে মারী শ্বশুরের অমূল্য সাহায্য পেলেন। আইরিনের জন্মের কয়েক দিন পরে মারীর শাশুড়ী মারা গেলেন। শোকাকুল বৃদ্ধ পিতামহ নাতনিকে বক্ষে তুলে নিলেন। রু-দ্য-সাল্ল'র বাগানে শিশুর প্রথম হাঁটি হাঁটি পা পা শুরু হলো তাঁরই হাত ধরে, বৃদ্ধ তাকে আগলে নিয়ে বেড়ালেন। রু-দে-লা গ্লেসিয়ের ছেড়ে যখন মারী ও পিয়ের বুলেভার্ড কেলরমান-এ ছোট্ট বাড়ি নিলেন, তখন থেকে বৃদ্ধ ডাঃ কুরীও এঁদের সঙ্গে এসে বাস করতে থাকেন। তিনি ছিলেন আইরিনের প্রথম শিক্ষক ও প্রিয় বন্ধু।

১৮৯১-র নভেম্বর মাসে পোল দেশীয়া যে মেয়েটি ট্রেনের ফোর্থ ক্লাস থেকে গার দু নর্ স্টেশনে নেমেছিল, তারপরে তাঁর জীবন-পরিক্রমা বহু দূর ব্যাপ্ত। মানিয়া শ্ক্লোদোভস্কা ফিজিক্স, কেমেষ্ট্রির সঙ্গে সঙ্গে সারা নারী-জীবনটাকেই যেন আবিষ্কার ক'রে ফেলেছেন। ছোট, বড় বহু বাধা পার হতে গিয়ে একথা একবারও তাঁর মনে হয় নি যে, কি অসীম শক্তি আর অসম সাহসিকতার পরিচয়ই না তিনি দিয়ে গেছেন।

এই সব সংগ্রাম আর সফলতা তাঁর দেহের ওপর ছাপ ফেলে ছিল। ত্রিশ বছর বয়সের সময়ে তোলা তাঁর ছবির দিকে চেয়ে মনটা বড় খারাপ লাগে। সেই গোল গোল ভরাট চেহারার মেয়েটি যেন হাওয়ায় ভাসছে! বলতে ইচ্ছে করে: 'কী অপূর্ব কী অদ্ভুত সুন্দরী!' কিন্তু ঐ ঘন ভুরুর নীচে বিশ্বজগৎ পেরিয়ে যে দৃষ্টি, তার দিকে চেয়ে মুখের কথা মুখেই আটকে যায়।

যশোলাভের সঙ্গে সঙ্গে মাদাম কুরীর আর এক রূপ যেন আরও খুলে যায়।

। রেডিয়ম আবিষ্কার ।

১২

যে সময়ে তরুণী গৃহিণী একদিকে সংসার করছেন, স্বামী-কন্যার যত্ন নিচ্ছেন, নিজ হাতে রান্না করছেন, সেই একই সময়ে এই বিজ্ঞানী স্কুল-অব-ফিজিক্সের ক্ষুদ্র গবেষণাগারে বিজ্ঞান-জগতের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারের কাজে ডুবে ছিলেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মারী পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটো ডিগ্রি, ফেলোশিপ আর কঠিন ইস্পাতের চুম্বকত্ব নিয়ে রচিত প্রবন্ধের জন্য বিশেষ স্বীকৃতি পত্র। আইরিনের জন্মের পর সুস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গবেষণাগারে কাজ শুরু করলেন।

এর পর তিনি পান ডক্টর ডিগ্রি। কোন্ লাইন ধরে তিনি থিসিসের জন্য এবার এগোবেন? একটা নতুন কিছু নিয়ে গবেষণা শুরু করতে চান। এই ভাবে অনিশ্চিয়তার মধ্যে তাঁর দিন কাটে।

লেখক যেমন নতুন উপন্যাসের বিষয়বস্তু নিজের মনে পর্যালোচনা ক'রে একটা স্থির ধারাপথ ধরে এগোতে শুরু করেন, তেমনি স্বামীর সহযোগিতায় মারী ফিজিক্সের নতুনতম কার্যকলাপ মন্থন ক'রে থিসিসের বিষয়বস্তুর সন্ধান করতে থাকেন। স্বামী তাঁর বিচক্ষণ পদার্থবিদ, তাঁর উপদেশ মারীর কাছে শিক্ষকের উপদেশের মতো, গুরুর উপদেশের মতো।

সাগর পাড়ি দেবার আগে নাবিক যেমন গ্লোবের ওপর ঝুঁকে পড়ে দূর দেশের বিচিত্র নাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে, মারীও তেমনি আধুনিকতম গবেষণা-মূলক বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি সযত্নে অনুধাবন করতে থাকেন। ফরাসী বৈজ্ঞানিক আঁরী বেকেরেলের বছরখানেক আগে লেখা একটি বিষয়বস্তু তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি ও তাঁর স্বামী বৈজ্ঞানিক বেকেরেলের এই কাজের কথা আগে থেকেই জানতেন। আবার অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে মারী লেখাটি পড়লেন। রঞ্জেনের 'এক্স-রে' আবিষ্কারের পর থেকে আঁরী পোয়ঁ্যাকারে চিন্তা করছিলেন যে প্রতিপ্রভ (fluorescent) পিণ্ড আলোর সংস্পর্শে এলে এক্স-রে জাতীয় রশ্মিতে পরিণত হয় কি না। একই সমস্যাদ্বারা আকৃষ্ট হয়ে আঁরী বেকেরেল ইউরেনিয়ম নামক এক দুষ্প্রাপ্য পদার্থের যৌগপিণ্ডগুলো

পরীক্ষা করছিলেন। কিন্তু যা আশা করেছিলেন, তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক অত্যাশ্চর্য জিনিস তিনি লক্ষ্য করলেন : ইউরেনিয়মের যৌগপিণ্ড (uranium salts) আলোক-সংস্পর্শ ছাড়াও আপনা থেকেই কয়েকটি অপরিচিত রশ্মি বিকিরণ করে। কালো কাগজে মোড়া ফটো-প্লেটের ওপর ইউরেনিয়ম-যৌগপিণ্ড রাখলে দেখা যায় কাগজ ভেদ ক'রে ফটো-প্লেটের ওপর ছাপ পড়েছে : এক্স-রে'র মতোই এই আশ্চর্য ইউরেনিয়ম যৌগপিণ্ড পারিপার্শ্বিক বাতাসকে পরিবাহী ক'রে ইলেক্‌ট্রোস্কোপ বা তড়িৎ-নিরূপক যন্ত্রে প্রতিফলিত হয়।

ইউরেনিয়ম যৌগপিণ্ডের বৈশিষ্টগুলো সৌরকিরণজাত নয়, মাসের পর মাস নীরন্ধ্র অন্ধকারে আবদ্ধ থাকলেও সেই বৈশিষ্ট্যগুলো ঠিকই থাকে—আঁরী বেকেরেল পর্যবেক্ষণ ক'রে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন। তিনিই প্রথম পদার্থবিদ যিনি এই বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করেন এবং পরবর্তীকালে মারী কুরী এর নামকরণ করেছিলেন "রেডিও-এ্যাক্‌টিভিটি" বা তেজস্ক্রিয়তা। কিন্তু তখন পর্যন্ত এই বিকিরণের পদ্ধতি কিংবা তার কারণ অবোধগম্যই ছিল।

বেকেরেলের আবিষ্কার কুরী-দম্পতিকে মুগ্ধ করল। ইউরেনিয়মের যৌগিক-পিণ্ডগুলো ক্রমাগত যে শক্তি ক্ষয় ক'রে চলেছে—সে যত সামান্যই হোক না কেন—তার উৎপত্তি কোথায়? এবং এই বিকিরণের নিয়মই বা কি? সত্যিই এটি গবেষণার বিষয়, এর উপরই তো থিসিস্ দেওয়া যেতে পারে! বিষয়বস্তুর নূতনত্ব মারীকে আকর্ষণ করল। বেকেরেলের কাজ অত্যন্ত আধুনিক এবং যতদূর তাঁর জানা ছিল, ইউরোপের কোন ল্যাবরেটারিতেই ইউরেনিয়মের মূল গবেষণা এখন পর্যন্ত হয় নি। নতুন বিষয়বস্তু হিসেবে এবং একমাত্র তথ্য হিসেবে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞান-আকাদেমিকে লেখা আঁরী বেকেরেলের মাত্র কিছু চিঠি-পত্রই শুধু পাওয়া যায়। এক অচেনা অজানা রাজ্যে মারীর এই প্রথম পদক্ষেপ।

কোথায় যে তাঁর গবেষণার কাজ শুরু করবেন সে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। স্কুল-অব-ফিজিক্সের পরিচালকের কাছে পিয়ের কয়েকবারই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলেন, কিন্তু সেদিক থেকে বিশেষ সাড়া পাওয়া গেল না। স্কুলের একতলায় একখানা ছোট্ট কাঁচের ঘর মারীকে ব্যবহার করতে দেওয়া হলো। সেই স্যাঁত-সেঁতে ঘরখানা ছিল অব্যবহার্য যন্ত্রপাতির গুদোম ঘর।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপযোগী বৈদ্যুতিক, তথা, অন্যান্য সবরকম সুবিধা হতে বঞ্চিত হয়েও মারী অধৈর্য হলেন না এবং এই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠেই তাঁর যন্ত্রপাতি কার্যকরী ক'রে তোলার চেষ্টা করলেন।

কাজটিও সহজ নয়। সূক্ষ্ম যন্ত্রের অগণিত দুশমন রয়েছে চারদিকে। বাতাসবাহী জলকণা, জলবায়ুর তাপের পরিবর্তন—এমনি সব শত্রু। এই ছোট্ট কারখানা-ঘরের আবহাওয়া অতি সূক্ষ্ম ইলেকট্রোমিটারের পক্ষেও যেমন ক্ষতিকর, তেমনি মারাত্মক মারীর স্বাস্থ্যের পক্ষেও। কিন্তু নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে মারী কখনও চিন্তা করতেই রাজী নন।

ডক্টর ডিগ্রি লাভ করার বাসনায় মারী প্রথম কাজ করেন ইউরেনিয়ম-রশ্মির "আয়োনেশন্" শক্তি-নির্ধারণ, অর্থাৎ কি উপায়ে সে বায়ুকে তড়িৎ পরিবাহী করে এবং তার সাহায্যে তড়িৎ-নিরূপক যন্ত্রটিকে (electroscope) চালিত করে।

ইতিপূর্বে মারীর স্বামী পিয়ের ও ভাশুর জ্যাক এক সূক্ষ্ম যন্ত্র তৈরি করেছিলেন তাঁদের দুই ভাইয়ের মিলিত এক গবেষণার জন্য। মারীর গবেষণার সাফল্যের মূলেও ছিল এই যন্ত্রটি। কাজের যন্ত্রপাতির মধ্যে একটি 'আয়োনেশন্ কক্ষ' একটি 'কুরী ইলেকট্রোমিটর' আর একটি 'পিজো-ইলেকট্রিক্ কোয়ার্টস্'।

কয়েক সপ্তাহ পরে প্রথম ফলাফল পাওয়া গেল। পরীক্ষাধীন পদার্থের ভিতর ইউরেনিয়মের পরিমাণের ওপরেই যে এই অত্যাশ্চর্য আলোর উজ্জ্বলতা নির্ভর করে এবিষয়ে মারী নিশ্চিন্ত হলেন। এই সঙ্গে আরও একটি সত্য ধরা পড়ে গেল—সেটি হলো: এই তেজস্ক্রিয়তা নির্ভুল ভাবে মাপা যায় এবং ইউরেনিয়মের যৌগিকাবস্থায় থাকা কিংবা আলোক বা উত্তাপের মতো বাইরের কিছু দ্বারা তা ব্যাহত হয় না।

সাধারণ লোকের কাছে এ জাতীয় তথ্যের হয়তো বিশেষ কোন মূল্যই নেই, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের কাছে এর মূল্য অপরিসীম। প্রায়ই দেখা যায়, পদার্থবিদ গবেষণা করতে করতে এমন এক আশ্চর্য সিদ্ধান্তে উপনীত হন যা হয়তো পূর্ব-পরিচিত কোনও নিয়মের অনুবর্তী। প্রায়ই গবেষকের গবেষণার কাজ এই স্তরে এসে থেমে যায়। গবেষক নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন, কাজ বন্ধ ক'রে দেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তেমন কিছু ঘটল না। ইউরেনিয়ম রশ্মির মধ্যে মারী যতই গভীর-ভাবে প্রবেশ করতে লাগলেন, ততই তাঁর মনে হলো, সবই অজানা, সবই অচেনা। পূর্ব পরিচিত আর কোন কিছুর সঙ্গেই এর তুলনা করা যায় না। অতি দুর্বল-শক্তি এই রশ্মি অপূর্ব, সবকিছু হতে স্বতন্ত্র।

দিন রাত্রী মারী এই নিয়েই ভাবছেন। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, এই অভাবনীয় বিকিরণের উৎপত্তিস্থল হলো এক আণবিক শক্তি। নতুন প্রশ্ন এল তাঁর মনে: যদিও কেবল ইউরেনিয়মের

মধ্যেই এর প্রকাশ দেখা গেছে, আর কোনও রাসায়নিক পদার্থ যে এই শক্তি ধরে না তার প্রমাণ কৈ? অন্যান্য বস্তুর পক্ষে এই শক্তি ধারণ করতে বাধা কোথায়? হয়তো শুধুমাত্র ঘটনাচক্রে ইউরেনিয়মের মধ্যেই প্রথম এর প্রকাশ নজরে পড়েছে আর সেই জন্যই পদার্থবিদদের মনে ইউরেনিয়মের কথাটাই বদ্ধমুল হয়ে আছে। এখন অন্যত্রও এর সন্ধান করা প্রয়োজন।...

সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু হলো। ইউরেনিয়মের পরীক্ষা ছেড়ে দিয়ে মারী পরিচিত শুদ্ধ বা অশুদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে—তারা একক অবস্থায়ই থাকুক কিংবা যৌগিক অবস্থায় থাকুক—কাজ শুরু করলেন। ফল পেতে বেশী দেরী হলো না। দেখা গেল থোরিয়ম তার এক যৌগিকাবস্থা থেকেই ইউরেনিয়মের মতোই একই ভাবে রশ্মি বিকিরণ করে। এখানে পদার্থবিদ অনুমান করলেন: তা হলে এই আশ্চর্য প্রক্রিয়া শুধুমাত্র ইউরেনিয়মের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। এবার এই প্রক্রিয়ার একটা নামকরণ প্রয়োজন। মাদাম কুরী নাম দিলেন: রেডিও-এ্যাকটিভিটি বা তেজস্ক্রিয়তা। ইউরেনিয়ম থোরিয়ম ইত্যাদি যেসব রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের মধ্যে এই শক্তির অস্তিত্ব পাওয়া গেল, তাদের নাম দেওয়া হলো রেডিও-এলিমেণ্ট বা তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ।

এই তেজস্ক্রিয়তা বৈজ্ঞানিককে এত মুগ্ধ করল যে, তিনি একই ভাবে বার বার বিভিন্ন পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। কৌতূহল,—অপরূপ নারীসুলভ কৌতূহল যা বৈজ্ঞানিকের গুণ বলে ধরা হয়—মারীর ভেতর তারই পূর্ণ বিকাশ দেখা গেল। সাধারণতঃ কম্পাউণ্ড, সল্ট, অক্সাইড ইত্যাদি যেসব বস্তুর পরীক্ষা করা হয়, তিনি তার মধ্যেই তাঁর গবেষণা সীমাবদ্ধ রাখলেন না। স্কুল-অব-ফিজিক্স কর্তৃক সংগৃহীত বিচিত্র সব পদার্থ আহরণ ক'রে, নিজের জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাবার চাহিদায় ইলেকট্রোমিটর যন্ত্রের সাহায্যে সবগুলিকে যাচাই ক'রে দেখতে লাগলেন।

প্রতিভাবানদের চিন্তাধারার মতো মারীর চিন্তাধারাও ছিল সহজ সরল। গবেষণা করতে করতে যেখানে মারী এসে থামলেন, সেখানে কত গবেষক যে মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছর পর্যন্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থেমে থাকেন। যাবতীয় রাসায়নিক দ্রব্য যাচাই ক'রে, থোরিয়মের মধ্যে নিহিত শক্তি আবিষ্কার ক'রে তাঁরা হয়তো অযথা ভেবে মরতেন: এই তেজস্ক্রিয়তার জন্ম কোথায়? মারীও সেই প্রশ্নই করলেন, সেই বিস্ময়ই তাঁর আত্মপ্রশ্ন। কিন্তু তাঁর বিস্ময় ফলপ্রসূ হয়েছিল। বাস্তব যতদুর সম্ভব তিনি পরীক্ষা করেছিলেন, এবার যে-রাজ্যে এখনও নজর পড়েনি, সেই অজানার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন।

আগে থেকেই তিনি বুঝেছিলেন কিংবা বুঝতে পারছিলেন বলে ভাবছিলেন যে, ধাতব পদার্থ পরীক্ষার ফল কি হতে পারে। ইউরেনিয়ম ও থোরিয়ম বর্জিত দ্রব্য সম্পূর্ণ "তেজস্ক্রিয়হীন" হবে এবং ইউরেনিয়ম ও থোরিয়ম বিশিষ্ট-পদার্থ তেজস্ক্রিয় হবে।

তাঁর এই অনুমান পরীক্ষার সাহায্যে সত্য বলে প্রমাণিত হলো। "তেজ-স্ক্রিয়হীন" পদার্থগুলিকে বর্জন ক'রে মারী অন্যান্য পদার্থের তেজস্ক্রিয়তার পরিমাপ করতে লাগলেন। এরপরেই এক নাটকীয় ঘটনা ঘটল : পরীক্ষাধীন দ্রব্যসমূহের অন্তর্গত ইউরেনিয়ম ও থোরিয়ম থেকে যে পরিমাণ বিচ্ছুরণ অনুমান করা গিয়েছিল—তার থেকে তা' 'অনেক বেশী পরিমাণে শক্তিশালী' হতে পারে!

তাঁর মনে হলো : 'এ নিশ্চয়ই পরীক্ষার ভুল…' কারণ প্রত্যাশিত ঘটনার প্রতি সন্দেহজড়িত দৃষ্টি দিয়েই বৈজ্ঞানিক প্রথমে দেখে থাকেন।

অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি বারবার সেই একই পদার্থগুলি পরীক্ষা ক'রে চললেন। শেষ অবধি হাতের প্রমাণকে মানতে বাধ্য হলেন; যৌগিক-পদার্থের অন্তঃস্থিত ইউরেনিয়ম ও থোরিয়ম-এর পরিমাণ দিয়ে বিচ্ছুরণের এই তীব্রতা ব্যাখ্যা করা যায় না।

তবে এই তীব্র তেজস্ক্রিয়তার ভিত্তিমূল কোথায়? এক্ষেত্রে একটিমাত্র ব্যাখ্যাই সম্ভব এবং তা হলো, এই দ্রব্যগুলিতে ইউরেনিয়ম ও থোরিয়ম ছাড়াও অনেক বেশী শক্তিসম্পন্ন অন্য কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে।

কিন্তু সে-বস্তুটি তা হলে কি? ইতিপূর্বে মারী যাবতীয় পরিচিত রাসায়নিক পদার্থ যাচাই ক'রে দেখেছেন। প্রতিভাময়ী রমণীর মন নির্ভুল যুক্তি সহকারে সাড়া দিয়ে উঠল। ঐ আকরের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন একটা তেজস্ক্রিয় কিছু রয়েছে যার মূলে আছে কোন অজ্ঞাত রাসায়নিক পদার্থ, এক মৌলিক পদার্থ : এক নতুন মৌলিক পদার্থ।

এক নতুন মৌলিক পদার্থ! অনুমান যতই আকর্ষণীয় বা লোভনীয় হোক্ না কেন—এখন পর্যন্ত তা অনুমানই মাত্র। এখন পর্যন্ত এই শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় পদার্থটি কেবলমাত্র মারী ও পিয়ের-এর কল্পনারাজ্যেই বিরাজ করছে। এই সময়ে একদিন মারী ব্রনিয়াকে বললেন :

'জানো দিদি, আমি যে তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলাম, তার ভিত্তি-মূলে রয়েছে এক নতুন রাসায়নিক পদার্থ। জিনিসটা সেখানেই আছে, এখন শুধু খুঁজে বের করার প্রশ্ন। এ সম্বন্ধে আমরা স্থিরনিশ্চিত। অন্যান্য

পদার্থবিদদের আমরা সেকথা বলতে তাঁরা বললেন যে নিশ্চয় আমরা কোথাও ভুল করেছি। আমাদের সাবধানে সযত্নে কাজ করতে উপদেশ দিলেন তাঁরা। কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা যে ভুল আমার হয় নি।'

মারীর জীবনে এ এক অসাধারণ সময়। সাধারণতঃ গবেষক ও তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত নাটুকে ও আজগুবী ধারণা পোষণ ক'রে থাকে। "আবিষ্কার মুহূর্ত" বলে সব সময়ে কিছু নির্দিষ্ট করাও যায় না। বৈজ্ঞানিকের কাজ প্রচুর ধৈর্য-সাপেক্ষ, দ্বিধাদ্বন্দ্বে পূর্ণ। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের মাঝখানে অনেক সময়ে বিদ্যুৎ-চমকের মতো হঠাৎ সাফল্যের নিশ্চয়তা মনের মধ্যে ঝলসে উঠে স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তিকে ধাঁধা লাগিয়ে দিতে পারে। যন্ত্রপাতির সামনে দাঁড়িয়ে মারী কখনও বিজয় গর্বের মাদকতা অনুভব করেন নি। প্রচণ্ড পরিশ্রম করছেন তিনি। আশায় ভরপুর হৃদয়ের বহুদিনের সঙ্কল্প আজ হঠাৎ এই উত্তেজনায় প্রকাশ পেল। কিন্তু কঠোর মানসিক সংশয় পার হয়ে যখন তিনি নিশ্চিত ভাবে বুঝলেন যে এক নতুন পদার্থের সন্ধানে সঠিক পথে চলেছেন, তখনই মাত্র তাঁর চিরসাথী দিদি ব্রনিয়ার কাছে খবরটি দিলেন।

পরস্পরকে একটিও সোহাগের কথা বলার প্রয়োজন হলো না। দুইবোন তাঁদের এতদিনের প্রতীক্ষা, পরস্পরের জন্য কষ্ট-স্বীকার, তাঁদের ছাত্রী-জীবনের শূন্যতা আশা ও বিশ্বাসে ভরে নিয়ে সাগ্রহে দিন গুনতে লাগলেন।

এর মাত্র চারবছর আগে মারী লিখেছিলেন :

'আমাদের জীবনের পথ সহজ নয়। কিন্তু তাতে কিই বা এসে যায়? আমাদের ধৈর্যের প্রয়োজন, সবচেয়ে বড় কথা, নিজেদের ওপর আস্থা রাখার প্রয়োজন। বিশেষ কিছু সম্পন্ন করার জন্যই যেন আমাদের জন্ম। যেমন করেই হোক তা সম্পাদন করতেই হবে।'

সেই "বিশেষ কিছু" হলো বিজ্ঞানকে এক নতুন অভাবিত পথে পরিচালিত করা।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল তারিখের বিজ্ঞান-আকাদেমির কার্যবিবরণীতে "মারী শ্‌ক্লোদোভস্কা কুরীর" একটি প্রবন্ধ পাওয়া যায়। তাতে তিনি পিচ-ব্লেণ্ড আকরকে রেডিও-এ্যাকটিভ শক্তিসম্পন্ন বলে অভিহিত করেছেন। আকাদেমির সঙ্গে এই তাঁর প্রথম যোগাযোগ এবং রেডিয়ম আবিষ্কারের এই হলো প্রথম পদক্ষেপ।

স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি নিজেকে বুঝিয়েছিলেন যে, এই আশ্চর্য পদার্থটির স্থিতি স্থিরনিশ্চিত। এর অস্তিত্বের ওপর তিনি রায় জারি ক'রে দিলেন:

এখন এর মুখোশ খুলে দিয়ে একে প্রকাশ্যে টেনে আনতে হবে। অনুমানকে প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, পদার্থটিকে আলাদা করতে হবে, চোখে দেখতে হবে। তারপর সরবে ঘোষণা করতে হবে: 'এইতো সে এখানেই আছে!'

পিয়ের কুরী তাঁর স্ত্রীর পরীক্ষাগুলো অসীম আগ্রহের সঙ্গে অনুধাবন ক'রে যাচ্ছিলেন। মারীর কাজে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা না ক'রে উপদেশ ও আলোচনার দ্বারা সাহায্য করছিলেন। স্ত্রীর কাজের বিস্ময়কর ফলাফল লক্ষ্য ক'রে তখনকার মতো নিজের স্ফটিক সম্বন্ধে গবেষণা স্থগিত রেখে নতুন মৌলিক পদার্থ আবিষ্কারের কাজে স্ত্রীর পাশে এসে দাঁড়ালেন।

সুতরাং, এতবড় একটা কাজে যখন সমর্থন বা যাচাই করার প্রয়োজন হতো, তখন মারী তাঁর পাশে পেলেন এক মস্ত বড় পদার্থবিদকে, পেলেন তাঁর জীবন-সহচরকে। তিন বছর আগে এই দুই অসাধারণ নর-নারী প্রেমের সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন—প্রেম, আর হয়তো ছিল রহস্যে ঘেরা কোন পূর্বজ্ঞান, ছিল দুজনের মধ্যে একমুখী কর্মযোগের অপার্থিব চেতনা।

রু-লমোঁর স্যাঁতসেঁতে ছোট্ট ঘরে এখন দুই বৈজ্ঞানিকের শক্তি একযোগে কাজ শুরু করল। দু'টি মস্তক, চারটি হাত দিনরাত অজানা এক জিনিসের সন্ধান ক'রে ফেরে। এরপর থেকে স্বামী-স্ত্রীর কাজ আর আলাদা করা যায় না। এ পর্যন্ত আমারা জানি যে, মারী তাঁর থিসিসের বিষয়বস্তু হিসেবে ইউরেনিয়মের তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে পড়তে আরম্ভ ক'রে আবিষ্কার করেন যে, অন্যান্য আরও রেডিও-এ্যাকটিভ পদার্থ আছে। আমরা জানি যে বিভিন্ন যৌগপিণ্ড পরীক্ষা ক'রে মারী ঘোষণা করেন আরও একটি অত্যন্ত শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় পদার্থের অস্তিত্বের কথা। এই সিদ্ধান্তের চরম মূল্য অনুমান ক'রে পিয়ের কুরী তাঁর সম্পূর্ণ অন্য ধরনের গবেষণা ত্যাগ ক'রে স্ত্রীকে এই নতুন পদার্থ সন্ধানের কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। সেই সময়, মে বা জুন মাস থেকে, আট বৎসরব্যাপী দু'য়ের এই মিলিত কাজ চলতে থাকে, যে পর্যন্ত না এক আকস্মিক দুর্ঘটনা এর অবসান ঘটায়। এই আট বছরের কাজের মধ্যে কতটুকু মারীর আর কতটুকুই বা পিয়ের-এর অবদান, তা' বিচার করতে বসা অর্থহীন। এ বিচার করতে যাওয়া মানে এই বৈজ্ঞানিক-দম্পতির কাজকে অন্যায় ভাবে ছোট ক'রে দেখা, যা তাঁরা নিজেরাও কোনদিন দেখেন নি। এই দুই মনীষীর যোগাযোগের পূর্ব পর্যন্ত পিয়ের কুরীর ব্যক্তিগত প্রতিভার নিদর্শন আমরা দেখেছি। আবিষ্কারের প্রথম স্তরেই তাঁর স্ত্রীর প্রতিভা প্রকাশ পেল। পরবর্তী—

কালে, পিয়ের-এর আকস্মিক মৃত্যুর পর, একা মারী যখন অপ্রতিহত সাহসে ভর ক'রে এক নব আবিষ্কৃত বিজ্ঞানকে গবেষণা দ্বারা ধাপে ধাপে সুশৃঙ্খল বিস্তৃতির পথে নিয়ন্ত্রিত করেন, তখন আবার তাঁর প্রতিভা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুতরাং তাঁদের এই যুক্ত প্রচেষ্টা থেকে একটি কথা প্রমাণ হয়ে যায় যে, স্বামী-স্ত্রীর এই উচ্চগ্রামের সখ্যতার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান-জগতে উভয়ের অবদান সমপর্যায়ের ছিল।

আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন ও কৌতূহল নিবৃত্তির পক্ষে এইটুকুই তো যথেষ্ট। কখনও আগেপরে, কখনও বা একসঙ্গে, যেখানে দু'জনের হাতের লেখা ফরমুলায় ভারাক্রান্ত নোটসহ বই চোখে পড়ে, প্রায় প্রতিটি প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক রচনার নীচে দু'জনের স্বাক্ষর একযোগে পাওয়া যায়, সে-ক্ষেত্রে দুই প্রেমাস্পদকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস আমাদের দিক থেকে না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। 'আমরা আবিষ্কার করলাম', 'আমরা লক্ষ্য করলাম'—এই ছিল তাঁদের ভাষা। যখন তথ্যের সন্ধানে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখার প্রয়োজন হয়েছে, তখন তাঁরা নিম্নলিখিত হৃদয়গ্রাহী ভাষা ব্যবহার করেছেন :

'ইউরেনিয়ম ও থোরিয়ম বিশিষ্ট কয়েকটি আকর (পিচ-ব্লেণ্ড, চালকোলাইট ইউরেনাইট) বেকেরেল-রশ্মি বিচ্ছুরক হিসেবে খুবই সক্রিয়। ইতিপূর্বে গবেষণামূলক প্রবন্ধে "আমাদের মধ্যে একজন" লিখেছিলেন যে, ইউরেনিয়ম ও থোরিয়ম অপেক্ষা এদের শক্তি অনেক বেশী এবং এর কারণ হিসেবে তিনি মনে করেন যে এইসব খনিজ দ্রব্যের মধ্যে স্বল্প পরিমাণে কোন অতি সক্রিয় পদার্থ বিদ্যমান।'

(পিয়ের ও মারী কুরী : বিজ্ঞান-আকাদেমির কার্যবিবরণী : ১৮ই জুলাই ১৮৯৮।)

ইউরেনিয়ম বিশিষ্ট পিচ-ব্লেণ্ড আকরের মধ্যে মারী ও পিয়ের কুরী এই "অতি-সক্রিয়" পদার্থটির সন্ধান করেন, কারণ একে বিশুদ্ধ ক'রে যে ইউরেনিয়ম অক্স্যাইড পাওয়া গেল, তার তেজস্ক্রিয়তার ক্ষমতার চেয়ে ঐ অশোধিত পিচ-ব্লেণ্ডের শক্তি চারগুণ বেশী দেখা গেল। এই আকরের উপাদানগুলির মোটামুটি নির্ভুল বিশ্লেষণ বহুদিন আগেই হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং সেই অনাবিষ্কৃত নতুন পদার্থটি এর মধ্যে নিশ্চয় অতি অল্প মাত্রায়ই বর্তমান আছে, নতুবা প্রাক্তন বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি এ এড়াতে পারত না, তাঁদের রাসায়নিক বিশ্লেষণের সময় ধরা পড়তই।

হিসাব অনুযায়ী—অবশ্যই 'নৈরাশ্যবাদীর' হিসাব, কারণ অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকরা সাধারণতঃ দুই সম্ভাবনার মধ্যে অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বলটিকেই ধরে নেন—তাঁরা ভাবলেন খুব বেশী হলে পিচ-ব্লেণ্ড আকরের মধ্যে এই নতুন পদার্থটি শতকরা একভাগের বেশী থাকতে পারে না। পরিমাণ খুবই কম সন্দেহ নেই। যদি তখন জানতে পারতেন যে, যে-অভিনব পদার্থটি তাঁরা খুঁজে মরছেন, পিচ-ব্লেণ্ড আকরের মধ্যে তার পরিমাণ মাত্র দশ লক্ষের একভাগ, তাহ'লে সেদিন তাঁরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যেতেন।

তেজস্ক্রিয়তার উপর ভিত্তি ক'রে রাসায়নিক গবেষণার যে অভিনব পন্থা তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন, সেই পদ্ধতি অনুসারে সেই একই ভাবে ধৈর্যসহকারে তাঁরা তাঁদের অন্বেষণ শুরু করলেন। সাধারণ রাসায়নিক বিশ্লেষণ যে ভাবে হয়ে থাকে, সেই উপায়ে তাঁরা পিচ-ব্লেণ্ডের প্রতিটি পদার্থ বিচ্ছিন্ন করলেন এবং এই বিচ্ছিন্ন প্রতিটি পদার্থের তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ যাচাই করলেন। একটি একটি ক'রে বাদ দিতে দিতে তাঁরা দেখলেন যে সেই 'অস্বাভাবিক' তেজস্ক্রিয় জিনিসটি খনিজ আকরের মধ্যে বিশেষ বিশেষ জায়গায় বাসা বেঁধে আছে। যতই তাঁরা এগিয়ে চললেন, ততই অনুসন্ধানের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হতে থাকল। ঠিক যেভাবে পুলিশ একটি পাড়ায় একটি একটি ক'রে প্রত্যেকটি বাড়ি খুঁজে আসামী গ্রেপ্তার করে, তাঁদের এই অনুসন্ধানের কাজটাও যেন সেই ধরনের।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে আসামী ছিল একাধিক: পিচ-ব্লেণ্ডের প্রধানতঃ দুই বিভিন্ন রাসায়নিক ভগ্নাংশে এদের আধিক্য দেখা গেল। এর থেকে কুরী-দম্পতির বিশ্বাস জন্মাল যে, একটি নয়, দুটি নতুন মৌলিক পদার্থ রয়েছে এর মধ্যে। ১৮৯৮ সালের জুলাই মাসে তাঁরা একটি পদার্থের অস্তিত্ব নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করলেন।

এ যেন ছোট্ট আইরিনের নামকরণের ব্যাপার, এমনি ভাবে পিয়ের তাঁর স্ত্রীকে বললেন: 'তোমার এর একটা নাম দিতে হয়।' সেই পুরোনো দিনের মাদ্‌মোয়াজেল শ্‌ক্লোদোভ্‌স্কা যেন নীরবে বসে বসে কি ভাবলেন। তাঁর মাতৃভূমি আজ পৃথিবীর মানচিত্র থেকে অবলুপ্ত, তাঁর অন্তরের আবেগ স্বাভাবিক ভাবেই সেই স্বদেশের প্রতি ধাবিত হলো। অস্পষ্ট ভাবে মনে হলো রুশিয়া, জার্মানি, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি অত্যাচারী দেশগুলোতে যদি এই আবিষ্কারের কথা রাষ্ট্র হয়? ভীরু কণ্ঠে পিয়েরকে বললেন: 'পোলোনিয়ম নাম দিলে কেমন হয় গো?'

১৮৯৮-র জুলাই-সংখ্যা 'বিজ্ঞান-আকাদেমির কার্যবিবরণীতে' আমরা দেখতে পাই :

'পিচ-ব্লেণ্ড আকর থেকে আমরা যে জিনিসটি পেয়েছি, বিশ্লেষণের দ্বারা তার ভেতর বিস্‌মাথ সম্পর্কিত একটি ধাতুর অস্তিত্ব অনুভব করেছি। এটি যখন স্বীকৃত ধাতুদের অন্যতম বলে গণ্য হবে, সে-সময়ে তাকে যেন 'পোলোনিয়ম' নাম দেওয়া হয়, কারণ, আমাদের মধ্যে একজনের মাতৃভূমির নামটির সম্মানের জন্য এই নাম আমরা প্রস্তাব করছি।'

ফ্রান্সবাসিনী ও পদার্থবিদ হয়েও মারির স্বদেশপ্রীতি সেই আগের কালের মতোই রয়ে গেছে। আরও একভাবে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। বিজ্ঞান-আকাদেমির কার্যবিবরণীতে ('পিচ-ব্লেণ্ডের অন্তর্গত নূতনতম তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিষয়ে') প্রকাশিত হবার আগেই মারী নিজের দেশে তাঁর নিজের বৈজ্ঞানিক-জীবনের প্রথম হাতে খড়ি যাঁর কাছে হয়েছিল সেই 'মিউজিয়ম্ অব ইণ্ডাষ্ট্রিস্ এণ্ড এগ্রিকালচার'-এর অধ্যক্ষ যোসেফ বোগুস্কির কাছে তাঁর পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দিলেন। পারীতে যে সময়ে এটি প্রকাশিত হলো, প্রায় সেই একই সময়ে ওয়ার্‌সর 'স্বইআৎলো' নামক পত্রিকায়ও এটি প্রকাশিত হলো।

রু-দে-লা গ্লেসিয়েরে-এর প্রকোষ্ঠে তাঁদের জীবনধারা অব্যাহতই রইল। মারী ও পিয়ের আগের চেয়েও বেশী পরিশ্রম করতে লাগলেন। গ্রীষ্মকাল পড়লে তরুণী গৃহিণী বাজার থেকে ফলমূল কিনে আনতেন, রান্না করতেন, কুরী-পরিবারের প্রথা অনুসারে এটা-ওটা শুকিয়ে ঘরে তুলে রাখতেন। নীচে ঝল্‌সানো পাতার রাশ পড়েই থাকত, ওপরে জানালার পাখি টেনে বন্ধ ক'রে দিতেন তারপর পারী নগরীর হাজার হাজার তরুণীর মতো অর্লিয়ন্স স্টেশনে দু'খানা সাইকেল্ রেজিষ্ট্রি করিয়ে স্বামী-কন্যার সঙ্গে ছুটি উপভোগ করতে বেরোতেন।

অভার্নে ওরু ব'লে এক জায়গায় এঁরা সেবার এক চাষীর বাড়ি ভাড়া নিলেন। রু-লমোঁ'র ভারী বাতাসের পর প্রাণ ভরে নির্মল বাতাস পেয়ে মন তাঁদের খুশিতে ভরে উঠত। মাঁদ, পাই, ল্যারমঁ, মন্ত-দোর প্রভৃতি স্থানে কুরী-দম্পতি বেড়াতে গেলেন। তাঁরা পাহাড়ে চড়লেন, গুহায় প্রবেশ করলেন, নদীতে স্নান করলেন। প্রতিদিন গ্রামের পথে নিঃসঙ্গ এই বৈজ্ঞানিক দু'জন তাঁদের 'নতুন ধাতু' পোলোনিয়ম এবং 'অপরটি' যা' এখনও নির্দেশ করা যায় নি, সে-বিষয়ে আলোচনা করতেন। সেপ্টেম্বরে এঁরা আবার

তাঁদের স্যাভয়েতে কারখানায় ফিরে গিয়ে খনিজ আকর নিয়ে যেতে উঠবেন। আবার নবতম উদ্যমে গবেষণা শুরু হবে।

মারীর কাজের নেশার মধ্যে এই সময়ের একটি বেদনা যেন মনটাকে ভারাক্রান্ত ক'রে রেখেছে—দ্লুস্কিরা শিগগিরই পারী ছেড়ে চলে যাবেন। তাঁরা অস্ট্রিয়ার অধীনস্থ পোল্যাণ্ডে গিয়ে কার্পেথিয়ন পর্বতে জাকোপেন নামক স্থানে যক্ষ্মা হাসপাতাল তৈরি করবেন বলে স্থির করেছেন। বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এল। মারী ও ব্রনিয়ার প্রাণ কেঁদে উঠল। পরমবন্ধু, প্রতিপালিকার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মারীর আজ যেন নিজেকে নির্বাসিত মনে হচ্ছে।

১৮৯৮-র ২রা ডিসেম্বর মারী ব্রনিয়াকে লেখেন :

'আমার জীবনে যে কি পরিমাণ শূন্য ক'রে গেছ, তা' তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। স্বামী ও সন্তান ছাড়া পারীতে আমার আর নিজের বলে কিছুই রইল না। মনে হয়, আমার বাড়িটুকু, আর যে-ইস্কুলে আমরা কাজ করি, এ ছাড়া পারী বলে কোন শহর নেই। মাদাম দ্লুস্কাকে জিজ্ঞেস ক'রো তুমি যে চারাগাছটি ফেলে গেছ, তাতে জল দিতে হবে কিনা, হলে কতবার? খুব বেশী রোদ চাই কি গাছটার?

'আমরা ভালই আছি, সময়টা যদিও ভাল নয়, বৃষ্টি কাদা লেগেই আছে। আইরিন বড় হয়ে উঠছে। খাওয়া নিয়ে বড্ড জ্বালাতন করে। পায়েস ছাড়া কোন জিনিসই নিয়মিত খেতে চায় না, ডিম পর্যন্ত না। ওর বয়সে কি খাওয়া উচিত তার একটা ফর্দ ক'রে দিও।'...

সাদামাটা চিঠি বলেই বোধহয় বিশেষ ক'রে চিঠিখানা স্মরণীয়। ১৮৯৮ সালে লেখা মাদাম কুরীর চিঠিগুলির উদ্ধৃতির প্রয়োজন বোধ করি। 'ফ্যামিলি কুকিং' বলে একখানা বইয়ের মার্জিনে কিছু পাওয়া যায়। জেলি তৈরির নিয়মের পাশে লেখা আছে : 'আট পাউণ্ড ফল এবং সম পরিমাণ বড় দানা চিনি নিলাম। দশ মিনিট সিদ্ধ করার পর সূক্ষ্ম ছাঁকনির ভেতর দিয়ে মিশ্রিত জিনিসটি ছেঁকে নিলাম। আমি চৌদ্দ বোতল খুব ভাল জেলি পেলাম, স্বচ্ছ নয়, কিন্তু সুন্দর বসেছে।'

ছাই রঙের কাপড়ে বাঁধাই একটা ইস্কুলের নোট-বইয়ে প্রতিদিন আইরিনের ওজন, খাদ্য, প্রথম দাঁত ওঠার তারিখ—সব লিখে রাখতেন, পোলোনিয়ম আবিষ্কারের দিন কয়েক পরে ১৮৯৮ সালের ২০শে জুলাই এক জায়গায় লেখা আছে : 'আইরিন হাত নেড়ে ধন্যবাদ জানাতে শিখেছে। দিব্যি হামাগুড়ি দিচ্ছে, মুখে কথা ফুটেছে : "গোগলি, গোগলি, গো—।" সো'-এর বাগানে

একটা কার্পেটের ওপর সারাদিন পড়ে থাকে, গড়িয়ে যায়, নিজে নিজে উঠতে পারে, বসতে পারে।

শুরুতে ১৫ই আগস্ট: আইরিনের নীচের পাটিতে সপ্তম দাঁতটি বেরিয়েছে। হাত ছেড়ে একা একা দাঁড়াতে পারছে।

'গত তিন দিন যাবৎ ওকে আমরা নদীতে স্নান করাচ্ছি। ও কাঁদে, তবে আজ (চার দিনের দিন) কান্না বন্ধ ক'রে জলের মধ্যে হাত পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেলা করেছে!

'বেড়ালের সঙ্গে খেলে বেড়ায়, যেন লড়াই চলেছে এমনি চেঁচিয়ে তাড়া করে। নতুন লোক দেখে ভয় পায় না। খুব গান করে আর ওর চেয়ারে বসিয়ে দিলে টেবিলে চড়ে বসে।'

তিন মাস পরে ১৭ই অক্টোবর মারী গর্বভরে লিখছেন:

'আইরিন খুব ভাল হাঁটতে শিখেছে; আর হামা দেয় না।...'

৫ই জানুয়ারি ১৮৯৯: 'আইরিনের পনেরোটা দাঁত উঠেছে।...'

১৮৯৮-র ১৭ই অক্টোবর যেখানে 'আইরিন আর হামা দেয় না' লেখা আছে আর ৫ই জানুয়ারি, যেখানে 'আইরিনের পনেরটা দাঁত উঠেছে—' লেখা আছে, এর মাঝে এক ফাঁকে উল্লেখযোগ্য একটি বিশেষ কথা চোখে পড়ে।

লেখাটি মারী কুরী ও পিয়ের এবং তাঁদের এক সহকর্মী জ-বেমোঁ-র এই তিন জনের স্বাক্ষরিত। বস্তুতঃ বিজ্ঞান-আকাদেমির জন্য রচিত ও ১৮৯৮ সালের ২৬শে ডিসেম্বর-সংখ্যা কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত এই লেখাটিতে এঁরা পিচ-ব্লেণ্ডের মধ্যে আরও একটি নতুন রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব ঘোষণা করছেন।

এখানে এই বিজ্ঞপ্তির কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি:

এখানে উপস্থাপিত যুক্তিগুলির ভিত্তিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এই নতুন তেজস্ক্রিয় বস্তুতে একটি অভিনব মৌলিক পদার্থ বর্তমান। আমরা এর 'রেডিয়ম' নামকরণ করবার প্রস্তাব করছি।

এই নতুন রেডিও-এ্যাকটিভ পদার্থে নিশ্চয়ই বহু পরিমাণে বেরিয়ম আছে; তা সত্ত্বেও এর তেজস্ক্রিয়তা যথেষ্ট। সুতরাং, রেডিয়মের রেডিও-এ্যাকটিভিটি প্রচণ্ড হতে বাধ্য।

আটচালার নীচে চার বছর

১৩

ভিড়ের মধ্য থেকে যে-কোন লোককে নিয়ে গিয়ে রেডিয়ম আবিষ্কারের বিবরণ পড়তে দিলে সে নিঃসন্দেহে মেনে নেবে—হ্যাঁ, রেডিয়ম আছে বটে। বিশেষ চর্চা দ্বারা যে সব লোকের সমালোচনা-শক্তি একাধারে স্ফুরিত বা বিকৃত হয় নি, তাদের কল্পনাশক্তি সতেজ থাকে। অস্বাভাবিক মনে হলেও যে-কোন অভূতপূর্ব ঘটনা মেনে নিতে ও তা' নিয়ে চিন্তা করতে তাঁরা পারেন।

কুরীদের সমসাময়িক পদার্থবিদ-গোষ্ঠী খবরটিকে একটু অন্য ভাবে গ্রহণ করলেন। যুগ যুগ ধরে বৈজ্ঞানিকরা যে সকল প্রাথমিক ভিত্তির ওপর আস্থা স্থাপন ক'রে এসেছেন, পোলোনিয়ম ও রেডিয়মের মূল গুণাবলী তার বিরুদ্ধগামী। তেজস্ক্রিয় সামগ্রী যে আপনা হতেই রশ্মি বিচ্ছুরণ করে, তার ব্যাখ্যা কি? বিশ্বজ্ঞানের ভাণ্ডারে এই আবিষ্কার এক প্রচণ্ড ধাক্কা দিল। পদার্থের গঠন সম্বন্ধে এ যাবৎ কাল পর্যন্ত যে দৃঢ় ধারণা প্রচলিত রয়েছে, এ তার বিরোধিতা করছে। সুতরাং বিশেষজ্ঞ পদার্থবিদ চুপ করেই রইলেন। পিয়ের ও মারীর কাজ সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ আগ্রহ, তিনি বুঝতে পারছেন যে এ কাজটির সামনে অসাধারণ প্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে ফল প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা ক'রে থাকবেন।

রসায়নজ্ঞের দৃষ্টিভঙ্গী আরও সন্দেহপূর্ণ; যখন দ্রব্যকে স্পর্শ করা যায়, দেখা যায়, ওজন করা যায়, এসিড দ্বারা পরীক্ষা করা যায়, বোতলে ভরা যায় এবং তার আণবিক ওজন স্থির করা যায়, কেবল তখনই মাত্র রসায়নজ্ঞ সে-দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

এ পর্যন্ত রেডিয়ম কেউ চোখেও দেখে নি, তার আণবিক ওজনের কথাও শোনে নি। সুতরাং প্রচলিত-নিয়মের ব্যতিক্রম না ক'রে রসায়নবিদ বললেন: 'আণবিক ওজন যখন নেই, রেডিয়মও নেই। আগে দেখাও, তবে বিশ্বাস করব রেডিয়ম আছে।'

অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস করাবার জন্য জগতের কাছে তাঁদের 'সন্তান' পোলোনিয়ম ও রেডিয়ম-এর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে কুরী-দম্পতি এরপর চার বছর একটানা পরিশ্রম ক'রে গেলেন।

লক্ষ্য হলো বিশুদ্ধ রেডিয়াম ও পোলোনিয়ম-এর সন্ধান করা। এঁরা যে দ্রব্যের মধ্যে বিশেষ পরিমাণে তেজস্ক্রিয় শক্তি পেয়েছিলেন, তার মধ্যে এই মৌলিক পদার্থগুলির অস্তিত্ব সামান্য পরিমাণেই ছিল। পিয়ের ও মারী জানতেন কিভাবে এই নতুন মৌলিক পদার্থগুলি উদ্ধার করা যায়, কিন্তু প্রচুর পরিমাণে অশোধিত আকর ভিন্ন এই বিচ্ছিন্ন করার কাজ সম্ভব নয়।

এ ক্ষেত্রে সেই প্রশ্ন মাথা উঁচিয়ে উঠল: 'কোথা থেকে যথেষ্ট পরিমাণ অশোধিত আকর পাওয়া যাবে? এই পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত স্থানই বা কোথায়? এত বড় কাজের জন্য যথেষ্ট টাকাই বা কই?

পিচ-ব্লেণ্ড, যার মধ্যে পোলোনিয়ম ও রেডিয়মের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, তাও তো অত্যন্ত মূল্যবান; বোহেমিয়ার অন্তর্গত সাঁ্যা-জুকিমস্তাল খনি থেকে তোলা এই মূল্যবান অশোধিত ইউরেনিয়ম খনিজ লবন কাঁচ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উপস্থিত-বুদ্ধি অর্থাভাব পূরণ করল। বৈজ্ঞানিক দু'জনের আশা হলো ইউরেনিয়ম বের ক'রে নিলেও খনিজ আকরের অন্তর্গত পোলোনিয়ম ও রেডিয়ম নিশ্চয়ই থেকে যাবে। আকরের গাদের মধ্যে এগুলির সন্ধান না পাওয়ার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই। তাছাড়া পিচ-ব্লেণ্ড মূল্যবান হলেও কাজের শেষে যে গাদটা পড়ে থাকে তার কতই বা দাম হবে? এক অস্ট্রীয় সহকর্মীর মাধ্যমে সাঁ্যা-জুকিমস্তাল খনির কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলে অল্পমূল্যে যথেষ্ট পরিমাণ উদ্‌বৃত্ত গাদগুলো পাওয়া কি যাবে না?

কথাটা অত্যন্ত সহজ, কিন্তু কাউকে তো তা ভেবে বের করতে হলো!

অবশ্য এর দাম ও পারী পর্যন্ত রাহাখরচ দিতে হবে। যৎসামান্য পুঁজি থেকে পিয়ের ও মারী এ টাকার বন্দোবস্ত করলেন। সরকারের কাছে হাত পাতার মতো নির্বোধ তাঁরা ছিলেন না। যদি দুই পদার্থবিদ মস্ত কোন আবিষ্কারের আশায় পারী বিশ্ববিদ্যালয় বা ফরাসী সরকারকে পিচ-ব্লেণ্ডের গাদ কেনার পয়সা যোগাতে বলতেন, তবে তাঁরা হাস্যাস্পদ হতেন বৈকি! আর কিছু না হোক, এ ধরনের চিঠি অফিসের বড় সাহেবের ফাইলের মধ্যে হারিয়ে যেত। শেষ পর্যন্ত আশাপ্রদ কিছুই মিলত না, মাঝ থেকে খানিকটা সময় নষ্ট হতো। ফরাসী বিপ্লবের ঐতিহ্য ও মূলসূত্রের ভেতর দিয়ে এসেছিল মেট্রিক পদ্ধতি, নর্ম্যাল স্কুল, বহুক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রসার বেড়েছিল, তবু একযুগ পরেও লাভোয়াসিয়েকে গিলোটিনে হত্যা করার আদেশ দেবার সময়ে

ফুকিয়ে-ভিভিল—'এই গণতন্ত্রে বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজন নাই'—এ হেন অদ্ভুত উক্তি করতেও তো ছাড়েন নি।

সরবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অসংখ্য অট্টালিকা-প্রবাহের মধ্যে কুরী-দম্পতিকে কাজ চালিয়ে যাবার মতো একটি ঘরও কি দেওয়া যায় না? বোধ হয় না। বৃথা চেষ্টার পর পিয়ের ও মারী তাঁদের পুরোনো আখড়ায় ফিরে এলেন—পিয়ের-এর সেই 'স্কুল-অব-ফিজিক্সের' ছোট্ট ঘরে যেখানে মারী তাঁর প্রথম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলো চালিয়ে ছিলেন। ঘরখানার সামনে একটা উঠোন, অন্যদিকে একটা প'ড়ো কাঠের ঘর। এমনই অবস্থা যে, তার ভেতর দিয়ে জলবৃষ্টির অবাধ গতি। চিকিৎসা-শাস্ত্রের ছাত্ররা এখানে শব-ব্যবচ্ছেদের পাঠ নিত, কিন্তু বহুকাল ধরে এ কাজের পক্ষে অযোগ্য বিবেচনায় ঘরটি অব্যবহৃতই পড়েছিল। মেঝে বলতে কিছুই নেই, মাটি-লেপা এক প্রস্থ বিটুমেন ছড়ানো। কয়েকটা রান্নাঘরের টেবিল, একটা খাপছাড়া ব্ল্যাকবোর্ড আর মরচে-ধরা পাইপ লাগানো একটা পুরোনো ঢালাই-লোহার স্টোভ—এই ছিল এ ঘরের মোট আসবাব।

সহজে এ ঘরে কেউ কাজ করতে চাইবে না: মারী ও পিয়ের কিন্তু এ অবস্থাই মেনে নিলেন। এই কাঠের ঘরের একমাত্র সুবিধে ছিল এই যে, এমন শ্রীহীন, জরাজীর্ণ ঘরখানিতে কেউই বাধা দিতে এল না। এই স্কুলের ডিরেক্টর স্যুজেনবারা পিয়েরকে স্নেহ করেন। এর চেয়ে ভাল জায়গা দিতে না পারায় ভদ্রলোক অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করলেন। সে যাই হোক্, এর বেশী আর কিছু দেবার চেষ্টা তিনি করলেন না। স্বামী-স্ত্রী খুশি হয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন: 'এই যথেষ্ট, এতেই আমরা বেশ কাজ চালিয়ে নেব।'

এই ঘরটুকু গুছিয়ে নেবার সময়েই অস্ট্রিয়া থেকে চিঠি এল। সুখবর! এবারের ইউরেনিয়মের গাদ ফেলে দেওয়া হয় নি। স্যাঁ-জুকিম্স্তাল খনির কাছে পাইন গাছে ভরা স্থানে ঐ গাদ জমা করা ছিল। অধ্যাপক সো'অরে ভিয়েনার বিজ্ঞান-আকাদেমির মধ্যস্থতায় স্টেট-ফ্যাক্টরির মালিক হিসেবে অস্ট্রিয়ার সরকার দুই ফরাসী "পাগল"কে—এ হেন জিনিসে যাদের প্রয়োজন, তাঁদের এই গাদ উপহার দেওয়া স্থির করলেন। পরে যদি বেশী পরিমাণ দরকার হয় তবে, খনি থেকে অত্যন্ত সুলভে তাঁরা আবার পেতে পারবেন। আপাততঃ রাহা খরচটুকু দিলেই চলবে।

একদিন সকালে রু-লমোঁ-র 'স্কুল-অব-ফিজিক্স'-এর সামনে কয়লা-গাড়ির মতো বিরাট এক ওয়াগন এসে দাঁড়াল। পিয়ের ও মারীর কাছে খবর গেল। খবর পেয়েই ল্যাবরেটারির পোশাকে, খোলা মাথায় দু'জন ছুটে এলেন।

চিরস্থির পিয়ের শান্তই রইলেন, কিন্তু বস্তাগুলো খালি করতে দেখে মারীর উল্লাস আর চাপা থাকে না। এই তো পিচ-ব্লেণ্ড, এই তো সেদিন জাহাজের মাল-স্টেশন থেকে নোটিশ পেলেন! কৌতূহল আর অধৈর্য হৃদয়ে তিনি তক্ষুণি একখানা বস্তার মুখ খুলে তাঁর রত্ন যাচাই করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

মোটা চটের থলে বাঁধনমুক্ত ক'রে বোহেমিয়ার পাইন কাঁটায় ভরা হালকা বাদামী আকরের মধ্যে দুই হাত পুরে দিলেন।

এই তো এরই মধ্যে রেডিয়ম লুকিয়ে আছে! এরই মধ্যে থেকে গুপ্তসম্পদ উদ্ধার করতে হবে, প্রয়োজন হলে পথের ধুলোর মতো দেখতে এই জড়-পদার্থের পাহাড় ঘেঁটে রত্ন বের করতে হবে।

মারিয়া শক্লোদোভস্কার জীবনের সবচেয়ে উত্তেজনার মুহূর্তগুলি কেটেছিল চিলে-কুঠরির ভেতর। আর মারী কুরীর জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দও এল আর-এক জীর্ণ আটচালার নীচে।

চরম অসাচ্ছন্দ্যের আধার-ঘন আশঙ্কাকেও রু-লমোঁ'র এই আটচালা ঘর হার মানাতে পারে ; ছাদে কাঁচের জানালা থাকার দরুণ গ্রীষ্মকালে ঘরখানা হট-হাউসের মতো গরম ; শীতকালে বৃষ্টি হলে ভাল, না, বরফ পড়লে ভাল, একথা ভাববার অবসার হতো না বৈজ্ঞানিক-দম্পতির, কারণ বৃষ্টি হলে কোঁটায় কোঁটায় এক ঘেঁয়ে সুরে জল ঝরত মেঝেতে, টেবিলে ; বৈজ্ঞানিকদের সেই জল-ঝরা জায়গাগুলো দাগ দিয়ে রাখতে হতো, পাছে নিজেদের ভুলে কোন যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যায়। তুষারপাত হলে ঠাণ্ডায় জমে যাবার জোগাড় হতো। পুরোদমে স্টোভ জ্বেলেও কোন লাভ হতো না। একেবারে কাছে গিয়ে হাত দিলে হয়তো সামান্য গরম পাওয়া যেত ; কিন্তু দু'পা পেছিয়ে দাঁড়ালেই আবার সেই বরফের রাজ্য। বাইরে নিদারুণ শীতাতপে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়াই মারী ও পিয়ের-এর পক্ষে সবচেয়ে ভাল ছিল, কারণ, তাঁদের কাজের উপযোগী কোন ব্যবস্থাই সেখানে ছিল না, বিষাক্ত গ্যাসপূর্ণ বাতাস বাইরে চালান দেবার মতো চিম্‌নি ছিল না, সেইজন্য বেশীরভাগ কাজ তাঁদের খোলা আঙিনায় নীল আকাশের নীচেই সারতে হতো। হঠাৎ বৃষ্টি এলে দু'জনে তাড়াতাড়ি যন্ত্রপাতি গুটিয়ে ঘরে ঢুকতেন। কাজ করতে করতে যাতে দম বন্ধ হয়ে না যায়, সেজন্য খোলা দরজা আর জানালার মাঝে বাতাসবাহী নল বসিয়েছিলেন।

সম্ভবতঃ মারী ডাক্তার ভখিয়েরের কাছে যক্ষ্মা রোগের এমন আশ্চর্য চিকিৎসার গর্ব করেন নি!

(পরে এক সময়ে মারী লিখেছিলেন :) 'আমাদের টাকা ছিল না, ল্যাবরেটারি ছিল না, এই কঠিন অত্যাবশ্যক কাজ চালাবার জন্য কোন সাহায্য ছিল না। এ-যেন নয় কে হয় বানানো আর কাসিমির দ্লুস্কি যদি আমার ছাত্রী-জীবন সম্বন্ধে বলে থাকেন "আমার শ্যালিকার জীবনের দুঃসাহসিকতায় ভরা দিনগুলি" তাহ'লে আমার স্বামী ও আমার জীবনের এই সময়টিকে "আমাদের যৌথ জীবনের দুঃসাহসিকতম অধ্যায়" বললে বেশী বলা হবে না।

'তবু এই জঘন্য জীর্ণ আটচালার নীচেই সম্পূর্ণ কাজের মধ্যে ডুবে থেকে আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দের দিনগুলি কেটেছে। কখনও কখনও আমার নিজের সমান লম্বা একখানা লাঠি দিয়ে ফুটন্ত জিনিস ঘাটতে ঘাটতে সারাটা দিন কেটে যেত। সন্ধ্যাবেলা ক্লান্তিতে শরীর এলিয়ে আসত।...'

মঁসিয়ে ও মাদার কুরী ১৮৯৮ থেকে ১৯০২ পর্যন্ত চার বছর এই অবস্থার মধ্যে কাটিয়ে ছিলেন। প্রথম বছর তাঁরা রেডিয়ম ও পোলোনিয়মের রাসায়নিক বিচ্ছিন্ন-করণ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন এনং এই ভাবে উদ্ধৃত দ্রব্যগুলির তেজস্ক্রিয়তা (ক্রমেই বেশীরকম কার্যকরী) লক্ষ্য করতে লাগলেন। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তাঁরা বুঝলেন যে, নিজেদের কাজকে এখন বিভক্ত ক'রে নেওয়া প্রয়োজন। রেডিয়ম-এর গুণাবলী নির্ণয় এবং নতুন পদার্থটির সঙ্গে নিজেদের ভালোরকম পরিচয় করাবার কাজে নিযুক্ত রইলেন ; যে রাসায়নিক পরিশোধন দ্বারা বিশুদ্ধ রেডিয়ম-সল্ট লাভ হবে মারী সেই পরীক্ষায় যুক্ত রইলেন।

এই শ্রমবিভাগে মারী বেছে নিলেন 'একজন পুরুষের কাজ'। দিনমজুরের মতো খাটতে হ'তো তাঁকে। আটচালার নীচে তাঁর স্বামী সূক্ষ্ম নিরীক্ষার কাজে ডুবে রইলেন : আঙ্গিনার মাঝে পুরোনো ধূলিধূসরিত এসিড-জীর্ণ ঢিলে পোশাক গায়ে, বাতাসে এলোমেলো চুলে, চোখ-গলা জ্বালাকরা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন অবস্থায় মারী নিজেই যেন একটা কারখানা।

তাঁর লেখায় দেখি : 'এককালে কুড়ি কিলোগ্রাম পদার্থ আমি শোধন করতে লাগলাম, ফলে বিভিন্ন কঠিন ও তরল পদার্থ পূর্ণ বড় বড় বোতলে ঘর ভরে গেল। সেসব বয়ে নিয়ে যাওয়া, তরল পদার্থ ঢালা, ঘন্টার পর ঘন্টা গলাবার বাসনে ফুটন্ত জিনিস নাড়াচাড়া করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে যেত।'

মনে হতো মানুষের হাতে ধরা পড়ার ইচ্ছে রেডিয়মের নেই। মারী প্রথমে প্রথম ভেবেছিলেন পিচ-ব্লেণ্ডের মধ্যে শতকরা একভাগ অন্ততঃ রেডিয়ম পাওয়া যাবে, এখন সেসব চিন্তা কোথায় হারিয়ে গেল? নতুন পদার্থটির তেজস্ক্রিয়তা এত প্রখর যে, অশোধিত আকরের মধ্যে তার যৎসামান্ত পরিমাণের প্রতিফলন সত্যিই বিস্ময় জাগায়; এ প্রতিফলন সহজে মাপাও যায়, দেখাও যায়। মূল আকরের সঙ্গে এমন অবিচ্ছেন্ত ভাবে সে মিশে আছে যে, সেই ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্র-পরিমাণ জিনিসটিকে উদ্ধার করাই হলো কঠিন কাজ।

কাজের দিনগুলি মাসের থেকে বছরে গড়িয়ে যেতে লাগল। পিয়ের ও মারী হতাশ হলেন না। এই অন্তরালবাসী বিদ্রোহী পদার্থটি তাঁদের মুগ্ধ করেছে। এই অজানার প্রতি প্রেমের বন্ধনে, তাকে জানবার স্পৃহায় কাঠের আটচালায় তাঁরা কঠোর "প্রকৃতি-বিরুদ্ধ" জীবন যাপন করতে লাগলেন।

'এ সময়ে আমরা সম্পূর্ণ এক নতুন রাজ্যে বাস করতাম, এ জন্তে অপ্রত্যাশিত এই নতুন আবিষ্কারকে ধন্তবাদ,' (মারী লিখছেন:) 'কাজের এত অসুবিধা সত্ত্বেও আমরা খুব আনন্দে দিন কাটাতাম। দিনের বেলা ল্যাবরেটারিতেই কেটে যেত। জীর্ণ আটচালার নীচে আমরা খুঁজে নিয়েছিলাম অপার শান্তি: কোন একটা কাজের দিকে নজর রেখে আমরা দুজন খানিকটা পায়চারি ক'রে নিতাম। সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা হতো, শীতে কষ্ট হলে স্টোভের কাছে দাঁড়িয়ে এক পেয়ালা চা খেয়ে নিতাম। একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান ছিল আমাদের কাজ…যেন স্বপ্ন-রাজ্যে বাস করছি। …আমাদের ল্যাবরেটারিতে দু'একজন বাইরের লোক আসতেন। তাঁদের মধ্যে পদার্থবিদ ও রসায়নবিদ ছাড়া কেউ কেউ কাজ দেখতেও আসতেন। পদার্থ-বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় পিয়ের কুরীর দখল ছিল, কেউ বা আসতেন সে-সম্বন্ধে উপদেশ দিতে। তখন সামনে যে সব আলোচনা হতো, বৈজ্ঞানিক-জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে সেসব আলোচনা প্রেরণা যোগাত, উৎসাহ জাগাত, অথচ ল্যাবরেটারির অপরিহার্য শান্তি ও সাধনার পরিবেশ ব্যাহত হতো না।

এই জীর্ণ কুটিরে একা একা স্বামী স্ত্রী যন্ত্র রেখে যখনই দু'দণ্ড কথা বলতেন, তখনই অতি প্রিয় এই রেডিয়ম তার সু-উচ্চ আসন থেকে তাঁদের সন্তানের আসনের নেমে আসত।

কোন শিশুকে যদি খেলনা দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তা হলে তার কৌতূহল যেমন বাধা মানে না, তেমনি অদম্য কৌতূহল বাধা স্বরে মারী প্রশ্ন

বলতেন : 'সে যে কেমন দেখতে হবে, কি তার চেহারা হবে, আমি তো ভেবেই পাই না। পিয়ের, তোমার কি মনে হয় ? তাকে কেমন দেখতে হবে ?'

পদার্থবিদ শান্ত স্বরে বলতেন : 'জানি না, আমার ইচ্ছে করে, জিনিসটার যেন খুব সুন্দর রঙ হয়।'

আগে তাঁর চিঠি পত্রে মাঝে মাঝে হঠাৎ যেমন এই অত্যাশ্চর্য প্রচেষ্টা সম্বন্ধে কল্পনায় রঙীন এবং সেই সঙ্গে সারগর্ভ মন্তব্য পাওয়া যেত, এখন যেন আর তা পাওয়া যাচ্ছে না। তবে কি এতদিনের নির্বাসনে এই রমণীর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যোগসূত্র শিথিল হয়ে এসেছিল ? প্রচণ্ড কাজের চাপে কি তাঁর সময়াভাব ঘটেছিল ?

এই নীরবতার মূল কারণ কিন্তু অন্যত্র পাওয়া যায়। জীবন যখন আশ্চর্য এক বাঁক নিল, ঠিক সেই সময়েই যে মাদাম কুরীর চিঠির সুর বদলে গিয়েছিল, তা নয়। ছাত্রী, শিক্ষয়িত্রী, অথবা তরুণী গৃহিণী সব অবস্থাতেই তিনি নিজের কথা বলতে পারতেন। কিন্তু বর্তমানে তাঁর বৈজ্ঞানিক-সাধনার মধ্যে যা কিছু গোপনীয়, যা কিছু অবর্ণনীয়, সব মিলিয়ে তাঁকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছিল। যাঁরা তাঁর পরম প্রিয়, তাঁদের মধ্যে কেউই এই দুশ্চিন্তা, এই অসাধ্য সাধনের মর্ম উপলব্ধি করতে পারবেন না। একমাত্র জীবন-সহচর পিয়ের কুরীর পক্ষেই তাঁর এই হৃদয়-দহনের অংশ গ্রহণ করা সম্ভব। শুধু তাঁর কাছেই তিনি তাঁর অমূল্য সব চিন্তা ও স্বপ্নের ডালি উজাড় ক'রে দিতে পারতেন। এখন থেকে মারী তাঁর সব আত্মীয় বন্ধুর কাছে, যত প্রিয়ই তাঁরা হোন না কেন, নিজেকে এক অতি সাধারণ রমণী হিসেবে চালাতে লাগলেন। সাংসারিক সুখ-সাচ্ছন্দ্যের কথা লিখতেন। নারী হিসেবে তাঁর সুখের পরিপূর্ণতা সংযত ভাষায় লিখে জানাতেন। কিন্তু কাজ সম্বন্ধে অল্প কথায়, ছোট, ছোট বাক্যবিন্যাসে দু'তিন লাইন লিখে সারতেন। তাঁর জীবনে এ কাজের গুরুত্ব কতখানি, তা জানাবার চেষ্টা মাত্র করতেন না। অতি বিনয়ী মনোভাবের জন্য এবং অহংকার ও অতিরিক্ত আলোচনার ভয়ে মারী আত্মগোপন করলেন, নিজের মধ্যে ডুবে রইলেন, নিজের আধখানা শুধু বাইরের জগতে মেলে ধরলেন। লজ্জা, গতানুগতিকতা কিংবা অন্য কোন কারণ—যে জন্যই হোক, এই প্রতিভাময়ী বৈজ্ঞানিক নিজেকে মুছে ফেললেন, "আর পাঁচ জন নারীর মতো" একজন সাধারণ রমণী ব'লেই বাইরের জগৎ তাঁকে জানল।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ব্রনিয়াকে মারী লেখেন :

'আমাদের জীবন বরাবর একই ভাবে চলছে। আমরা প্রচণ্ড খাটি, কিন্তু

ঘুমোই ভাল, তাই স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে না। সন্ধ্যেবেলাটা বাচ্চার তদ্বির করতে কেটে যায়। সকালে উঠে আমি ওকে কাপড় ছাড়িয়ে খাইয়ে দিই, তারপর প্রায় নটা আন্দাজ বেরিয়ে পড়ি। গত এক বছরের মধ্যে আমরা একবার থিয়েটারে যাই নি, কনসার্টে যাই নি, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখাশোনাও করি নি। তবে আমরা বেশ সুখে আছি। আত্মীয়-স্বজনের জন্যে আমার মন কেমন করে—সবচেয়ে বেশী তোমাদের দু'জনের জন্যে, আর বাবার জন্যে কষ্ট হয়। আমার এই বিচ্ছিন্ন অবস্থা প্রায়ই আমায় পীড়া দেয়। তাছাড়া আর কিছু নিয়ে আমার কোন অনুযোগ নেই। আমাদের শরীর ভাঙে নি, বাচ্চাটা বেশ বাড়ছে, আমার স্বামী-ভাগ্য স্বপ্নাতীত, এমন মানুষের কল্পনাও করতে পারি নি কোনদিন। এ আমার সৌভাগ্য, এবং যত দিন যাচ্ছে ততই পরস্পরের প্রতি আমাদের ভালোবাসা গভীরতর হচ্ছে।

'আমাদের কাজ এগোচ্ছে, শিগ্‌গিরই এ বিষয়ে আমায় একটা বক্তৃতা দিতে হবে। গত শনিবারেই দেবার কথা ছিল, কিন্তু কোন কারণে বাধা পড়ে যায়; সুতরাং এই শনিবার অথবা তার পরের শনিবারে অবশ্যই বক্তৃতার ব্যবস্থা হবে।...'

সাধারণ ভাবে কাজটি কিন্তু বেশ ভালোভাবেই এগিয়ে চলছিল। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ও ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পিয়ের ও মারী কয়েকটি রিপোর্ট বের করেন: একটির বিষয়বস্তু হলো—রেডিয়মের দরুণ "প্রযোজিত রেডিও-এ্যাকটিভিটি," অপরটি হলো রেডিও-এ্যাকটিভিটির ফলাফল সম্বন্ধে, আর তৃতীয়টি হলো সেই রশ্মি দ্বারা প্রবাহিত বৈদ্যুতিক শক্তি সম্বন্ধে। শেষ অবধি ১৯০০ সালের কংগ্রেস-অব্‌-ফিজিক্সের জন্য রেডিও-এ্যাকটিভ পদার্থগুলির উপর এক বিস্তারিত প্রবন্ধ লেখেন, যার ফলে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

এই তেজস্ক্রিয়তা বা রেডিও-এ্যাকটিভিটি নিয়ে বিজ্ঞানের অভিনব প্রগতি আশ্চর্যরকম দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল। কুরীরা সহকর্মীর অভাব বোধ করলেন। এ পর্যন্ত পেতিত্‌ নামে একজন সাধারণ ল্যাবরেটারি সহকারী মাঝে মাঝে এসে তাঁদের সাহায্য করতেন। ভদ্রলোক সম্পূর্ণ নিজের উৎসাহে গোপনে এ কাজ করতেন, কিন্তু এবার প্রথম শ্রেণীর সুদক্ষ কর্মীর প্রয়োজন হলো। তাঁদের আবিষ্কার রসায়ন-রাজ্যে অনেক দূর প্রবেশ করেছিল, সে-ক্ষেত্রে সহকারীর বিস্তৃত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। কুরীরা সুদক্ষ গবেষক-কর্মীর সহযোগিতার প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভব করলেন।

এই সময়ে মারীর লেখায় দেখি : 'রেডিও-এ্যাকটিভিটির কাজ আমরা নিরিবিলিতেই শুরু করেছিলাম, কিন্তু ক্রমেই তা এত জটিল হয়ে দাঁড়াল যে, বাইরের সহযোগিতা অপরিহার্য হলো। ১৮৯৮ সালে জ. বেমোঁ নামে স্কুল-ল্যাবরেটারির প্রধান কর্মীদের মধ্যে একজন আমাদের কিছুদিন সাহায্য করলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রফেসর ফ্রিদেল্-এর ল্যাবরেটারি-সহকারী আঁদ্রে দ্যবিয়েরন্ নামে অল্পবয়সী এক রসায়নবিদ পিয়ের কুরীর কাজে এগিয়ে এল। পিয়ের-এর ওপর ছেলেটির অশেষ শ্রদ্ধা ছিল। আঁদ্রে দ্যবিয়েরন্ খুশি হয়ে, তেজস্ক্রিয়তার ওপর খাটতে রাজি হলো। এক-জাতীয় লোহা আর দুষ্প্রাপ্য মাটির মধ্যে এক নতুন তেজস্ক্রিয় পদার্থের অস্তিত্ব সন্দেহ করা হচ্ছিল, ছেলেটি সে-বিষয়ে বিশেষ উৎসাহে লেগে গেল। সে "এক্টিনিয়ম" নামে এক নতুন পদার্থ আবিষ্কার করল। সরবনে জ্যঁা-পেরিন পরিচালিত পদার্থ-রাসায়নিক ল্যাবরেটারিতে ছেলেটি কাজ করত কিন্তু প্রায়ই আমাদের আটচালায় যাতায়াত ক'রে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। পরে আমাদের বাচ্চাদের সঙ্গে ও'র ঘনিষ্ঠতা হলো।"

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, রেডিয়ম ও পোলোনিয়মের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকৃত হবার আগেই এক ফরাসী বৈজ্ঞানিক আঁদ্রে দ্যবিয়েরন্ ওদেরই 'সহোদর' "এক্টিনিয়ম" পদার্থটি আবিষ্কার করেন।

(মারী আমাদের বলেন :) প্রায় একই সময়ে জর্জ সাগঁ নামে এক তরুণ পদার্থবিদ এক্স-রে'র বিষয় পড়তে পড়তে প্রায়ই পিয়ের-এর কাছে আসতেন। এইসব রশ্মি ও তাদের শাখারশ্মিগুলির মধ্যে সাদৃশ্য এবং তেজস্ক্রিয় দ্রব্যগুলির বিচ্ছুরণ, এই ছিল তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু। তাঁরা দুজনে মিলে এই শাখা-রশ্মির সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তির একটা কাজ সম্পন্ন করেন।

স্যাঁ-জুকিমস্তাল থেকে অনেকবারই পিচ-ব্লেণ্ডের গাদ পাঠান হলো, তার প্রতিটি কিলোগ্রাম মারী সহস্তে যাচাই করলেন। অসীম ধৈর্য বলে চার বছর ধরে সমানে তিনি একাধারে পদার্থবিদ, রসায়নজ্ঞ, বিশিষ্ট কর্মী, যন্ত্র-বিশারদ এবং শ্রমিকের কর্তব্য পালন ক'রে গেলেন। তাঁর মস্তিষ্ক ও শারীরিক শক্তির কল্যাণে আটচালার নীচে পুরোনো টেবিলখানা ক্রমেই বেশী পরিমাণে রেডিয়ম-বিশিষ্ট পদার্থে পূর্ণ হয়ে উঠল। মাদাম কুরীর কাজ শেষের দিকে এগিয়ে আসছিল, এখন আর উঠোনে বিশ্রী ধোঁয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে ভারী ভারী বাসন-ভরতি জিনিসপত্র জ্বাল দিতে হয় না। এখন শুধু শোধন করা আর অতিরিক্ত রেডিও-এ্যাকটিভ তরল মিশ্রণের "ভগ্নাংশিক কেলাস-করণের" কাজ। কিন্তু জোড়াতালি দেওয়া ব্যবস্থার দৈন্য এখন ক্রমেই গুরুতর সমস্যার কারণ হচ্ছে

উঠছে। এখন বিশেষ প্রয়োজন ঝক্ঝকে পরিষ্কার কাজের জায়গা এবং শীতাতপ, ধুলো হতে সংরক্ষিত যন্ত্রপাতি। এই আটচালার নীচে মারী মধ্যে লক্ষ্য করলেন যে, এত যত্নে শোধিত পদার্থগুলির সঙ্গে বাতাস-তাড়িত লোহা আর কয়লার গুঁড়ো মিশে যাচ্ছে। তাঁর এত সময় ও সামর্থ ব্যর্থ হতে যাচ্ছে দেখে সময়ে সময়ে তাঁর অন্তর সঙ্কুচিত হয়ে উঠত।

দিনের পর দিন এইভাবে কাজ ক'রে পিয়ের বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন। রেডিয়ম ও রেডিও-এ্যাকটিভিটি সম্বন্ধে পড়াশোনা তিনি চালিয়ে যেতেন। তখনকার মতো বিশুদ্ধ রেডিয়ম প্রস্তুতের কাজ ক্লান্তির জন্য বন্ধ রাখতে চাইছিলেন। প্রত্যহ বাধা যেন পাহাড়-প্রমাণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পরে ভাল ব্যবস্থা ক'রে এ কাজে হাত দিলে ক্ষতি কি? পদার্থের বাস্তব সত্তার তুলনায় প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে অনেক বেশী যোগাযোগ থাকায় পিয়ের মারীর এই অমানুষিক প্রচেষ্টার যৎকিঞ্চিৎ ফলাফল দেখে বিরক্ত হয়ে উঠলেন।

কিন্তু স্ত্রীর স্বভাবের কথা তাঁর মনে ছিল না। মারী যখন রেডিয়ম বিচ্ছিন্ন করবেন ভেবেছেন, তখন তার শেষ না দেখে তিনি ছাড়বেন না। ক্লান্তি ও বাধা তিনি সইতে পারতেন না, এমন কি নিজের অজ্ঞানতার জন্য কাজের মধ্যে যে জটিলতার সৃষ্টি হতো, তার প্রতিও তাঁর বিতৃষ্ণার অন্ত ছিল না। বাস্তবিক বৈজ্ঞানিক হিসেবে তিনি একেবারেই ছেলেমানুষ ছিলেন; কুড়ি বছরের সাধনায় পিয়ের যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ করেছিলেন, সে-ধরনের আস্থা তো তাঁর নিজের ওপর ছিল না। যেসব বিষয়ে তাঁর জ্ঞান কম ছিল, বা অল্প সময়ের মধ্যে কোনরকমে পড়ে নিতে হতো, সেসব প্রাকৃতিক অবস্থা বা হিসাব-পদ্ধতির কাছে এসে মাঝে মাঝে তিনি ধাক্কা খেতেন।

বিভ্রাট বেড়েই যেত। মস্ত জোড়া-ভুরুর নীচে চোখ দুটি দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় স্থির হয়ে যেত; তিনি তাঁর যন্ত্রপাতি ও টেস্টটিউব আঁকড়ে পড়ে থাকতেন।

কুরী-দম্পতি রেডিয়মের অস্তিত্ব ঘোষণা করার পঁয়তাল্লিশ মাস পরে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে মারী এই ক্ষয়যুদ্ধে জয়ী হলেন: এক ডেসিগ্রাম বিশুদ্ধ রেডিয়ম তৈরি ক'রে তার আণবিক ওজন ২২৫ নির্ণয় করলেন।

অবিশ্বাসী পদার্থবিদের দল,—এ পর্যন্ত যাঁদের মধ্যে অল্প কয়েকজনই অবশিষ্ট ছিলেন,—তাঁরা সকলে সত্যের কাছে মাথা নীচু করতে বাধ্য হলেন।

রেডিয়মের অস্তিত্ব স্বীকৃত হলো।

রাত তখন ন'টা বাজে। পিয়ের ও মারী কুরী সে-সময়ে ১০৮ নং বুলেভার্ড

কেলারম্যান্-এর তাঁদের ছোট্ট বাড়িতে বাস করছিলেন। এখানে এঁরা ১৯০০ সাল থেকেই বাস করছিলেন। বাড়িটা তাঁদের পছন্দসই। বুলেভার্দ থেকে তিন সারি গাছ বাড়িখানা প্রায় আড়াল ক'রে রেখেছিল, শুধু একখানা ন্যাকাশে দেয়াল আর একটা ছোট্ট দরজা চোখে পড়ত। কিন্তু এই দোতলা সুন্দর বাড়ির পেছনে লোকচক্ষুর অন্তরালে সুন্দর নিরিবিলি দেশী গাছগাছালির একটা বাগান ছিল। "জেন্‌টিলির" বেড়া পেরিয়ে তাঁরা দুখানা সাইকেল নিয়ে গ্রামের পথে, বনবাদাড়ের পথে পাড়ি দিতেন।...

বৃদ্ধ ডাক্তার কুরী এই দম্পতির সঙ্গেই থাকতেন, তিনি তখন নিজের ঘরে গিয়ে শুয়েছেন। মারী তাঁর বাচ্চাকে স্নান করিয়ে বিছানায় শুইয়ে তার পাশে বসেছিলেন। এটা একটা অনুষ্ঠানের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। রাত্রে বিছানার পাশে মাকে না পেলে আইরিন সমানে 'মে!' বলে চেঁচাতে থাকত। 'মাম্মা'কে ছোট ক'রে আমরা বরাবর 'মে' বলেই ডাকতাম। মারী চারবছরের শিশুর আব্দার রেখে, সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠেই অন্ধকারে যতক্ষণ না কচি গলার উচ্ছ্বাস ধীরে ধীরে শান্ত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দে পরিণত হতো, ততক্ষণ, বসে থাকতেন, তারপর তিনি পিয়ের-এর কাছে ফিরে যেতেন। পিয়ের আবার ততক্ষণে অধৈর্য হয়ে উঠেছেন! অমন দয়ার শরীর হলে কি হয়, স্ত্রীর ওপর তাঁর দাবীর অন্ত ছিল না, এ বিষয়ে তিনি রীতিমত স্বার্থপর ছিলেন। সারাক্ষণ স্ত্রীর পাশে থেকে তাঁর এমনই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে, অল্প সময়ের জন্যেও মারী সরে গেলে তাঁর চিন্তার স্রোতে বাধা পড়ত। মারী যদি বাচ্চার পাশে কিছু বেশী সময় থাকতেন, তবে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এমন অন্যায় ভাবে বকতেন যে, সেকথা ভাবলেও হাসি পায়: 'বাচ্চা ছাড়া তোমার আর কোন চিন্তা ভাবনা নেই দেখছি!'

পিয়ের ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে পায়চারি ক'রে বেড়ান। মারী আইরিনের নতুন এপ্রনে কয়েক কোঁড় মুড়ি সেলাই তুলতে থাকেন। তিনি কখনও তৈরি জামা কিনে বাচ্চাকে পরান নি। তাঁর মনে হতো সেগুলো বড্ড বাহারে, কোন কাজের নয়। আগে যখন ব্রনিয়া পারীতে ছিলেন, তখন দুই বোনে তাঁদের ছেলেমেয়েদের জামা একসঙ্গে ব'সে কাটতেন, নিজেরাই তার প্যাটার্ন বের করতেন। মারী এপর্যন্ত সেইসব প্যাটার্নই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আজ সন্ধ্যে থেকে তিনি কেমন যেন এদিকে মন দিতে পারছিলেন না। বিচলিতভাবে উঠে পড়ে বললেন: 'ধরো, যদি এক মুহূর্তের জন্য আমরা আবার সেখানে ফিরে যাই?' তাঁর কণ্ঠে এ অনুরোধের সুরের

কোন প্রয়োজন ছিল না—কারণ ঘণ্টা দুই আগে ছেড়ে-আসা আটচালাটা পিয়েরকেও হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। জীবন্ত প্রাণীর মতো, আশ্চর্য প্রেমের মতো মোহময় রেডিয়ম বৈজ্ঞানিক-দম্পতিকে জীর্ণ ল্যাবরেটারিতে টেনে নিয়ে গেল।

সেদিন পরিশ্রমটা কিছু বেশীই হয়েছিল। সেই জন্যই বিশ্রামের প্রয়োজনও ছিল অতিরিক্ত। কিন্তু পিয়ের ও মারীকে সব সময়ে যুক্তি দিয়ে বোঝা যেত না। দুটি কোট গায়ে দিয়ে বৃদ্ধ শ্বশুরকে ব'লে দু'জনে পথে বেরিয়ে এলেন। হাত ধরাধরি ক'রে, যৎসামান্য কথার আদান প্রদান হলো কি হলো না, তাঁরা পায়ে হেঁটে চললেন। এই অদ্ভুত জায়গার ভিড় ঠেলে ফ্যাক্টরি-বাড়িগুলো পেরিয়ে, পোড়ো জমি, কুঁড়ে ঘরের সারি পেছনে ফেলে তাঁরা রু-লমোঁ'য় এসে পৌঁছলেন এবং আঙিনার ওপাশে চলে গেলেন। পিয়ের তালায় চাবি ঘোরালেন। এর আগে হাজারবার যেমন ক্যাঁচ ক'রে শব্দ হয়েছে, আজও তার ব্যতিক্রম হলো না, তাঁরা আবার তাঁদের স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করলেন।

'আলো জেলো না।' অন্ধকারে মারী বললেন, তারপর অল্প হেসে আবার বললেন: 'মনে পড়ে, তুমি একদিন আমায় বলেছিলে যে, তোমার ইচ্ছে, রেডিয়মের যেন খুব সুন্দর একটা রঙ হয়।'

বহুকাল আগের এক সাধারণ ইচ্ছার চেয়ে বাস্তব অনেক বেশী মোহন রূপে দেখা দিল। সুন্দর রঙের চেয়েও রেডিয়মের অতিরিক্ত আরও কিছু ছিল। পদার্থটি স্বভাবতই উজ্জ্বল। আলমারির অভাবে কাঁচের জার ভরা সেই অমূল্য পদার্থটি টেবিলের ওপর দেওয়ালে পেরেক ঠোকা তাকের ওপর রাখা ছিল: সেই দীন আটচালার নীচে এর নীলাভ আলো অন্ধকারের গায়ে উজ্জ্বল হয়ে জ্বল জ্বল করছিল।

অস্ফুট নারী কণ্ঠে বিস্ময় ভেঙ্গে পড়ল: 'দেখ···দেখ গো!' সন্তর্পণে এগিয়ে একটা বেতের চেয়ার টেনে মারী বসে পড়লেন। অন্ধকারে নিঃশব্দে তিনি বসলেন। আবছা আলোর দিকে, বিচ্ছুরণের রহস্যময় কেন্দ্রগুলির দিকে, 'রেডিয়ম',—তাঁদের রেডিয়মের দিকে দু'জনে মুগ্ধ নয়নে চেয়ে রইলেন। শরীরটা সামনে ঝুঁকিয়ে, আগ্রহ-ভরা অন্তরে মারী ঘণ্টাখানেক আগে নিদ্রিত শিশুর বিছানার পাশে যেভাবে বসেছিলেন সেই ভাবে বসে রইলেন।

তাঁর জীবন-সহচর আলতো ভাবে তাঁর মাথার ওপর হাত রাখলেন।

আজীবন এই সান্ধ্যজোনাকির কথা, এই রহস্যের কথা তাঁর মনে ছিল।

কঠিন জীবনসংগ্রাম

১৪

এই জীর্ণ ল্যাবরেটারিতে প্রকৃতির সঙ্গে সাংঘাতিক যুদ্ধ চালানোই যদি একমাত্র সাধনা হতো, তবে পিয়ের ও মারীর জীবনে হয়তো দুঃখের কিছু থাকতো না।

দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁদের নানা ধরনের যুদ্ধেরও সম্মুখীন হতে হতো আর সব সময়েই তাঁরা যে বিজয়ী হতেন, তাও নয়।

পাঁচশ' ফ্র্যাঙ্কের বিনিময়ে পিয়েরকে স্কুল-অব-ফিজিক্সে একশ' কুড়িটা পাঠ দিতে হতো। এর জন্যে তাঁকে যথেষ্ট খাটতে হতো। তাঁর নিজস্ব গবেষণার কাজের ওপর এই ক্লান্তিকর চাকরি তিনি নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। যতদিন সন্তান হয় নি, মারী সহস্তে গৃহকাজ সম্পন্ন করেছেন। ততদিন টাকার টান পড়ে নি। কিন্তু আইরিনের জন্মের পর একটি চাকর ও একটি ধাই-এর খরচ তাঁদের আয়ের খাতে মোটা আঁচড় বসাতে শুরু করেছে। প্রথমে পিয়ের পরে মারী এই যুদ্ধে নামলেন, অর্থোপায়ের পথ খুঁজে নিতেই হবে।

বছরে দুই থেকে তিন হাজার ফ্র্যাঙ্কের প্রয়োজন, অথচ এই অসাধারণ দম্পতির পক্ষে এটুকু অর্থোপার্জন করার বিশ্রী গ্লানিকর প্রচেষ্টার মতো বিড়ম্বনার আর কি আছে? যেমন তেমন কিছু একটা কাজ জোগাড় ক'রে টাকা রোজগার করাটাই তো আসল কথা নয়! পিয়ের মনে করতেন বৈজ্ঞানিক-অনুসন্ধানের মতো অপরিহার্য কর্তব্য আর কিছু হতে পারে না। তাঁর চোখে আহার নিদ্রার তুলনায় ল্যাবরেটারিতে পরিশ্রম করা, ল্যাবারটারির অভাবে অন্ততঃ আটচালার নীচে কাজ চালিয়ে যাওয়ার সার্থকতা অনেক বেশী। দায়-দায়িত্বের বোঝা ভারী না ক'রে, আদর্শ পালন করতে পারলে কাজ হালকা হয়। কিন্তু টাকার যে বড্ড দরকার! পথ কি?

সমাধানের পথ ছিল বৈ কি। সরবনে যদি তিনি অধ্যাপনার কাজ পান, তবে সেটি তাঁর যোগ্য হয়, বছর গেলে দশ হাজার ফ্র্যাঙ্ক পাওয়া যায়। এখানে ইস্কুলের কাজ থেকে কম সময় যাবে পাঠ দিতে অথচ ছাত্রদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সমৃদ্ধ হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান উন্নত হবে। আর এই সঙ্গে যদি ল্যাবরেটারির কাজ যোগ হয় তবে পিয়ের-এর আর কিছু চাইবার থাকে না।

ভরণ-পোষণের মতো উপার্জন এবং সেই সঙ্গে পদার্থবিদ্যের শিক্ষাদানের জন্য অধ্যাপকের পদ, কাজের জন্য একটা ল্যাবরেটারি, তাঁদের আটচালাতে যে জিনিসগুলির বড্ড অভাব ছিল, সেই সব অভাবশূন্য একটি ল্যাবরেটারি, বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য কার্যোপযোগী ব্যবস্থা, সহকারীর জন্য একটি ঘর, শীতের সময় আগুন—এই তো সামান্য ছিল তাঁর চাওয়া।

এ কি অসম্ভব দাবী, উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন! ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সারা দুনিয়া যখন তাঁর প্রতিভা স্বীকার ক'রে নিল, তখন পর্যন্ত অধ্যাপকের কাজের জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ল্যাবরেটারির স্বপ্ন তাঁর স্বপ্নই রয়ে গেল। মহাপুরুষদের ওপর সরকারি কর্মচারীদের চেয়ে মৃত্যুর দাবী অনেক বেশী।

আসলে, রহস্যঘন প্রকৃতির জটিলতা উদ্‌ঘাটনে অথবা বিদ্রোহী পদার্থের বিরুদ্ধে সূক্ষ্ম অভিযানে যিনি সিদ্ধহস্ত, সেই পিয়েরকে যখন নিজের চাকরির চেষ্টা করতে হলো, তখন তিনি অদ্ভুত অপটুতা জাহির করলেন। তার প্রথম অন্তরায় হলো তাঁর প্রতিভা; ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় যে-কোন প্রতিভা অসহ্য অব্যক্ত বিদ্বেষের সৃষ্টি করে। এসব ক্ষেত্রে দলীয় মনোভাব বা হীন-পন্থার বিষয় কিছুই তিনি অবগত ছিলেন না। তাঁর অনন্যসাধারণ গুণপনাকে কার্যকরী করার পদ্ধতি তো তাঁর জানা ছিল না।

বন্ধু, এমনকি শত্রুর সামনে পর্যন্ত নিজেকে জাহির করার কোন চেষ্টাই তাঁর ছিল না। লোকে বলত তিনি নাকি 'পদপ্রার্থী হিসেবে অকেজো' (অঁারী পোয়ঁ্যাকারে তাঁকে লিখেছিলেন, আর সেই সঙ্গে এও জানিয়েছিলেন:) 'আমাদের প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমাদের সে-জিনিসটার অভাব আছে, চাকরির উমেদাররা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা পূরণ করতে সক্ষম হন না।'

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সরবনে ফিজিকাল কেমিস্ট্রির একটা পদ খালি হলো। পিয়ের ভাবলেন সেটির জন্য চেষ্টা করবেন। ন্যায়সঙ্গত ভাবে এই পদটি তাঁরই প্রাপ্য ছিল। কিন্তু যেহেতু তিনি সাধারণ কিংবা পলিটেক্‌নিক স্কুলে পড়েন নি; সেইজন্য এই সব শিক্ষায়তনের প্রাক্তন ছাত্ররা তাদের কাছ থেকে যে সুপারিশ পেয়ে থাকে, তা থেকে তিনি বঞ্চিত। তাছাড়া কয়েকজন ছিদ্রধারী অধ্যাপকের মতে—গত পনেরো বছর যাবৎ তাঁর আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলিকে "যথার্থ" পদার্থ-রাসায়নের পর্যায়ে ফেলা যায় না!···সুতরাং তাঁর প্রার্থী-পদ বাতিল হলো।

(অধ্যাপক ক্রিদেল নামে তাঁর সমর্থক এক ভদ্রলোক তাঁকে এই সময়ে লেখেন:) 'আমরা হেরে গেলাম কিন্তু ভোটের তুলনায় তোমার বিষয়ে যে

আলোচনা অনেক বেশী অনুকূল হয়েছিল সে-কথা যদি না বুঝতাম, তাহলে এই ব্যর্থ উমেদারির জন্য তোমায় উৎসাহিত করার গ্লানি আমার ঘুচত না। কিন্তু লিপমান, বাউটি, পেলাত, আর আমার আপ্রাণ চেষ্টা এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের মুখে পর্যন্ত তোমার কাজের প্রশংসা সত্ত্বেও নর্মাল স্কুলে পড়া পদপ্রার্থী আর গণিতশাস্ত্রবিদ্‌দের অন্ধসংস্কারের বিরুদ্ধে কি করা যায় জানি না।'

'আলোচনা অনেক বেশী অনুকূল হয়েছিল,' এ সত্য পিয়ের-এর কাছে বিশুদ্ধ দার্শনিক সান্ত্বনা মাত্র হলো। কয়েকমাস ধরে কোন লোভনীয় পদ খালি হলো না এবং কুরী-দম্পতি রেডিয়মের সাধনায় লিপ্ত থেকে চাকরির উমেদারিতে সময় নষ্ট করার চেয়ে কষ্টে দিনগুজরান করা অনেক শ্রেয় বলে মনে করলেন। দুঃখের অন্ন সুখ ক'রে খেলেন, কোন অভিযোগ রইল না তার জন্য। পাঁচশ' ফ্র্যাঙ্ক একেবারে কিছু না, তা তো নয়! দিন চলে যায়··· তবে অতি কষ্টে।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মারী তাঁর দাদা যোসেফ শ্‌ক্লোদোভ্‌স্কিকে লেখেন:

'আমাদের খুব হিসেব ক'রে চালাতে হয়। আমার স্বামীর মাইনে বেঁচে থাকার পক্ষে যথেষ্ট নয়; কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রতি বছরই একটা-না-একটা বাড়তি রোজগার হয়েই গেছে আর তাইতে আমাদের ধার করতে হয় নি।

'আশাকরি আমরা শিগগিরই বাঁধা চাকরি পেয়ে যাব। তখন যে শুধু খরচে কুলিয়ে যাবে তা' নয়, বাচ্চার ভবিষ্যতের জন্যও কিছু থাকবে। চাকরির চেষ্টা করার আগে, আমি শুধু ডক্টরেট ডিগ্রিটা পেতে চাই। বর্তমানে আমাদের গবেষণা নিয়ে এমন ব্যস্ত আছি যে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্যে তৈরি হবার সময়ই পাই না। এই কাজের ওপরে হলেও এ বিষয়ে আরও কিছু পড়তে হবে। তারও সময় পাচ্ছি না।

'শরীর আমাদের ভালই আছে। আমার স্বামীর বাত কমে গেছে, কারণ দুধ, ডিম আর আনাজপাতি পথ্য করছেন, মদ বা মাংস একেবারে বন্ধ, প্রচুর জল খান। আমি বেশ ভালই আছি, কাশি একেবারে নেই, আর শুধু পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে আমার ফুসফুসে কোন গোলমাল নেই।

'আইরিন স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠছে। আঠারো মাসে পড়তে আমার দুধ বন্ধ ক'রে দিয়েছি, কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত দুধের স্যুপ দিয়েছি, এখনও দুধের স্যুপ খায়। টাটকা মুরগীর ডিমও খায়।'

১৯০০ খৃষ্টাব্দে ব্যায়ের মাত্রা আয় ছাপিয়ে উঠে গেল। বৃদ্ধ ডাক্তার কুরী এখন ওঁদের সঙ্গেই থাকেন, কাজেই ভৃত্য সমেত পাঁচজন মানুষের সংসার

চালাতে মারী বুলেভার্দ কেলরমান-এর বাড়ি চোদ্দ-শ' ফ্র্যাঙ্ক-এ ভাড়া নিলেন। অভাবের চাপে পিয়ের পলিটেক্‌নিক ইস্কুলে মাষ্টারি নিলেন। এই প্রচণ্ড পরিশ্রমের বদলে তিনি বছরে মাত্র আড়াই হাজার ফ্র্যাঙ্ক পাবেন।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব এল, কিন্তু ফ্রান্স থেকে নয়। রেডিয়ম আবিষ্কারের খবর জনসাধারণের অজানা থাকলেও পদার্থবিদ-মহলে আর অজানা ছিল না। জেনেভার বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ধারণায় ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক-দম্পতিকে নিজেদের দেশে নিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। সেখানকার অধ্যক্ষ পিয়ের কুরীকে পদার্থবিদ্যা বিভাগে সাগ্রহে এক উচ্চপদে আহ্বান জানালেন, দশ হাজার ফ্র্যাঙ্ক বাৎসরিক বেতন, বাসা খরচ, 'ল্যাবরেটারি-পরিচালনার প্রয়োজনে নির্ধারিত অর্থের অঙ্ক বৃদ্ধি—এ-সবই প্রফেসর কুরীর সঙ্গে আলোচনা-সাপেক্ষ। দুইজন সহকর্মীর বন্দোবস্ত থাকবে। ল্যাবরেটারির সম্ভাবনা পরীক্ষা ক'রে পদার্থবিদ্যার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হবে।' একই ল্যাবরেটারিতে মারীর জন্যও একটি পদের বন্দোবস্ত করা হবে।

এসব ক্ষেত্রে অদৃষ্টের পরিহাস যেমন হয়ে থাকে, তেমনি যা যা তাঁরা চাইছিলেন, সবই যেন হাতের কাছে ধরা দিল, কিন্তু সামান্য একটুখানি খুঁৎ সমস্ত ব্যবস্থা অসম্ভব ক'রে তুলল। এই চমৎকার চিঠিখানির শিরোনামা যদি 'রিপাবলিক অব ক্যান্টন অব জেনেভা'—না হয়ে, 'ইউনিভার্সিটি অব পারী' থাকত, তবে কুরী-দম্পতির আর আনন্দের সীমা থাকত না।

জেনেভার এই প্রস্তাবপত্রে এত আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধা ছিল যে, প্রথমে পিয়ের রাজি হয়ে গেলেন। জুলাই মাসে তিনি সস্ত্রীক সুইট্‌জারল্যাণ্ডে গেলেন এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে অত্যন্ত সাদর অভ্যর্থনা পেলেন। কিন্তু গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি সময় থেকে তাঁরা দুশ্চিন্তিত হয়ে উঠলেন। তাঁদের এই নতুন অমূল্য অবিষ্কারের কি এখানেই ছেদ টানতে হবে? রেডিয়মের গবেষণার কাজে বাধা পড়বে, কারণ অন্যত্র এ সব জিনিসপত্র চালান করা তো সহজ ব্যাপার নয়! এ অভিনব পদার্থ শোধনের কাজ ফেলে রেখে যাওয়া কি উচিত হবে? দুই বৈজ্ঞানিকের কাছে, দু'জন কর্মীর কাছে এ প্রশ্ন সব থেকে বড়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিয়ের জেনেভায় তাঁর অক্ষমতা জানিয়ে, তাঁদের প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে চিঠি দিলেন, সহজ জীবনের প্রলোভন দূরে সরিয়ে তিনি রেডিয়মের আকর্ষণে পারীতে থাকাই স্থির করলেন। এদিকে অক্টোবর মাসে

পলিটেকনিক থেকে একটু বেশী মাইনের এক চাকরি পেলেন। সরবনেরই এক উপশাখা রু-কুভিয়ের-এর পি. সি. এন.*-এ শিক্ষকতার পদ। মারী স্বামীকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন; ভারসাই-এর কাছে স্যাভর-এ "হায়ার নর্মাল স্কুল ফর গার্লস"-এ প্রফেসর পদের জন্য আবেদনপত্র পাঠালেন। সহ-অধ্যক্ষের কাছ থেকে প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে চিঠি এল:

'মহাশয়া,—

আপনাকে সানন্দে জানান যাইতেছে যে, আমার সুপারিশে স্যাভর-এর 'নর্মাল স্কুলে ১৯০০ থেকে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় বাৎসরিক ছাত্রীদের পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষাদানের ভার আপনার উপর ন্যস্ত হইল। অনুগ্রহ করিয়া আগামী সোমবার ২৯শে পরিচালক-গোষ্ঠীর সামনে উপস্থিত হইবেন।'

দু'জায়গার চেষ্টাই সফল হলো। অনেক দিনের জন্য সংসারের ভাবনা ঘুচল। কিন্তু ঠিক যে-সময়ে তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষার কাজে তাঁদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করার প্রয়োজন, তখনই বাইরের প্রচণ্ড কাজের বোঝা ঘাড়ে এসে চাপল। সরবনে প্রফেসরের পদ হলে পিয়ের-এর উপযুক্ত কাজ হতো, সেখানে তারা ওঁকে প্রত্যাখ্যান করল। কিন্তু দেখা গেল কর্তৃপক্ষ এই শিক্ষকটির স্কন্ধে বক্তৃতার বোঝা চাপানোতেই যেন উৎসাহী। মঁসিয়ে ও মাদাম কুরী পাঠ্য পুস্তকের উপর হুমড়ি খেয়ে ক্লাসে শেখাবার উপযোগী বিষয়বস্তু খুঁজতে লাগলেন। পিয়েরকে এখন দুই শ্রেণীর ছাত্রকে দু'রকম পাঠ দিতে ও হাতের কাজ শেখাতে হয়। ফরাসী ভাষায় শিক্ষকতা প্রথমেই এত ভাল উৎরে গেল যে মারী স্যাভর-এর ছাত্রীদের বক্তৃতায় ও হাতে-কলমে পদার্থবিদ্যা শেখাবার জন্য উঠে পড়ে নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নিলেন। নতুন নতুন শিক্ষা-পদ্ধতি আবিষ্কার এবং পূর্ব-নির্ধারিত পাঠগুলির এমন উন্নতি করলেন যে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ পোয়্যাঁকারে মুগ্ধ হয়ে এই তরুণী শিক্ষিকাকে অভি-নন্দন জানালেন। কোন কাজই আধাআধি করা মারীর ধাতে ছিল না।

কিন্তু এতে কত যে শক্তি-ক্ষয় হতো, আসল কাজের বাঁধা-ধরা সময় থেকে কত ঘণ্টা যে বাদ পড়ে যেত, তার হিসেব নেই। পোর্টফলিও ব্যাগ-ভরতি ছাত্রীদের সংশোধিত "বাড়ির কাজ" বয়ে নিয়ে মারীকে সপ্তাহের মধ্যে বহুবার স্যাভর-এর দিকে যেতে হতো। ট্রাম চলত গরুর গাড়ির গতিতে, আর তারই

---

* Physics, Chemistry, Natural Science (পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ও প্রকৃতি-বিজ্ঞান)

জন্য রাস্তার ধারে কখনও কখনও আধঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো। পিয়ের ছুটতেন রু-লমোঁ থেকে রু-কুভিয়ের-এর পি. সি. এন-পর্যন্ত, আবার রু-কুভিয়ের থেকে রু-লমোঁ। হয়তো সবে একটা নতুন পরীক্ষা শুরু করেছেন, তক্ষুণি আবার যন্ত্র রেখে ছুটতে হতো স্কুলে।

আশা ছিল যে, নতুন চাকরিতে একটা ল্যাবরেটারি হাতে পাবেন, এবং তা পেলে অনেক সান্ত্বনা পাওয়া যেত। কিন্তু পি. সি. এন. থেকে ওঁকে দু'খানা ছোট ঘর দেওয়া হলো মাত্র। পিয়ের এতে এত হতাশ হলেন যে, চেয়ে নেবার সঙ্কোচ মুখ বুজে জয় ক'রে আর-একটু বড় কাজের জায়গার জন্য আর্জি পেশ করলেন। কিন্তু সব বৃথা।

'যারা এ ধরনের দাবী করে,' (মারীর লেখায় দেখি:) 'তারা জানে যে, এর জন্য কি পরিমাণ আর্থিক ও ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধীয় গোলযোগে পড়তে হয়। তাদের মনে রাখা উচিত যে, সামান্যতম সুবিধা ক'রে নিতে হলে কি পরিমাণ সরকারি চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করতে হয় এবং কত জনের হাতে পায়ে ধরতে হয়। এ ধরনের কাজে পিয়ের-এর ছিল অপরিসীম ক্লান্তি ও নৈরাশ্যবোধ।'

এই চেষ্টার প্রতিক্রিয়া দেখা যেত কুরী-দম্পতির ওপর, এমন কি তাঁদের-শারীরিক শক্তির ওপর। বিশেষতঃ পিয়ের-এর এত কষ্ট হতো যে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাজের ঘণ্টা কমিয়ে আনতে হতো। ঠিক সেই সময়ে সরবনে ধাতুতত্ত্ব-বিদের একটি পদ খালি হলো। স্ফটিকতত্ত্বের বিশেষ গবেষণা দ্বারা পিয়ের ইতিপূর্বে কতকগুলি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, এবং এই পদটির জন্য বিশেষ যোগ্যতা তিনিই দাবী করতে পারতেন। আবেদনপত্রও দিলেন, কিন্তু তাঁর প্রতিপক্ষের আবেদন গ্রাহ্য হলো।

মঁতেন দুঃখিত অন্তকরণে লেখেন: 'অপূর্ব দক্ষতা ও ততোধিক বিনয়ের জন্য মানুষ বহুদিন পর্যন্ত জগতে অপরিচিতই থেকে যায়।'

পিয়ের কুরীর সুহৃদমণ্ডলী তাঁকে অধ্যাপকের দুর্জয় পদের কাছাকাছি টানবার বহু চেষ্টা করেছিলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে, অধ্যাপক মাসকারে পিয়েরকে 'বিজ্ঞান-আকাদেমি'র সভ্য হিসেবে নিজেকে উপস্থিত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তিনি যে নির্বাচিত হবেন, এতো জানা কথা, আর এর ফলে চাকরির বাজারে তাঁর সুবিধেও হবে।

প্রথমে দ্বিধাগ্রস্ত, পরে নিরুৎসাহ ভয়ে তিনি রাজি হলেন। আকাদেমির সদস্যদের সাক্ষাৎ করার প্রচলিত প্রথা তাঁর কাছে কেমন যেন যুক্তিহীন,

অবমাননাকর ব'লে মনে হতো, নিজে এ ব্যাপারে এগোতে তাঁর খুবই খারাপ লাগত। কিন্তু আকাদেমির পদার্থ-বিদ্যা বিভাগ একযোগে সকলে মিলে তাঁকে সমর্থন করলেন। এ ঘটনা তাঁর হৃদয় স্পর্শ করল, তিনি আবেদন করলেন। শাসকারের নির্দেশমত তিনি এই খ্যাতনামা গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। যখন তিনি বাস্তবিক যশ লাভ করলেন, তখন সাংবাদিকরা এই অসাধারণ বৈজ্ঞানিকের জীবনের নানা ঘটনা খুঁজে বের করলেন। তাদের মধ্যে একজন ১৯০২ সালের মে মাসে পিয়ের কুরীর এই সাক্ষাৎকারের ব্যাপার নিয়ে লেখেন :

'...সিঁড়ি বেয়ে উঠে ঘণ্টা বাজিয়ে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা ক'রে আগমনের কারণ বলতে গিয়ে ভদ্রলোকের লজ্জার সীমা থাকত না। উপরন্তু আপন সম্মানের উল্লেখ ক'রে, স্বীয় গুণপনা জাহির ক'রে, আপন বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা আর ক্রিয়াকলাপের প্রশংসা করা তাঁর কাছে মানবিক ক্ষমতার অবমাননা বলে মনে হতো। ফলে তিনি সর্বান্তঃকরণে নিজের প্রতিযোগীরই প্রশংসা করতেন এবং অবশেষে স্বয়ং কুরীর তুলনায় মঁসিয়ে আমাগা সদস্য-পদের যে অনেক বেশী উপযুক্ত সেকথা প্রমাণ ক'রে উঠে আসতেন...'

৯ই জুন নির্বাচনের ফলাফল বেরলো। পিয়ের কুরী ও মঁসিয়ে আমাগার মধ্যে আকাদেমির পণ্ডিতরা মঁসিয়ে আমাগাকেই নির্বাচন করলেন। জর্জ গোয়া ছিলেন পিয়ের-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু : তাঁর কাছে পিয়ের ব্যাপারটা এইভাবে বললেন :

'ওহে বন্ধুবর, তুমি যা ভেবেছিলে ঠিক তাই হলো, পাল্লাটা আমাগার দিকেই ঝুঁকল শেষ পর্যন্ত। তিনি পেলেন ৩২ ভোট আমার ভাগ্যে জুটল ২০ আর গার্নেজি পেল ৬টা।

'সব বলা-কওয়ার পর একটা বিষয়ে আমার অনুতাপ রয়ে গেল যে তদ্বির করতে এতটা সময় নষ্ট হয়ে গেল। পদার্থবিদ্যা বিভাগ একযোগে আমারই নাম তালিকায় তুলেছিল আর আমিও তাদের বাধা দিই নি।

'...এসব কথা তোমায় বলছি, কারণ আমি জানি এ ব্যাপার সম্বন্ধে তোমার আগ্রহ আছে এবং তুমি জান যে এ সব ছোট খাট ঘটনা আমাকে বিশেষ নাড়া দেয় না। ইতি—

তোমারই অন্তরঙ্গ বন্ধু
পিয়ের কুরী।

নতুন আচার্য-পোল আপ্পেল, এককালে মারী যাঁর পড়ানো শুনতে শুনতে

বিভোর হয়ে যেতেন, তিনি পিয়েরকে সাহায্য করার আর-এক উপায় উদ্ভাবন করলেন। পিয়ের-এর একরোখা স্বভাবের কথা তিনি জানতেন, তাই আগে থেকে রাস্তা ক'রে রাখলেন। পোল্ আপ্পেল পিয়েরকে লিখলেন :

'মন্ত্রীসভা থেকে আমার কাছে 'লিজিয়ন অব অনার' লাভের উপযুক্ত কয়েক জনের নাম চেয়ে পাঠিয়েছে। আমার তালিকায় আপনার নাম অবশ্যই থাকবে। শিক্ষাবিভাগের প্রতি কর্তব্য মনে ক'রে আপনি আশাকরি আপনার নাম তালিকাভুক্ত করবার অনুমতি দেবেন। বুঝতে পারি, আপনার মতো কীর্তিমান পুরুষের কাছে পদকের কোন মূল্যই হতে পারে না, কিন্তু শিক্ষা-বিভাগে সবচেয়ে উপযুক্ত লোকদের নামই মাত্র আমি দিতে চাই, বিশেষ ক'রে যাঁরা আবিষ্কার ও অন্যান্য কাজের জন্য সুনাম অর্জন করেছেন। সরকারের সঙ্গে এই সব গুণীজ্ঞানীদের পরিচয় হবার এবং সেই সঙ্গে সরবনে আমাদের অগ্রগতির নমুনা দেবার এই হলো একমাত্র উপায়। আপনার ইচ্ছেমত সম্মান-চিহ্ন আপনি ধারণ করতেও পারেন, নাও করতে পারেন, কিন্তু আপনার নাম প্রস্তাব করায় বাধা দেবেন না, এই আমার আন্তরিক অনুরোধ।

'প্রিয় সুহৃদ্, এ ভাবে আপনাকে উত্যক্ত করার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। ইতি—

পোল্ আপ্পেল।

পোল্ আপ্পেল মারী কুরীকে আলাদা লেখেন :

'আমি বহুবার রেক্টর মঁসিয়ে লিয়ার্দকে মঁসিয়ে কুরীর অপূর্ব অবদান, তাঁর কাজের উপযুক্ত জিনিসপত্রের অভাব ও তাঁর প্রয়োজন বড় একখানা ল্যাবরেটারির বন্দোবস্ত করার কথা বলেছি। ১৪ই জুলাই সম্মান-চিহ্ন প্রদান করার যে কথা চলেছে, সেই সুযোগ ধরে প্রধান অধ্যক্ষ মন্ত্রীসভায় একথা তুলেছিলেন। মঁসিয়ে কুরীর সম্বন্ধে মন্ত্রীমহাশয়ের যথেষ্ট উৎসাহ আমি লক্ষ্য করেছি। সম্ভবত মঁসিয়ে কুরীকে সম্মানচিহ্ন প্রদান করাই হবে তার প্রথম প্রকাশ। এই আন্দাজ ক'রে আমি তোমাকে একান্ত ভাবে অনুরোধ করছি, যেন মঁসিয়ে কুরী এ সুযোগ প্রত্যাখ্যান না করেন। এ বিষয়ে তোমার সাধ্যমত ওঁকে বোঝাবে। জিনিসটার নিজের হয়তো কোন মূল্য নেই, কিন্তু ভবিষ্যতে এ থেকে যথেষ্ট সুফল ফলতে পারে; (যেমন ল্যাবরেটারি; প্রয়োজনমত অর্থের সুরাহা ইত্যাদি)।

'বিজ্ঞানের নাম ক'রে শিক্ষাবিভাগের অশেষ কল্যাণের কথা চিন্তা

ক'রে আমি তোমাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করছি যেন ম'সিয়ে কুরী তাঁর নাম প্রস্তাব করায় বাধা না দেন।'...

এবার পিয়ের কুরীকে "কোন কিছুতেই নাড়ানো" গেল না। এসব ব্যাপারে তাঁর আন্তরিক বিতৃষ্ণাই যথেষ্ট অজুহাত বলা যেতে পারত, কিন্তু এর পেছনে আরও একটা অনুভূতি ছিল। বৈজ্ঞানিককে সবরকম সুবিধা থেকে বঞ্চিত রেখে একই সময়ে "উৎসাহিত" করার জন্য একখণ্ড লাল রেশমী রিবনের প্রান্তে একটি এনামেল করা ক্রুশ চিহ্ন উপহার দেওয়া—এটা তাঁর কাছে প্রহসন বলে মনে হলো।

আচার্যের চিঠির উত্তরে তিনি লিখলেন : 'অনুগ্রহ ক'রে মন্ত্রী মহাশয়কে আমার হয়ে ধন্যবাদ জানাবেন এবং সেই সঙ্গে তাঁকে এই সংবাদটুকু দেবেন যে, সম্মানের প্রয়োজন আমার এতটুকু নেই বরং একটি ল্যাবরেটারির প্রয়োজন আমি উপলব্ধি করি বিশেষ ভাবে।...'

সচ্ছল জীবনের আশা ত্যাগ করতে হলো। বহু আকাঙ্ক্ষিত ল্যাবরেটারির অভাবে জীর্ণ আটচালাতেই তাঁদের সন্তুষ্ট থাকতে হলো এবং এই কেঠো আটচালার নীচে নিবিষ্টচিত্তে যেটুকু সময় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে পারছেন, এই চেতনাই তাঁদের কাছে অনেক অভাবের সান্ত্বনা হয়ে দাঁড়াল। শিক্ষকতা চালিয়ে গেলেন দু'জনেই। সেটুকু তাঁরা বিতৃষ্ণাহীন হৃষ্ট মনেই করতেন। একাধিক ছাত্রের মনে পিয়ের-এর পড়াবার পদ্ধতি স্পষ্ট ভাবে দাগ ফেলে গেছে, কৃতজ্ঞচিত্তে সেকথা তারা ভবিষ্যতে স্মরণ করেছে। স্যাভর-এর একাধিক ছাত্রীর মনে বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ মারীই জাগিয়ে তুলেছিলেন ; চমৎকার সোনালী চুল ভরতি মাথা ছিল প্রফেসর মারীর, যাঁর স্লাভ-উচ্চারণে বিজ্ঞানের হাতের কাজগুলো পর্যন্ত সঙ্গীতময় হয়ে উঠত!

চাকরি আর নিজেদের কাজের ঘূর্ণিপাকে পড়ে তাঁদের নাওয়া খাওয়া ঘুচে যেত। আগেকার দিনে মারী তাঁর কাজের যে ধারায় চলতেন, তাঁর রান্না, সংসারের তদ্বির করা—সব ভুলে গেলেন। কি ভুল করছেন না ভেবেই, স্বামী-স্ত্রী-দুজনেই তাঁদের ক্রম-ক্ষয়িষ্ণু শক্তির অপচয় করতে লাগলেন। কয়েকবারই অসহ্য শারীরিক যন্ত্রনায় ও পরে অসম্ভব কাঁপুনির জন্য পিয়েরকে শয্যা নিতে হয়েছে। অমানুষিক মনের জোরে মারী এপর্যন্ত খাড়া ছিলেন : পরিবারের সকলের দুশ্চিন্তার কারণ তাঁর দেহে যক্ষ্মার আক্রমণ, তিনি দৈনিক অত্যাচারের সাহায্যে তা সারিয়ে তোলেন, ফলে তিনি নিজেকে দুর্জয় ব'লে মনে করতেন। কিন্তু ছোট্ট একটি নোট-বইয়ে নিজের সপ্তাহিক ওজন টুকে রাখতেন, সেখানে

প্রতি সপ্তাহে তাঁর ওজন কমতে দেখা যায়। আটচালার নীচে চার বছরের পরিশ্রমের ফলে মারীর সতেরো কিলোগ্রাম ওজন কমে যায়। তাঁর ফ্যাকাশে রঙ আর শুকনো মুখ বন্ধুবান্ধবের চোখ এড়ালো না; তাঁদের মধ্যে এক পদার্থবিদ পিয়েরে-এর নিজের ও মারীর স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হতে পিয়েরকে অনুরোধ ক'রে চিঠি লিখলেন। এই চিঠিতে কুরীদের জীবনযাত্রার এবং কিভাবে তাঁরা নিজেদের জীবন বিজ্ঞানের পায়ে উৎসর্গ করেছিলেন, তার এক ভীতিপ্রদ চিত্র পাওয়া যায়।

পিয়েরকে লেখা জর্জ সার্গঁর চিঠি :

'...সেদিন পদার্থবিদদের মজলিসে মাদাম কুরীর দৈহিক পরিবর্তন দেখে আমি আঁতকে উঠেছি। জানি, থিসিস্ নিয়ে তিনি অত্যধিক পরিশ্রম করছেন।

'কিন্তু এই সূত্রে বলে রাখি তোমরা যেরকম বিশুদ্ধ জ্ঞানসমৃদ্ধ জীবন যাপন করো, তার ধাক্কা সামলাবার মতো শারীরিক অবস্থা মাদামের নেই; এই সঙ্গে জেনে রেখো যে, তোমার পক্ষেও এ কথা সমভাবেই প্রযোজ্য।

'একটা দৃষ্টান্ত দিই : তুমি বা তোমরা দু'জনে প্রায় কিছুই খাওনা বলেই আমার বিশ্বাস। মাদাম কুরীকে মাত্র দু'টুকরো সসেজ আর এক পেয়ালা চা খেতে আমি নিজে একাধিকবার দেখেছি। তুমি কি জাননা যে সুস্থ শরীরেও এতটুকু খেলে চলে না? মাদাম কুরীর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লে তুমি কোথায় যাবে শুনি?

'তাঁর নিজের উদাসীনতা বা একগুঁয়েমিতে তোমার কোন সান্ত্বনা হবে না। প্রতিবাদে তুমি হয়তো বলবে, "তাঁর ক্ষিদে কম, তাছাড়া নিজের শরীর বোঝবার মতো বয়স তাঁর হয়েছে।" সত্যি বলতে কি—এক্ষেত্রে তাঁর ব্যবহার শিশুর মতো। তোমার প্রতি আমার বন্ধুত্বের ওপর ভরসা রেখেই এসব কথা বলছি।

'তুমি তোমার খাবার জন্য যথেষ্ট সময় নাও না। যখন খুশি খাও, রাত্রে এত দেরীতে খাও যে, অপেক্ষা ক'রে ক'রে পেটটা দুর্বল হয়ে আসে, তারপর যখন খাও তখন ক্ষিদে নষ্ট হয়ে যায়। গবেষণার কাজে এক-আধদিন দেরি হওয়া সম্ভব, কিন্তু সেটা অভ্যাসে দাঁড় করাবার কোন অধিকার তোমার নেই। ...এবং এটাই তোমরা ক'রে চলেছ; জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে বিজ্ঞানের চিন্তায় এভাবে জটিল ক'রে তোলা কখনই উচিত নয়। শরীরকে স্বাভাবিক ভাবে চলতে দাও। খাবারের সামনে শান্ত মনে বসে ধীরে ধীরে চিবিয়ে খাবে, আর সেসময়ে গোলমেলে কথাবার্তা এমনকি যা মনকে ক্লান্ত করে, সে-

মারীর অন্তরে বিবেকের দৈত্য যেন বাসা বেঁধে ছিল, নিজেকে তিনি অন্যায় ভাবে দুষছিলেন। তাঁর পিতার জীবনের শেষ ক'টি বছর শান্তিতেই কেটেছিল। পরিবারের সকলের শ্রদ্ধা ভালোবাসা পেয়ে, পিতা পিতামহ হবার পূর্ণ তৃপ্তি লাভ ক'রে অধ্যাপক শ্‌ক্লোদোভস্কি নিজের দীপ্তিহীন জীবনের দুঃখ ভুলেছিলেন। তাঁর অন্তিম আনন্দের উৎস কিন্তু মারীর কাছ থেকেই তিনি পেয়েছিলেন। পোলোনিয়ম ও রেডিয়ম আবিষ্কার, পারীর বিজ্ঞান-আকাদেমির কার্যবিবরণীতে তাঁর কন্যার প্রবন্ধাদি, পদার্থবিদ প্রফেসারকে নিত্যই আনন্দ ধারায় অবগাহন করাত, কারণ চিরদিন সংসারের গুরুদায়িত্ব তাঁকে এজাতীয় গবেষণার প্রচেষ্টা থেকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছিল। তিনি ধাপে ধাপে তাঁর কন্যার কাজের ধারা অনুসরণ ক'রে যাচ্ছিলেন। কন্যার কাজের গুরুত্ব ও তার ভবিষ্যৎ যশের সম্ভাবনা তিনি বুঝেছিলেন। কিছু আগে মারী তাঁকে লিখেছিলেন যে, চারবছর ধৈর্য সহকারে পরিশ্রম ক'রে কিছু পরিমাণ বিশুদ্ধ রেডিয়ম পাওয়া গেছে। মৃত্যুর ছ'দিন আগে শেষ যে চিঠিখানি লিখেছিলেন, তাতে অধ্যাপক শ্‌ক্লোদোভস্কি কম্পিত হস্তে এই ক'টি কথা লিখেছিলেন, আগের সেই মুক্তাক্ষর অবশ্য আর তেমন ছিল না :

'এতদিনে তুমি বিশুদ্ধ রেডিয়ম সমন্বিত লবনের অধিকারিণী হলে। এর উদ্ধার কার্যে যে পরিমাণ পরিশ্রম করেছ, তার হিসাব নিতে বসলে যাবতীয় রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে একে সবচেয়ে মূল্যবান ধরা উচিত। এমন অপূর্ব একটা কাজের মূল্য শুধুমাত্র খাতায় কলমে রইল ; এর চেয়ে দুঃখের আর কি আছে ?

'এখানে খবর দেবার মতো নতুন কিছু নেই। এখনও গরম পড়ে নি, বলতে গেলে ঠাণ্ডাই আছে। এবার আমায় শুতে যেতে হবে। এখানেই শেষ করি। তুমি আমার অনেক, অনেক আদর গ্রহণ করো।'

আরও দু'বছর বেঁচে থাকলে এই সরল বৃদ্ধের আনন্দের সীমা থাকত না। তিনি দেখতেন তাঁর কন্যার নামের ওপর যশ যেন স্থায়ী ভাবে থাকছে, তিনি দেখতেন আঁরী বেকেরেল, পিয়ের কুরী আর মারী কুরী—তাঁর সেই ছোট্ট মেয়ে আন্সিউপিসিয়ো—নোবেল প্রাইজ লাভ করলেন।

আগের চেয়ে আরও বেশী ফ্যাকাশে, আরও অনেক বেশী রোগা হয়ে মারী ওয়ার্‌স থেকে ফিরলেন। সেপ্টেম্বরে তিনি আবার পোলাণ্ডে ফিরবেন, কথা

দিয়ে এলেন। এত দুঃখের পর শ্লোদোভ্স্কি-সন্তানদের নিজেদের মধ্যে স্নেহ-ভালবাসার বন্ধন এতটুকুও শিথিল হয় নি।

অক্টোবর মাসে পিয়ের ও মারী আবার ল্যাবরেটারিতে ফিরে গেলেন। দু'জনেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। গবেষণার সময়ে, স্বামীর সঙ্গে কাজ করতে করতে মারী রেডিয়ম শোধনের ফলাফলের রেকর্ড রাখছিলেন। কিন্তু তাঁর মন ভেঙ্গে গিয়েছে, কোন কিছুতেই যেন তেমন উৎসাহ পাচ্ছেন না। স্নায়ু-মণ্ডলীর ওপর যে প্রচণ্ড সংযম তিনি এতকাল অভ্যাস ক'রে এসেছিলেন, এখন তার অদ্ভুত সব প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে লাগল। রাত্রে মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে উঠে সাড়া বাড়ি ঘুরে আসতেন। আগামী বছরগুলিতে ভর ক'রে এগিয়ে আসছে যতসব অঘটন। একটি সন্তান-সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়ে গেল অকালে; মারী ব্যথা পেলেন তীব্র ভাবে। ব্রনিয়ার কাছে লেখা চিঠিতে দেখি (—২৫শে আগষ্ট ১৯০৩):

'এই আকস্মিক দুর্ঘটনা আমায় এত দূর বিচলিত করেছে যে, আমি আর কাউকে চিঠি লিখতে ভরসা পাই না। সন্তানের আগমন সম্বন্ধে আমি এতদূর নিশ্চিন্ত ছিলাম যে, আমার এখন মরিয়া অবস্থা, কোন কিছুতেই সান্ত্বনা পাই না। আমি তোমায় অনুরোধ করছি, ঠিক ক'রে বলো দেখি শুধু ক্লান্তিই এর কারণ কিনা; বাস্তবিকই আমি শক্তি সঞ্চয় করার কোন চেষ্টাই করি নি। আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর অশেষ ভরসা ছিল, তার জন্য কি মূল্যই না দিতে হলো আমায়! আজ আমার অনুতাপের সীমা নেই। সন্তানটি মেয়ে ছিল, ভাল অবস্থাতেই বেঁচে ছিল; আর কী আকুল ভাবেই না আমি তাকে চেয়েছিলাম!'

কিছুদিন পরে পোল্যাণ্ড থেকে দুঃসংবাদ এল: ব্রনিয়ার দ্বিতীয় সন্তান, সেও এক ছেলে, অল্প কয়দিন 'টিউবারকুলার মেনিন্‌জাইটিস্‌' হয়ে মারা গেছে।

'...দ্লুস্কি পরিবারের এই দুঃসংবাদে আমি হতবাক হয়ে গেছি,' (মারী পরে দাদাকে লেখেন:) 'শিশুটি যে স্বাস্থ্যের প্রতীক ছিল! যদি সমস্ত যত্ন বিফল ক'রে শিশু মারা যায়, তবে সব শিশুই যে বাঁচবে, বড় হবে, সে-ভরসা কই? এখন আমার মেয়ের দিকে চাইতে বুক কেঁপে ওঠে। ব্রনিয়ার দুঃখ আমায় দহন জ্বালায় ধুকিয়ে মারছে।'

মারীর জীবনে এই সব ঘাত-প্রতিঘাত আরও একটি কারণে সাংঘাতিক ও অসহ্য হয়ে উঠছিল—সেটি এই যে, পিয়ের-এর স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না। যে

স্নায়ুশূল ব্যথায় তাড়নায় পিয়েরকে প্রায়ই শয্যা নিতে হতো, ডাক্তাররা অন্য কোন লক্ষণ না দেখে তাকে বাত বলেই মনে করছিলেন। এই ব্যথা প্রায়ই চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল ও তাঁকে অত্যন্ত দুর্বল ক'রে ফেলল। ব্যথার দরুন তিনি সারারাত কাতরাতেন আর তাঁর ভীতা স্ত্রী দুঃশ্চিন্তা নিয়ে সারারাত জেগে বসে পাহারা দিতেন।

কিন্তু উপায় কি? মারীকে যে স্যাভর্-এ পড়াতে যেতেই হবে, পিয়েরকে ছাত্রদের জন্য প্রশ্ন তৈরি ক'রে রাখতে হবে, তাদের ল্যাবরেটারির কাজ দেখিয়ে দিতে হবে আর ল্যাবরেটারিতে এই দুই পদার্থবিদকে নিজেদের সূক্ষ্ম গবেষণা চালিয়ে যেতেই হবে।

একবার, মাত্র একবার পিয়ের অভিযোগ করেন। নিঃশ্বাসের ফাঁকে বলেন:

'আমাদের বেছে-নেওয়া এই জীবন বড় কষ্টকর—'

মারী প্রতিবাদের চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর উৎকণ্ঠা চেপে রাখতে পারলেন না। পিয়ের-এর নৈরাশ্যের প্রকাশ একটি মাত্র সত্যকে যেন ইঙ্গিত করে,—তাঁর শক্তি কি শেষ হয়ে আসছে? হয়তো কোন কঠিন মারাত্মক রোগ তাঁকে কাবু করছে। আর নিজে? মারীর পক্ষেই কি এই অসম্ভব ক্লান্তি জয় করা সম্ভব হবে? কয়েক মাস ধরে এই মহান নারীর মনের চার পাশে মৃত্যুর ছায়া যেন ভয় দেখিয়ে বেড়াচ্ছে।

'পিয়ের—!'

বিপদের আশঙ্কা মারীর কণ্ঠ যেন চেপে ধরেছে। বিস্মিত বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞেস করেন: 'কি হয়েছে? বল, বল প্রিয়া, তোমার কি হয়েছে?'

'পিয়ের, আমাদের মধ্যে একজন কেউ যদি আগে চলে যায়, অন্যজন কি নিয়ে বাঁচবে? আমরা পরস্পরকে ছেড়ে বাঁচতে পারব না—পারব না।'

পিয়ের ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন। মারী প্রেমময়ী নারীর মতো এই কথা কয়টি ব'লে তাঁকে যেন নতুন ক'রে মনে করিয়ে দিলেন যে, বৈজ্ঞানিকের জীবনের সার্থকতা বিজ্ঞানে, এই সাধনা ছেড়ে যাওয়ার কোন অধিকার তাঁর নেই। বিষাদভরা মারীর মুখখানা আস্তে তুলে ধরে তার দিকে তাকিয়ে থেকে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন: 'তুমি ভুল করছ গো। যাই হোক না কেন, যদি আমাদের মধ্যে একজনকে নির্জীব অবস্থায়ও বেঁচে থাকতে হয়, তবু তাকেই কাজ চালিয়ে যেতে হবে।'

১৫

বিজ্ঞানের পরম সাধকরা যদি ধনী বা দরিদ্র হয়, সুখী বা অসুখী হয়, সুস্থ বা অসুস্থ হয়, তাতে বিজ্ঞানের কি এমন এসে যায়! সে জানে যে, এদের সৃষ্টিই হয়েছে তত্ত্ব অনুসন্ধান করতে এবং যত দিন পর্যন্ত তাদের ক্ষমতার উৎস শুকিয়ে নিঃশেষ না হয়ে যায়, ততদিন তাদের সাধনার শেষ নেই। তার শক্তি নেই নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার; বিতৃষ্ণা ও বিদ্রোহে মন ভরে থাকলেও পা দুটি ঠিকই ল্যাবরেটারির যন্ত্রপাতির দিকে টেনে নিয়ে যাবে।

সুতরাং এ-হেন দুর্দিনেও পিয়ের ও মারীর অপূর্ব অবদানের দিকে তাকিয়ে অবাক হতে ভুলে যাই। রেডিও-এ্যাকটিভিটি এল এবং আপন গতিতে এগিয়ে চলল, কিন্তু যাবার পথে তার জন্মদাতা দুই পদার্থবিদকে একেবারে অবসন্ন ক'রে রেখে গেল।

১৮৯৯ থেকে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কুরী-দম্পতি কখনও একত্রে, কখনও বিচ্ছিন্ন ভাবে, আবার কখনও বা সহকর্মীদের সঙ্গে কাজ চালিয়ে বত্রিশটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। এই সব প্রবন্ধের গম্ভীর শিরোনামা এবং তাঁদের লেখার মধ্যে অজস্র বৈজ্ঞানিক চিত্র ও নিয়মাবলী সাধারণ মানুষকে ঘাবড়ে দিতে পারে। অবশ্য এর প্রত্যেকটিই এক-একটি বিজয়স্তম্ভ। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যগুলির নাম ধরে বিচার ক'রে যাই—কি পরিমাণ জ্ঞান-পিপাসা, নিষ্ঠা ও প্রতিভাই না এর পেছনে লুকিয়ে ছিল!—

"রেডিয়ম রশ্মির রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া।" —মারী কুরী ও পিয়ের কুরী, ১৮৯৯।

"রেডিয়ম সংলগ্ন বেরিয়মের আণবিক ওজন।" —মারী কুরী, ১৯০০।

"নতুন রেডিও এ্যাক্‌টিভ পদার্থগুলি ও তাহাদের নিক্রান্ত রশ্মিগুলি।" —মারী কুরী ও পিয়ের কুরী, ১৯০০।

"রেডিয়ম খনিজ লবনের সাহায্যে উত্তেজিত রেডিও-এ্যাক্‌টিভিটি।" —পিয়ের কুরী ও আন্দ্রে ডবিয়েরন্, ১৯০০।

"রেডিয়ম রশ্মির রাসায়নিক ক্রিয়া।" —পিয়ের কুরী ও আঁরী বেকেরেল, ১৯০১।

"রেডিও-এ্যাক্‌টিভ পদার্থগুলি সংক্রান্ত" —মারী কুরী ও পিয়ের কুরী, ১৯০১।

"রেডিয়মের আণবিক ওজন।" —মারী কুরী, ১৯০২।

"সময়ের সঠিক পরিমাপ।" —পিয়ের কুরী, ১৯০২।

"আরোপিত রেডিও-এ্যাক্‌টিভিটি ও রেডিয়ম নির্গমন"—পিয়ের কুরী, ১৯০৩।

"রেডিয়ম সম্বলিত যৌগকাণ্ড হইতে স্বতঃস্ফুরিত উত্তাপ।"—পিয়েরী কুরী ও এ লাবোর্দে, ১৯০৩।

"রেডিও-এ্যাক্‌টিভ পদার্থগুলির উত্তাপ গবেষণা।" —মারী কুরী, ১৯০৩।

"উষ্ণ প্রস্রবণ হইতে উৎক্ষিপ্ত গ্যাসের রেডিও-এ্যাক্‌টিভিটি।" —পিয়ের কুরী ও এ লাবোর্দে, ১৯০৪।

"রেডিয়ম নির্গমনের পদার্থিক প্রক্রিয়া।" —পিয়ের কুরী, শার্ল বুশাল ও ভি. বালতাজার, ১৯০৪।

ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ ক'রে রেডিও-এ্যাকটিভিটি অতি অল্পকালের মধ্যেই বিভিন্ন দেশগুলি জয় ক'রে ফেলল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দ থেকে শুরু হলো রু-লমোঁতে চিঠি-পত্রের আক্রমণ। ইংল্যাণ্ড, জার্মানি, অষ্ট্রিয়া, ডেনমার্ক—সবজায়গা থেকে খবর জানাবার অনুরোধ ক'রে চিঠি আসতে লাগল। সুতরাং এর পর ক্রমাগতই কুরীদের সঙ্গে স্যার উইলিয়ম ক্রুক্‌স্, প্রফেসর সুৎস্, ভিয়েনার বোল্‌স্‌মান, ডেনমার্কের আবিষ্কারক পল্‌সেন—এঁদের চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলতে লাগল। রেডিয়মের জন্মদাতা—পিতামাতা—সহকর্মীদের কাছে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও কার্যকরী উপদেশ দিতে কার্পণ্য করলেন না। বহুদেশে গবেষকের দল অজানা রেডিও-এ্যাক্‌টিভ পদার্থের সন্ধানে লেগে গেল। তারা নতুন কিছু আবিষ্কারের আশা করছিল। এই সব অনুসন্ধানের সার্থকতা আমরা দেখতে পাই মেসো-থোরিয়ম, রেডিও-থোরিয়ম, আয়োনিয়ম, প্রোট্যাক্‌টিনিয়ম এবং রেডিও-লেড আবিষ্কারে।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে র‍্যামসে ও সোডি নামক দুই ইংরেজ বৈজ্ঞানিক সর্বপ্রথম প্রমাণ ক'রে দেখালেন যে, রেডিয়ম ক্রমাগত খুব কম পরিমাণে একরকম গ্যাস নির্গত ক'রে যায় যার নাম হেলিয়ম। আণবিক বিবর্তনের এই হলো প্রথম প্রমাণ। মারী কুরী ১৯০০ খৃষ্টাব্দে যে সুচিন্তিত বাণী দিয়েছিলেন তারই উপর নির্ভর ক'রে ইংল্যাণ্ডের রাদারফোর্ড ও সোডি এক অভিনব "তেজস্ক্রিয় বিবর্তন-তত্ত্ব" নামে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, রেডিও-এ্যাক্‌টিভ

পদার্থগুলিকে যতই অপরিবর্তনীয় মনে হোক না কেন, তাদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত একটা পরিবর্তন হয়েই চলেছে; এই পরিবর্তনের দ্রুতগতির ওপর তেজস্ক্রিয়তার শক্তি নির্ভর করে।

'এখানে আমরা সাধারণ বস্তুর রূপান্তরের এক প্রামাণিক সত্য পাই, কিন্তু রসায়নজ্ঞদের সঙ্গে আমাদের ধারণার পার্থক্য আছে।' (পিয়ের কুরী লিখেছিলেন:) 'জড় পদার্থ কালের প্রকোপে চিরন্তন নিয়মানুসারে পরিবর্তিত হতে বাধ্য।'

অপূর্ব রেডিয়ম! ক্লোরাইড-এর প্রথায় বিশোধন করলে ফ্যাকাশে সাদা চূর্ণ পদার্থে পরিণত হয়, দেখে চট ক'রে রান্নাঘরের নুন বলে ভুল হতে পারে। কিন্তু যতই এর মৌলিক পদার্থগুলির সন্ধান পাওয়া যেতে লাগল, ততই বিস্ময়ের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। রেডিয়েশন, যার জোরে কুরীরা একে চিনে বের করলেন, তার প্রাচুর্য এক্ষেত্রে অনেক উর্ধ্বে। ইউরেনিয়মের তুলনায় এর রেডিয়েশন দুই নিযুত গুণ বেশী। বিজ্ঞান ইতিপূর্বেই বিশ্লেষণ ও বিখণ্ডিত ক'রে রশ্মিকে তিনটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করেছিল। রূপ পরিবর্তনের পরে সে কঠিনতম ও অসচ্ছতম দ্রব্য ভেদ করতে পারে। একমাত্র কালো সিসের মোটা পর্দা এই রশ্মিগুলির অদৃশ্য গতি রোধ করতে সক্ষম।

রেডিয়মের ছায়া আছে, ভূত আছে বলা যায়, নিজে নিজেই একটি গ্যাসীয় পদার্থ তৈরি করে, রেডিয়ম ভস্ম, যা একসময়ে কার্যকরী থাকে, পরে খুব শক্ত ক'রে মুখ-আঁটা কাঁচের টিউব থেকেও আপনা আপনি নষ্ট হয়ে যায়। উষ্ণ প্রস্রবণের মধ্যে এই গ্যাসের প্রাচুর্য দেখা যায়।

আর একটি ধাক্কা পড়ল পদার্থবিদ্যার অনড় ভিত্তির উপর এবং তা হলো রেডিয়মের তাপ নিষ্ক্রমণ। এক ঘণ্টায় যে পরিমাণ তাপ ক্ষরণ করে, তার সাহায্যে সে নিজের সমওজনের বরফ গলাতে পারে। বাইরের শীত থেকে একে যদি রক্ষা করা যায়, তবে এর তাপ বৃদ্ধি পায় এবং এই তাপের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার চেয়ে দশ ডিগ্রি উর্ধ্বে ওঠা সম্ভব ছিল।

এর দ্বারা কি না সম্ভব? কালো কাগজের ভেতর দিয়ে ছবি-তোলা কাঁচের ওপর সে ছায়া ফেলতে পারে। বাতাসের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ ক'রে সুদূরস্থিত বিদ্যুৎ নিরূপক যন্ত্রকে চালিত করে। যে কাঁচের বাসনে রেডিয়ম রাখা হয়, তাকে সে হাল্‌কা বেগুনি আর ভায়লেট ফুলের রঙে রাঙিয়ে দেয়। যে কাগজ বা তুলোর মধ্যে জড়িয়ে রাখা যায়, তাকে সে ক্ষয় ক'রে ধীরে ধীরে পাউডারে পরিণত করে।

'আগেই আমরা দেখেছি এর জ্যোতি আছে। দিনের আলোয় এই ঔজ্জ্বল্য ধরা পড়ে না' (মারী লিখেছেন :) 'কিন্তু আধো অন্ধকারে সহজেই ধরা পড়ে। অন্ধকারে সামান্য পরিমাণ পদার্থের আলোয় দিব্যি পড়া যায়।...'

রেডিয়মের আশ্চর্য গুণাবলীর বর্ণনা এখনও শেষ হয় নি। নিজে থেকে আলো দিতে পারে না এমন অনেক পদার্থে ফস্‌ফেরেন্স বা জ্যোতি যোগায়।

হীরক এই জাতীয় পদার্থ।

রেডিয়মের গুণেই হীরক এত আলো বিকিরণ করে এবং কৃত্রিম হীরক এত নিষ্প্রভ যে সহজেই চেনা যায়।

এসব ছাড়াও ভালো সুগন্ধী অথবা সংক্রামক ব্যাধির মতো রেডিয়মের রেডিয়েশন 'সংক্রামক'। যে-কোন প্রাণসমৃদ্ধ পদার্থ—গাছ, পশু বা মানুষের কাছাকাছি রেডিয়মের টিউব রেখে সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, তাদের মধ্যে কর্মশক্তি বেড়ে গেছে। এর ফলে বৈজ্ঞানিকদের সঠিক পরীক্ষার কাজে বাধা সৃষ্টি হতো এবং এই সংক্রমণ পিয়ের ও মারী কুরীর দৈনিক শত্রু হয়ে দাঁড়াল।

'শক্তিমান তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিষয় জানতে হলে,' (মারী লিখেছিলেন :) 'প্রথম থেকে সাবধান হতে হবে যদি সূক্ষ্ম ওজনের কাজ করতে হয়। রাসায়নিক ল্যাবরেটারিতে যে বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার করা হয় এবং পদার্থ-বিস্তার পরীক্ষার কাজে যা ব্যবহার করা চলে, এ সকলই অল্প সময়ের মধ্যে তেজস্ক্রিয় হয়ে দাঁড়ায় এবং ছবি-তোলা কাঁচের ওপর কালো কাগজ ভেদ ক'রে ছায়া ফেলতে শুরু করে। ধুলো, ঘরের বাতাস, মানুষের কাপড়-জামা—সব তেজস্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ঘরের বাতাসই বাহকের কাজ করে। আমরা যে ল্যাবরেটারিতে কাজ করি, তার ভেতর এর শত্রুতা চরমে পৌঁচেছে এবং আমাদের কোন যন্ত্র আর সম্পূর্ণ নিরোগ নেই।'

কুরীদের মৃত্যুর অনেক পরে তাঁদের নোট-বই থেকে এক রহস্যময় তেজস্ক্রিয়তার কথা প্রকাশ পায়, এবং তা হলো এই যে, "সক্রিয়ভাবে কার্য-কালের" ত্রিশ, চল্লিশ বছর পরে পর্যন্তও এর মাপযন্ত্রটিতে তেজস্ক্রিয়তা বর্তমান।

তেজস্ক্রিয়তা, তাপ-উদ্‌গিরণ, হিলিয়ম গ্যাসের উৎপত্তি ও নির্গমন, স্বকৃত আত্ম-বিনাশ, এ সবের সাহায্যে পূর্বতন নির্জীব পদার্থ জড় পরমাণুর ধারণা থেকে আমরা কতদূর অগ্রসর হয়ে এসেছি! মাত্র পাঁচ বছর আগে বৈজ্ঞানিকরা বিশ্বাস করতেন যে আমাদের পৃথিবী কতগুলি বিশেষ অনড় অটল পদার্থে সংগঠিত। এখন দেখতে পাচ্ছি প্রতি মুহূর্তে রেডিয়ম-কণিকা আপন

দেহ হতে হিলিয়ম গ্যাস নিক্রমণ ক'রে প্রচণ্ড শক্তিতে চারদিকে নিক্ষেপ করছে। এই অণু-পরিমাণ ভীষণ বিস্ফোরণকে মারী নাম দিলেন : "প্রলয়ঙ্করী আণবিক রূপান্তর।" এই নিক্রান্ত গ্যাসীয় পরমাণু আবার তেজস্ক্রিয় দেহে রূপান্তরিত হয় এবং পরে তারও আবার পরিবর্তন ঘটে।

এইভাবে রেডিও-উপাদানগুলির জননী-পদার্থের স্বেচ্ছামৃত্যু থেকে উদ্ভূত হয়ে বিস্ময়কর ও নির্দয় উপ-পদার্থ গোষ্ঠী সৃষ্টি করে। ইউরেনিয়মের "বংশধর" রেডিয়ম এবং রেডিয়মের বংশধর পোলোনিয়ম। প্রতিমুহূর্তে এদের জন্ম আর চিরন্তন নিয়মানুযায়ী সেই ক্ষণেই সংঘটিত হয় এদের বিনাশ। এই ক্ষণটিকে "নির্ধারিত কাল" বলা হয়, এর কোন নড়চড় হয় না, চিরদিন একই রকম থাকে। নির্ধারিত কালের মধ্যে রেডিও-উপাদানটি তার অর্ধেক অংশ বিনষ্ট ক'রে ফেলে। ইউরেনিয়মের অর্ধাংশ বিনষ্ট হতে কয়েক সহস্র নিযুত বৎসর লাগে, রেডিয়মের লাগে ছয়শ' বৎসর, রেডিয়ম ভস্মের লাগে চারদিন এবং ভস্মের "বংশধরদের" লাগে কয়েক মুহূর্ত মাত্র।

বাহ্যদৃষ্টিতে অচল মনে হলেও পদার্থের মধ্যে জন্ম, সংঘর্ষ, খুন, আত্মহত্যা সবই সংঘটিত হয়ে চলেছে। চূড়ান্ত নিষ্ঠুর নাটকের উপাদান এর মধ্যে লুকিয়ে আছে : আছে জন্ম, আছে মৃত্যু।

রেডিও-এ্যাকটিভিটির আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে এই সব সত্য উদ্‌ঘাটিত হলো। দার্শনিকের দর্শন, পদার্থবিদের বিদ্যা আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হলো।

রেডিয়মের সবচেয়ে প্রধান কাজ হলো মানুষকে সুখী করা। সাংঘাতিক রোগ ক্যানসারের বিরুদ্ধে অভিযানে সে মানুষের পাশে এসে দাঁড়াল।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে জার্মান বৈজ্ঞানিক ওয়াখফ ও গিসেল ঘোষণা করলেন যে, এর কিছু শারীরিক উপকার আছে; সঙ্গে সঙ্গে পিয়ের কুরী তাঁর কাছে সবচেয়ে সহজ যে রাস্তা মনে হলো সেইভাবে পরীক্ষা করতে লেগে গেলেন। বিপদের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে তিনি নিজের হাতখানার ওপর রেডিয়মের প্রক্রিয়া যাচাই করতে বসলেন। সেখানে একটি ক্ষতের আবির্ভাবে তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। সেইটির দিকে লক্ষ্য রেখে, ঠাণ্ডা মাথায় আকাদেমির জন্য এর ক্রমপরিবর্তন বর্ণনা ক'রে রিপোর্ট তৈরি করলেন।

'রশ্মির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ছয় সেন্টিমিটর জায়গা জুড়ে গায়ের চামড়া লাল হয়ে গেল; দেখতে মনে হলো পোড়ার দাগ। কিন্তু ব্যথা ছিল না, বা

থাকলেও যৎসামান্য। ক'দিন পর সেই লাল ভাবটা ছড়িয়ে না প'ড়ে গাঢ় হয়ে এল, কুড়ি দিনের দিন খোসের মতো হওয়ায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধার দরকার হলো; বেয়াল্লিশ দিনের দিন দেখা গেল পাশ দিয়ে নতুন চামড়া তৈরি হয়ে ভেতর দিকে এগোচ্ছে। রশ্মি নেবার বেয়াল্লিশ দিন পরে এক স্কোয়ার সেন্টিমিটর প্রমাণ জায়গা ঘায়ের মতো রয়ে গেল, আর কেমন একটা ধূসর চেহারা থেকে গভীরতর আঘাতের ইঙ্গিত দিল।

'প্রসঙ্গতঃ আরও একটি কথা বলা যায়; পাতলা ধাতুর তৈরি বাক্সের ভেতর ছোট্ট মুখবন্ধ টিউবে অল্প কয়েক সেন্টিগ্রাম অত্যন্ত সক্রিয় পদার্থটি বয়ে নিয়ে যাবার সময়ে মারী কুরীর হাতও প্রায় একই ধরনে পুড়ে যায়। একবারের কথা বিশেষ ভাবে মনে আছে, সেবার আধঘন্টা পরে একটি লাল দাগ দেখা যায়, ঠিক যেন পোড়া ফোস্কা, পনেরো দিন লাগল সারতে।

'এসব থেকে একটি কথা প্রমাণ হয়ে গেল যে, সক্রিয় রশ্মির পরিমাণের ওপর এবং কাজের আরম্ভের সময়ের ওপর পরিবর্তনের কাল নির্ভর করে।

এই সব জীবন্ত ফলাফল ছাড়াও সক্রিয় পদার্থ নিয়ে কাজ করার সময়ে আমাদের হাতের ওপর এর নানারকম পরিণতি লক্ষ্য করেছি। হাতের চামড়া উঠতে থাকে। যে সব আঙুল দিয়ে সক্রিয় পদার্থটির টিউব বা ক্যাপসুল ধরা হয়, সেগুলো শক্ত হয়ে আসে, মাঝে মাঝে খুব ব্যথা হয়; আমাদের মধ্যে একজনের আঙুলের ডগা প্রায় এক পক্ষ কাল ফুলে রইল, তারপর চামড়া উঠতে লাগল, কিন্তু দু'মাস পর্যন্ত আঙুলের ব্যথা সারল না।...'

আঁরী বেকেরেল একবার রেডিয়মের টিউব ওয়েস্ট-কোটের বুক-পকেটে নিয়ে যেতে যেতে এমন পুড়ে গেলেন যা তিনি আদৌ আশঙ্কা করেন নি। রেগেমেগে তিনি কুরীদের কাছে এই নিদারুণ 'শিশুর' অত্যাচার, অঘটন সম্বন্ধে নালিশ করতে ছুটলেন:

'রেডিয়মকে আমি ভালোবাসি ঠিকই, কিন্তু তার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ আছে!'

তারপর তিনি তাঁর এই অনিচ্ছাকৃত পরীক্ষার ফলাফল লিপিবদ্ধ করলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন সংখ্যা "কার্যবিবরণী"তে এ বিষয়ে পিয়ের কুরীর নিরীক্ষণ করা তথ্যগুলির সঙ্গে এটিও প্রকাশিত হয়।

রশ্মির অলৌকিক প্রক্রিয়ায় মুগ্ধ পিয়ের জন্তু-জানোয়ারের ওপর এর প্রভাব অনুধাবন করতে লাগলেন। প্রফেসর বুশার ও বাল্‌তাজার নামে দুই উচ্চপদস্থ

চিকিৎসাবিদের সঙ্গে একত্রে তিনি এবার কাজ করলেন। শীঘ্রই তাঁদের ধারণা হলো যে, দেহের রুগ্ন সেল্‌গুলি নষ্ট ক'রে রেডিয়ম, টিউমার বা ক্যানসার জাতীয় অনাহুত রোগের আবির্ভাব রোধ করতে পারে। চিকিৎসার এই নতুন পদ্ধতিকে 'কুরী থেরাপি' নাম দেওয়া হলো। ফরাসী ডাক্তাররা (দোলোস্‌, উইকাম, দমিনিচি, হুগেস্‌ প্রভৃতি) মারী ও পিয়ের কুরীর কাছ থেকে ধার ক'রে রেডিয়ম ভস্মের টিউবের সাহায্যে রোগীর চিকিৎসা ক'রে কৃতকার্য হলেন।

স্যাঁ-লুই হাসপাতালে ডাক্তার দোলোস্‌ ত্বকের চিকিৎসায় রেডিয়ম ব্যবহার ক'রে দেখলেন। (মারী লেখেন :) 'একদিক দিয়ে উৎসাহজনক ফল পাওয়া গেল ; রেডিয়ম ব্যবহারের জন্য চামড়ার যে ক্ষতি হলো তা' আবার নতুন ক'রে সুস্থ হয়ে উঠল।'

রেডিয়ম প্র য়ো জ নী য়—আশ্চর্যরকম প্রয়োজনীয় পদার্থ।

এ জাতীয় আবিষ্কারগুলির আশু পরিণতি সম্বন্ধে ধারণা করা যেতে পারে। নতুন মৌলিক পদার্থটি এখন আর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না, এ এখন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াল। রেডিয়ম "শিল্পের" সূত্রপাত হলো।

পিয়ের ও মারী এই শিল্প প্রচেষ্টার তত্ত্বাবধানে রইলেন, তাঁদের উপদেশ ছাড়া চলেই বা কি ক'রে ? স্কুল-অব-ফিজিক্সের প'ড়ো আটচালার নীচে, সম্পূর্ণ নিজেদের ধারায়, আট টন পিচ-ব্লেণ্ডের গাদ শোধন ক'রে, কুরীরা নিজেদের হাতে সর্বপ্রথম গ্রাম রেডিয়ম আবিষ্কার করেন। ধীরে ধীরে রেডিয়মের যাদু বহু মনীষীর কল্পনা উত্তেজিত করল এবং কুরী-দম্পতি কাজ করার জন্য প্রচুর সাহায্য পেলেন।

সেণ্ট্রাল কেমিক্যাল প্রোডাক্টস্‌ কম্পানিতে আঁদ্রে দ্যবিয়েরন্‌-এর পরিচালনায় আকরের ব্যাপক পরিশোধনের কাজ শুরু হলো এবং বিনা মুনাফায় তিনি কাজ করতে রাজি হলেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞান-আকাদেমি কুরীদের ২০,০০০ হাজার ফ্রাঙ্ক দিলেন "তেজস্ক্রিয় বস্তু" বের করবার জন্য। তাঁরা পাঁচ টন আকর নিয়ে কাজ শুরু করলেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে আরমে দ্য লিল নামক জনৈক বুদ্ধিমান সাহসী শিল্পনেতা রেডিয়ম তৈরির এক কারখানা করবেন বলে স্থির করলেন। পচনশীল ক্ষতের

চিকিৎসার জন্য ডাক্তারদের রেডিয়ম যোগানই হবে এর উদ্দেশ্য। এই ক্যাক্টরি-সংলগ্ন এক ল্যাবরেটারি তিনি পিয়ের ও মারীকে দিতে চাইলেন, যেখানে বসে তাঁরা কেঠো-আটচালার দুঃখ ভুলে মনের খুশিতে কাজ করতে পারবেন। সেখানে কুরীদের সঙ্গে এফ. হুডেপিন ও জ্যাক ডেন কাজে যোগ দিলেন। আরমে দ্য লিল এঁদের ওপর সেই অমূল্য রত্ন উদ্ধারের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন।

মারী তাঁর সেই প্রথম গ্রাম রেডিয়মটিকে ছেড়ে থাকতে পারতেন না, সেটিকে তিনি এই ল্যাবরেটারিতে দান করলেন। সম্পূর্ণ মনের জোর ও অমানুষিক প্রচেষ্টা, এছাড়া কোন রকম মূল্য এর জন্য কখনও ধার্য করা হয় নি। যখন জীর্ণ আটচালাটি ভেঙে শেষ হয়ে গেল আর মাদাম কুরীও এ পৃথিবীতে রইলেন না, তখন এই রেডিয়মটুকু দুই অসীম সাহসিকের অসাধ্য সাধনের জাজ্জ্বল্য প্রমাণ স্বরূপ রয়ে গেল।

এর পরবর্তীকালে রেডিয়মের মূল্য কাঞ্চন তৈলে নির্ধারিত করা হতো। নিয়মিত বিক্রির খাতে এর মূল্য পৃথিবীর অন্যতম মহার্ঘ পদার্থের পর্যায়ে উঠল। প্রথম বছর প্রতি গ্রাম রেডিয়ম ৭,৫০,০০০ স্বর্ণ ফ্রাঙ্কে বিক্রি হয়।

এমন অভিজাত পদার্থ অবশ্যই সমালোচনার দাবি রাখে : ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে 'রেডিয়ম' শীর্ষক প্রথম সমালোচনা-সংখ্যা বেরুলো, শুধু মাত্র তেজস্ক্রিয় পদার্থের আলোচনা ছিল তার বিষয় বস্তু।

রেডিয়ম ব্যবসায়ক্ষেত্রে সতন্ত্র সত্তা অর্জন করল। বাজার-দরের সঙ্গে যোগ হলো মুদ্রণ যন্ত্রের। আরমে দ্য লিল-এর কারখানার চিঠিপত্রের কাগজে বড় বড় হরফে ছাপা হলো :

রেডিয়ম সল্টস—তেজস্ক্রিয় দ্রব্য
টেলি : রেডিয়ম, নোঁজ-স্যুর-মার্ন

বহু দেশের বৈজ্ঞানিকদের কর্মপ্রচেষ্টা, অভিনব শিল্পের উৎপত্তি এবং রোগের অলৌকিক চিকিৎসা যদি সফল হয়ে থাকে, তবে তার মূলে রয়েছেন এক সুন্দরী তরুণী, যিনি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে অদম্য কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে, বেকেরেলের রশ্মিকে তাঁর থিসিসের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন ; নতুন এক পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর অনুমান এবং সেই তত্ত্ব প্রমাণের জন্য স্বামীর সাহায্যতায় বিশুদ্ধ রেডিয়ম আবিষ্কারে সফলতা লাভ করেছিলেন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুন সরবনে ছাত্রীদের ছোট্ট ঘরটিতে আমরা এই মহিলার সাক্ষাৎ পাই। লোকচক্ষুর অন্তরালে ঘোরানো এক সিঁড়ি বেয়ে এই ঘরে যাওয়া যেতো। পাঁচ বছরের মধ্যে মারী তাঁর থিসিস্ নিয়ে মাথা ঘামাতে পারেন নি। মস্ত বড় আবিষ্কারের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে গিয়ে বারে বারে ডক্টর ডিগ্রি পরীক্ষায় বাধা পড়ছিল, কারণ তার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে উঠছিল না। আজ তিনি বিচারকমণ্ডলীর সামনে উপস্থিত হয়েছেন।

পরীক্ষক অধ্যাপক লিপমান, অধ্যক্ষ বাউটি ও মোয়াসোঁর কাছে তিনি তাঁর গবেষণা: "রেডিও-এ্যাকটিভিটির ওপর মাদাম শ্‌ক্লোদোভস্কা কুরীর গবেষণা" অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছিলেন। এ সময়ে আরও একটি অবিশ্বাস্য কাজও তিনি করেছিলেন! নিজের জন্য কালো রেশম ও পশম মেশানো একরকম কাপড় দিয়ে নতুন একটি পোশাক করিয়েছিলেন। আসলে ব্রনিয়া সে-সময়ে থিসিস্ দেবার উপলক্ষ্যেই পারীতে এসেছিল, মারীর পুরোনো রঙ-ওঠা পোশাক দেখে, তাকে লজ্জা দিয়ে জোর ক'রে দোকানে টেনে নিয়ে গেল। সেখানে দোকানীর সঙ্গে আলোচনা ক'রে, জামা পছন্দ ক'রে একটু-আধটু অদল-বদল যা করতে হবে, তার ব্যবস্থা ক'রে দিল, পাশে বোনটি যে গোমড়া মুখে অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেদিকে আমলই দিল না।

ঠিক কুড়ি বছর আগে ১৮৮৩র উজ্জ্বল এক প্রভাতে ব্রনিয়া যে মারীকে আর-একটি অনুষ্ঠানের জন্য সাজিয়ে দিয়েছিল, তা কি আজ এদের মনে পড়ে? সেদিনের সেই সুগম্ভীর সকালে, ছোট্ট মান্যুসিয়া ক্রাকোভস্কি বুলেভার্দ-এর বিদ্যায়তনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার স্বর্ণপদক লাভ করেছিল।...

মাদাম কুরী সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর ফ্যাকাশে মুখ আর বাঁকা ভুরুর ওপর থেকে চুলের রাশ টেনে পেছনে চুড়ো ক'রে বাঁধা। যে প্রচণ্ড যুদ্ধ ক'রে বিজয়ী হয়েছেন, তার চিহ্নস্বরূপ কপালে কয়েকটি সূক্ষ্ম রেখা নজরে পড়ে। পদার্থবিদ ও রসায়নবিদদের ভিড়ে রোদে-ভরা ঘরখানা প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে, বাড়তি চেয়ারের বন্দোবস্ত হয়েছে; গবেষণায় তাঁরা যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তার পরিচয় যেন আজ পাওয়া যাবে; তাই এত বৈজ্ঞানিকের ভিড়।

বৃদ্ধ ডাক্তার ইউজিন কুরী, পিয়ের কুরী আর ব্রনিয়া ঘরের পেছনে তাঁদের চেয়ারে গিয়ে বসেছেন। ছাত্রদের ভিড়ে পিষে যাচ্ছেন সব। তাঁদের কাছাকাছি একদল মেয়ে কল্‌কল্ ক'রে কথা বলছে, এরা স্যাভর-এর মেয়ে, মারীর ছাত্রী, তাদের শিক্ষয়িত্রীর গৌরবে তারা নিজেরাই যেন গৌরবান্বিত।

একটা চীনা ওক কাঠের টেবিলের অপর পার্শ্বে তিনজন পরীক্ষক বসে আছেন। তাঁরা একজনের পর একজন প্রশ্ন ক'রে গেলেন।

ম'সিয়ে এবং বাউটি, তাঁর প্রথম শিক্ষাগুরু ম'সিয়ে লিপমান-এর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মুখখানা তাঁর ঈষৎ উত্তেজিত দেখাল। দীর্ঘ শ্মশ্রুসমন্বিত ম'সিয়ে মোয়াসোঁর প্রশ্নের উত্তর দিলেন অতি কোমল কণ্ঠে। কখনও বা ব্ল্যাক-বোর্ডের ওপর খড়ি দিয়ে কোন একটি যন্ত্রের ছবি আঁকলেন অথবা কোন বৈজ্ঞানিক সূত্র লিখে দিলেন। গবেষণার ফলাফল অলঙ্কারবর্জিত পরিভাষায় অতি সাধারণ বিশেষণ যোগে ব্যাখ্যা করলেন। কিন্তু পারিপার্শ্বিক ছোট বড় গুরু শিষ্য সকল শ্রেণীর পদার্থবিদমহলে আশ্চর্য ভাবান্তর দেখা গেল। মারী বর্ণিত ধীর স্থির শব্দগুলির মাধ্যমে ফুটে উঠল এক অপূর্ব উজ্জ্বল আশ্চর্য চিত্র, সে-যুগের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারের প্রতিচ্ছবি।

বৈজ্ঞানিকরা বাক্‌চাতুরী বা অযথা মন্তব্য পছন্দ করেন না। মারী কুরীকে ডক্টর পদে বরণ ক'রে নেবার সময়ে ফ্যাকাল্‌টি অব সায়েন্স-এ সমাগত বিচক্ষণ বিচারপতিরা যে সকল অনাড়ম্বর ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, আজ ত্রিশ বছর পরে সে কথাগুলি পড়তে বসে গভীর আবেগে হৃদয় আলোড়িত হয়ে ওঠে।

সেদিন সভাপতি ম'সিয়ে লিপমানের পবিত্র বাণী ছিল: 'পারীর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "ডক্টর" ডিগ্রি আপনার উপর ন্যস্ত হইল। "বহুসম্মানিত" বিশেষণটিও এর সঙ্গে যোগ হবে।'

দর্শকমণ্ডলীর প্রচণ্ড করতালির বেগ শান্ত হলে প্রাচীন পণ্ডিতের সঙ্কুচিত কণ্ঠস্বর হৃদয়ের স্পর্শে মধুর হয়ে উঠল: 'মহাশয়া জুরীদের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে অশেষ অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলি, এই গম্ভীর, শ্রদ্ধাপূর্ণ অনুষ্ঠানাদি প্রতিভাবান গবেষক আর বিবেক-সম্পন্ন কর্মীর উপর একই প্রভাব বিস্তার করে। এর মধ্যে ব্যঙ্গ-কৌতুকের স্থান নেই। এদের ধরন নিজস্ব।

থিসিস্ উপস্থিত করার কিছুকাল আগে আর পারী ও অন্যান্য দেশে রেডিয়মের ব্যবসায়িক বিস্তৃতির পূর্বে, পিয়ের ও মারী একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। নিজেরা এবিষয়ে খুব একটা গুরুত্ব না দিলেও তাঁদের বাকি জীবনে এর প্রভাব যথেষ্টই প্রবল ছিল।

পিচ-ব্লেণ্ডের পরিশোধন এবং রেডিয়মকে বিচ্ছিন্ন করার এক অভিনব পদ্ধতি মারী আবিষ্কার করেন এবং সেই সঙ্গে এই শিল্পের এক নিজস্ব ধারার প্রবর্তন করেন।

চিকিৎসার কাজে রেডিয়মের প্রয়োগ চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে রেডিও-এ্যাকটিভ খনিজ আকরের সন্ধান সর্বত্র আরম্ভ হয়ে গেল। বেলজিয়ম- আমেরিকা- আদি বহু দেশে অনুসন্ধানের জন্য নানান্ জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগল। কিন্তু এই সব কারখানাতে যদি বিশুদ্ধ রেডিয়ম প্রস্তুতের সূক্ষ্ম ক্রিয়া-পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়র থাকতেন, তবেই 'মহার্ঘ ধাতুটি'র নিষ্কাশন সম্ভব হতো।

তাঁদের বুলেভার্দ কেলারমানের ছোট বাড়িতে এক রবিবার সকালে পিয়ের স্ত্রীকে এই কথা বোঝালেন। সবেমাত্র পিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে একটা চিঠি দিয়ে গেছে। বৈজ্ঞানিক মনোযোগ সহকারে চিঠিখানা পড়ে ভাঁজ ক'রে ডেস্কের ওপর রেখে দিলেন।

'আমাদের রেডিয়মের বিষয়ে আরও একটু ফলাও ক'রে ব্যাখ্যা করার সময় এসেছে।' চিন্তিত মুখে তিনি বললেন: 'এখন এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, ব্যবসায়িক দিকে এর প্রচুর বিস্তৃতির সম্ভাবনা আছে। সম্প্রতি ম্যালিগন্যান্ট টিউমার চিকিৎসায় সাফল্য আমাদের এই ইঙ্গিতই দিচ্ছে; কয়েক বছরের মধ্যে সারা দুনিয়া রেডিয়ম চাইবে। এই মাত্র বাফেলো থেকে যে-চিঠিখানা পেলাম, তাতে আমেরিকার কয়েকজন শিল্প-মালিক রেডিয়ম সম্বন্ধে আমার কাছে জানতে চেয়েছেন।

পিয়ের-এর কথা মারী বিশেষ আগ্রহ নিয়ে শুনছিলেন না। তিনি বললেন: 'তা বেশ তো! কি করা যায় এখন?'

'এখন আমাদের দুটো পথের মধ্যে একটা বেছে নিতে হবে। গবেষণার ফলাফল আর বিশোধনের নিয়মাবলী সমস্তই আমাদের ব্যাখ্যা ক'রে লিখতে হবে।...'

যন্ত্রচালিতের মতো ঘাড় নেড়ে মারী সায় দিলেন: 'হ্যাঁ, তা বটে।'

'কিংবা,' পিয়ের বলে গেলেন: 'আমরা নিজেদের রেডিয়মের আবিষ্কারক হিসেবে স্বত্ব জারি করতে পারি। সেক্ষেত্রে পিচ-ব্লেণ্ডের শোধন-পদ্ধতির বিস্তৃত বর্ণনা প্রকাশ করার আগে সর্বস্বত্ব বজায় রেখে, পৃথিবীর সামনে রেডিয়মের ওপর আমাদের দাবি জাহির করতে হবে।'

মারী কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে উত্তর দিলেন: 'তা সম্ভব নয়! সে যে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির বিরোধী কাজ হবে!'

পিয়ের-এর গম্ভীর মুখখানা জ্বলজ্বল ক'রে উঠল: নিজের বিবেকের সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন ব'লে বিষয়টি নিয়ে আর একটু এগোলেন:

'আমারও তাই মনে হয়...কিন্তু এই সিদ্ধান্ত হালকা ভাবে নেবার কথা

নয়। আমাদের অবস্থা সচ্ছল…তাছাড়া চিরদিন এই ভাবেই কাটবে বলে মনে হয়। আমাদের একটি মেয়ে আছে, আরও ছেলে মেয়ে হবে। এই স্বত্বসংরক্ষণের ফলে তাদের এবং আমাদের পক্ষেও প্রচুর অর্থ-সম্পদ, আরামের নিশ্চিন্ততা ও কর্মক্লিষ্ট জীবনের সুখ নিশ্চিত হতে পারবে।'

তারপর মৃদু হেসে আজীবন স্বপ্নের কথাটাও তুললেন: 'আমাদের এক-খানা খুব ভাল ল্যাবরেটারিও হতে পারে।'

মারীর চোখে পলক পড়ে না। এই লাভের কথা, পার্থিব সাচ্ছল্যের কথা শান্ত মনে ভেবে দেখলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মন থেকে তা ঝেড়ে ফেললেন:

'পদার্থবিদরা চিরকাল নিজেদের অভিজ্ঞতা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাই ক'রে থাকেন। আমাদের আবিষ্কারের যদি কোন ব্যবসায়িক সাফল্য থাকে তা আকস্মিক ঘটনামাত্র, তা' দ্বারা লাভবান হওয়া আমাদের কখনই উচিত নয়। তাছাড়া চিকিৎসার কাজেই রেডিয়মের সার্থকতা। এর সুযোগ নেওয়া অত্যন্ত নীচ মনোবৃত্তির পরিচয় হবে ব'লে আমার মনে হয়।'

স্বামীকে বোঝাবার চেষ্টা মারীর মধ্যে ছিল না। মারী জানতেন শুধুমাত্র বিবেকের দংশন এড়াবার জন্যই স্বামী এ কথা তুলেছেন। পরম বিশ্বাসে ভর ক'রে যে কথা মারী বললেন, তা তাঁদের দু'জনের অনুভূতি, আদর্শ, বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁদের অভ্রান্ত ধারণাকেই ফুটিয়ে তুলল।

মারীর কথায় প্রতিধ্বনির মতো পিয়ের আস্তে আস্তে বললেন: 'হ্যাঁ, এ কাজ বাস্তবিক বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির বিরোধী হবে।'

তৃপ্ত মনে, যেন অপ্রয়োজনীয় কোন বিষয়ে মন স্থির ক'রে ফেলেছেন, এই ভাবে বললেন: 'আমি তা হলে আজ রাতে আমেরিকান ইঞ্জিনিয়রদের তাঁরা যা' জানতে চেয়েছেন সব কথা বুঝিয়ে চিঠি লিখে দেব।'

(এর কুড়ি বছর পড়ে মারী লিখেছিলেন:)…'আমার কথার সমর্থনে পিয়ের আমাদের অবিষ্কার থেকে কোনরকম আর্থিক লাভ করবেন না বলে সঙ্কল্প করলেন। ফলে, স্বত্বসংরক্ষণের চেষ্টা না ক'রে আমরা গবেষণার ফলাফল, তথা রেডিয়ম তৈরির পদ্ধতি যথাযথ বর্ণনা ক'রে কাগজে প্রকাশ ক'রে দিলাম। উপরন্তু প্রত্যেক উৎসুক মানুষের কৌতূহল নিবারণ ক'রে সব খবর পরিবেশন ক'রে ছিলাম। রেডিয়ম-শিল্পের যথেষ্ট উপকার হলো, প্রথমে ফ্রান্সে, পরে বিদেশে পূর্ণ বেগে সে তার উন্নতির পথে এগিয়ে গেল;

বৈজ্ঞানিক আর ডাক্তারদের প্রয়োজন মিটল। বস্তুতঃ আজ অবধি এই শিল্প আমাদের নির্ধারিত পথ থেকে প্রায় বিচ্যুত হয় নি বললেও চলে।

'স্মারক গ্রন্থ হিসেবে 'বাফেলো সোসাইটি অব্ ন্যাচারল সায়েন্স' আমাকে ইউনাইটেড স্টেটস্-এ রেডিয়ম-শিল্পের উন্নতি সম্বন্ধে প্রকাশিত একটি পুস্তিকা উপহার পাঠিয়েছেন, তার মধ্যে তাঁরা আমেরিকার ইঞ্জিনিয়রদের প্রশ্নের উত্তরে (১৯০২ ও ১৯০৩-এ) পিয়ের কুরীর চিঠিগুলির ছবি তুলে ছেপে দিয়েছেন।'

রবিবার সকালে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই আলোচনার পঁচিশ মিনিট পরে পিয়ের ও মারী তাঁদের প্রিয় সাইকেলে চেপে জেন্টলির ফটক পেরিয়ে ক্লামার্ত-এর পথে বেড়াতে বেরোলেন।

চির দারিদ্র্য ও সম্পদের মধ্যে তাঁদের পথ তাঁরা বেছে নিয়েছেন। সন্ধ্যা বেলায় হাতভরা ঘাসের ফুল আর রঙ-বেরঙের পাতা নিয়ে ক্লান্ত শরীরে দু'জন বাড়ি ফিরে এলেন।

১৫

যদিও সুইজারল্যাণ্ড কুরী-দম্পতিকে প্রথম সম্মানিত পদ দিতে এগিয়ে আসে—জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই চিঠি খানা আমার মনে পড়ছে—প্রকৃত পক্ষে ইংল্যাণ্ডই কিন্তু তাঁদের প্রথম মর্যাদা দেয়।

ফ্রান্সে যে-কয়েকটি বিজ্ঞান-পুরস্কার তাঁরা লাভ করেন সেগুলো হলো:

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে প্লাতে-পুরস্কার এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে লাকাজ-পুরস্কার অর্পণ ক'রে পিয়েরকে সম্মানিত করা হয়। মারীকে সম্মানিত করা হলো তিন-তিন বার গেঞ্জে-পুরস্কার অর্পণ ক'রে। বহুকাল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য এমন বিশেষ কোন সম্মানের শিরোপা তাঁরা পান হয় নি যার সঙ্গে ১৯০৩-এর জুন মাসে ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউট কর্তৃক পিয়ের কুরীকে রেডিয়মের ওপর বক্তৃতা দিতে আহ্বান জানানোর তুলনা হতে পারে। বৈজ্ঞানিক-দম্পতি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করলেন।

মৈত্রী ও শুভেচ্ছায় উজ্জ্বল একখানা পরিচিত মুখ প্রথমেই এগিয়ে এলেন স্বাগত জানাতে; স্বাগত জানাতে এগিয়ে এলেন লর্ড কেলভিন। স্বনামধন্য বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক তরুণ-দম্পতির সাফল্যকে যেন নিজের ব্যক্তিগত সাফল্য বলেই মনে করতেন, কুরীদের সাফল্যে তাঁর অন্তর গর্বে ভরে উঠেছিল। তিনি তাঁর ল্যাবরেটারিতে এঁদের নিয়ে এলেন; পিতৃস্নেহে পিয়ের-এর কাঁধের ওপর হাত রেখে তাঁকে নিয়ে এগিয়ে চললেন। উচ্ছ্বসিত আনন্দে অধীর হয়ে পারী থেকে আনা উপহারটি তিনি তাঁর বন্ধুমহলে দেখালেন। প্রকৃত পদার্থবিদের উপযুক্ত সেই উপহারখানি ছিল ছোট্ট কাঁচের টিউবের মধ্যে এক কণা অমূল্য রেডিয়ম।

বক্তৃতার দিন লর্ড কেলভিন মারীর পাশের আসনখানিতে এসে বসলেন। রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউটে ইতিপূর্বে কোন মহিলা প্রবেশাধিকার পান নি। জনাকীর্ণ হল্‌-এ ইংরেজ বৈজ্ঞানিকদের ঠেলাঠেলি। স্যার উইলিয়ম্ ক্রুক্‌স্, লর্ড র‍্যালে, লর্ড এভবারি, স্যার ফ্রেডরিক ব্র্যামওয়েল, স্যার অলিভার লজ, প্রফেসর ডেওয়ার, রে-ল্যান্‌কেস্টার, আয়ারটন, এস্. পি. টমসন, আর্মস্ট্রং...। ধীর কণ্ঠে ফরাসী ভাষায় পিয়ের রেডিয়মের বর্ণনা করলেন। তারপর ঘর অন্ধকার

ক'রে দিয়ে বাঁলে, কতগুলি আশ্চর্য পরীক্ষা দেখালেন : রেডিয়মের স্বাহুস্পর্শে ছুঁয়ে রাখা একটি বিদ্যুৎ-নিরূপক যন্ত্রের সোনার পাতখানা সক্রিয় হলো ; জিঙ্ক-সালফেট সমন্বিত একটি পর্দা অনুপ্রভ হলো। কালো কাগজে মোড়া ছবি-তোলা প্লেটের উপর ছাপ ফেলে দেখালেন এবং এই অপূর্ব পদার্থ থেকে স্বতঃ-বিচ্ছুরিত উত্তাপ প্রমাণ করলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় উত্তেজনা আর উৎসাহের প্রভাব সকাল থেকেই দেখা গেল : সারা লণ্ডন শহর রেডিয়মের আবিষ্কারকদের দেখবার জন্য অস্থির হয়ে উঠল। "প্রফেসর ও মাদাম কুরী" অজস্র ডিনার ও আনন্দ উৎসবে যোগদানের আমন্ত্রণ পেলেন।

এই সব উৎসব-রজনীতে তাঁদের সম্মানে যে অভিনন্দন বাণী বর্ষিত হলো, তাঁরা অতি সংক্ষেপে সবিনয়ে তার উত্তরে ধন্যবাদ জানালেন। পি. সি. এন্-এ যে পোশাকটি পরে পিয়েরে ছাত্র পড়াতেন, সেই পুরোনো-ছাঁটের স্যুটখানাই তাঁর অঙ্গের শোভা হয়ে রইল, তাঁর স্বাভাবিক নম্রতা ভেদ ক'রে একটি ভাব ফুটে উঠত, তিনি যেন সেখানে নেই, সেই সব প্রশংসার ভাষা যেন তাঁকে নয়, আর কাউর উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে। অস্বস্তির সঙ্গে মারী অনুভব করতেন সহস্র চক্ষুর দৃষ্টি তাঁর ওপর নিবদ্ধ—তিনি যেন এক দুর্লভ প্রাণী, প্রকৃতির বৈচিত্র—এক নারী-পদার্থবিদ।

কালো পোশাকটি কণ্ঠের কাছে যৎসামান্য খোলা, এসিড-পোড়া হাত দুটি নিরাভরণ, বিবাহের-চিহ্নস্বরূপ একখানি আংটি পর্যন্ত সে-হাতের আঙুলে শোভা পাচ্ছে না। তাঁরই আশেপাশে আবরণহীন কণ্ঠে রাজ্যের সেরা হীরে-মুক্তোর ছড়াছড়ি। এইসব গহনার দিকে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে মারী তাকিয়েছিলেন এবং এক সময়ে বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর অন্যমনস্ক স্বামীর দৃষ্টিও এই সব জড়োয়া অলঙ্কারের ওপর গিয়ে পড়েছে।

সেরাত্রে পোশাক বদল করার সময়ে তিনি পিয়েরকে বললেন : 'এমন সব অলঙ্কার যে সত্যি সত্যি আছে, এ আমার কল্পনারও বাইরে ছিল।'

পদার্থবিদ হাসতে লাগলেন। 'জানো, ডিনারের সময়ে যখন ভাববার মতো কোন বিষয় জুটছিল না, তখন মনে মনে আমি এক খেলা শুরু করলাম। মনে মনে হিসেব করতে লাগলাম, এক-একজন মহিলা যত অমূল্য রত্ন অঙ্গে চড়িয়েছেন, তা দিয়ে কতগুলো ল্যাবরেটারি তৈরি হতে পারে! বক্তৃতা শুরু করার আগে পর্যন্ত দেখলাম ল্যাবরেটারির সংখ্যা গণিত শাস্ত্রের পাতা ছাড়িয়ে গেছে!'

ক'দিন পর কুরী-দম্পতি তাঁদের আটচালার ল্যাবরেটারিতে ফিরে এলেন। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে তাঁদের সখ্যতার বন্ধন সুদৃঢ় হলো। তাঁদের কাছে নানারকম সাহায্য পাবার আশা রইল। ইংরেজ সহকর্মী প্রফেসর ডেওয়ার-এর সহ-যোগিতায় শিগগিরই রেডিয়ম-ব্রোমাইড থেকে নির্গত বিভিন্ন গ্যাস সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা লিখিতভাবে প্রকাশ করবেন ব'লে স্থির হলো।

এ্যাংলো-স্যাক্সন জাতি যাঁদের শ্রদ্ধা করে, তাঁদের প্রতি বিশ্বাস অটুট রাখে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে পিয়ের ও মারী একখানি চিঠি পেলেন যে, "রয়াল সোসাইটি অব লণ্ডন" শ্রদ্ধা জানাবার জন্য তাঁদের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার "ডেভি মেডেল" তাঁদের অর্পণ করতে চান।

অসুস্থ মারী স্বামীকে ঠেলে পাঠিয়ে দিলেন। পিয়ের ইংল্যাণ্ড থেকে তাঁদের নাম খোদাই করা একখানা ভারী স্বর্ণপদক নিয়ে দেশে ফিরলেন। পিয়ের বুলেভার্দ কেলরমান-এর বাড়িতে পদকটি রাখার জায়গা খুঁজে বেড়ালেন, অনভ্যস্ত হাতে সেটিকে নাড়াচাড়া করলেন, একবার হারালেন, আবার খুঁজে পেলেন। শেষে হঠাৎ কি মনে ক'রে, পদকখানি তাঁদের কন্যা আইরিনের হাতে সঁপে দিলেন। সে-বেচারীর ছ' বছরের জীবনে এ হেন আনন্দের দিন ইতিপূর্বে কখনো আসে নি।

বন্ধুরা দেখা করতে এলে বৈজ্ঞানিক তাঁদের দেখালেন, মেয়ে তার নতুন খেলনা নিয়ে কি আনন্দে খেলা করছে! পরে বললেন: 'মা-মণির আমার নতুন মস্ত বড় পেনিটি ভারী পছন্দ!' দুটো নাতিদীর্ঘ বিদেশ-ভ্রমণ এবং ছোট্ট মেয়ের সোনার চাকতি নিয়ে খেলা,—এদের ভেতর দিয়ে যে জীবন-সঙ্গীত এবার দ্রুত গতিতে সর্বোচ্চ গ্রামে পৌঁছবে, তারই আয়োজন যেন এখন থেকে সূচিত হলো।

এবার সুইডেন এগিয়ে এল। ১৯০৩, ১০ই ডিসেম্বর "গুরুগম্ভীর সাধারণ সভায়" স্টকহল্‌ম-এর বিজ্ঞান-আকাদেমি প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করল যে, সে-বৎসরের পদার্থবিদ্যার জন্য নির্দিষ্ট নোবেল পুরস্কারের অর্ধেক আঁরী বেকেরেলকে আর অপর অর্ধেক মঁসিয়ে ও মাদাম কুরীকে তাঁদের রেডিও-এ্যাকটিভিটি সম্বন্ধে গবেষণা ও আবিষ্কারের জন্য দেওয়া হবে।

কুরী-দম্পতির মধ্যে একজনও সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সক্ষম হলেন না। ফরাসী মন্ত্রী তাঁদের হয়ে রাজার হাত থেকে ডিপ্লোমা ও স্বর্ণপদক গ্রহণ করলেন। অসুস্থ, পরিশ্রান্ত পিয়ের ও মারী শীতের মধ্যে এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে রাজী হলেন না।

১৪ই নভেম্বর, ১৯০৩—প্রফেসর অরিভিলিয়াস্ মঁসিয়ে ও মাদাম কুরীকে লিখলেন :

'মঁসিয়ে ও মাদাম কুরী,

'টেলিগ্রাফ মারফৎ আপনাদের জানানো হয়েছে যে, সুইডিশ্ একাডেমি অব্ সায়েন্স, তার ১২ই নভেম্বরের বৈঠকে, বেকেরেল-রশ্মির উপর আপনাদের অপূর্ব কীর্তির জন্য এ বছর পদার্থবিদ্যা বিভাগের নোবেল পুরস্কারের অর্ধাংশ আপনাদের অর্পণ করবে ব'লে ঘোষণা করেছে।

'১০ই ডিসেম্বর একটি সাধারণ সভায় পুরস্কার বিতরণী বিভিন্ন সংস্থার যাবতীয় সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হবে ; সেপর্যন্ত এই সকল সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গোপন ভাবেই সংরক্ষিত হবে। সেই সভায় একই কালে ডিপ্লোমা ও পদক অর্পণ করা হবে।

'বিজ্ঞান-আকাদেমির তরফ থেকে আমি আপনাদের সেই সভায় উপস্থিত থেকে সহস্তে পুরস্কার গ্রহণ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

'নোবেল ফাউণ্ডেশনের ৯ নং ধারা অনুযায়ী এই সভার পরে ছয় মাসের মধ্যে আপনি যে-বিষয়ে পুরস্কার পেলেন, সে-বিষয়ে আপনাকে বক্তৃতা দিতে হবে। আপনি যদি উল্লিখিত সময়ে এখানে উপস্থিত থাকেন, তবে তার পরবর্তী ছয় মাসই এ কাজের উপযুক্ত হবে,—অবশ্য আপনার এ ব্যবস্থা যদি মনঃপূত হয়, তবেই।

'আশা করি স্টক্হল্ম-এ আপনার সাক্ষাৎলাভে আকাদেমি ধন্য হবে। আমি আপনাদের স্বামী-স্ত্রী উভয়কে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।'

১৯শে নভেম্বর ১৯০৩, প্রফেসর অরিভিলিয়স্‌কে পিয়ের কুরী লিখলেন :

'সম্পাদক মহাশয়,

'স্টক্হলম-এর বিজ্ঞান-আমাদেমি কর্তৃক নোবেল পুরস্কারের অর্ধাংশ আমাদের অর্পণের প্রস্তাবে আমরা নিজেদের অত্যন্ত সম্মানিত মনে করছি। অনুগ্রহ ক'রে আমাদের কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ যথাস্থানে পৌঁছে দেবেন।

'১০ই ডিসেম্বর সুইডেনের অনুষ্ঠানে যাওয়া আমাদের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। সে-সময়ে যাওয়া মানে আমাদের দু'জনেরই শিক্ষকতার কাজের যথেষ্ট অসুবিধা হবে। অনুষ্ঠানে যোগ দিলেও আমাদের পক্ষে সেখানে অতি অল্পকালই থাকা সম্ভব হবে এবং আপনাদের দেশের বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও আমাদের হতে পারবে না।

'পরিশেষে, মাদাম কুরী গ্রীষ্মে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়েছেন এবং এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন নি।

'এ অবস্থায় আমাদের যাওয়া ও বক্তৃতা দেবার সময় পেছিয়ে দিতে অনুরোধ জানাই। ঈস্টারের সময়ে আমরা স্টকহল্‌ম-এ যেতে পারি। তার চেয়েও ভালো হয় যদি জুন মাসের মাঝ-বরাবর হয়।

'সম্পাদক মহাশয়, আমাদের শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।'

এইসব সরকারী চিঠিপত্র আদান-প্রদানের পর আরও একটি বিস্ময়-কর চিঠি আপনাদের শোনাব। চিঠিখানি পোল ভাষায় মারী তাঁর দাদাকে লিখেছিলেন। তারিখ উল্লেখযোগ্য :—১১ই ডিসেম্বর, ১৯০৩—স্টকহল্‌মে সাধারণ সভার পরের দিন ; খ্যাতির গৌরবে ভূষিত হবার প্রথম দিবস! যেদিন জয়ের আনন্দে মারীর পাগল হয়ে যাবার কথা! সত্যই বিচিত্র তাঁর অভিযান, এ পর্যন্ত কোনও রমণী বিজ্ঞানের সুকঠোর রাজ্যে প্রবেশাধিকার পান নি। সে-সময়ে বিজ্ঞান-জগতে তিনিই প্রথম এবং একমাত্র স্বনামধন্যা নারী-বিজ্ঞানী।

১১ই ডিসেম্বর ১৯০৩, যোসেফ শ্‌ক্লোদোভ্‌স্কিকে মারী লিখছেন :

'প্রিয় দাদাভাই, তোমাদের স্নেহমাখা চিঠির জন্য তোমাদের দু'জনকেই অশেষ ধন্যবাদ জানাই। মান্যুসিয়াকে (যোসেফ-কন্যা) আমার হয়ে ধন্যবাদ দিতে ভুলো না, কি মিষ্টি চিঠিখানি যে সে লিখেছে! আমি খুব খুশি হয়েছি! এর পর একটু সময় পেলেই তাকে আমি চিঠি লিখব।

'শরীরটা আমার বিশেষ ভাল যাচ্ছে না। নভেম্বরের গোড়ায় ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল। তারপর থেকে একটু কাশি লেগেই আছে। ডাক্তার ল্যান্‌ড্রোকে দেখালাম, তিনি বললেন, ফুসফুসে কোন দোষ নেই, কিন্তু আমার শরীরে রক্ত কিছু কমে গেছে। আমি অবশ্য আগের মতোই শক্তসমর্থ আছি। বরং হেমন্ত কালে যেটুকু পরিশ্রম করতাম, তার চেয়ে এখন বেশীই করি। ক্লান্তিবোধও ততো নেই।

'আমার স্বামী "ডেভি মেডেল" আনতে লণ্ডনে গেছেন। ক্লান্তির ভয়ে আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম না।

'নোবেল পুরস্কারের অর্ধেক আমরা পেয়েছি। ঠিক যে ব্যাপারটি কি, তা আমার ধারণা নেই, টাকার অঙ্কে বোধহয় সত্তর হাজার ফ্রাঙ্ক হবে। আমাদের কাছে ওই ঢের! জানিনা কত দিনে টাকাটা হাতে আসবে, বোধহয় স্টকহল্‌ম-এ যাবার পর পাওয়া যাবে। ১০ই ডিসেম্বরের পরবর্তী ছয় মাসের কোন এক সময়ে আমাদের সেখানে বক্তৃতা দিতে হবে।

'অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া গেল না; কারণ তার সুযোগ-সুবিধে হয়ে উঠল না। এতো লম্বা পাড়ি দেবার মতো দৈহিক সামর্থ্য এখনও পাই নি (না থেমে আটচল্লিশ ঘণ্টা, আর যদি পথে থামা যায়, তবে আরও বেশী)। ঐ রকম অসময়ে, ঠাণ্ডার দেশে গিয়ে তিন চার দিনের বেশী থাকা হতো না : তাছাড়া এই মুহূর্তে অতদিন আমাদের পড়াশোনার কাজে বাধা পড়লে চলবে না।

'চিঠির বন্যা, ছবি তোলার লোক আর সাংবাদিকদের ভিড়ে এখানে আমাদের পিষে যাবার যোগাড় হয়েছে। একটু শান্তির লোভে মাটির গর্তে লুকোতে ইচ্ছে করে। আমেরিকা থেকে সেখানে গিয়ে বক্তৃতা দেবার নিমন্ত্রণ এসেছে। তারা জানতে চায় আমরা কি চাই! কোন সর্তেই আমরা যেতে চাই না। আমাদের প্রতি সম্মান দেখাবার জন্য এখানে যে-সব আয়োজন চলছিল, অনেক কষ্টে তাদের শান্ত করেছি। মরিয়া হয়ে আমরা এদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করি আর লোকে বলে যে কোন উপায় নেই।

'আমার আইরিন ভালোই আছে। বাড়ি থেকে অনেক দূরে একটা ইস্কুলে যায়। পারীতে ছোট ছেলেমেয়েদের ভালো ইস্কুল বলতে গেলে নেই।

'সবাই আমার ভালোবাসা নিও, অনুগ্রহ ক'রে আমায় তোমরা ভুলো না।'

'নোবেল পুরস্কারের অর্ধেক আমরা পেয়েছি···জানিনা কতদিনে টাকাটা হাতে আসবে।'

এই সেদিন যিনি স্বেচ্ছায় সম্পদের লোভ ত্যাগ করলেন, তাঁর লেখা এই কথাগুলির বিশেষ তাৎপর্য আছে। সংবাদপত্র ও জনসাধারণের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা, প্রশংসার এই প্রচণ্ড তুফান, সরকারি মহলের নিমন্ত্রণ, আমেরিকা থেকে সুবর্ণ সেতুর প্রস্তাব, এসবের বিরুদ্ধে মারীর অভিযোগের অন্ত ছিল না। যে নোবেল পুরস্কার অকস্মাৎ পিয়ের ও তাঁকে বিখ্যাত দম্পতি ব'লে বিশ্বজগতে পরিচয় করিয়ে দিল, তাঁর চোখে তার একটিমাত্র মূল্য দেখা দিল : সত্তর হাজার স্বর্ণমুদ্রা। বিজ্ঞান-জগতের দুই কর্মীকে সুইডেন থেকে পরিস্কৃত করা আর তা' গ্রহণ করায় "বৈজ্ঞানিক-আদর্শের" চ্যুতি হয় নি। পিয়েরকে শিক্ষানবিসীর কয়েক ঘণ্টা থেকে মুক্তি দিয়ে স্বাস্থ্যোদ্ধারের অবকাশ দেবার এই তো অপূর্ব সুযোগ।

২রা জানুয়ারি, ১৯০৪ অভিন্যু দে গবলঁ্যার ব্যাঙ্কের শাখায় চেক্‌খানি জমা পড়ল। কুরী-দম্পতির যৎসামান্য পুঁজি এখানেই জমা থাকত। শেষ অবধি পিয়ের স্কুল অব ফিজিক্স থেকে অব্যাহতি পেলেন, তাঁর জায়গায়

নাম করা এক পদার্থবিদ, তাঁরই এক উদ্যমশীল প্রাক্তন ছাত্র পল্ ল্যাঙ্গেভিন শিক্ষার ভার গ্রহণ করলেন। কুরীরা এবার নিজেরাই খরচ দিয়ে একজন ল্যাবরেটারি-সহকারী নিযুক্ত করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে তাগিদ দিয়ে সহকারী পাবার মিথ্যে আশায় কাল কাটানোর চেয়ে এই পথ অনেক সহজ ও সত্বর হলো। দলুস্কি-দম্পতির হাসপাতাল তৈরির কাজে সাহায্য করার ইচ্ছায় মারী কুড়ি হাজার অস্ট্রীয় ক্রাউন সেখানে ধার দিলেন। এই সময়ে ওসিরিস পুরস্কারের অর্ধেক মারী কুরী ও অপর অর্ধেক এডুয়ার্ড ব্রান্‌লি পেলেন। আগের পুরস্কারের যৎসামান্য উদ্‌বৃত্তের সঙ্গে এই পঞ্চাশ হাজার যোগ ক'রে তাকে সমান দুইভাগে ভাগ করা হলো, তার অর্ধেক ফরাসী বণ্ড, আর অর্ধেক ওয়ার্‌স নগরীর বণ্ড কিনে জমা রাখলেন।

কালো মলাট-বাঁধাই হিসেবের খাতায় আরও কয়েকটি বড় বড় খরচের হিসাব পাওয়া যায়। পিয়ের-এর ভাইকে একই সঙ্গে অর্থোপহার ও ধার দেওয়া আছে, মারীর বোনেদের উপহারের টাকার অঙ্ক তাঁরা নিজেরাই জোর ক'রে কমিয়ে নিয়েছিলেন। এছাড়া বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলিতেও মোটা মোটা অঙ্কের চাঁদা দিয়েছিলেন। প্রদত্ত উপহারের তালিকায় দেখি :

পোলদেশীয় ছাত্রদের, মারীর শৈশবের এক বান্ধবীকে, ল্যাবরেটারি-সহকারীদের, সেভর ইস্কুলের এক দুস্থা ছাত্রীকে, হঠাৎ মনে পড়ে গেল একদা এক মাদ্‌মোয়াজেল দে সাঁতবিঁর কথা, যিনি মারীকে যত্ন ক'রে ফরাসী ভাষা শিখিয়েছিলেন। ভদ্রমহিলার জন্মভূমি হলো ফ্রান্সের দিপ্পী শহর, কিন্তু সে-সময়ে তাঁর নাম মাদাম কোজোলোভস্কা, বাস সুদূর পোল্যাণ্ডে। একবার নিজের জন্মভূমিকে চোখে দেখার সাধ তাঁর মনের কোণে লুকিয়ে ছিল —একথা মারী জানতেন। মারী চিঠি লিখে তাঁকে ফ্রান্সে নিমন্ত্রণ করলেন। ভদ্রমহিলাকে নিজের বাড়িতে রেখে ওয়ার্‌স থেকে পারী ও পারী থেকে দিপ্পী যাওয়া-আসার খরচ দিলেন। ভদ্রমহিলা আনন্দাপ্লুত নয়নে লোকের কাছে একথা বলে বেড়াতেন।

মারী অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে এই জাতীয় হৃদয়স্পর্শী কাজ ক'রে যেতেন। অপরিমিত দয়া বা বেহিসেবী খেয়াল তাঁর ছিল না, অথচ যাদের প্রয়োজন বোধ করতেন তাদের আজীবন সাহায্য ক'রে যেতেন। তাঁর সামর্থ্যের মধ্যেই সে-সাহায্যের অঙ্ক সীমাবদ্ধ থাকত, যাতে চিরকাল টেনে যেতে অসুবিধা না হয়।

নিজের কথাও একটু-আধটু তিনি ভাবতেন বৈকি! বুলেভার্দ কেলরমান-এ

তাঁদের বাড়িতে স্নানের ঘরখানা ঢেলে সাজালেন, আর-একখানা ছোট্ট ঘরে দেয়ালের কাগজ বদলাবার দরকার ছিল, সেটি নতুন ক'রে করালেন। কিন্তু একটা নতুন টুপি কেনার কথা তাঁর মনেই এল না এবং স্বামীকে জোর ক'রে স্কুল অব ফিজিক্স থেকে বের ক'রে আনলেও, নিজে সেভর ইস্কুলের মাষ্টারি ছাড়লেন না। ছাত্রীদের প্রতি তাঁর অসম্ভব টান ছিল এবং বাঁধা মাইনের চাকরি করার মতো শক্তি তাঁর আছে, একথা তিনি মনে করতেন।

যখন যশ আর সম্মান দু'হাত বাড়িয়ে তাঁদের আলিঙ্গন করতে চাইছে, তখন এইসব ছোটখাটো খরচের হিসাব দেওয়া কেন—একথা পাঠকের মনে আসা স্বাভাবিক। কৌতূহলী জনতা ও দেশ-বিদেশের সাংবাদিকরা কিভাবে তাঁদের বাড়ি, রু-লমোঁ'র ল্যাবরেটারির আটচালা ঘরখানা ছেঁকে ধরেছিল, আমার হয়তো সেসব কথাই লেখা উচিত। প্রকাণ্ড টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত টেলিগ্রাম ও হাজার হাজার সংবাদপত্রের প্রবন্ধগুলির হিসেব নিয়ে ছবিতোলার ভিড়ের মধ্যে পদার্থবিদদের চেহারার বর্ণনা দেওয়া উচিত।

কিন্তু সেরকম কোন বাসনা আমার নেই। আমি জানি, যে উত্তেজনা সেসময়ে দেখা দিয়েছিল, তাতে আমার মা-বাবা দুঃখ বই সুখ পান নি। তাঁদের তৃপ্তির চেহারা অন্য ধরনের। পিয়ের ও মারী সুইডেনের আকাদেমি কর্তৃক তাঁদের আবিষ্কারের যথার্থ সমাদর দেখে খুশি হলেন, অভিনন্দন-পত্রের পাহাড়ের মধ্যে প্রকৃত শ্রদ্ধেয় কয়েকজনের উৎসাহবাণী পেয়ে আনন্দ পেলেন। আত্মীয়স্বজনের আনন্দে তৃপ্তি পেলেন এবং সত্তর হাজার ফ্রাঙ্কের দরুন প্রাত্যহিক কর্মক্লান্তির ক্ষণেক অবকাশে খুশি হলেন। বাদবাকী যে "ফালতু" জিনিসটুকুর জন্যে মানুষ আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে অনেক সময়ে নিজেদের অনেক নীচে নামিয়ে ফেলে, তা এঁদের কাছে শুধুমাত্র দুঃখ ও যন্ত্রণার কারণ হ'য়ে রইল।

জনসাধারণের যে সহানুভূতি এঁদের দিকে ধেয়ে আসছিল, তার প্রতি চিরদিনের মতো এঁদের মনে বীতরাগ জন্মে গেল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে কুরী-দম্পতি বোধহয় তাঁদের জীবনের চরমতম দুঃসময়ে এসে পৌঁছলেন। তাঁরা এমন এক যুগে বাস করতেন যখন প্রতিভাবানের অভিজ্ঞতার শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করা সম্ভব ছিল। বৃষ্টিভেজা একখানা আটচালার নীচে রেডিয়ম আবিষ্কার ক'রে তাঁরা সারা দুনিয়াকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু কাজ তো এখনও শেষ হয় নি। অন্যান্য বহু অজ্ঞাত অন্বেষ্টব্য সম্পদের সম্ভাবনার স্বপ্ন তাঁদের মাথায় ঘুরছিল। তাঁরা অন্বেষক, অন্বেষণার কাজ তাঁদের ক'রে যেতেই হবে।

কিন্তু পিয়ের ও মারীর মনের এই ক্ষুধা সম্বন্ধে যশোদেবীর তো কোন মাথা-ব্যথা নেই! মহৎকে আশ্রয় ক'রে, পূর্ণ-শক্তিতে তাঁদের সমস্ত ক্ষমতা গ্রাস ক'রে, প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করাই তো যশের ধর্ম। এই গবেষক-দম্পতিকে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার ফলে কোটি কোটি লোকের দৃষ্টি এঁদের উপর এসে পড়ল। নর-নারী নির্বিশেষে, দার্শনিক, কর্মী, অধ্যাপক, ব্যবসায়ী এবং সমাজের মধ্যমণি সকলেই চোখ মেলে চাইল এঁদের দিকে। কোটি কোটি লোকের শ্রদ্ধা কুরীরা পেলেন। কিন্তু প্রতিদানের দাবিও এদের অনেক! ইতিপূর্বে যে অমূল্য অবদান এই দুই বৈজ্ঞানিক দিয়েছেন—আবিষ্কারের উপযোগী বুদ্ধিবৃত্তি আর এক মারাত্মক অমঙ্গলের বিরুদ্ধ-অভিযানে এর সক্রিয় সহযোগিতা—তাতে তারা তুষ্ট নয়। এর উৎকর্ষের জন্য আদৌ সহযোগিতা করার দরকার নেই, এর জন্ম-রহস্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস অন্বেষণেই এইসব লোকেরা সব ব্যস্ত। কুরী-দম্পতির ধীর চাঞ্চল্যহীন জীবনপ্রবাহ এবং একান্ত উদাসী মনোভাব গল্পের মতো চালু হয়ে গেল। তাঁদের নিরিবিলি সংসারের ওপর হানা শুরু হলো। শ্রদ্ধা নিবেদনের ব্যগ্রতায় লোকে আদর্শস্থানীয়দের মূলসত্তার উপর জুলুম আরম্ভ করল। জনসাধারণের ভক্তি নিবেদনের লক্ষ্যস্থল হয়ে—যা গ্রহণে তাঁরা আদৌ রাজী ছিলেন না—তাঁরা সাধনার জন্য তাঁদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় সেই অবাধ শান্তি আর নীরবতা হারালেন।

সে-সময়ের সংবাদপত্রগুলিতে পিয়ের ও মারীর ছবির সঙ্গে ("এক বিশিষ্টা, সুতনুকা, সুন্দরী রমণী," কিংবা "বিচক্ষণা এবং অনন্তের প্রতি কুতূহলী এক মনোমোহিনী জননী") কন্যা ("মায়াবিনী বালিকা") আর খাবার ঘরে স্টোভের কাছে খেলার বলের মতো গুটিয়ে-শোয়া বেড়ালছানা "ডিডি"র বর্ণনা ও ছোট্ট বাড়িখানা আর ল্যাবরেটারির বিষয়ে রঙ-চড়ানো আলোচনা বোঝাই হয়ে থাকত। অথচ এই দুই বৈজ্ঞানিক তাঁদের দারিদ্র্যের স্নেহছায়াটুকু একান্ত নিজেদের অন্তরের ধন ক'রেই রাখতে চেয়েছিলেন। বুলেভার্দ কেলরমান-এর বাড়িখানাকে "ঋষি দম্পতি"র আশ্রমের ওপর আরও রঙ চড়িয়ে বলা হলো: "পারীর অচেনা নির্জন প্রান্তে প্রাচীরের ছায়ায় সুরক্ষিত একটি ছোট্ট নীড়—দুই মহাবৈজ্ঞানিকের অন্তরঙ্গতার মহিমায় সুষমামণ্ডিত..."

এবং সেই আটচালা এবার পীঠস্থানের মর্যাদা পেল

"প্যান্থিয়নের পেছনে সেকেলে নাটুকে উপন্যাসের পাতায় যে-ধরনের এচিং দেখতে পাওয়া যায়, সেরকম কালো ক্ষতবিক্ষত বাড়িগুলির মাঝখান দিয়ে

ক-শবোঁয় গলির পাক-খাওয়া ফুটপাথের পাশে একখানা জীর্ণ ব্যারাকের কাঠের দেয়াল উপরে উঠে গেছে: এটি হলো মিউনিসিপাল স্কুল অব ফিজিক্স এণ্ড কেমিষ্ট্রি।

"কালের সুতীব্র কষাঘাত আঙ্গিনার সর্বাঙ্গে। সেটুকু পেরিয়ে নির্জন খিলানের নীচ দিয়ে যাবার সময়ে আমার পায়ের শব্দের প্রতিধ্বনি ফিরে এল এবং একটু পরেই একটি স্যাঁতসেঁতে কানাগলির মধ্যে এসে পৌঁছলাম।

"নজরে পড়ল দু'খানা কাঠের তক্তার গোঁজের ওপর একটি গাছ বেঁকেচুরে মরণাপন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। দেখলাম অনেকগুলি এক-ধরনের লম্বা নীচু কাঁচের ঘর। তার ভেতর দিয়ে ছোট ছোট স্থির আলোর শিখা এবং নানা ঢঙের কাঁচের যন্ত্রপাতি আমার নজরে এল। কোন সাড়াশব্দ নেই, গভীরতায় সমাচ্ছন্ন, নীরবতায় ঢাকা; শহরের কোন শব্দ কখনও এরাজ্যে প্রবেশ করে না।

"অনেক দরজা। একটা দরজায় টোকা দিলাম। আশ্চর্যরকম আড়ম্বর-বর্জিত এক ল্যাবরেটারিতে প্রবেশ ক'রে লক্ষ্য করলাম, সে-ঘরের মেঝে অসমান, দেয়ালের প্লাস্টার জীর্ণ, মাথার ওপর নড়বড়ে তক্তার ছাত, ধুলোমাখা জানালা দিয়ে ক্ষীণ আলো ঘরে ঢুকছে। একখানা জটিল যন্ত্রের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে এক যুবক কাজ করছিল, মাথাটা একবার শুধু তুলে বলল: মঁসিয়ে কুরী ও-ঘরে। সঙ্গে সঙ্গে আবার কাজের মধ্যে ডুবে গেল। ঘড়ির কাঁটা মিনিটের কোঠা পেরিয়ে চলল। হিমেল ঠাণ্ডা। টপ টপ শব্দে একটা কল থেকে জল পড়ছে। গ্যাসের বার্ণার জ্বলছে।

"অবশেষে রোগা, লম্বা এক ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করলেন, রুক্ষ ধূসর শ্মশ্রু-শোভিত কৃশ মুখখানি, মাথায় জীর্ণ টুপি। ইনিই মঁসিয়ে কুরী।"

["একো-দে পারী," পল একার]

প্রতিষ্ঠা এক আশ্চর্য আয়না বিশেষ। কখনও সত্য কখনও বা প্রমোদোদ্যানের উত্তল কাঁচের মতো বিকৃত; পাত্রপাত্রীর সহস্র চিত্র প্রক্ষিপ্ত করে এবং তাদের সামান্যতম ভঙ্গী ব্যঙ্গ-চিত্রের মাধ্যমে বর্ধিত করে। সৌখিন সব হোটেলে কুরীদের জীবন নিয়ে নাটক সৃষ্টি হতে লাগল। একবার কাগজে খবর পাওয়া গেল, মঁসিয়ে ও মাদাম কুরীর সঞ্চিত রেডিয়ম থেকে হঠাৎ কিছু পরিমাণ খোয়া গেছে। "মৎমার্তে" থিয়েটারে সঙ্গে সঙ্গে একটি নাটিকা চালু হয়ে গেল, তার মধ্যে দেখা গেল কুরীরা তাঁদের আটচালার দরজা বন্ধ ক'রে নিজ হাতে ঘর ঝাঁট দিচ্ছেন, কাউকে সেখানে ঢুকতে দিচ্ছেন না এবং স্টেজের প্রতিকোণে ঘুরে ঘুরে হাস্যাস্পদ ভাবে হারানো ধন খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

মারী ঘটনাটি এইভাবে বলেন: (যোসেফ শ্ক্লোদোভ্স্কিকে মারীর চিঠি:)

'সম্প্রতি আমাদের একটি মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে: রেডিয়ম নিয়ে একটি সূক্ষ্ম কাজ করতে গিয়ে বেশ কিছু পরিমাণ হারিয়ে ফেলেছি, অথচ এই সর্বনাশের কোন কারণ এখনও বুঝতে পারছি না। ফলে রেডিয়মের আণবিক ওজন নিরূপণের কাজে বাধা পড়ে গেল, অথচ ঈস্টারের মধ্যে আমরা কাজটা শুরু করবো বলে ঠিক করেছিলাম।...'

আরও একটি চিঠিতে তাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান রেডিয়মের কথা উল্লেখ ক'রে তিনি বলছেন: (২৩শে ডিসেম্বর, ১৯০৩—মারী লিখছেন দাদাকে:)

'সম্ভবতঃ আমরা এই হতভাগ্য পদার্থটি আরও বেশী পরিমাণে তৈরি করতে পারব। সেজন্য চাই অশোধিত আকর আর অর্থ। টাকার দুঃশ্চিন্তা এখন ঘুচেছে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে আকর পাওয়া যাচ্ছে না। বর্তমানে কিছু আশা পাওয়া গেছে এবং মনে হয় আগের মতো প্রয়োজনানুযায়ী যথেষ্ট না পেলেও এখন পেতে অসুবিধা হবে না। কাজেই তৈরি করার কাজ এগিয়েই যাবে কিন্তু এতটুকু রেডিয়মের জন্য কি পরিমাণ সময়, ধৈর্য আর অর্থব্যয় যে হয় তা যদি জানতে!'

নোবেল প্রাইজ পাবার তেরোদিন পর মারীর এই দুশ্চিন্তা। এই তেরো দিনের মধ্যে দুনিয়া কিন্তু তার নিজের মতো আর-এক আবিষ্কার ক'রে ফেলেছে: আবিষ্কার করেছে কুরী-দম্পতিকে—এক "অনন্যসাধারণ দম্পতিকে!" কিন্তু পিয়ের ও মারী এই নবকলেবর ধারণ করতে পারলেন না।

১৯০৪-এর ২২শে জানুয়ারি পিয়ের তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু জর্জ গোয়াকে লেখেন:

'প্রিয় বন্ধু:

'বহুদিন আগে আমি তোমায় চিঠি লিখব ভেবেছিলাম; কিন্তু এতদিন পারি নি বলে ক্ষমা ক'রো। আমার বর্তমানের অর্থহীন জীবনই তার জন্য দায়ী।

'রেডিয়মের ওপর এই হঠাৎ ঝোঁক নিশ্চয় তোমার নজর এড়ায় নি। জনপ্রিয়তার সাময়িক উত্তেজনা সবটাই আমাদের দোরে এসে পড়েছে; দুনিয়ার যতো রাজ্যের সাংবাদিক, ফোটো-গ্রাফারদের পাল্লায় পড়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত; তারা নার্সের সঙ্গে আমার শিশু-কন্যার আবোল তাবোল কথা পর্যন্ত ছেপে বের

করছে, বাড়ির সাদা কালো বেড়ালটা অবধি বাদ পড়ছে না। দুনিয়ার যতো পাগল, পরিচয়হীনরা চিঠি লিখছে আর সেই সঙ্গে চিঠি ও সাক্ষাৎ পাচ্ছি অনেক আবিষ্কারকদের যাঁদের কপালে প্রশংসা মেলে নি।...বহুলোক অর্থ সাহায্য চেয়ে গেছে। পরিশেষে অটোগ্রাফ-সংগ্রাহক, অহঙ্কারী উদ্ধত সামাজিক স্তরের লোক, আবার কখনও কখনও বৈজ্ঞানিকরা পর্যন্ত আমাদের ঐ অপরূপ রু-লমোঁর ল্যাবরেটারিতে ধাওয়া করছে। এই সব কারণে ল্যাবরেটারির শান্তি দৌড়ে পালিয়েছে ; প্রতি রাত্রে এক-পাহাড় চিঠির উত্তর লিখতে হয়। এই অবস্থায় পড়ে আমার মনে হচ্ছে বর্বর নির্বুদ্ধিতা যেন আমার ওপর চেপে বসেছে।...'

যাঁরা দারিদ্র্যকে মেনে নিয়েছেন, অত্যধিক পরিশ্রম, এমনকি অবিচার পর্যন্ত মুখ বুঁজে সহ্য ক'রে এসেছেন—এই প্রথম তাঁদের মধ্যে এক ক্রমবর্ধমান বিচিত্র অস্থিরতা দেখা গেল।

এই সময়ে চার্লস এডুয়ার্ড গুইলমকে পিয়ের কুরী লেখেন :

'...আমাদের কাছ থেকে প্রবন্ধ ও বক্তৃতা চাওয়া হচ্ছে আর কয়েক বছর পরে যখন এইসব লোকেরাই দেখবে যে, আমাদের কাজ মোটে এগোয় নি, তখন তারাই অবাক হবে সব থেকে আগে।...'

১৫ই জানুয়ারি, ১৯০৪—চার্লস এডুয়ার্ড গুইলমকে পিয়ের কুরী আবার লেখেন :

'প্রিয়বন্ধু, ১৮ই ফেব্রুয়ারি আমার বক্তৃতা হবে ; কাগজে ভুল সংবাদ বেরিয়েছে। এই ভুল সংবাদের জন্য আমার কাছে ২০০ খানা টিকিটের অনুরোধ এসেছে। আমি এখন জবাব দেওয়া বন্ধ করেছি।

'ফ্ল্যামারিয়ঁর বক্তৃতা সম্বন্ধে নিরবচ্ছিন্ন ও দুর্জয় আলস্য বোধ করছি। অপেক্ষাকৃত শান্তিতে কোন নিরিবিলি জায়গার জন্য প্রাণ আকুল হয়ে উঠেছে, যেখানে বক্তৃতা নিষিদ্ধ এবং সংবাদপত্র-বিক্রেতারা দণ্ডিত!'

১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯০৪, মারী কুরী লিখেছেন দাদা যোসেফকে :

'...সারাক্ষণ গোলমাল। এরা আমাদের কাজ করতে দেবে না। অভদ্রতা হলেও এবার আমি জোর ক'রে বাইরের লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংক্ষেপে সারতে চাইছি। তবুও তারা আমায় জ্বালাতে ছাড়ছে না। সম্মান আর প্রশংসার ভারে আমাদের জীবন বরবাদ হতে চলেছে।'

১৯শে মার্চ ১৯০৪, মারী কুরী আবার লিখছেন দাদাকে :

'প্রিয় দাদা ভাই,—

'তোমার জন্মদিনে আমার আন্তরিক ভালোবাসা জানবে। তোমার সুন্দর

স্বাস্থ্য ও পারিবারিক কুশল প্রার্থনা করি এবং সেই সঙ্গে এও প্রার্থনা করি যেন, আমাদের মতো তোমাকে চিঠিপত্রের প্লাবনে ভেসে যেতে অথবা বাইরের জগতের আক্রমণে বিপর্যস্ত হতে না হয়।

'এখন দুঃখ হয় চিঠিগুলো কেন ফেলে দিলাম। তার মধ্যে শিক্ষনীয় কিছু ছিল। রেডিয়মের উপর চতুর্দশপদী কবিতা, সম্পূর্ণ কবিতা, বিভিন্ন আবিষ্কারকের চিঠি, ভৌতিক চিঠি, দার্শনিক চিঠি, ইত্যাদি নানা উপাদান সেগুলোর মধ্যে ছিল। গতকাল এক মার্কিন ভদ্রলোক চিঠি লিখেছেন, তাঁর রেসের ঘোড়াকে আমার নামে নামাকরণ করলে আমি আপত্তি করব কিনা! এর ওপর অটোগ্রাফ ও ফটোগ্রাফের অসংখ্য চাহিদা তো আছেই। এসব চিঠির উত্তর দিই না, কিন্তু পড়তেও তো সময় যায়।'

২০শে মার্চ ১৯০৪, পিয়ের কুরী বন্ধু জর্জ গোয়াকে লিখছেন:

'...তুমি লক্ষ্য ক'রে থাকবে যে, এই মুহূর্তে আমরা সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর আশীর্বাদ পেয়েছি, কিন্তু সৌভাগ্য সর্বদা বিচিত্র সব দুশ্চিন্তা সঙ্গে ক'রে আনে। আমরা ইতিপূর্বে আর কখনও এমন শান্তিহীন অবস্থায় দিন কাটাই নি। এমন দিন যায়, যেদিন আমরা নিঃশ্বাস ফেলার অবসর পাই না, অথচ আমরা বুনো লোকেদের মতো জনসমাজ থেকে দূরে থাকার স্বপ্ন দেখতাম!'

আত্মীয়া আঁরীয়েতাকে মারী লিখলেন ১৯০৪ সালের বসন্তকালে:

'আমাদের শান্তিপূর্ণ কঠোর পরিশ্রমের দিনগুলো শেষ হয়ে গেছে, জানি না আর কোনদিন পুরোনো দিনের ভারসাম্য ফিরে পাব কিনা!'

এই নিদারুণ বিরক্তি ও হতাশা থেকে আমি বলতে পারি যে, বৈজ্ঞানিকরা তাঁদের মনের শান্তি হারিয়েছিলেন।

'অনুপযুক্ত পরিবেশে অসাধ্য-সাধনের নিদারুণ ক্লান্তি জনপ্রিয়তার আক্রমণে বহু পরিমাণে বেড়ে গেল,' (মারী পরে লেখেন:) 'স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নেওয়া নিরিবিলি জীবনের মূলে কুঠারাঘাত হওয়ায় আমরা সত্যিকারের দুঃখের সম্মুখীন হলাম এবং সবরকমে সর্বনাশের ফল ভোগ করতে লাগলাম।'

ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যশের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি সুযোগ অন্ততঃ কুরীদের প্রাপ্য ছিল; ভাল চাকরি, ল্যবরেটারি, সহকর্মীদের সহযোগিতা ও আর্থিক সুরাহা,—এসব তাঁদের বহুদিনের আশা। কিন্তু এই বা জোটে কই? তাঁদের পথ চেয়ে থাকার যেন আর শেষ ছিল না।

এবার পিয়ের ও মারীর বিতৃষ্ণার কারণগুলি উল্লেখ করব। সব দেশের

সবচেয়ে পরে ফ্রান্স এঁদের মূল্য দিতে রাজী হলো। ডেভি মেডেল ও নোবেল পুরস্কার লাভ ক'রে পিয়েরকে প্রমাণ করতে হলো যে পদার্থবিদ্যা বিভাগে অন্ততঃ একটি পদে তাঁর যৎসামান্য দাবী আছে। তাঁদের মনে এ নিয়ে ক্ষোভের অন্ত ছিল না। সান্ত্বনা শুধু এইটুকু যে, বাইরের দুনিয়া চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, কী রকম দুরবস্থার মধ্যে এঁরা এতবড় আবিষ্কার করতে সফল হয়েছেন। তবুও এ অবস্থা পরিবর্তনের কোন তাগিদ দেখা গেল না।

গত চার বছর যাবৎ যতগুলি পদ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছে, পিয়ের সেসব একবার খতিয়ে দেখলেন। যে একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান সাধ্যমত তাঁর প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত ও সমর্থন করেছিল সেই স্কুল-অব্-ফিজিক্সের কর্তৃপক্ষের প্রতি চির কৃতজ্ঞ রইলেন। সরবনে বিরাট জনতার সামনে বক্তৃতা দেবার সময় তিনি সেই শূন্য জীর্ণ আটচালাটি সম্বন্ধে বলেন :

'এখানে আমি একটি কথা বলতে চাই যে, আমরা আমাদের যাবতীয় গবেষণা স্কুল-অব্-ফিজিক্সেই করেছি।

'সবরকম বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির পক্ষে পরিবেশ একটি বড় কথা এবং ফলাফলের কিছুপরিমাণ সার্থকতা তার উপরেই নির্ভর করে। কুড়ি বছরেরও অধিক আমি এখানে আছি। এই বিদ্যায়তনের প্রথম পরিচালক স্যুজেন্‌বার্জার সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক ছিলেন। মনে পড়ে যখন আমি সামান্য এক সহকারী মাত্র, তখন তিনি আমার কাজের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন; পরে তিনি মারীকে আমার সঙ্গে কাজ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। সেসময়ে এমন ঘটনা লোকে কল্পনাও করতে পারত না। বর্তমান পরিচালকদ্বয় মঁসিয়ে লে: ও মঁসিয়ে গারিয়েল-এর কাছেও একই রকম সহানুভূতি আমরা পেয়েছি।

'এই ইস্কুলের প্রফেসর ও পাঠ-শেষ-করা ছাত্ররা—সবাই মিলে একটি হিতৈষী শিল্পায়তন-গোষ্ঠী রচনা করেছেন,—যা থেকে আমি বিশেষ প্রেরণা পেয়েছি। এই ইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে থেকেই আমরা সহকর্মী ও সুহৃদ লাভ করেছি এবং আজ এখানে আমি এঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।'...

কাজের নেশা ও সময় নষ্ট হবার আতঙ্ক ছাড়াও যশের প্রতি বিতরাগের আরও কারণ ছিল। স্বভাবতঃ নির্বিরোধী প্রকৃতির মানুষ পিয়ের কুরীর চিরদিনের আদর্শে ঘা' পড়ল। তিনি উত্তরাধিকার তথা গোত্রবিভাগের বিরোধী ছিলেন। ক্লাসের মধ্যে "প্রথম" বলে কেনই বা কোন বিশেষ ছাত্র থাকবে? বয়স্ক লোকেরা সাধারণতঃ যে সব সম্মানচিহ্ন ইত্যাদির জন্য লালায়িত,

সেগুলি তাঁর কাছে ইস্কুলের ছেলে-ভোলানো পদক ব'লে মনে হতো। যে মনোভাব থেকে তিনি দেশের শ্রেষ্ঠ সম্মানচিহ্ন "লেজিঁঅ অ অনর" প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সেই একই মনোভাব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তিনি পোষণ করতেন। প্রতিযোগিতার কোন স্পৃহাই তাঁর মধ্যে ছিল না এবং "আবিষ্কারের ঘোড়দৌড়ে" সমসাময়িক লোকের কাছে হার মানতে তাঁর এতটুকু মনোবেদনা হতো না। তিনি বলতেন: 'একজন যখন বের ক'রেই ফেলেছে, আমি আর তবে অমুক অমুক কাজের ফিরিস্তি বের ক'রে কি করব?'

এই রকম অদ্ভুত ঔদাসীন্যের প্রভাব মারী এড়াতে পারেন নি। কিন্তু তিনি নিজে এই স্তুতি-স্তাবকতার হাত থেকে যে রেহাই পেতে চাইছিলেন—স্বামীকে অনুকরণ করা বা স্বামীর ইচ্ছা মেনে চলার আগ্রহ তার কারণ নয়। যশের বিরুদ্ধ-অভিযানের স্পৃহা তাঁর ছিল না, তাঁর ছিল এক ভীরু চেতনা, লোকচক্ষুর দৃষ্টি তাঁর ওপর রয়েছে একথা মনে হলেই তাঁর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসত, এমন কি মাথা ঘোরা, শারীরিক অস্বস্তি ইত্যাদি নানা বিপত্তি শুরু হয়ে যেত।

এছাড়া, দায়িত্বের মধ্যে আকণ্ঠ ডুব দিয়ে এককণা শক্তিরও অপব্যয় তাঁর সইত না। তাঁর নিজস্ব দায়িত্বের পূর্ণভার বহন ক'রে সংসার, মাতৃত্ব, শিক্ষকতা, এসবের ভেতর দিয়ে জীবনের দুরূহ পথ বেয়ে তাঁকে চলতে হতো। এর সঙ্গে অতিরিক্ত আর একটি কোন কাজ গ্রহণ করতে গেলে ভারসাম্য নষ্ট হতো। সহধর্মিণী, জননী, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষয়িত্রী—মারীর পক্ষে প্রখ্যাতা মহিলার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার মতো একটি মুহূর্তও অবসর ছিল না।

ভিন্ন ভিন্ন পথে পিয়ের ও মারী এই ভাবে এক জায়গায় এসে মিশেছিলেন। লোকে মনে করতে পারে একসঙ্গে মস্ত কাজ ক'রে যশ যখন পেলেন, তখন দু'জনে দু'রকম ভাবে তাকে গ্রহণ করতে পারতেন। পিয়ের-এর ঔদাসীন্য বজায় থাকলেও, মারীর মধ্যে অহঙ্কার আসতে বাধা কোথায়? কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটে না। দু'টি মস্তিষ্কের মতো দুটি হৃদয়ের মধ্যেও ছিল সম্পূর্ণ সাদৃশ্য। জীবনের আর সব পরীক্ষার মতো এই যুদ্ধেও এঁরা জয়ী হলেন, যশের স্বর্ণ-শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ার আগে দু'জনে একত্রে নিজেদের গুটিয়ে নিলেন।

স্বীকার করতে বাধা নেই যে, সর্বান্তঃকরণে যাঁকে আমি অনুধাবন করেছি, তিনি সাধারণ নিয়মের এক নিষ্ঠুর ব্যতিক্রম। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন বিশ্ব-জোড়া খ্যাতি যা' ইতিপূর্বে কোন মহিলা অর্জন করতে পারেন নি, আমার

মা তা'র থেকে কিছুটা আনন্দ পেয়েছিলেন, একথা জানতে পারলে আমি শান্তি পেতাম। এই অসাধারণ অভিযানের নায়িকা শুধু দুঃখই পেলেন,—এ যেন বড় বেশী অন্যায় ব'লে আমার মনে হয়েছে। কোনও চিঠির শেষের দিকে, গোপন কথা বলার মতো ক'রেও এতটুকু স্বার্থপর অহঙ্কার, বিজয়ের উল্লাস বা উচ্ছ্বসিত প্রলাপের আভাসটুকুও যদি পেতাম, তাহলে যেন ঢের ভাল লাগত।

সে-আশা দুরাশা। মারী "প্রখ্যাত মাদাম কুরী"-র পদে উন্নীত হবার পরেও মাঝে মাঝে আনন্দ পেয়েছেন বৈকি, কিন্তু তা শুধু তাঁর ল্যাবরেটারির শান্তিচ্ছায়ায় অথবা সংসারের গণ্ডির মধ্যে। দিনের পর দিন তিনি নিজেকে আবছা ক'রে এনেছেন, মুছে এনেছেন, যাতে লোকে তাঁকে মঞ্চের ওপর খাড়া ক'রে এমন এক তারকা গড়তে না পারে যার ভেতর তিনি নিজেকে আর খুঁজে না পান। অনেক বছর পর্যন্ত অচেনা বহু লোক তাঁকে এসে উত্যক্ত করত: "আপনিই তো মাদাম কুরী, না?' অন্তরের ভীরুতা গোপন ক'রে স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দিতেন মা: 'না, আপনার ভুল হয়েছে।' এইভাবে নিজেকে তিনি দুর্গম ক'রে তুলতেন।

ভক্তবৃন্দ অথবা সমসাময়িক শক্তিমান গোষ্ঠী তাঁর সঙ্গে সম্রাজ্ঞীর মতো ব্যবহার করত। তাদের সামনে তিনি তাঁর স্বামীর মতো বিস্ময়, অবসাদ, অধৈর্য ও বিরক্তি অল্পবিস্তর চাপা দেবার চেষ্টা করতেন, লোকে যখন তাঁর আবিষ্কার, তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে অনর্গল উচ্ছ্বাস প্রকাশ করত, তখন ভেতরে ভেতরে অসহ্য বিরক্তি তাঁকে অবসন্ন ক'রে ফেলত।

পিয়ের বলতেন: 'ভাগ্যের অনুকম্পা'। কুরী-দম্পতির এই 'ভাগ্যের অনুকম্পা'-র মনোভাব নিয়ে অসংখ্য গল্প আছে, তার মধ্যে একখানি খুব সুন্দর এবং সেই ঘটনাটি আমি এখানে তুলে দিচ্ছি। ইলিসী-প্রাসাদে একদিন রাষ্ট্রপতি লুবে-র সঙ্গে সান্ধ্য-ভোজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে কুরী-দম্পতিকে যেতে হয়। এক মহিলা এসে মারীকে জিজ্ঞেস করেন:

'গ্রীসের রাজার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব?'

নিস্পৃহ শান্ত নম্র কণ্ঠে মারী উত্তর দেন:

'তার কি কোন প্রয়োজন আছে?'

মহিলার হতভম্ব মুখের ভাব মারীর চোখে পড়ল, এবং আতঙ্কের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন যে, যাঁকে চিনতে না পেরে প্রত্যাখ্যান করলেন, তিনি স্বয়ং মাদাম লুবে!

নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জায় লাল হয়ে বলে উঠলেন:

'কিন্তু, কিন্তু আপনার ইচ্ছে থাকলে নিশ্চয়ই আমি আলাপ করব। আপনার যা ইচ্ছে...'

কুরী-দম্পতি চিরদিন 'আদিবাসীদের মতো সহজ জীবন যাপন' করতে চাইতেন। বর্তমানে নিরালার প্রয়োজন হলো আরেকটি কারণে, তাঁরা কুতূহলী জনতার দৃষ্টির অন্তরালে পালিয়ে বাঁচতে চাইছিলেন। আগের চেয়ে অনেক বেশী ঘন ঘন তাঁরা অজানা পল্লীগ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন এবং কোন হোটেলে যদি রাত্রিবাস করতে হতো, তবে ছদ্ম নামে সই করতেন।

তাঁদের স্বাভাবিক চালচলনই ছিল তাঁদের সবচেয়ে ভাল ছদ্মবেশ। যেমন-তেমন পোশাক পরা এই লম্বা সাধারণ চেহারার ভদ্রলোক এবং কৃষক বধূর পোশাক পরা তরুণী পত্নীকে ব্রিটানীর অপ্রশস্ত পথে সাইকেল চালিয়ে যেতে দেখে কে-ই বা কল্পনা করতে পারত যে, এঁরা নোবেল পুরস্কার বিজয়ী দম্পতি!

অতিপরিচিতরাও চিনতে ভুল করতেন। এক মার্কিন সাংবাদিক সুচতুর-ভাবে তাঁদের অনুসরণ ক'রে এসে লা পুলডু নামক স্থানে এক ধীবরের কুটিরের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। এক সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে জগদ্বিখ্যাতা বৈজ্ঞানিক মাদাম কুরীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তাকে পাঠানো হয়েছিল। কোথায়ই বা তিনি থাকতে পারেন? কার কাছে সন্ধান পাওয়া যায়? সম্ভবতঃ ঐ যে স্ত্রীলোকটি খালি পায়ে দোরগোড়ায় বসে জুতোর ভেতর থেকে বালি ঝেড়ে ফেলছে, তার কাছে হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

ভদ্রমহিলা মাথা তুলে অনাহূত আগন্তুকের দিকে ধূসরছোঁয়ানো চোখ তুলে চাইলেন...এবং হঠাৎ সংবাদপত্রের শত-সহস্র ছবির সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য ধরা পড়ে গেল। রিপোর্টার এক মুহূর্তের জন্য ঘাবড়ে গেল, পরমুহূর্তে মারীর পাশে মাটিতে বসে পড়ে নোট-বইখানা টেনে বের করল।

পালাবার পথ না পেয়ে মারী হাল ছেড়ে দিলেন এবং ছোট ছোট কথায় জবাব দিয়ে গেলেন। হ্যাঁ, তিনি এবং পিয়ের কুরী রেডিয়ম আবিষ্কার করেছেন। হ্যাঁ, তাঁরা কাজ চালিয়েই যাচ্ছেন।

ইতিমধ্যে জুতো জোড়া ঝেড়ে নিয়ে সম্পূর্ণ বালিমুক্ত ক'রে, পাথরে কাঁটা ঝোঁপে ছড়ে যাওয়া সুন্দর দু'খানি খালি পায়ে পরে নিলেন। সাংবাদিকের পক্ষে কী সুবর্ণ সুযোগ! ভাগ্যের আশাতীত যোগাযোগে জীবনের "অন্তরতম" মুহূর্তের এমন একখানি চিত্রের সন্ধান পাওয়া গেল...সিদ্ধহস্ত রিপোর্টার এমন সুযোগ ছাড়ে? চট ক'রে সে কতকগুলি ঘরোয়া খবর জেনে নিল। যদি মারীর

যৌবন, তাঁর কার্যপদ্ধতি, কিংবা গবেষণায় উৎসর্গিত নারীর মনস্তত্ত্বের কিছুও জানা যায়…

'কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে সেই আশ্চর্য সুন্দর মুখখানি তার দিক থেকে অন্য-দিকে ফিরে গেল। ইদানীং তিনি একটি কথা বারবার ব্যবহার করতেন, তাতে তাঁর চরিত্র, সত্তা ও সাধনা রূপায়িত হতো। সম্পূর্ণ একখানি গ্রন্থের চেয়েও দামী সেই কথাটি ব'লে মারী সব প্রশ্নের ছেদ টানতেন : 'বিজ্ঞানচর্চার বিষয়বস্তু ব্যক্তি নয়, পদার্থ।'

॥ দৈনন্দিন জীবন ॥

১৭

কুরীদের আজ মস্ত নাম-ডাক! এঁদের আর্থিক অনটনের কিঞ্চিৎ উপশম হলেও, সুখের দিনগুলি বুঝি হারিয়ে গেল।

বিশেষ ক'রে মারী তাঁর চারিত্রিক উদ্যম ও আনন্দের অভাববোধ করলেন। পিয়ের-এর মতো তিনি অনন্যমনা হয়ে বিজ্ঞান-সাধনা করতে পারছিলেন না। দৈনন্দিনের ঘটনাপ্রবাহ তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতির উপর ছাপ ফেলে যাচ্ছিল এবং তার প্রতিক্রিয়া তাঁর কাছে সুসহও ছিল না।

পিয়ের-এর অসুস্থতায় তাঁর জীবন বিষময় হয়ে উঠেছিল, রেডিয়ম আবিষ্কার ও নোবেল পুরস্কারের আলোড়ন এক মুহূর্তের জন্যও তাঁকে এই দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই দিতে পারছিল না।

৩১শে জানুয়ারি, ১৯০৫—বন্ধু জর্জ গোয়াকে পিয়ের লেখেন :

'বর্তমানে হাতের ব্যথা আমায় ছুটি দিয়েছে, কিন্তু এই গ্রীষ্মে এত কষ্ট হয়েছিল যে, আমার সুইডেন যাত্রা রদ করতে হলো। বুঝতেই পারছ সুইডেনের আকাদেমি আমাদের ওপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছে। কথা হলো এই যে, সবরকম শারীরিক ক্লান্তি বাদ দিলে তবেই আমি ঠিক থাকি। আমার

স্ত্রীর অবস্থাও প্রায় একই রকম, কাজেই আগেকার মতো সারাদিন পরিশ্রমের কথা আমরা আর স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।'

২৪শে জুলাই, ১৯০৫—পিয়ের জর্জ গোয়াকে আবার লেখেন :

'আমাদের পূর্ববৎ চলছে, খুব ব্যস্ত অথচ কিছুই এগোচ্ছে না। পুরো এক বছর কেটে গেল, আমি এদিকে কোন কাজেই লাগলাম না, আমার নিজের বলতে একমুহূর্ত সময়ও হাতে পাই না। এই যে সময় নিজের মনে বয়ে চলেছে, তার হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার সঠিক রাস্তা এখনও খুঁজে পাই নি। অথচ সত্যিই তার বিশেষ প্রয়োজন। বুদ্ধিজীবীদের এ এক জীবনমরণ সমস্যা।

'আমার এই ব্যথাগুলো ঠিক বাত নয়, স্নায়বিক কোন গণ্ডগোল থেকে হচ্ছে বলেই আমার ধারণা। ঠিকমতো পথ্য ক'রে আর ষ্ট্রিচনিন্ খেয়ে অনেকটা সুস্থ বোধ করছি।'

সাইকেল চড়ে ছেলেমানুষের মতো নিশ্চিন্ত মনে পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর সেই অপূর্ব দিনগুলো হারিয়ে গেছে। পারীর কাছে শেভ্‌র্যজ-এর উপকূলে মারী একখানি ছোট্ট বাড়ি ভাড়া নিয়ে স্বামী ও কন্যার সেবা যত্ন করেন।

মাদাম জঁ্যা পেরিনকে মারী সঁ্যা রেমি লে শেভ্‌র্যজ থেকে লিখলেন :

'আইরিনের হুপিং কাশি সারতে খুব কষ্ট হলো ; ওর সম্বন্ধে আমি এখনও খুব নিশ্চিন্ত নই, তিনমাস ধরে গাঁয়েই রয়েছি, তবু মাঝে মাঝে কাশতে শুরু করে। আমার স্বামী বিশেষ দুর্বল, বেরাতে পারেন না, আমরা পদার্থবিদ্যা ও গণিতের উপর আমাদের সঞ্চিত তত্ত্ব আলোচনা ক'রে সময় কাটাই।

'এবার আইরিনের জন্য একটা ছোট্ট সাইকেল কিনে দিলাম, দিব্যি চড়ে বেড়ায়। ছেলেদের পোশাক প'রে সাইকেল চড়ে, ভারি মজা লাগে দেখতে।'

শরীরে আর মনে ক্লান্তি ছেয়ে ছিল, মাথার ওপর কোন দুর্বিপাক হানা দেবার অপেক্ষা অথচ অযথা সময় চলে যাচ্ছে ভেবে পিয়ের দিনরাত স্বস্তি পেতেন না। এত অল্প বয়সে তিনি কি মৃত্যুর আশঙ্কা করছিলেন? যেন কোন অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা চলেছে। দৃঢ় সঙ্কল্প এবং তৎপরতার প্রতিমূর্তি ভদ্রলোক সস্নেহ তিরস্কারে স্ত্রীকে আপন উদ্বেগের অংশীদার ক'রে তুললেন। এত ধীর গতিতে কাজ তাঁর পছন্দ হতো না। গবেষণার মন্দাক্রান্তা ছন্দে প্রাণ সঞ্চার করা দরকার, প্রতি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার হওয়া দরকার, ল্যাবরেটারিতে অনেক বেশী সময় দেওয়া দরকার।

মারী কাজের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন, তাঁর স্নায়বিক সহনশক্তি সীমা ছাড়িয়ে গেল।

ভাগ্য তাঁর প্রতি নিষ্ঠুর ছিল। ষোল বছর বয়সে যে দিনটিতে তিনি গ্রাম থেকে নাচের স্মৃতিতে মন ভরে নিয়ে ওয়ার্‌সয় রোজগারের ধান্দায় ফিরে এসেছিলেন, সেদিন থেকে এক মুহূর্ত বিশ্রাম পান নি। যৌবন তাঁর কাটল নিঃসঙ্গে, হিমশীতল চিলেকোঠায়, পদার্থবিদ্যার বইয়ের উপর হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে থেকে। শেষে যখন জীবনে প্রেম এল, সেও এল কাজের ছদ্মবেশে।

বিজ্ঞান-সাধনা ও প্রেমের সাধনায় মিলে মিশে মারীর জীবন এক নতুন খাতে বয়ে চলল। তাঁদের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা একই রকম সুগভীর, তাঁদের আদর্শ একই মহিমায় মহিমান্বিত। কিন্তু তার আগে পিয়ের-এর জীবনে দীর্ঘ আলস্যময় অবসর, সম্মোহিত কৈশোর এবং আনন্দময় খামখেয়ালে পূর্ণ অখণ্ড অবকাশ ছিল। মারী, যেহেতু তিনি নারী, সেই হেতু কখনও কর্তব্যভ্রষ্ট হন নি, শুধু বেঁচে থাকবার আনন্দ যে কি, তা' জানবার অবকাশ তার ঘটে নি। স্নেহময়ী জায়া ও জননী তিনি। মধুর অবকাশ, বিশ্রাম, বেহিসেবী দিনের স্বপ্ন দেখতেন শুধু!

এই দিক থেকে তিনি পিয়েরকে অবাক ক'রে দিয়েছিলেন। প্রতিভাময়ী সঙ্গিনীর সন্ধান পেয়ে পিয়ের চেয়েছিলেন যে, নিজেকে যেমন "মহতী চিন্তাধারা"র পায়ে উৎসর্গ করেছিলেন, তেমনি মারীও করুক।

মারী তাঁকে মেনেই চলতেন সর্বদা কিন্তু দেহে-মনে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন। গোড়ার কথাটি হলো অত্যন্ত সহজ। ছত্রিশ বছরের এই নারী-দেহে বহুকাল ধরে জীবনী-শক্তির ক্ষয় হ'তে হ'তে এখন এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, যখন প্রাণ তার সত্ব ছেড়ে দিতে আর রাজী নয়। কিছুদিনের মতো "মাদাম কুরী"র সত্বা থেকে মারী হওয়া তাঁর দরকার, রেডিয়ম ভুলে যাওয়া দরকার, এখন শুধু আহার-নিদ্রা, আর সব রকম চিন্তা থেকে অব্যাহতি চাই।

কিন্তু এ কি সম্ভব, প্রতিদিন নতুন নতুন চাহিদা এসে ১৯০৪ সালে তাঁর অবস্থা অচল ক'রে দিল। মারী গর্ভবতী। একটিমাত্র অনুগ্রহ তিনি ভিক্ষা চাইলেন, সেভর ইস্কুল থেকে ক'দিনের ছুটি। সন্ধ্যাবেলায় ক্লান্ত অবসন্ন দেহে পিয়ের-এর হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে ল্যাবরেটারি থেকে ফিরে মাঝে মাঝে ওয়ারস্‌-র বিশেষ একটি সুখাদ্য একখণ্ড 'কাভিয়র'-এর জন্য মন কেমন করে।

দ্বিতীয় গর্ভাবস্থার শেষ দিকে চূড়ান্ত অবসাদ তাঁর মনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিল। স্বামীর স্বাস্থ্যের জন্যে দুশ্চিন্তা তাঁর মানসিক শান্তি হরণ করল— তাঁকে ছাড়া দুনিয়াতে মারীর প্রিয় বলে যেন আর কিছুই নেই,—বিজ্ঞান না,

জীবন না, যে শিশুটি আসছে সে পর্যন্ত না। পোল্যাণ্ড থেকে ব্রনিয়া প্রসবের সময়ে এসে মারীর এই পরাজিত বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে গেল।

বারবারই মারী প্রশ্ন করেন : 'কেন এই শিশুটিকে পৃথিবীতে আনা? জীবন ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন, অতিশয় নিরস দায়িত্ব। নিরীহ শিশুদের ওপর এই বোঝা চাপানো কখনই উচিত নয়।'

সীমাহীন অসহ্য এই প্রতীক্ষা। অবশেষে ৬ই ডিসেম্বর ১৯০৪, একটি মোটা কাটা বাচ্চা হলো, তার মাথাভরা কুচকুচে কালো চুল—মেয়ের নাম রাখা হলো ইভ।

শান্ত বিচক্ষণ ব্রনিয়ার স্নেহের প্রলেপ পড়ল মারীর অবসন্ন হৃদয়ের ওপর। যাবার সময়ে বোনের মনে কিছু শান্তি আবার ফিরিয়ে রেখে গেল।

নার্সের কোলে নবজাতকের হাসি ও অপরূপ রঙ্গভঙ্গী তরুণী মায়ের প্রাণে আবার নতুন ক'রে বলসঞ্চার করল। ক্ষুদ্র মানবশিশু তার অন্তর স্নেহাপ্লুত করল। ধূসর রঙের একখানা নোট-বইয়ে তিনি আইরিনের বেলায় যেমন করেছিলেন, এর বেলায়ও তেমনি প্রথম দাঁত ওঠা, প্রথম হাঁটা, চলা, সব টুকে রাখলেন। মেয়েটি যেমন যেমন বেড়ে উঠতে লাগল, মায়ের স্নায়বিক দুর্বলতা ততই সেরে আসতে লাগল। শিশুর জন্মের পর বাধ্যতামূলক বিশ্রামে মারী দেহ আর মনে আশ্চর্য রকমের প্রসন্নতা লাভ করলেন। বহুকাল পরে আবার অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ল্যাবরেটারির যন্ত্রপাতি হাতে তুলে নিলেন সেভর-এর ইস্কুলে আবার তাঁকে দেখা গেল।

সাময়িক দ্বিধার পরে আবার তিনি উঠে দাঁড়ালেন, আবার সেই পুরোনো বন্ধুর পথে ফিরে গেলেন।

আবার সব কিছুতে আনন্দ, আগ্রহ, সংসার, ল্যাবরেটারি। তাঁর মাতৃভূমির মুক্তি আন্দোলন সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠলেন ; ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের রুশ বিপ্লব জারের বিরুদ্ধে পোলদের যোগদান তাঁকে উদ্বেল ক'রে তুলল।

২৩শে মার্চ, ১৯০৫—মারী দাদাকে লিখলেন :

'মনে হচ্ছে তোমাদের আশা আছে, এই কষ্টকর পরীক্ষার ফলে দেশের কিছু সুরাহা হবে। ব্রনিয়াও তাই মনে করে। এই আশা যেন ব্যর্থ না হয়। আমি কায়মনোবাক্যে এই আশা করি এবং সর্বদাই এই চিন্তা

আমার মন জুড়ে আছে। যাই হোক, বিপ্লবের সমর্থন করাই যুক্তিসঙ্গত। এই উদ্দেশ্যে কাসিমিরকে কিছু টাকা পাঠাচ্ছি। হায়! এসময়ে আমি তোমাদের কোন কাজে লাগব না।

'এখানে নতুন খবর কিছু নেই। বাচ্চারা মনের সুখে বড় হচ্ছে। ছোট্ট ইভের ঘুম বড় কম এবং জেগে নিজের বিছানায় শুয়ে থাকতে মোটেই সে রাজী নয়। যতক্ষণ না শান্ত হয়, ততক্ষণ তাকে কোলে নিয়ে বেড়াই। এ মেয়ে আইরিনের মতো হয় নি। এর চুল কালো, চোখ নীল। আইরিনের চুলের রঙ এখনও হাল্‌কা আছে। চোখ দুটি সবুজে-খয়েরিতে মেশানো।

'আমরা এখনও সেই বাড়িতেই আছি এবং এখন বসন্তের শুরুতে বাগানটি ভারি সুন্দর হয়েছে। আজকের দিনটি আমাদের ভারী ভাল লাগছে, কারণ, শীত এখানে স্যাঁৎসেঁতে।

'১লা ফেব্রুয়ারি আমি আবার সেভর-এর চাকরিতে ফিরে গেছি। বিকেলে ল্যাবরেটারিতে যাই, আর সপ্তাহে দু'দিন সকালে সেভর-এ যেতে হয়, বাদবাকী সময় বাড়িতেই থাকি। সংসার, মেয়েদের দেখাশোনা করা, পড়ানো, ল্যাবরেটারি—সব মিলিয়ে এত কাজের চাপ যে সামলানো দায়।'

সময় ভাল থাকায় পিয়ের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে শরীরে বল পেলেন, মারীর মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল। বহুদিন ফেলে-রাখা একটি কর্তব্য এবার না করলেই নয়, স্টক্‌হলম-এ গিয়ে বক্তৃতা দিতে হবে।

১৯০৫-এর ৬ই জুন স্টকহল্‌ম-এর বিজ্ঞান-আকাদেমির সামনে মারী ও নিজের তরফ থেকে পিয়ের কুরী রেডিয়মের উপর এক বক্তৃতা দিলেন। তিনি রেডিয়মের গুণাবলী নিয়ে আলোচনা ক'রে পদার্থবিদ্যার বলবিদ্যা বিভাগের মূল আদর্শগুলিকে কি ভাবে রেডিয়ম বহুল পরিমাণে পরিবর্তন করেছে তা দেখিয়ে দিলেন।

রসায়নে—তেজস্ক্রিয়তার উৎস মূল সন্ধানে দুঃসাহসিক অনুমান করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

ভূতত্ত্ব ও আবহাওয়া-বিদ্যায়—এতাবৎ কাল দুর্বোধ্য এক প্রাকৃতিক রহস্য উদ্‌ঘাটিত করেছে।

জীববিদ্যায়—ক্যানসারে জীর্ণ কোষগুলির উপর রেডিয়মের উপকারিতা।

রেডিয়ম মানব জ্ঞানকে সমৃদ্ধ, কল্যাণকে জাগ্রত করেছে। কিন্তু এর দ্বারা কি কোন অকল্যাণ সাধিত হতে পারে না?

'মনে হওয়া স্বাভাবিক,' (পরিশেষে পিয়ের বলেন:) 'অসাধু হাতে রেডিয়ম সাংঘাতিক রূপ নিতে পারে এবং আমরা এখানে নিজেদের জিজ্ঞেস করতে পারি প্রকৃতির গোপন কথা জেনে মানুষ লাভবান হলো কিনা, না তার পক্ষে ক্ষতি হলো। নোবেলের আবিষ্কার এক্ষেত্রে চমৎকার উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে: শক্তিমান বিস্ফোরক মানুষকে অপূর্ব সব কাজ করার সুযোগ ক'রে দিয়েছে। আবার এই একই বস্তু শয়তানের হাতে প'ড়ে মানুষকে যুদ্ধের মতো নৃশংসতার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে।

'নোবেলের সঙ্গে আমি এখানে একমত, নব নব আবিষ্কারে পৃথিবী অকল্যাণের তুলনায় কল্যাণকেই পাবে অনেক বেশী পরিমাণে।'

সুইডেনের বৈজ্ঞানিক মহল থেকে যে স্বাগত জানাবার ব্যবস্থা ছিল, তাতে কুরী-দম্পতি খুশি হলেন। এতদূর এসে তাঁরা ভিড়ের আশঙ্কা করেছিলেন। কিন্তু বিচক্ষণ ভাবে পরিচালিত ব্যবস্থাটি চমৎকার মনোজ্ঞ হয়েছিল। কোন ভিড় ছিল না। অল্প কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাবেশ শুধু। পিয়ের ও মারী ইচ্ছেমতো দেশটি দেখে বেড়ালেন, বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে তৃপ্ত চিত্তে ঘরে ফিরে এলেন।

২৪শে জুলাই ১৯০৪, পিয়ের বন্ধু জর্জ গোয়াকে লিখলেন:

'...সম্প্রতি সস্ত্রীক আমি সুইডেনে বেশ ভাল ভাবে কাটিয়ে এলাম। সবরকম দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে খানিক বিশ্রামের অবকাশ পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। জুন মাসে স্টকহল্‌ম-এ প্রায় কোন লোক ছিল না, সেই জন্য সরকারি ব্যাপারগুলো সহজেই সেরে নেওয়া গিয়েছিল।

'সুইডেনে হ্রদ আর সমুদ্রের প্রসারিত বাহুর মেলা, তারই মাঝে মাঝে জমির ফালির ওপর পাইনের সমারোহ, নুড়ি পাথর, লালকাঠের বাড়ি...। প্রায় আগাগোড়া একই দৃশ্য কিন্তু ভারি সুন্দর আর শান্ত। আমাদের যাত্রাকালে রাত বলতে কিছু ছিল না.. এক হৈমন্তিক সূর্য সারাক্ষণ চারদিক আলো ক'রে ছিল।

'আমাদের বাচ্চারা ও বাবা ভালই আছে, আমি এবং আমার স্ত্রী বেশ আছি যদিও ক্লান্তি ভাবটা আমাদের মধ্যে সহজেই আসে।

বুলেভার্দ কেলরমান্‌-এর বাড়িতে বাইরের জগতের দৃষ্টি এড়িয়ে পিয়ের ও মারী এমনি সহজ জীবন যাপন করতেন। যা নইলে নয়, সংসারের কাজ ততটুকুতে গুটিয়ে আনা হলো। ঠিকে ঝি ভারী কাজ সেরে দিত, বাকী কাজের জন্য আরেকজন স্ত্রীলোক ছিল, রাঁধাবাড়া সেই সব ক'রে দিত। এই আশ্চর্য মনিব ও মনিব-পত্নীর মুখের দিকে চেয়ে বৃথাই সে অপেক্ষা ক'রে মরত, হয়তো

রোস্ট, বা আলুর তরকারির সুস্বাদুতা নিয়ে দুটো প্রশংসার কথা এঁদেরই মুখ থেকে সে শুনবে।

শেষে একদিন আর অপেক্ষা করতে না পেরে বেচারী ভালমানুষ-স্ত্রীলোকটি পিয়ের-এর সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করল : 'এইমাত্র যে বিফ্‌স্টিক্‌টুকু তৃপ্তি ক'রে খেলেন, সেটা কেমন রান্না হয়েছে?' কিন্তু উত্তর শুনে বেচারী আরও বেশী ঘাবড়ে গেল। বৈজ্ঞানিক বললেন : 'আমি কি বিফ্‌স্টিক খেলাম?' তারপর সান্ত্বনার সুরে বললেন : 'বোধহয় খেয়েছি!'

যখন খাটুনি বাড়ত তখনও মেয়েদের যত্নের জন্য মারী সময় ক'রে নিতেন। কাজের চাপে ঝি-চাকরের ওপর ভরসা করতে হতো বটে, কিন্তু যতক্ষণ না দেখতেন আইরিন আর ইভ ভাল ক'রে খেয়ে ঘুমিয়েছে, তাদের স্নান করানো, চুল আচড়ানো ঠিক মতো হচ্ছে, সর্দি বা অন্য কোন অস্বস্তি নেই, ততক্ষণ স্বস্তি পেতেন না। আসলে তিনি যদি এর চেয়ে কিছু কমও করতেন, আইরিন ঠিক মনে করিয়ে দিতে পারত। তার যথেষ্ট পছন্দ-অপছন্দ বোধ ছিল। শুধু এতটুকু বাচ্চার দেখা-শোনা করা ছাড়াও মাকে কি ক'রে দখল করতে হয়, সে-জ্ঞান তার টনটনে। শীতের দিনে মারী পারীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে, খুঁজে খুঁজে যে বিশেষ আপেল আর কলা যা তাঁর কন্যা ভালোবাসে তাই নিয়ে আসতেন। সে-সব না নিয়ে বাড়ি ফেরার সাহস তাঁর ছিল না।

সারা সন্ধ্যা ড্রেসিং গাউন আর চটি পরে, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ইত্যাদির আলোচনা ক'রে, নোট-বইয়ের জটিল অঙ্কের মধ্যে তাঁদের সময় কেটে যেত। উপরন্তু চিত্র-প্রদর্শনীতে তাঁদের দেখা মিলত বছরে সাত-আটবার দু'ঘণ্টা ক'রে, কনসার্ট শুনতেও তাঁরা যেতেন মাঝে-মধ্যে।

সে-যুগে পারীতে অনেক শক্তিমান শিল্পী ছিলেন। পিয়ের ও মারী মাঝে মাঝে ইলিয়ানোরা ডিউসের অভিনয় দেখতে যেতেন। জ্যুলিয়া বার্তে ও জান্ গ্রানিয়ে'র স্বাভাবিক অভিনয় অথবা লুসিয়ঁ্যা গিত্রীর অপূর্ব দক্ষতা, মুনে স্যুলী ও সারা বের্নার্ড-এর কলাকৌশলের চেয়ে তাঁদের অনেক বেশী অভিভূত করল।

চিরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকেরা যা পছন্দ ক'রে এসেছেন, এঁরাও সেই 'প্রগতিশীল' প্রযোজনাগুলিকেই সমর্থন করতেন। থিয়েটার দ্য লুভ্-এ স্যুজান দেপ্রে ইবসেনের নাটক অভিনয় করেছিলেন এবং ল্যুঞে পোয়ে 'দি পাওয়ার-অব-ডার্কনেস' মঞ্চস্থ করেছিলেন। এইসব অভিনয় দেখে পিয়ের ও মারী তৃপ্ত মনে বাড়ি ফিরে আসতেন এবং বেশ কিছুদিন ধরে তাঁদের মনের ওপর

একটা বিষণ্ণতার ছাপ পড়ে থাকত। ঈষৎ হেসে বৃদ্ধ ডাক্তার কুরী তাঁদের দোর খুলে দিতেন। ভলটেয়ার-পন্থী এই বৃদ্ধ বিবাদবাদের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি এঁদের করুণ মুখের ওপর নীল রঙের চোখ দুটি রেখে সর্বদাই ঠাট্টার সুরে কথা বলতেন: 'ভুলে যেও না, তোমরা সেখানে আনন্দ করতে গিয়েছিলে।'

চিরন্তন বৈজ্ঞানিক-কৌতূহলের সঙ্গে রহস্যের প্রতি আকর্ষণ—এই দুয়ে মিলে এই সময়ে কুরীদের এক আশ্চর্য পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল: ইউসাপিয়া পালাডিনা নামে এক নামকরা মধ্যস্থের সাহায্যে অশরীরী কাণ্ডকারখানায় এক বৈঠক বসত। তাঁরা সেখানে যোগ দিতে নয়, দর্শক হিসেবে গেলেন। চেতনার রাজ্যে এদের এই কার্যকলাপের পরিচয় লাভই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। বিশেষ ক'রে পিয়ের-এর এ বিষয়ে দারুণ আগ্রহ ছিল এবং অন্ধকারের ভেতর তিনি এইসব কাল্পনিক অথবা বাস্তব পদার্থগুলির অস্তিত্ব অনুভব করবার চেষ্টা করতেন।...

তাঁর নিরপেক্ষ অন্তর এই জাতীয় কাণ্ডকারখানা দেখে বিশেষ বিচলিত হয়েছিল। ল্যাবরেটারির পরীক্ষার মতো এখানে ছিল না কোন কঠিন নিয়মের বা নিষ্ঠার বালাই। কখনও কখনও মধ্যস্থ ব্যক্তি আশ্চর্য ফল পেতেন এবং দুই বৈজ্ঞানিক এদের কার্যকলাপে প্রায় আস্থা স্থাপন ক'রে ফেলেছিলেন। হঠাৎ এক বৈঠকে এদের মিথ্যাচার বিশ্রীরকম ভাবে ধরা পড়ে গেল। কিছু-দিনের মধ্যেই মারীরা এ বিষয়ে ভাবনা চিন্তা একেবারে পরিত্যাগ করেন।

পিয়ের ও মারী নিমন্ত্রণ ইত্যাদি এড়িয়ে চলতেন, সামাজিক কোন ব্যাপারে তাঁদের কখনও দেখা যেত না। কিন্তু বিদেশী বৈজ্ঞানিকদের সম্মানার্থে যে-সব ডিনার বা পার্টির আয়োজন হতো সে-সব তাঁরা বিশেষ বাদ দিতেন না। সুতরাং মাঝে মাঝে পিয়েরকে তাঁর প্রাত্যহিক ব্যবহারের মোটা পশমের স্যুট ছেড়ে সান্ধ্য-পোশাক পরতে হতো এবং মারীকে তাঁর একমাত্র সান্ধ্য-সজ্জায় সাজতে হতো।

এই একই পোশাক মারী বছরের পর বছর তুলে রাখতেন; মাঝে মাঝে সাধারণ কোন দরজীকে দিয়ে সামান্য অদল-বদল ক'রে নিতেন। পোশাকটি ছিল রেশম ও পশমে মেশানো কালো কাপড়ে তৈরি, গলায় আর কব্জির কাছে হালকা রেশমী মগজির ওপর পাতলা কাপড়ের ফ্রিল তোলা, কিংবা খুব বেশী বাড়াবাড়ি হলো তো কালো ভেলভেট ছোঁয়ানো সাদা 'শাঁতিলী' লেস্। যে-কোন সৌখিন মেয়ে এ হেন পোশাকের দিকে ফিরেও তাকাবে না, কিন্তু

মারী ক্যাপানও জানতেন না, এদিকে তাঁর পছন্দ-অপছন্দের কোন বালাইও ছিল না। কিন্তু যে বিচারবুদ্ধি এবং গাম্ভীর্য ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, তারই সাহায্যে তিনি সাধারণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পেতেন এবং তাঁর পোশাকের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকত। অতি অসুন্দর ল্যাবরেটারির আলখাল্লা-খানা ছেড়ে সান্ধ্য-পোশাক পরে যখন তিনি রূপোলী রঙের চুলগুলি টেনে মাথার উপর চুড়ো বাঁধতেন এবং সসঙ্কোচে হালকা কাজ-করা সোনার নেকলেসটি গলায় পরতেন, তখন তাঁকে সত্যই অপরূপ দেখাত। সুতনু ও প্রতিভাদীপ্ত মুখশ্রীর সমস্ত সৌন্দর্য যেন হঠাৎ প্রকাশিত হয়ে পড়ত। ফর্সা মস্ত বড় কপালের নীচে উজ্জ্বল দু'খানি চোখ মেলে মারী যখন দাঁড়াতেন, তখন অন্যান্য মহিলাদের সৌন্দর্য ভাটা পড়ত না নিশ্চয়ই, কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেককেই অশালীন ও নির্বোধ দেখাত।

এক সন্ধ্যায় এমনি বেরোবার সময়ে অস্বাভাবিক মনোযোগ সহকারে পিয়ের মারীর নিরাবরণ কণ্ঠ, নিরাভরণ পেলব বাহু দুটি লক্ষ্য ক'রে দেখলেন। আকণ্ঠ বিজ্ঞানে নিমজ্জিত ভদ্রলোকের মাথার ওপর দিয়ে অনুতাপের ছায়া খেলে গেল। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললেন: 'সান্ধ্য-পোশাকে তোমায় এত সুন্দর মানায়!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললেন: 'কিন্তু উপায় কি, সময় কোথায় আমাদের?'

হঠাৎ কখনও যদি কয়েকজনকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করা হলো, তাহলে খাবার যাতে ভাল হয়, আর বাড়িটা পরিপাটি থাকে, সেদিকে মারী সজাগ থাকতেন। বছরের প্রথম ফলে-বোঝাই ঠেলাগাড়ির ভিড়ে এবং রু-ম্যুফের্তার-এর আনাজ-বাজারে ঘুরে ঘুরে বাছাই ক'রে ফল কিনতেন। মাখনের দোকানীকে বিভিন্ন পনিরের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে গভীরভাবে প্রশ্ন করতেন। ফুলওয়ালার ঝুড়ি থেকে থোকা থোকা গোলাপ, টিউলিপ, লাইল্যাক বেছে কিনতেন…বাড়ি ফিরে বোকে গড়তে বসতেন। এদিকে রাঁধুনি সেদিন স্বেচ্ছায় কতগুলি ভাল ভাল পদ রান্না ক'রে রাখত, পাড়ার মেঠাইওয়ালা সাড়ম্বরে কিছু আইসক্রিম দিয়ে যেত। এই কাজের বাড়িতে অতি সাধারণ ব্যাপারেও বেশ সাড় সাড় পড়ে যেত। শেষ মুহূর্তে মারী একবার টেবিলটা দেখে নিয়ে আসবাবপত্র যথাস্থানে সাজিয়ে রাখতেন।

কারণ শেষ পর্যন্ত কুরী-পরিবারে কিছু আসবাব এসে জুটে গিয়েছিল। চেয়ার ও কিছু আসবাব যেগুলি রু-দে-লা গ্লেসিয়ের্-এ প্রবেশাধিকার পায় নি, বুলেভার্দ কেলরমান্-এ তাদের অনায়াসে স্থান হলো। হালকা রঙের দেয়াল-

কাগজে মোড়া বসার ঘরে ফিকে সবুজ ভেলভেটে ঢাকা খোদাই কাজের মেহগনি সোফাগুলি এবং রেস্টোরেশন্‌-আমলের আরাম-কেদারাগুলি ভারি সুন্দর মানিয়েছিল। এই সোফাগুলির একটি আইরিনের বিছানার জন্ম ব্যবহার হতো। কিন্তু এই সাদামাটা শান্ত ঘরে দু'খানা উঁচু বইয়ের তাকের ভেতর মোটা মোটা বাঁধাই বই সারি সারি সাজানো থাকত, তাদের গায়ে লেখা : "*Treatise on Physics*" এবং "*Differential and Integral Calculus.*"

অতিথি বলতে বিদেশী কোন বৈজ্ঞানিক বন্ধু পারীর ভেতর দিয়ে যাবার সময় হয়তো দেখা ক'রে গেলেন, কিংবা পোল দেশের কেউ মারীকে দেশের খবর দিতে এলেন। মাদাম কুরী কখনও কখনও লাজুক মেয়ে আইরিনকে খুশি করার জন্ম বাচ্চাদের পার্টি দিতেন : মালা দিয়ে, রঙিন মোমবাতি দিয়ে, রঙ করা বাদাম দিয়ে ক্রীস্‌মাস্‌-ট্রি সাজিয়ে দিতেন—বহুদিন পর্যন্ত বাচ্চাদের মনে এই সব স্মৃতি জেগে থাকত।

মাঝে মাঝে বাড়িতে আলোর গাছের চেয়েও চমৎকার ম্যাজিকের বন্দোবস্ত হতো। আলোকসজ্জার ব্যবস্থাপকরা মঞ্চে আলো ফেলার যন্ত্র আর বৈদ্যুতিক আলো সাজিয়ে নিতেন, তারপর খাওয়া হয়ে গেলে সবারই সামনে নাচতেন। নাচতে নাচতে আলো-ব্যবস্থাপনার কৌশলে একবার তাঁকে অগ্নিশিখাময় তন্বী, আবার পরক্ষণেই ফুলবালা আবার হঠাৎ এক দেবী কিংবা ডাকিনীর মতো দেখাত।

এই নর্তকীর নাম লোয়া-ফ্যুলে, এই "আলো-পরী"র নৃত্যকলায় সারা পারী তখন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কুরীদের সঙ্গে অদ্ভুত ভাবে এঁর ভাব হয়ে যায়। খবরের কাগজে রেডিয়মের আলোকশক্তির কথা পড়ে ফলীবের্জের-এর এই তারকা এক আশ্চর্য আলোকজ্জ্বল অনুপ্রভ-পোশাকের কথা কল্পনা করলেন, যার দ্বারা দর্শকমণ্ডলীকে তিনি বিস্ময়ে স্তব্ধ ক'রে দিতে সক্ষম হবেন। তিনি কুরীদের কাছে চিঠি লিখলেন। তাঁর সুচতুর পত্রের উত্তরে কুরী-দম্পতি মৃদু হেসে তাঁকে জানালেন যে : 'রেডিয়মের প্রজাপতি-ডানার সাহায্যে তাঁর কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হওয়া অসম্ভব নয়।'

প্রতি রাত্রে এই মার্কিন নর্তকী উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়ে থাকেন। কুরীদের চিঠি নিয়ে তিনি বড়াই ক'রে বেড়ালেন না এবং তাঁর নাচ দেখে অন্যান্যের সঙ্গে প্রশংসায় যোগদান করতে কুরীদের আহ্বানও জানালেন না। তিনি মারীকে শুধু লিখলেন : 'একটিমাত্র উপায়ে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাতে পারি।

একদিন আপনার বাড়িতে আপনাদের দু'জনের সামনে আমার নাচ দেখাবার অনুমতি দিন।'

পিয়ের ও মারী রাজী হলেন। সস্তা পোশাক পরা একটি মেয়ে শিশুর মতো সরল দুটি চোখ আর প্রসাধন-হীন "কালমুক্" মুখ নিয়ে তাঁদের দোরে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে এল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নিয়ে একদল যান্ত্রিক। একটু বিপন্ন বোধ ক'রে কুরীরা ঘরখানা আগন্তুকদের ছেড়ে ল্যাবরেটারিতে আশ্রয় নিলেন। তাঁদের ছোট্ট খাবার ঘরে অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য আলোর বিভিন্ন যোগাযোগ ইত্যাদি নিয়ে ভানুমতী ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরিশ্রম ক'রে কাটালেন।

গেটের কড়া পাহারার ভেতর ছোট্ট বাড়িতে 'সুরের জগত থেকে এক দেবী' নেমে এলেন। লোয়া'র মনটি ছিল ভারি নরম। মারীর প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা—যে-শ্রদ্ধা প্রতিদানে কিছু চায় না, শুধু সেবা ক'রে খুশি হয়। এঁদের বুলেভার্দ কেলরমান্-এর বাড়িতে আগের মতোই নিরিবিলিতে এসে তিনি আরও অনেকবার নাচ দেখিয়ে গেছেন। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার পর মারী এবং পিয়ের তাঁর বাড়িতেও দেখা করতে গিয়েছেন। তাঁরই ওখানে অগস্ট রোডিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং পরবর্তীকালে তা' বন্ধুত্বে পরিণত হয়। এই সময়ে মাঝে মাঝে ভাস্করের স্টুডিওতে, মাটি ও মার্বেলের পরিবেশের মধ্যে পিয়ের ও মারী, লোয়া-ফুলে আর রোডিনকে শান্তভাবে গল্প করতে দেখা যেত।

সাত আটজন অন্তরঙ্গ বন্ধু বুলেভার্দ কেলরমান-এ সর্বদাই যাতায়াত করতেন, আদ্রেঁ দ্বিবিয়েরন, জঁ্যা-পেরিন্ ও তাঁর স্ত্রী—ইনি হলেন মারীর সব চেয়ে অন্তরঙ্গ বান্ধবী; জর্জ উ্যর্বঁ্যা পল্ ল্যাঙেভিন্ এমে কতঁ, জর্জ সানিঞ্র, চার্লস এডুয়ার্ড গুইলোম, সেভর ইস্কুলের কয়েকজন ছাত্রী—এঁরা সবাই বৈজ্ঞানিক।

রবিবার বিকেলে দিন ভাল থাকলে এঁরা বাগানে বসতেন, ইভের বেবি-গাড়ির পাশে হাতের-কাজ নিয়ে বসতেন মারী। রিপুর কাজ করতে করতে আলোচনায় তিনি যোগ দিতেন। অন্য কোন মহিলার পক্ষে এ আলোচনা দুর্বোধ্য ঠেকত।

এই সময়ে সবচেয়ে প্রচলিত যে আলোচনা এঁদের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াত সেটি হলো 'এল্ফা, বিটা ও গামা' রেডিয়ম-রশ্মির আশ্চর্য প্রকাশ। পেরিন,

উয়র্ব্যাঁ, স্থবিয়েয়্ন রেডিয়মের শক্তির উৎসসন্ধানের গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে হলে, হয় কারনটের নিয়মাবলীকে জলাঞ্জলি দিতে হতো কিংবা শক্তি সঞ্চয় বা উপাদান সঞ্চয়ের নিয়মগুলিকে বাতিল করতে হতো। পিয়ের রেডিও-এ্যাক্‌টিভ রূপান্তরের অনুমান প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে উয়র্ব্যাঁ বিস্ময়ে চিৎকার ক'রে উঠলেন। তিনি একথায় কানই দিতে চাইলেন না, নিজের মতটাই আঁকড়ে ধরে রইলেন আর সানিঞ-ই বা কি করছিলেন? রেডিয়মের আণবিক ওজন নিয়ে মারীর গবেষণার ফলই বা কি দাঁড়াল?

রেডিয়ম, রেডিয়ম, রেডিয়ম! এই যাদু শব্দটি দশ কুড়িবার উচ্চারিত হতো তারপর একজনের থেকে আর-একজন—এমনি ক'রে মুখে মুখে চলতে থাকত। মাঝে মাঝে মারীর মনে কষ্ট হতো। অদৃষ্টের ফেরে রেডিয়ম এমনি একটি অতুলনীয় পদার্থ হয়ে উঠল। অথচ কুরীদের প্রথম আবিষ্কার 'পোলো-নিয়ম' শুধুমাত্র দ্বিতীয় পর্যায়ের কৌতূহলের বিষয় হয়েই রইল! দেশ-প্রেমিকা মারী মাতৃভূমির নামানুসারে এর নামকরণ করেছিলেন, রেডিয়মের মতো যশ এর ভাগ্যেও জুটে যাক, এই আশাই তিনি করেছিলেন।

উচ্চস্তরের এই সব কথাবার্তার মাঝে সময় সময় অনেক ঘরোয়া কথাও হতো। বৃদ্ধ ডাক্তার ইউজিন কুরী স্থাবিয়েয়্ন এবং ল্যাঙেভিন্‌-এর সঙ্গে রাজনীতি আলোচনা করতেন; ছাঁটকাটের বালাইহীন পোশাক ও সবরকম চপলতার প্রতি বিতৃষ্ণার জন্য উয়র্ব্যাঁ বন্ধুর মতো মারীকে শাসন করতেন। তরুণী মারী এ হেন অপ্রত্যাশিত বক্তৃতায় বিস্ময়ে নীরব হয়ে যেতেন। জঁ্যা পেরিন্‌ অণু-পরমাণুর "অনন্তক্ষুদ্রতা"কে বিসর্জন দিয়ে উদ্ভাসিত মুখখানা আকাশের দিকে তুলে বিশুদ্ধ "হ্বাগনারিয়" কায়দায় 'রেইনগোল্ড' অথবা 'মিস্টারসিঙ্গা' গেয়ে যেতেন। বাগানের অপর প্রান্তে মাদাম পেরিন তাঁর ছেলে মেয়ে এলিন ও ফ্রান্সিস্‌-এর সঙ্গে আইরিন ও তার খেলার সাথীদের পরীর গল্প শোনাতেন।

এই পেরিন ও কুরী-পরিবার প্রত্যহ পরস্পরের খোঁজ খবর নিতেন। পাশা-পাশি বাড়ি, গোলাপঝাড়ে ঢাকা একখানা রেলিং আর দু' খানা বাগান দিয়ে মাত্র বিচ্ছিন্ন ছিল। যখন আইরিনের বন্ধুদের বিশেষ গোপন কথা বলার দরকার হতো তখন সে তাদের সেই রেলিং-এর কাছে ডাক দিত। যতদিন না তারাও বড়দের মতো পদার্থবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারল, ততদিন এই মরচে-ধরা লোহার বেড়ার ফাঁক দিয়ে চকোলেটের টুকরো, খেল্‌না আর মনের কথার আদান প্রদান চলত।

"বড়রা" বিশেষতঃ পিয়ের ও মারী নানারকম চিন্তায় ডুবে থাকতেন। কুরীদের সামনে নতুন যুগ দেখা দিল, ফ্রান্স তাঁদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তাঁদের প্রচেষ্টাকে সাহায্য করার কথা ভাবতে শুরু করল।

এবং এই কাজে প্রথম পদক্ষেপ হবে পিয়েরকে বিজ্ঞান-আকাদেমির সদস্য পদে আহ্বান করা। আবার একবার বিজ্ঞান-আকাদেমির সৌরমণ্ডলী প্রদক্ষিণ ক'রে বেড়াবার কষ্ট পিয়েরকে স্বীকার করতে হলো। তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা ভয় পেলেন পাছে বৈজ্ঞানিক আবার আকাদেমি-সদস্যদের প্রতি 'যোগ্য-পাত্রে'র উপযুক্ত ব্যবহারে ত্রুটি রেখে দেন, সেজন্য উদ্বিগ্ন বন্ধুদের উপদেশ বর্ষণ শুরু হলো।

১৯০৫-এর ২২শে মে ই. মাস্‌কার পিয়েরকে লিখলেন :

'প্রিয় বন্ধু কুরী,—

'...জানা কথা যে, তালিকার মাথায় তোমারই নাম আছে এবং তেমন কোন প্রতিযোগীও দেখছি না ; কাজেই তোমার নির্বাচন সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

'যাই হোক, সাহসে ভর ক'রে আকাদেমির সভ্যদের বাড়ি বাড়ি আর-একবার ঘুরে দেখা ক'রে এস, বাড়িতে যদি কারুর দেখা না পাও, তোমার কার্ডের একটা কোণ ভেঙ্গে রেখে এস। সামনের সপ্তাহে শুরু ক'রো, দিন পনেরোর মধ্যে সারতে পারবে।'

২৫শে মে ই. মাসকার পিয়েরকে আবার লেখেন :

'প্রিয়বন্ধু কুরী,—তোমার যেমন সুবিধে সেই মত সেরে ফেল, কিন্তু ২০শে জুনের আগে আকাদেমির সভ্যদের একবার শেষ দেখা দেবার কষ্ট তোমায় স্বীকার করতেই হবে। যদি দিনের বেলা একখানা মোটর গাড়ি ভাড়া করতে হয়, তাই-ই করতে হবে।

'আদর্শ হিসেবে তোমার যুক্তি অকাট্য সন্দেহ নেই, কিন্তু চল্‌তি নিয়মের যুপকাষ্ঠে মানুষকে কিছুটা ছাড়তে হয় যে! তাছাড়া আরেকটা কথাও ভেবে দেখো, ইন্‌স্টিটিউট-এর সভ্য হিসেবে তুমি সবাইকে অনেক বেশী সাহায্য করতে পারবে।'

১৯০৫-এর ৩রা জুলাই পিয়ের কুরী আকাদেমিতে প্রবেশ করেন, কিন্তু তাও কোনরকমে। বাইশ জন বৈজ্ঞানিক শুধুমাত্র তাঁকে সমপর্যায়ে উঠবার আশঙ্কায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মঁসিয়ে গার্নেজকে ভোট দিয়েছিলেন।

২৪শে জুলাই ১৯০৫, জর্জ গোয়াকে পিয়ের লেখেন :

'আকাদেমিতে এসে বুঝতে পারছি যে, আমিও এখানে আসতে চাই নি,

আর এরাও আমায় চায় নি। আমি একবার মাত্র বাড়ি বাড়ি দেখা করতে গিয়েছিলাম। যাদের সাক্ষাৎ পাইনি তাঁদের বাড়িতে কার্ড রেখে এসেছিলাম। আর, সবাই বলেছিলেন যে পঞ্চাশটি ভোট আমার বলে বাঁধাই আছে। বোধহয় সেই কারণেই সামান্য এতটুকুর জন্য আমার সুযোগটা ফসকে যাচ্ছিল!

'...এর কি মূল্য আছে বলতে পার? এখানে ষড়যন্ত্রের চক্র-ঘূর্ণি ছাড়া এক পা চলার উপায় নেই। কৌশলে গড়ে-তোলা একটি উপদলের ক্রিয়াকলাপ ছাড়াও আমি এখানকার কেরানী কুলের এবং যারা মনে করে আমি যথেষ্ট তোষামোদ করি নি—তাদেরও সহানুভূতির অভাব দেখলাম। এস—আমায় প্রশ্ন করেছিল—কোন্ কোন্ সভ্যের ভোট আমি আশা করছি। আমি বললাম যে সে-কথা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, তবে আমি কাউকে ভোট দিতে অনুরোধ করি নি। তার উত্তরে সে কি বললে জানো: ও! বুঝেছি, তুমি তার দরকার মনে করোনি!...তার মতে আমি নাকি অহংকারী!'

৬ই অক্টোবর ১৯০৫, পিয়ের জর্জ গোয়াকে আবার লিখলেন:

'...সোমবারে ইন্‌স্টিটিউটে গিয়েছিলাম, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কি যে সেখানে করেছি তা আমি নিজেই জানি না। অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আমার কিছুই করবার নেই এবং মিটিংগুলোর কোন কার্যকরী উদ্দেশ্যও আমি দেখি না। বেশ বুঝতে পারছি যে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আমার কোন স্থান নেই।'

১৯০৫ অক্টোবর—পিয়ের জর্জ গোয়াকে আবার লিখলেন:

'আমি আজ অবধি আকাদেমির উদ্দেশ্য খুঁজে পেলাম না।'

এই সম্মানিত পণ্ডিত-গোষ্ঠীর প্রতি মনোভাব যেমনই থাকুক, তাঁর সম্বন্ধে ইউনিভার্সিটির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সজাগ ছিলেন; কারণ তাঁর কাজ এঁদের ওপর নির্ভর করছিল। ১৯০৪-এর প্রারম্ভে অধ্যক্ষ লিয়ার্ড তাঁর জন্য পদার্থবিদ্যা বিভাগে একটি আসনের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। এতদিনের আশা পূর্ণ হলো, অধ্যাপকের আসন পাওয়া গেল কিন্তু সেও নামেমাত্র। কাজে যোগ দেবার আগে পিয়ের জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর ল্যাবরেটারিটা কোথায় হবে?

'ল্যাবরেটারি? ল্যাবরেটারি আবার কি? ল্যাবরেটারির কথা ওঠে কোথা থেকে?'

সেই মুহূর্তেই নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত রেডিয়মের আবিষ্কারক বুঝতে পারলেন যে পি. সি. এন্-এর চাকরি ছেড়ে সরবনে পড়াতে গেলে তাঁর পক্ষে আদৌ কোন কাজ করা সম্ভব হবে না। এখানে অধ্যাপককে কাজের জন্য কোন স্থান দেওয়া হবে না, ওদিকে পি. সি. এন্-এ যে দুটি ঘর ব্যবহার

কর্মাইলেন সে-দুটিও স্বাভাবিক ভাবেই নতুন লোকের হাতে চলে যাবে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কাজের স্থান তখন হবে উন্মুক্ত রাজপথে।

ভাষার অভাব তাঁর ছিল না, সহজ বিনয়ের সঙ্গে সুদৃঢ় মনোভাব বহন ক'রে চিঠি চলে গেল : এরা তাঁকে না দিল ঘর, না দিল গবেষণার সাহায্যের জন্য যথেষ্ট অর্থ। এমন চাকরিতে তাঁর প্রয়োজন কি? এর চেয়ে পি. সি. এন্-এর গাধার খাটুনিও সহ্য করা ভাল, কারণ সেই ছোট্ট জায়গায় মারীর সঙ্গে যেমন ক'রে হোক্ কাজ তো তিনি করেই যাচ্ছিলেন।

গুজব যেমন ছড়ায়, এক্ষেত্রেও সেই ভাবেই ছড়িয়ে গেল। তারপর মস্ত কিছু করছি এই রকম ভাব দেখিয়ে ইউনিভার্সিটি একখানা ল্যাবরেটারি করার জন্য চেম্বার-অব-ডেপুটির হাতে একশত পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক ধার্য ক'রে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। সরবনে পিয়েরকে দেবার মতো জায়গা অবশ্য কোন মতেই হতে পারে না, রু্য-কুভিয়েরেই দু'খানা ঘর তৈরি হবে। ম'সিয়ে কুরীকে বাৎসরিক বারো হাজার ফ্রাঙ্ক ধার দেওয়া হবে, উপরন্তু তৈরি করার খরচ বাবদ আরও পঁয়ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক তিনি পাবেন।

পিয়ের সরল মনে ভেবেছিলেন যে "তৈরি করার খরচ" মানে যন্ত্রপাতি কিনে ল্যাবরেটারিখানা সম্পূর্ণ কাজের উপযোগী ক'রে নিতে তিনি পারবেন। হ্যাঁ—তা তিনি পারেন বৈকি, তবে এই নতুন ঘরের দাম আগে ঐ ক'টি টাকা থেকে শোধ দিয়ে তারপর। কর্তাদের চোখে দু'খানা ঘর তৈরি আর "ল্যাবরেটারি তৈরির খরচ" একই কথা!

এই ভাবে সরকারের পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে গেল।

৩১শে জানুয়ারি জর্জ গোয়াকে পিয়ের লেখেন :

'পি. সি. এন.-এর দুখানা ঘরে আমরা কাজ করি, সে-দুটি আমারই আছে আর এঁরা আঙিনার মাঝে আরও দুখানা ঘর আমার জন্যে তৈরি ক'রে দিচ্ছেন, যার দাম দাঁড়াবে কুড়ি হাজার ফ্রাঙ্ক; এই টাকাটা এঁরা আমার যন্ত্র কেনার টাকা থেকে কেটে নেবেন।'

১৯০৫-এর ৭ই নভেম্বর পিয়ের জর্জ গোয়াকে আবার লেখেন :

'আজ থেকে আমি পড়াতে শুরু করলাম, কিন্তু হাতে ক'রে পরীক্ষা করতে হলেই কাজ ঠেকে যায়, কারণ সরবনে বক্তৃতা আর রু্য-কুভিয়েরে আমার ল্যাবরেটারিতে পরীক্ষার কাজ। তাছাড়া এই একই ঘরে আরও অনেকগুলি বক্তৃতা চলে, কাজেই আমি মাত্র একদিন ঘরখানা ব্যবহার করতে পাই।

'আমার শরীর যে খুব ভাল—তা বলা যায় না। দেখছি যে বড় সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়ছি, যৎসামান্য কাজের ক্ষমতা আমার মধ্যে অবশিষ্ট আছে। আমার স্ত্রী কিন্তু বাচ্চাদের দেখাশোনা, সেভর ইস্কুল আর ল্যাবরেটারির খাটুনি সব মিলিয়ে দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি এক মিনিটও সময় নষ্ট করেন না, ল্যাবরেটারির কাজে আমার চেয়ে অনেক বেশী নিয়মিত এগিয়ে যাচ্ছেন, সেখানেই তাঁর দিনের বেশী সময় কাটে।'

অতিমন্দ গতিতে সরকারি পদভূষিত অফিসার মহলে পিয়ের কুরীর আসন পাকা হয়ে এল। একটি একটি স্কোয়ার-ফুট ক'রে কক্ষের ঘরগুলি তাঁকে আদায় ক'রে নিতে হলো: অপ্রশস্ত দু'খানি ঘর মাত্র।

এ হেন বিসদৃশ অবস্থায় এক ধনী মহিলা কুরী-দম্পতিকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন এবং নির্জন শহরতলীতে একখানা বাড়ি তৈরি করার কথা বললেন। ভরসা পেয়ে পিয়ের তাঁর কাছে নিজের মনের ইচ্ছা খুলে বললেন।

মাদাম হ—কে পিয়ের চিঠি লিখলেন (৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯০৬):

'মাদাম,—

'আমার স্বপ্নের ল্যাবরেটারি সম্বন্ধে আপনি চিঠির ভেতর পাবেন। এর সবটুকু যে হতেই হবে, তা নয়, আমাদের হাতে কতটা জায়গা, কত টাকা আছে তার হিসেব ক'রে ব্যবস্থা করা যেতে প্যারে।

'ল্যাবরেটারিটা গ্রামাঞ্চলে হলেই ভাল হয়, কারণ আমাদের মেয়েদের সঙ্গে থাকাটা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। একাধারে সন্তান এবং ল্যাবরেটারির দায়িত্ব যাদের ওপর, তাদের সারাক্ষণ সজাগ থাকতে হয়। ল্যাবরেটারি এবং বাড়ি দূরে দূরে থাকলে আমার স্ত্রীর পক্ষে বিশেষ ভাবে অসুবিধা হবে। এতটা তাঁর শরীর সইতে পারবে না।

'.. পারীর বাইরে অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিবেশ বৈজ্ঞানিক-গবেষণার পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক এবং সেখানে ল্যাবরেটারি সরিয়ে নিতে পারলে গবেষণার পক্ষেও অনেক ভাল হয়। অন্যদিকে শহরের মাঝে বড় হওয়া সন্তানদের পক্ষে মারাত্মক এবং আমার স্ত্রী এই অবস্থায় তাদের মানুষ করার কথা ভাবতেও পারছেন না।

'আমাদের সম্পর্কে আপনার সহানুভূতির জন্য আমরা বিশেষ বাধিত।

'মাদাম, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিনন্দন এবং আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।'

এই সহৃদয় প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হলো। রেডিও-এ্যাকটিভিটির উপযোগী আবাস প্রস্তুত হতে আরও আট বছর দেরি হয়েছিল। মারীর এই বাড়ি পিয়ের দেখে যেতে পারেন নি। তাঁর জীবন-সহচর আজীবন বৃথাই একটি সুন্দর ল্যাবরেটারির প্রতীক্ষায় কাটিয়ে গেলেন, অন্তিম দিনটি পর্যন্ত তাঁর এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষার কথা মারীর হৃদয়ে গভীর ভাবে রেখাপাত করেছিল, তিনি এক-মুহূর্তের জন্যও সেকথা বিস্মৃত হন নি।

ক্ল্য-কুভিয়েরে যে দু'খনা ঘর একমাত্র পিয়েরকেই দেওয়া হলো সে-সম্বন্ধে মারীর লেখা এক চিঠিতে দেখি :

'যখন মনে হয় মাত্র এইটুকু দিতে তারা রাজী হয়েছিল এবং কুড়ি বছর বয়স থেকে যাঁর প্রতিভার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল, এ হেন বৈজ্ঞানিকের ফরাসী দেশে একখানা ভাল ল্যাবরেটারি জোটে না, তখন মনটা সত্যিই বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে। আরও কিছুকাল বেঁচে থাকলে কখনও-না-কখনও ভাল জায়গায় কাজ করার আনন্দ তিনি পেতেন নিশ্চয়ই, কিন্তু সাতচল্লিশ বছর বয়সেও তাঁর সে-সৌভাগ্য হয় নি। সঙ্গতির অভাবে উদ্যমশীল নিঃস্বার্থ এক মহৎকর্মীর ক্রমাগত বিফল হওয়ার দুঃখ কেউ কল্পনা করতে পারে? দেশের সবচেয়ে যা মঙ্গল—তার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতিভা, ক্ষমতা ও সাহস—এসবের এ হেন অমার্জনীয় অপচয়ের কথা চিন্তা করতেও বুক ফেটে যায়।

'...একথা সত্য যে রেডিয়ম অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে আবিষ্কার করা হয়েছে, যে চালার নীচে এর জন্ম, তাতে হয়তো রূপকথার কোন জাদু বাসা বেঁধেছিল। কিন্তু এ হেন রোমাঞ্চকর পরিবেশে আদৌ কোন সুবিধা হয় নি, আমাদের শক্তি ক্ষয় হলো, কাজের দেরী হলো। ভাল ব্যবস্থার মধ্যে হলে প্রথম পাঁচ বছরকে দু'বছরে নাবিয়ে আনা যেত এবং কাজের কষ্টও কম হতো।'

মন্ত্রীপক্ষের যাবতীয় সিদ্ধান্তের মধ্যে একটাই মাত্র কুরীদের আনন্দ দিতে পেরেছিল। পিয়েরকে সাহায্য করার জন্য তিনজন সহকর্মীর বন্দোবস্ত করা হলো, একজন ল্যাবরেটারি-প্রধান, একজন ল্যাবরেটারি-সহকারী, একজন ল্যাবরেটারি-যোগানদার। ল্যাবরেটারি-প্রধান হিসেবে মারী কাজ করতে এগিয়ে এলেন।

ল্যাবরেটারির ভেতর এই সর্বপ্রথম এক নারী সরকারী ভাবে প্রবেশাধিকার পেলেন। মারী রেডিয়মের আবিষ্কার করার সময় কোন বেতন বা পদমর্যাদা পান নি। ১৯০৪ সালে নভেম্বর মাসে স্বামীর ল্যাবরেটারিতে এই প্রথম

তাঁর প্রকৃত অধিকার লাভ হলো—বাৎসরিক দু'হাজার চারশ ফ্রাঙ্ক বেতনে। এক যোগ্য পদে তিনি উন্নীত হলেন।

॥ ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয় ॥

"বৈজ্ঞানিক ডঃ মাদাম কুরীকে আগামী ১লা নভেম্বর ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগে পদার্থবিদ্যার প্রধানকর্মী নিয়োজিত করা হইল। এই তারিখ হইতে তাঁহার জন্য বাৎসরিক দুই হাজার চারিশত ফ্রাঙ্ক বেতন ধার্য করা হইল।"

জীর্ণ আশ্রয়, তোমাকে বিদায়। পিয়ের ও মাদাম পুরোনো আটচালা থেকে যাবতীয় যন্ত্রপাতি রু্য-কুভিয়েরে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। কঠিন পরিশ্রম এবং নির্মল আনন্দের সঙ্গে জড়িত আবাসখানির প্রতি এঁদের এমন মায়া জন্মেছিল যে, অনেক সময় তাঁরা পরস্পরের হাত ধরে এর স্যাঁতসেঁতে দেয়াল ও জরাজীর্ণ কাঠের তক্তাগুলি দেখতে আসতেন।

নতুন জীবনের সঙ্গে ধীরে ধীরে তাঁরা নিজেদের মানিয়ে নিলেন। পিয়ের তাঁর নতুন পাঠ তৈরি করতে লাগলেন। মারী আগের মতোই সেভর-এর ক্লাস চালাতে লাগলেন। তারপর এই নতুন জগতের ঘর দু'টিতে এঁরা স্বামী-স্ত্রী এলেন ; এখানে আঁদ্রে দ্যবিয়েরন, এক আমেরিকান এলবার্ট লাবোর্ডে, প্রফেসর দুয়ানে এবং আরও কয়েকজন সহকারী ছাত্রেরা গবেষণার কাজ করতেন। তাঁরা সবাই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গবেষণার কাজে নিবিষ্ট চিত্তে যোগ দিতেন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল পিয়ের কুরী লিখলেন :

'মাদাম কুরী ও আমি নিষ্ক্রান্ত ভস্মের সাহায্যে নির্ভুলভাবে রেডিয়মের মাত্রা স্থির করতে চেষ্টা করছি। কথাটা শুনতে মনে হবে কিছুই না, কিন্তু এদিকে আমাদের এই ব্যাপার নিয়ে বেশ কয়েক মাস কেটে গেছে। সম্প্রতি একটা ধারাবাহিক ফলাফল পেতে আরম্ভ করেছি।'

'মা দা ম কু রী ও আ মি কা জ ক র ছি ·'

মৃত্যুর মাত্র দিন পাঁচেক আগে লেখা এই কথাগুলোর মধ্যে এক আশ্চর্য সুন্দর সৌহার্দ্যে ভরা যুগলজীবনের ছবি প্রকাশ পায়। প্রতিটি কাজের অগ্রগতি প্রতিটি নৈরাশ্যের বেদনা এবং জয়ের আনন্দ উভয়কে পরস্পরের একান্ত নিকটতম করেছিল।

দুই প্রতিভার মিলনে যে অনির্বচনীয় মাধুরী, যে নিবিড় আস্থা, যে

আনন্দের উৎস সৃষ্টি হয়েছিল তার বর্ণনা কি আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব? দিনের প্রতিটি ঘটনায় পিয়ের ও মারীর মধ্যে ছোট-বড় প্রশ্ন, মন্তব্য ও উপদেশের আদান-প্রদান চলতো। সঙ্গে থাকতো উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বা সহৃদয় সমালোচনা। সমপর্যায়ের দুটি নরনারীর মধ্যে ছিল পরস্পরের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা, ছিল না বিন্দুমাত্র হিংসার জ্বালা, তাই গড়ে উঠেছিল কর্মীর সহজ ও অপূর্ব নিবিড় মৈত্রী—গভীর প্রেমের এই বুঝি সূক্ষ্মতম প্রকাশ।

(সম্প্রতি তাঁদের সহকারী এলবার্ট লাবোর্ডে আমায় লেখেন :)

'রু-কুভিয়েরের ল্যাবরেটারিতে আমি একদিন পারাযন্ত্র নিয়ে কাজ করছিলাম। পিয়ের কুরী সেখানে উপস্থিত ছিলেন, মাদাম কুরী যন্ত্রটি দেখে একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার প্রতি কৌতূহল প্রকাশ করলেন এবং প্রথমটা তিনি ধরতে পারলেন না। আসলে যান্ত্রিক ব্যাপারটা বেশ সহজই ছিল। কিন্তু যখন তাঁকে সেটুকু ব্যাখ্যা ক'রে দেওয়া হলো, তখনও তিনি সহজে তা মানতে চাইলেন না। এরপর হর্ষ, প্রেম ও বিরক্তির সংমিশ্রণে অপরূপ শোনাল পিয়ের-এর কণ্ঠস্বর : 'আঃ, আশ্চর্য, মারী—!' আমার কানে সেই সুর আজও বাজে, ইচ্ছে করে কোনরকমে আমি যদি সেই স্বরটুকু আবার শোনতে পারতাম! ক'দিন পরে জনকয়েক বন্ধু গণিতে এক জটিল সূত্র নিয়ে গুরুর কাছে সাহায্য চাইতে আসেন। তিনি তাঁদের খানিক অপেক্ষা করতে ব'লে জানালেন যে মাদাম কুরীর ইন্‌টিগ্রাল ক্যালকুলাসের জ্ঞান সহজেই তাঁদের এই জটিলতা থেকে মুক্তি দিতে পারবে। বাস্তবিক মাদাম কুরী কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঐ কঠিন সূত্রের জট ছাড়িয়ে দিলেন।'

যখন পিয়ের ও মারী একা থাকতেন, তখন পরিপূর্ণ প্রেমে তাঁদের মুখের ভাব, পরস্পরের প্রতি ব্যবহার অপূর্ব মধুর হয়ে উঠত। শান্ত সমাহিত পুরুষ এবং অফুরন্ত উদ্যমে ভরপুর অনেক বেশী বাস্তব প্রকৃতির এই রমণী—সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গড়া প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বপূর্ণ দুটি চরিত্র—পরস্পরকে দমন করার আদৌ চেষ্টা করেন নি। তার কারণ তাঁদের চিন্তাধারা ছিল অভিন্ন এবং জীবনের সূক্ষ্মতম ঘটনাতেও তাঁরা মিলিতভাবে কাজ করতেন। এগারো বছরের মধ্যে "পরস্পরের জন্য ত্যাগ স্বীকার" তাঁদের করতে হয় নি, অথচ লোকে বলে, বিবাহিত জীবনে এ ভিন্ন সুখী হবার বলে আর কোন উপায় নেই।

যদি কোন বন্ধু—মাদাম পেরিন—পিয়েরকে এসে জিজ্ঞেস করতেন আইরিনকে তাঁর বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে নিয়ে যাবেন কিনা, তিনি সসংকোচে

ভীরু হেসে জবাব দিতেন: 'আমি ঠিক বলতে পারছি না···মারী এখনও ফেরেন নি। তাঁকে না বলে আপনাকে জবাব দিতে পারছি না।'

সাধারণত স্বল্পভাষিণী মারী যদি কোন বৈজ্ঞানিকদের আড্ডায় প্রাণ খুলে আলোচনায় যোগ দিতেন, তবে দেখা যেত, সহসা আরক্ত বদনে আপন বাক্য স্রোতে ছেদ টেনে তিনি স্বামীকে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছেন; পিয়ের-এর মতামত যে তাঁর চেয়ে হাজার গুণ দামী, এ বিষয়ে তাঁর এমনি ছিল অগাধ বিশ্বাস।

(পরে মারী লিখেছিলেন:) 'বিয়ের সময়ে মনে হলো—স্বপ্ন দিয়ে গড়া আমার স্বামী। এমন দুর্লভ ও উচ্চস্তরের অনন্যসাধারণ গুণাবলীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ক্রমাগতই বেড়ে চলল। আদর্শ জীবনের জন্য সযত্ন প্রয়াস থাকা সত্ত্বেও, আমাদের নিজেদের ভিতর ও বহির্জগতে অনেক ছোট বড় ক্ষুদ্রতা আমরা অনেক সময়ে ক্ষমা ক'রে যাই। এই সব দুর্বলতা ও অহঙ্কারের ঊর্ধ্বে এ মানুষটিকে আমার সময়ে সময়ে অদ্বিতীয় পুরুষ বলে মনে হতো।···'

১৯০৬-এর ঈস্টারের ছুটিটা সুন্দর উজ্জ্বল হয়ে ভরে রইল। পিয়ের ও মারী তাঁদের সাঁ্যারেমি-লে-শেভ্রয়জ্-এর নিরালায় বেশ কিছুদিন গ্রাম্য জীবন-ধারা ফিরে পেলেন। মেয়েদের নিয়ে কাছেপিঠে গয়লাবাড়ি থেকে দুধ আনতে বেরোন। চোদ্দ মাসের মেয়ে ইভ টলি টলি পায়ে ঠেলাগাড়ির চাকার দাগ ধরে হেলে দুলে হাঁটবেই হাঁটবে, তার কাণ্ড কারখানা দেখে পিয়ের হেসে ওঠেন।

এক রবিবার ভোরবেলা দূরে কোথায় গির্জার ঘণ্টা বাজছিল, স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে সাইকেল নিয়ে পোর্ট-রয়াল বনভ্রমণে বেরোলেন। তাঁরা ফুটন্ত মাহোনিয়ার ডাল আর জলজ বামুনকুলির থোকা নিয়ে ফিরলেন। ক্লান্ত পিয়ের মাঠে ঘাসের ওপর অলসভাবে শুয়ে পড়লেন। সূর্যের অপরূপ হালকা আলো ভোরের কুয়াশার পর্দা উড়িয়ে নিয়ে গেল। ইভ কাঁদছিল, আইরিন ছোট্ট একখানা সবুজ রঙের জাল বাড়িয়ে প্রজাপতি তাড়া ক'রে বেড়াচ্ছিল আর কচিৎ এক-আধটা প্রজাপতি ধরা পড়লে আনন্দে হৈ হৈ ক'রে উঠছিল। পিয়ের ও মারী পাশাপাশি শুয়ে মুগ্ধ হয়ে বাচ্চাদের গল্প করছিলেন। শিশুদের গায়ে মেয়েদের ব্লাউস আর ছেলেদের পাজামা।

সেদিন সকালে কিংবা তার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা মদির বসন্তের শান্ত সৌন্দর্যে পরিতৃপ্ত অন্তরে পিয়ের ঘাসের ওপর মেয়েদের খেলা করতে দেখেন,

পাশে মারীর শান্ত মুখের দিকে চেয়ে তাঁর গালে, নরম চুলে হাত বুলিয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে বললেন : 'মারী, ভারী সুন্দর জীবন···সবকিছু মধুময়।'

বিকেলে ইভকে কাঁধে নিয়ে ওঁরা বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালেন। আগের কালে পিয়ের যখন লম্বা লম্বা পা ফেলে বেড়িয়ে বেড়াতেন, লিলি ফুলে ছাওয়া পুকুর দেখে মুগ্ধ হতেন দু'জনে—তেমন পুকুর আজ আর খুঁজে পেলেন না। পুকুর এদিনে প্রায় শুকিয়ে যায়, লিলিও অন্তর্হিত। কাদায় ভরা পুকুরের চার পাশ ঘিরে উজ্জ্বল হলুদ রঙের মটর জাতীয় ফুলের ঝাড় দেখা গেল। কাছেই পথের ধার থেকে ওঁরা ভায়লেট আর পেরিউঙ্কল ফুল তুলে নিলেন।

তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া সেরে পিয়ের একলা ঠাণ্ডা হাওয়ার মুখে ফেরৎ-ট্রেনে রওনা হলেন। আরও একটা দিন বাইরের আলো-হাওয়ায় কাটিয়ে মারী আইরিন ও ইভকে নিয়ে পারীতে ফিরে এলেন। বাচ্চাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ল্যাবরেটারিতে পিয়ের-এর সঙ্গে মিলিত হলেন। সেখানে এসে দেখেন বরাবরের মতো সেদিনও পিয়ের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করছেন। মারীর জন্যই অপেক্ষা করছিলেন এতক্ষণ। ওভারকোট এবং টুপি-খানা নিয়ে স্ত্রীর হাত ধরে পদার্থবিদ-গোষ্ঠীর চিরাচরিত ডিনারের আস্তানা 'ফয়য়ৎ রেস্তোরাঁ'র উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সেখানে তাঁর প্রিয় বন্ধুরা, আঁরী পোয়ঁ্যাকারের মতন বিজ্ঞানীরা খাবারের টেবিলে তাঁর পাশে বসতেন, তাঁদের সঙ্গে নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হতো—রেডিয়ম-ভস্মের পরিমাপ, অলৌকিক বিষয়ের উপর সেদিনকার পরীক্ষা ও তাঁদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, স্ত্রী-শিক্ষা ইত্যাদি ছিল আলোচনার বিষয়। এ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অভিমত ছিল, স্ত্রী-শিক্ষাকে সম্পূর্ণ প্রকৃতি বিজ্ঞান অভিমুখে পরিচালিত করা।

জলবায়ুর পরিবর্তন শুরু হলো। আগের দিন সন্ধ্যাবেলাতেও টের পাওয়া যায় নি যে গ্রীষ্ম সমাগত। শীত বোধ হচ্ছিল, তীক্ষ্ণ বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টিধারা কাঁচের গায়ে আছড়ে পড়ছে। পথ ঘাট ভিজে পিচ্ছিল।

॥ ১৯শে এপ্রিল, ১৯০৬ ॥

১৮

বৃহস্পতিবার তেমনি গুমোট ক'রে রইল, বৃষ্টি থামে নি তখনোও ; আঁধার-ঘেরা চারিধার ; কাজের মধ্যে মাথা গুঁজে থেকেও কুরীরা এপ্রিলের অঝোর-ঝরণ ভুলতে পারলেন না। ফ্যাকাল্‌টি-অব-সায়েন্স-এর অধ্যাপক-মণ্ডলীর এক দ্বিপ্রাহরিক অধিবেশনে যোগ দিয়ে, সেখান থেকে তাঁর প্রকাশক গোতিএ ভিলার-দের সঙ্গে প্রুফ্‌ সংশোধনের জন্য দেখা ক'রে শেষ পর্যন্ত ইন্‌স্টিটিউটে পিয়েরকে যেতে হবে। মারীরও বাইরে অনেক কাজের তাড়া।

সকালে কাজের ভিড়ে স্বামী-স্ত্রীতে প্রায় দেখাই হয় না। নীচ থেকে মারীকে ডেকে পিয়ের জিজ্ঞেস করলেন, তিনি ল্যাবরেটারিতে যাবেন কিনা। মারী দোতলায় আইরিন ও ইভকে জামা ছাড়াচ্ছিলেন। তিনি জবাব দিলেন, হয়তো তাঁর সময় হবে না, কিন্তু বৃষ্টির শব্দে তাঁর কথা শোনা গেল না। সদর দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। পিয়ের বেরিয়ে গেলেন।

মারী যখন মেয়েদের নিয়ে বৃদ্ধ শ্বশুর ডাঃ ইউজিন কুরীর সঙ্গে খেতে বসলেন, ততক্ষণে পিয়ের রু-দাঁতঁ-য় অতেল-দ্য সোসাইতে সাভাঁতে তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে কাজের কথাবার্তায় মেতে গেছেন। যেখানে শুধু কাজের কথা, সরবনের কথা, গবেষণার আলোচনা হতো, সেসব মিটিংগুলো তাঁর ভাল লাগত। ল্যাবরেটারিতে নানা ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে, সেই কথাই চলছিল তখন। পিয়ের গবেষকদের জন্য বিপদ-নিবারণ প্রচেষ্টার পরিকল্পনায় সায় দিলেন।

বেলা আড়াইটার সময় তিনি উঠে পড়লেন, বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে জ্যঁা পেরিনের সঙ্গে করমর্দন করলেন, এঁর সঙ্গে আবার সেদিন সন্ধ্যাবেলা দেখা হবার কথা। দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে একবার যন্ত্রচালিতের মতো ওপর দিকে চেয়ে মেঘে-ঢাকা আকাশ দেখে মুখ বাঁকালেন। মস্ত ছাতাটি খুলে অবিশ্রাম বৃষ্টি-ধারার মধ্যে বেরিয়ে সীনের দিকে চললেন।

গোতিএ-ভিলার-এ পৌঁছে দেখেন দরজা বন্ধ, সেখানে হরতাল চলছিল। সেখান থেকে রু-দ-প্যাঁ ধরে চললেন, রাস্তায় কোচম্যানদের বিচিত্র চিৎকার

এবং চলন্তি-ট্রামের ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ। পুরোনো প্যারীর এই জনবহুল পথটিতে অসম্ভব ভিড়। ফুটপাথে কোনরকমে দু'জন মানুষ পাশাপাশি চলতে পারে, বিশেষত বিকেলের এই সময়টাতে সংকীর্ণ ফুটপাথে পা দেবার উপায় থাকে না। পিয়ের নিজের অজান্তেই একটু নিরিবিলি পথ খুঁজতে লাগলেন। আপন মনে ভাবতে ভাবতে তিনি কখনও পাথরের বাঁধের ওপর, কখনও বা মাঝ রাস্তায় অসমান পা ফেলে চলতে লাগলেন। গভীর মুখে ভুরু কুঁচকে কী যে তিনি আপন মনে ভাবছিলেন! সম্ভবতঃ সম্প্রতি যে বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন, তার কথা! কিংবা হয়তো বন্ধু উ্যর্ব্যাঁ আকাদেমিতে যে কাজের ব্যাখ্যা পাঠিয়েছিলেন, যা তাঁর পকেটেই রয়েছে তখন, সেই কথা ভাবছিলেন, কিংবা হয়তো মারীর কথা!...

একখানা বন্ধ গাড়ি ধীরে ধীরে পন্ট নুফের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, পিয়ের তার পেছন পেছন হাঁটছিলেন। রাস্তার মোড়ে জাহাজ-ঘাটের কাছে ভীষণ গোলমাল হচ্ছিল; প্লাস্-দ্য-লা-কঁকর্দ অভিমুখী একটা ট্রাম সবে পার হয়ে গেছে। লাইন পেরিয়ে একখানা ভারী দুই-ঘোড়াটানা মালগাড়ি পুলের ওপার থেকে রু-দ-পাঁ্যায় এসে ঢুকল।

রাস্তা পেরিয়ে পিয়ের ও-পাশের ফুটপাতে যেতে চাইলেন, বন্ধ গাড়িটা চৌকো বাক্সের মতো তাঁর সামনের দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করে চলতে লাগল। তিনি সেটা পেরিয়ে কয়েক পা বাঁ দিকে এগোলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে জুড়ি ঘোড়ার মধ্যে একটা ঘোড়া বন্ধ গাড়িটা পেরিয়ে গেল। দু'খানা গাড়ির অন্তবর্তী ব্যবধান হঠাৎ কেমন সংক্ষিপ্ত হয়ে এল, অবাক হয়ে পিয়ের জানোয়ারটার গলা ধরে ঝুলে পড়তে চেষ্টা করলেন আর ঘোড়াটাও ঠিক তক্ষুণি পিছিয়ে গেল। ভিজে রাস্তার ওপর বৈজ্ঞানিকের পা পিছলে গেল। ঐ দুর্দান্ত ঘোড়া দুটির পায়ের নীচে পিয়ের পড়ে গেলেন। পথচারীরা হৈ হৈ ক'রে উঠল: 'থামো! থামো!' কোচম্যান সজোরে লাগাম কষে ধরল, কিন্তু হায়, ঘোড়া দুটোকে থামাতে পারল না।

পিয়ের পড়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু অক্ষত দেহে জীবিতই ছিলেন। তিনি চিৎকার করেন নি, নড়েনও নি। প্রথমে দুটি ঘোড়ার পা, পরে মালগাড়ির চাকা দুটি তাঁর দেহ স্পর্শ না করেই পেরিয়ে গেল। ছয় টন ওজনের ঐ বিপুল-আকার মালগাড়িখানা বেশ কয়েক গজ লম্বা ছিল। পিছনে বাঁ দিকের চাকাটি এক জায়গায় সামান্য বাধা পেল, সেটিকে সে অনায়াসে গুঁড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল; বাধা পেল একটি কপালে, এক নরমস্তিষ্কে। মাথার

খুলিটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, কাদার ওপর খানিকটা লাল রঙের তরল পদার্থ ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল, পিয়ের কুরীর মস্তিষ্ক।

তখনই গরম দেহখানি পুলিশের লোকেরা এসে তুলে নিল, মুহূর্তে সে-দেহ প্রাণহীন হয়ে গেল। পরপর কয়েকটি গাড়িকে তারা হাত দেখিয়ে দাঁড় করাল, কিন্তু কোন কোচম্যান কর্দমাক্ত রক্তাক্ত মৃতদেহ নিয়ে যেতে রাজী হলো না। সময় গড়িয়ে চলল, কৌতূহলী লোকের ভিড় জমে গেল। শুদ্ধ শরীরখানা ঘিরে ভিড় বেড়েই চলল। বাস্তবিক হতভাগ্য ড্রাইভার লুই মানঁ্যার এ দুর্ঘটনায় হাত ছিল না, তবু তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত চিৎকার, গালমন্দ বর্ষিত হতে লাগল। শেষ অবধি দু'জন লোক একখানা স্ট্রেচার জোগাড় ক'রে আনল। মৃতব্যক্তিকে তাতে শুইয়ে অযথা এক ডাক্তারখানায় দেরী ক'রে পুলিশ-স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হলো, সেখানে তাঁর পার্স খুলে কাগজপত্র পরীক্ষা করা হলো। যখন মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল যে, ইনি সেই স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক প্রফেসর পিয়ের কুরী, তখন জনতার ক্রোধ চিৎকারে ফেটে পড়ল, বহুলোক ড্রাইভার মানঁ্যাকে খুন করবার জন্য ক্ষেপে উঠল, শেষে পুলিশ গিয়ে তাকে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করল।

ডাঃ দ্রুয়ে ক্ষত-বিক্ষত মুখখানি ধুইয়ে মাথার ক্ষত পরীক্ষা করলেন। তারপর কুড়ি মিনিট আগেও যা একখানি দুর্লভ মগজের আধার ছিল, তার ভগ্নাবশেষ কুড়িটি হাড় গুনে গুনে রাখলেন। টেলিফোন মারফৎ ফ্যাকাল্টি-অব-সায়েন্সকে খবর দেওয়া হলো। শীঘ্রই সেই রু-দে-গ্রঁ-দোগুস্তার অখ্যাত পুলিশ-ফাঁড়িতে জনৈক সহৃদয় সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষাদপ্তরের সেক্রেটারি, পিয়ের-এর ল্যাবরেটারি সহকারী ক্রন্দনরত মঁসিয়ে ক্লার্ক এবং ড্রাইভার মানঁ্যার পাশে এসে দাঁড়ালেন। কেঁদে কেঁদে মানঁ্যার চোখ-মুখ ফুলে উঠেছিল।

পিয়ের-এর মাথার দিকে ব্যাণ্ডেজ ক'রে দেওয়া হয়েছে, সম্পূর্ণ মুখখানায় বিশ্বের প্রতি একান্ত নির্লিপ্ত ভাব ফুটে উঠেছে। ফৌজীজামা বোঝাই কুড়ি ফুট লম্বা গাড়িটা দোরের কাছে আনা হয়েছে। বৃষ্টির জলে ততক্ষণে একটি চাকার রক্তের দাগ ধুয়ে গেছে। তেজী বাচ্চা ঘোড়া দুটো প্রভুর অদর্শনে ভীত হয়ে সমানে পা দাপাচ্ছে।

কুরী-পরিবারের ওপর দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে এল। মোটর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি অনিশ্চিতভাবে দেয়ালের চারপাশে ঘোরাঘুরি ক'রে নির্জন পথের ধারে থেমে গেল। রাষ্ট্রপতির তরফ থেকে প্রতিনিধি পাঠান হলো, ভদ্রলোক দরজায় ঘণ্টা বাজিয়ে যখন শুনলেন, 'মারী বাড়ি ফেরেন নি,' তখন আর খবর

না দিয়েই ফিরে গেলেন। আবার ঘণ্টা, এবার ফ্যাকাল্‌টির প্রধান অধ্যক্ষ পোল আপ্পেল্ ও জ্যঁা পেরিন বাড়িতে ঢুকলেন।

সে-সময়ে বৃদ্ধ ডাক্তার কুরী এবং একজন মাত্র ভৃত্য বাড়িতে ছিল। এতসব গণ্যমান্য আগন্তুক দেখে ডাক্তার কুরী একটু অবাক হলেন। তিনি এগিয়ে এলেন, আগন্তুকদের বেদনাহত মুখের ভাব তাঁর চোখে পড়ল। পোল আপ্পেল্ মারীকেই সর্বাগ্রে খবর দেবেন ভেবে এসেছিলেন, তাঁর বৃদ্ধ শ্বশুরের সামনে অস্বস্তিকর ভাবে চুপ ক'রে গেলেন। কিন্তু দুঃখের আশঙ্কা বেশীক্ষণ চাপা থাকে না। এই দীর্ঘকায় বৃদ্ধ আরও এক মুহূর্ত এঁদের মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন, তারপর প্রশ্ন না করেই বললেন :

'বুঝেছি, আমার ছেলে মারা গেছে।'

দুর্ঘটনার বিবরণ শুনে রেখাবহুল মুখখানা বুড়ো-মানুষী কান্নায় বিকৃত হলো। চোখের জলের মধ্যে শোকের সঙ্গে বিদ্রোহের জ্বালা মিশেছিল। অসীম স্নেহ ও নৈরাশ্যের তীব্রতায় ডাঃ কুরী তাঁর ছেলেকে প্রাণঘাতী অন্যমনস্কতার জন্য অভিযুক্ত করলেন, বার বার বুকভাঙ্গা তিরস্কার করতে লাগলেন : 'এবার সে কিসের স্বপ্ন দেখছিল ?'

ছ'টা বাজল : দরজায় চাবি ঘোরানোর শব্দ হলো। মারীর হাসিখুশি সরল মুখখানা দোর-গোড়ায় দেখা গেল। কেমন যেন তাঁর অস্পষ্ট মনে হলো, আগন্তুক বন্ধুদের অত্যধিক শ্রদ্ধার ভাবের মধ্যে কোথায় যেন করুণার প্রচ্ছন্ন ছায়া দেখা যাচ্ছে। পোল আপ্পেল্ আবার সেই দুর্ঘটনা বিবৃত করলেন। মুহূর্তে মারীর মুখ থেকে হাসিখুশি ভাব উড়ে গেল। স্তব্ধ, স্থির হয়ে গেলেন মারী। দেখে মনে হলো, তাঁর মাথায় কিছুই ঢোকে নি। তাঁদের স্নেহের আলিঙ্গনে তিনি আশ্রয় নিলেন না, কাঁদলেন না, অপেক্ষাও করলেন না। খড়ের পুতুলের মতো অসাড় অজ্ঞান মনে হলো তাঁকে। দীর্ঘ সময় কঠোর নিস্তব্ধতার পর ঠোঁঠ দু'টো আস্তে একটু নড়ে উঠল, পাগলের মতো এইমাত্র শোনা-খবর যেন মিথ্যা—এই আশায় ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললেন : 'পিয়ের, আমার পিয়ের মারা গেছে ? মারা গেছে ? একেবারে মারা গেছে ?'

লোকে বলে আকস্মিক দুর্ঘটনা মানুষকে চিরদিনের মতো বদলে দিয়ে যায়। যাই হোক, আমার মায়ের চরিত্রের ওপর, তথা তাঁর সন্তানদের ওপর এই ক'টি মুহূর্তের প্রভাব নীরবে এড়িয়ে যাওয়া যায় নি। সুখী তরুণী ভার্যা থেকে সান্ত্বনাহীন বৈধব্যে মারী কুরীর পরিবর্তন চোখে পড়ে না। রূপান্তরের চেহারা অনেক বেশী জটিল, অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষতবিক্ষত

অন্তরের প্রচণ্ড আলোড়ন এবং নানান্ দুশ্চিন্তার অজানা আতঙ্ক আত্মগোপন ক'রে কিংবা কারুর কাছে খুলে ব'লে হাল্‌কা হবার পক্ষে বেদনার তীব্রতা ছিল অত্যধিক। 'পিয়ের মারা গেছেন,' যে-মুহূর্তে এই তিনটি শব্দ তাঁর চেতনায় প্রবেশ করল, সেই মুহূর্তে চিরদিনের জন্য তাঁর দেহ-মন ঘিরে নিঃসঙ্গতা ও গোপন বেদনার এক আবরণ নেমে এল। এপ্রিল মাসের এই দিনটিতে মাদাম কুরী কেবল যে বিধবা হলেন তা নয়, সেই সঙ্গে বরাবরের জন্য তিনি একা হয়ে গেলেন।

একখানি অদৃশ্য প্রাচীর তাঁকে যেন আশেপাশে আর সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখল। আগন্তুকদের করুণ প্রবোধ বাক্য তাঁকে স্পর্শও করল না। অশ্রুহীন দুটি চোখ, রক্তচ্ছটাহীন পাণ্ডুর মুখ। কারুর কথা তাঁর কানেও পৌঁছল না, বহুকষ্টে নেহাৎ দরকারি দু'একটি কথার জবাব মিলল। সংক্ষেপে দু'চার কথায় তিনি শব ব্যবচ্ছেদ দ্বারা আইনের দাবী মেটাতে অসম্মত হলেন এবং বুলেভার্দ কেলরমানে পিয়ের-এর দেহ ফিরিয়ে আনতে বললেন। বন্ধু মাদাম পেরিনকে কিছুদিনের জন্য আইরিনের ভার নিতে অনুরোধ করলেন; ওয়ার্‌সয় টেলিগ্রাম পাঠালেন: 'দৈব দুর্ঘটনার ফলে পিয়ের নেই।' তারপর বাগানে গিয়ে, ভিজে ঘাসের ওপর বসে পড়ে, হাঁটুতে কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে, দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরে শূন্য দৃষ্টি মেলে অসাড় বধির বোবার মতো তিনি স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা ক'রে রইলেন।

পিয়ের-এর পকেটে যে সব জিনিস পাওয়া গিয়েছিল, প্রথমে ওরা সেগুলো নিয়ে এল। একখানা ফাউন্টেন পেন, কয়েকটি চাবি, একখানা পার্স ও একটি ঘড়ি। ঘড়ির কাঁচ পর্যন্ত ভাঙ্গে নি, তখনও দিব্যি টিক্‌টিক্ ক'রে চলছিল। রাত্রি আটটার সময়ে একখানা এম্বুলেন্স বাড়ির সামনে এসে থামল। মারী তার ভেতরে উঠে গেলেন এবং সেই আলো-আঁধারের মধ্যে স্বামীর শান্ত সহৃদয় মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

ধীরে ধীরে স্ট্রেচারটিকে সরু দরজার ভেতর দিয়ে বের করা হলো। আঁদ্রে দ্যবিয়েরন পুলিশ-স্টেসনে তাঁর গুরু, তাঁর বন্ধুকে আনতে গিয়েছিলেন, তিনি এই শোকের বোঝা বয়ে নিয়ে এলেন। নীচের তলায় মৃতদেহ শোয়ানো হলো। মারী তাঁর স্বামীর কাছে একা বসে রইলেন। তখনও দেহখানা সম্পূর্ণ হিমশীতল হয়ে যায় নি, হাত দুটো নাড়ানো গেল; মারী সেই হাতে মুখে সর্বাঙ্গে চুম্বন করলেন। শব সাজানোর সময়ে একরকম জোর করেই তাঁকে পাশের ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি সরে এলেন

কিন্তু হঠাৎ মনে হলো শেষের এই অমূল্য মুহূর্তগুলি তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে; ঐ পবিত্র দেহ স্পর্শ করার অধিকার আর কারুর থাকতে পারে না। এই কথা মনে হওয়া মাত্র তিনি ফিরে এসে স্বামীর দেহ আঁকড়ে বসে রইলেন।

পরদিন জ্যাক কুরী এসে পৌঁছতে মারীর রুদ্ধ কণ্ঠ, রুদ্ধ অশ্রুর অর্গল মুক্ত হলো। একজন জীবিত, অন্যজন মৃত—এই দুই ভাইয়ের সামনে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তারপর হঠাৎ আবার কঠিন আবরণের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বাড়ির ভেতর একবার ঘুরে এলেন, ইভকে স্নান করানো, চুল আঁচড়ানো হয়েছে কিনা খোঁজ নিলেন। বাগান পেরিয়ে আইরিনকে রেলিঙের কাছে ডেকে এনে তার সঙ্গে কথা বললেন, সে তখন কাঠের ব্লক নিয়ে পেরিন-শিশুদের সঙ্গে খেলা করছিল। বললেন: 'বাবার মাথায় খুব চোট লেগেছে। বিশ্রামের দরকার—' শিশু নিজের মনে আবার খেলায় মেতে গেল।

কারুর কাছে নিজের অসহ্য দুঃখের কথা বলতে পারেন না, নিস্তব্ধ মরুভূমির মাঝে ঘুরতে ঘুরতে এক-এক সময়ে আতঙ্কে চিৎকার ক'রে কেঁদে ওঠেন। এইভাবে সপ্তাহ কেটে গেল। একদিন একখানা ছাইরঙের নোট-বই খুলে বেদনার ডালি উজাড় করতে বসলেন, হাত কেঁপে কেঁপে গেল। চোখের জলে ঝাপসা লেখার যতটুকু উদ্ধার ক'রে প্রকাশ করতে পারি তাতে দেখি, তিনি যেন পিয়েরকে ডেকে কথা বলছেন, প্রশ্ন করছেন। যে নিদারুণ দুর্ঘটনা তাঁকে তাঁর স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করল, তার বিস্তৃত বিবরণ লিখে রেখেছেন, ভবিষ্যতে চিরদিন নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করার অস্ত্র এমনি ভাবেই তিনি সঞ্চিত করে রাখলেন। মারীর এই একমাত্র ছোট্ট একান্ত নিজস্ব দিনপঞ্জীতে তাঁর জীবনের আঁধারতম ক্ষণের ছবিটি পাওয়া যায়।

'...পিয়ের, আমার পিয়ের, ঐ তো তুমি মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে শুয়ে আছ, বড় ব্যথা পেয়ে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছ! তোমার মুখখানা কত সুন্দর, কত পবিত্র দেখাচ্ছে, স্বপ্নরাজ্যের ছায়া-ঘেরা ঐ মুখখানা যে একান্ত আমারই! তোমার ঐ ঠোঁট দুটিকে আমি বলতাম লোভী, তারা এখন জীবনের রঙ হারিয়ে সীসের মতো নীল হয়ে উঠেছে। তোমার ছোট্ট দাড়িটুকু ধূসর। চুলগুলো দেখাই যাচ্ছে না...ওখান থেকেই তো ক্ষতের শুরু হয়েছে। কপালের ওপর ডানদিকের ভাঙ্গা-হাড়খানা দেখা যাচ্ছে। উঃ কী যন্ত্রনাই না তুমি ভোগ করলে, কত রক্তই না ঝরল, তোমার কাপড় রক্তে একেবারে ভিজে উঠেছে! তোমার মাথার ওপর দিয়ে কি ধাক্কাই না গেল!...আমার দু'হাতের মধ্যে ঐ

মাথা নিয়ে কত আদরই না আমি করেছি! তুমি মাথাটি এগিয়ে এনে চোখ বন্ধ করতে, আমি চোখের পাতার ওপর চুমু দিতাম, ঠিক তেমনি ক'রে তুমি তোমার মাথাটা এগিয়ে আনো না!...

'শনিবার সকালে আমরা তোমায় শুইয়ে দিলাম, সে-সময়ে তোমার মাথা আমি নিজে ধরেছিলাম। তোমার হিমশীতল মুখখানায় আমরা শেষ চুম্বন দিলাম। বাগান থেকে কয়েকটি পেরিউইঙ্কল্ আর আমার যে-ছবিটা তুমি ভালোবেসে বলতে: "ছোট্ট লক্ষ্মী ছাত্রী"—সেইটে সঙ্গে দিলাম। ঐ ছবিটার তোমার সঙ্গেই যাওয়া উচিত কারণ, ও-ছবির মালিককে তুমি মাত্র কয়েকবার দেখেই এত খুশি হয়েছিলে যে, তুমি তাকে তোমার জীবন-সঙ্গিনী করতে এতটুকু দ্বিধা করো নি। তুমি প্রায়ই আমায় বলতে যে জীবনে সেই একবার মাত্র তুমি এতটুকু দ্বিধা না ক'রে সঠিক কাজ করছ এই বিশ্বাস নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এসেছিল। আমার পিয়ের, বোধ হয় তুমি ভুল করো নি। আমরা পরস্পরের জন্য তৈরি হয়েছিলাম। আমাদের মিলন ছিল বাঞ্ছনীয়।...

'কফিন বন্ধ হলে তোমায় আর দেখতে পেলাম না। বিশ্রী কালো কাপড় দিয়ে ওরা তোমার সুন্দর দেহকে ঢাকতে চাইল। আমি কি ক'রে তা দেব! সে আমি হতে দেব না। তোমাকে সুন্দর ক'রে ফুল দিয়ে সাজিয়ে, ফুলে আবৃত ক'রে আমি পাসে বশে রইলাম।

'...ওরা তোমায় নিতে এল, শোকমুহ্যমান গুণমুগ্ধরা। আমি ওদের নীরবে দেখলাম। তোমায় আমরা সো'য় নিয়ে গেলাম এবং মস্ত গভীর গর্তের ভেতর তোমায় নেমে যেতে দেখলাম। তারপর সেই ভয়াবহ শোক যাত্রা! তারা আমাদের সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে, কিন্তু তোমার দাদা জ্যাক্ আর আমি কিছুতেই নড়লাম না। শেষ পর্যন্ত আমরা দেখতে চাই। ওরা মাটি ঢেকে দিল, তার ওপর ফুলের রাশ ঢেলে দিল! সবশেষ, পিয়ের! তুমি মাটির নীচে শেষ নিদ্রায় নিদ্রিত, সব শেষ, সব কিছুর শেষ!'

মারী তাঁর জীবন-সহচর পৃথিবীর এক দুর্লভ মানুষকে হারালেন। বৃষ্টি-ভেজা দিন আর কাদা যেন সেই অমানুষিক মৃত্যুর সঙ্গে মানুষের মনে বার বার ঘা দিল। সর্বদেশে, সবরকম পত্রিকায় অনেক 'কলম' জুড়ে রু-দ প্যাঁর শোচনীয় দুর্ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হলো। বুলেভার্দ কেলরমান-এর বাড়িতে রাজা, মন্ত্রী, কবি, বৈজ্ঞানিকদের নামের সঙ্গে অনেক অপরিচিত নাম স্বাক্ষরিত

সহানুভূতিপূর্ণ চিঠি জড়ো হলো। এই স্তূপীকৃত চিঠি, প্রবন্ধ, টেলিগ্রামের মধ্যে কতকগুলিতে যথার্থ আন্তরিকতার পরিচয় মেলে :

লর্ড কেলভিন :

'কুরীর মৃত্যুর নিদারুণ সংবাদে নিতান্ত মর্মাহত হলাম। শেষকৃত্য কবে হবে ? আমরা কাল সকালে হোটেল মিরাবোয় পৌঁছব।'

মার্সাল্যা বের্তেলো :

'...বজ্রাহতের মতো এই দুঃসংবাদ আমাদের স্তম্ভিত করেছে। বিজ্ঞান-জগতে বিশ্বমানবের জন্য মহাপুরুষের কতই না কীর্তি রয়ে গেল! এই প্রতিভাবানের কাছ থেকে আরও কত কিছুই না আমরা আশা ক'রে বসে আছি। মুহূর্তে সমস্ত কোথায় অন্তর্হিত হলো—! এরই মধ্যে সব অতীতের স্মৃতি হয়ে দাঁড়াল ?'

প্রফেসর জ. লিপমান :

'আমার মনে হচ্ছে যেন সহোদর ভাইকে আমি হারালাম। তোমার স্বামীর সঙ্গে আমার যে কী বন্ধন ছিল, এতদিন তা বুঝতে পারি নি, আজ তা বুঝতে পারছি তীব্র ভাবে।

'মাদাম, তোমার জন্য আমি আন্তরিক ব্যথিত!'

শার্ল শ্যাভ্যনো, পিয়ের কুরীর ল্যাবরেটারি-সহকারী :

'আমাদের মধ্যে অনেকেরই তাঁর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ জন্মেছিল। ব্যক্তি-গত ভাবে আমার কথা বলতে গেলে, নিজের পরিবারের পরে পৃথিবীতে তাঁকেই আমি সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতাম : তাঁর সামান্যতম সহকারীকেও তিনি কি অসীম স্নেহ-ভালোবাসায় বশ ক'রে রাখতেন! প্রভুভক্ত নিম্নতম ভৃত্যের প্রতিও তাঁর দয়ার অন্ত ছিল না। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে ল্যাবরেটারির ছেলেদের যে রকম অসহ্য বেদনায় বুকফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে দেখেছি এমন আর কোথাও দেখি নি।'

আর সব ব্যাপারের মতো এবারেও এই মহিলা জন-সম্বর্ধনার হাত থেকে পালিয়ে বাঁচলেন ; এখন থেকে তাঁর নতুন নামকরণ হলো : 'সুপ্রসিদ্ধা বিধবা'। বাইরের আড়ম্বর এড়াবার ইচ্ছায় মারী ২১শে এপ্রিল শ্রাদ্ধের দিন ধার্য করলেন। কোনরকম শোকযাত্রা, প্রতিনিধিদের ভিড় বা বক্তৃতার আয়োজন করতে তিনি নিষেধ করলেন এবং সো'-র বাড়িতে পিয়েরকে তাঁর জননীর পাশে সমাধিস্থ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মন্ত্রী আরিস্তিদ ব্রিঅঁ এই নিষেধ অমান্য ক'রে কুরী-পরিবারের সঙ্গে সুদূর

মফঃস্বলের সমাধিস্থান পর্যন্ত পিয়ের-এর কফিনের অনুসরণ করলেন। সাংবাদিকরা সমাধি-স্তম্ভগুলির আড়াল থেকে মোটা ওড়নায় ঢাকা মারীকে লক্ষ্য করতে লাগল :

'...মাদাম কুরী তাঁর বৃদ্ধ শ্বশুরের হাত ধরে স্বামীর কফিনের সঙ্গে চেস্টনাট গাছের ছায়ায় ঘেরা সমাধি-স্থান পর্যন্ত ধীরে, অতি ধীরে হেঁটে গেলেন। সেখানে মুহূর্ত কাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, মুখে এক কঠিন দৃষ্টি : কিন্তু যেই কবরের কাছে এক গোছা ফুল আনা হলো, তিনি হঠাৎ ফুলগুলি নিয়ে কফিন সাজাবার জন্য একটি একটি ক'রে আলাদা করতে লাগলেন।

'ধীর ভাবে নিবিষ্ট চিত্তে আশেপাশের সব ভুলে গিয়ে তিনি ফুল বাছতে লাগলেন, বেদনাহত দর্শকরা নিশ্চল নির্বাক হয়ে দেখতে লাগল।

'শোকানুষ্ঠানের ব্যবস্থাপক ধীরে এগিয়ে এলেন মাদাম কুরীর অনুমতি চাইতে। হঠাৎ যেন চেতনা ফিরে এল, হাতের ফুল মাটিতে ফেলে দিয়ে একটি কথাও না ব'লে মারী আবার ফিরে গেলেন শ্বশুরের পাশে।

('লে জুর্নাল,' এপ্রিল ২২, ১৯০৬)

পরবর্তী কয়েকদিন ধরে বিগত বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধে সরবনে ফরাসী তথা বিদেশী বৈজ্ঞানিক-মহলে, যাঁরাই মনে করতেন পিয়ের তাঁদেরই একজন, সকলের মুখে শুধু তাঁর কথাই শোনা যেতে লাগল। বিজ্ঞান-আকাদেমিতে বন্ধুর স্মৃতিরক্ষা করার জন্য আঁরী পোয়্যাঁকারে বললেন :

'পিয়েরকে যাঁরা জানতেন তাঁরা অবশ্যই তাঁর সুমিষ্ট গম্ভীর বন্ধুপ্রীতি, স্বাভাবিক বিনয়, সত্যনিষ্ঠা এবং মানসিক সৌন্দর্যজাত অপূর্ব মাধুর্যের কথা জানতেন।

'কে বিশ্বাস করবে যে, এত মধুর প্রকৃতির অন্তরালে এমন অনমনীয় দৃঢ়তা বাসা বেঁধে ছিল? যে মহৎ আদর্শের মধ্যে তিনি মানুষ হয়েছিলেন, যে বিশেষ নৈতিক দায়িত্বকে তিনি ভালোবাসতে শিখেছিলেন, আমাদের বর্তমান পৃথিবীর মানদণ্ডে তার প্রতি একান্ত নিষ্ঠা মাত্রাধিক বলে মনে হলেও তিনি এর থেকে এক পা বিচ্যুত হন নি। প্রতিপদে সহস্র দুর্বলতার সঙ্গে আমরা কেমন সহজে আপস ক'রে নিই, সেই আপসের কৌশল তিনি জানতেন না। আদর্শের প্রতি এই যে অতুল নিষ্ঠা, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তার বিচ্যুতি ঘটে নি। সত্যের প্রতি সহজ বিশুদ্ধ অনুরাগ থেকে কেমন ক'রে কর্তব্য সম্বন্ধে উচ্চ দায়িত্ববোধ জন্মায়, পিয়ের তার উজ্জ্বল উদাহরণ আমাদের সামনে রেখে গিয়েছেন। কোন্

দেবতাকে তুমি বিশ্বাস করো সেটা বড় কথা নয়, দেবতা নয়, কেবলমাত্র বিশ্বাস থেকেই অসম্ভব সম্ভব হয়।'

মারীর দিনপঞ্জী :

'...শ্রাদ্ধের পরদিন আইরিনকে সবকথা খুলে বললাম, সে তখন ছিল পেরিনদের বাড়ি। প্রথমটায় কিছু বুঝতে না পেরে বিনা আপত্তিতে আমায় ছেড়ে দিল, কিন্তু পরে বোধহয় কান্নাকাটি ক'রে আমাদের কাছে আসতে চেয়েছিল। বাড়ি ফিরে প্রথমে খুব কাঁদল, তারপর তার ছোট্ট ছোট্ট বন্ধুদের কাছে চলে গেল বোধহয় হালকা হতে। প্রথমে বেশী কিছু জানতে চায় নি, বাবার কথা জিজ্ঞেস করতে ভয় পাচ্ছিল। আমার কালো পোশাকগুলোর দিকে বড় বড় বিপন্ন চোখে তাকিয়ে দেখল, তারপর...তারপর থেকে আর সে তা নিয়ে মাথা ঘামায় নি।

'যোসেফ আর ব্রনিয়া এসেছে। ওরা সবাই বড় ভাল, আইরিন তার জ্যাঠামণি আর মামাদের সঙ্গে খেলা করে। এতসব ঘটনা বিপর্যয়ের মধ্যে ইভ টলমল ক'রে হাঁটতে শিখছে, এখন সারা বাড়িময় হেঁটে বেড়ায়, অজানা আনন্দে হাসে, খেলা করে, প্রত্যেকেই কথা বলে। শুধু আমার চোখের ওপর ভাসে পিয়ের-এর ছবি...মৃত্যুর পরের পিয়ের-এর মুখখানা।

'...পিয়ের, তুমি চলে যাবার পরের রবিবার সকালে প্রথম আমি জ্যাকের সঙ্গে ল্যাবরেটারিতে পা দিলাম। যে গ্রাফ-কাগজের ওপর আমরা দু'জনে কয়েকটা পয়েন্ট তুলতে পেরেছিলাম, তারই জন্য কিছু মাপজোক্ করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার পক্ষে একটুও এগনো সম্ভব হলো না। আমি পথ চলি মন্ত্রমুগ্ধের মতো, কোনো জিনিসের প্রতি দৃষ্টি আমার চলে না। আত্মহত্যা আমি করব না। তেমন কোন বাসনাও আমার নেই। কিন্তু আমার প্রিয়তমের অদৃষ্টের অংশ গ্রহণ করতে পারি এমন কি কোন উপায় নেই?'

কালো পোশাক পরা হিমশীতল, স্বয়ংচালিত যন্ত্রের মতো মারীর গতিবিধি লক্ষ্য করেন বৃদ্ধ শ্বশুর ডাঃ কুরী, পিয়ের-এর দাদা জ্যাক, মারীর দাদা যোসেফ আর দিদি ব্রনিয়া। সকলেই তাঁরা শঙ্কিত। সন্তানদের দেখেও যেন তাঁর মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হতো না। জড় পদার্থের মতো কঠিন, মৃত স্বামীর সঙ্গে মিলিত না হয়েও জীবনের সংস্পর্শ থেকে সরে গেলেন তিনি, জীবিত থেকেও প্রাণহীনা।

কিন্তু জীবন তো তার দাবী ছেড়ে দেবে না, সকলে বিচলিত হয়ে উঠলেন এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মারী অবশ্য তা বুঝলেন

না। পিয়ের-এর আকস্মিক মৃত্যুতে কয়েকটি বড় সমস্যার উদয় হলো। পিয়ের যে গবেষণা আরম্ভ করেছিলেন তার কি গতি হবে? মারীর কি হবে?

মন্ত্রীসভা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়স্বজন এই সব কথা নিয়ে নিম্নকণ্ঠে আলোচনা করলেন। বুলেভার্দ কেলরমান-এ এরা সব যাতায়াত করছিলেন। শেষকৃত্যের পরদিন সরকারের তরফ থেকে সরাসরি প্রস্তাব এল যে, পিয়ের কুরীর পত্নী এবং মেয়েদের জন্য জাতীয় বৃত্তির ব্যবস্থা করা হবে। জ্যাক্ মারীকে এই প্রস্তাবের কথা বলতে তিনি সোজা-সুজি প্রত্যাখ্যান করলেন: 'তার কোন প্রয়োজন হবে না, নিজের এবং বাচ্চাদের খরচটুকু রোজগার করার মতো বয়স আমার যায় নি।'

হঠাৎ যেন গলার জোর ফিরে পেলেন, স্বভাবসিদ্ধ সাহসিকতার প্রথম অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি যেন কানে এল।

কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে কুরী-পরিবারের আলোচনার মধ্যে কেমন যেন দ্বিধার ভাব এসে পড়ল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মারীকে তাঁর নিজস্ব পদে বহাল রাখতে কোন আপত্তি ছিল না কিন্তু পদটির সংজ্ঞা নিয়ে সমস্যা হলো। কোন্ ল্যাবরেটারিতে তাঁকে স্থান দেওয়া যায়? যে-কোনো ল্যাবরেটারির প্রধানের অধীনে কি এই অসীম প্রতিভাসম্পন্না নারী-বিজ্ঞানীকে নিযুক্ত করা সঙ্গত হবে? তাছাড়া পিয়ের কুরীর ল্যাবরেটারি পরিচালনা করার মতো উপযুক্ত প্রফেসর কই?

মাদাম কুরীর কি ইচ্ছা জানতে গিয়ে শোনা গেল তিনি এখনও ঠিক মতো ভাবতে পারছেন না, এক্ষুণি কিছু বলতে পারবেন না···

জ্যাক্ কুরী, ব্রনিয়া ও পিয়ের-এর সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু জর্জ গোয়া অনুভব করলেন যে, এক্ষেত্রে মারীর হয়ে তাঁদেরই কিছু একটা স্থির ক'রে দিতে হবে। জ্যাক্ কুরী ও জর্জ গোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষকে তাঁদের সিদ্ধান্ত জানালেন: পিয়ের ও মারী দু'জনে যে কাজ শুরু করেছিলেন, ফরাসী বৈজ্ঞানিক-মহলে একমাত্র মারীর পক্ষেই তার ছিন্ন সূত্র তুলে নেওয়া সম্ভব। মারীই একমাত্র পিয়ের-এর আসনে শিক্ষকতা করার উপযুক্ত উত্তরাধিকারিণী। ল্যাবরেটারিতে স্বামীর জায়গায় থেকে পরিচালনা করার দায়িত্ব একমাত্র মারীর পক্ষেই নেওয়া সম্ভব। ঐতিহ্য এবং প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম ক'রেও মারীকে সরবনে প্রফেসরের আসন দেওয়া উচিত।'

মার্সাল্যা বের্তেলো, পোল-আপ্পেল এবং সহ-অধ্যক্ষ লিয়ার্দের আন্তরিক

চেষ্টায় কর্তৃপক্ষ এক্ষেত্রে সহজ ও সদাশয় ব্যবহার করলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে বিজ্ঞানী অধ্যাপকবৃন্দ এক যোগে স্থির করলেন যে, পিয়ের-এর জন্ত নির্ধারিত আসন মারীকেই দেওয়া হবে এবং তাঁকে "শার্জে দ্য কুর" পদবীতে ভূষিত করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রস্তাব গেল মাদাম কুরীর কাছে :

॥ ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয় ॥

"মাদাম পিয়ের কুরী, ডক্টর-অব-সায়েন্স-কে পারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগীয় অধ্যাপকমণ্ডলীতে গবেষণা কার্যের প্রধান পরিচালিকা হিসেবে ঐ বিভাগের পদার্থবিদ্যা শিক্ষকতার দায়িত্ব দেওয়া হইল।

"এই পদের বাৎসরিক পারিশ্রমিক তিনি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১লা মে হইতে দশ সহস্র ফ্রাঙ্ক পাইবেন।"

ফরাসী উচ্চ শিক্ষা বিভাগে এই সর্বপ্রথম নারীর প্রবেশাধিকার লাভ। অন্যমনস্কভাবে উদাসীন মুখে মারী তাঁর শ্বশুরের মুখে এই কঠিন দায়িত্বের কথা শুনলেন—এখন তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করার অপেক্ষা। চারটি কথায় তিনি জবাব দিলেন : 'আমি চেষ্টা ক'রে দেখব।'

একসময়ে পিয়ের একটি কথা বলতেন এবং সেই কথাটি এখন বেদবাক্যের মতো মারীর স্মৃতিপথে উদিত হয়ে পথনির্দেশ করল : 'যাই হোক্ না কেন, যদি নিজের দেহকে প্রাণহীন বলেও মনে হয়, তবু কাজ ক'রে যেতেই হবে।'

মারীর দিনপঞ্জী থেকে :

'আমার পিয়ের, এরা আমায় তোমার জায়গায় তুলে দিতে চায়। আমি রাজী হলাম। ভাল করলাম, কি মন্দ করলাম, তা জানি না। তুমি প্রায়ই বলতে যে সরবনে আমি পড়াতে পারি এ তোমার বহুকালের ইচ্ছে। তাছাড়া তোমার কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে আমি চেষ্টা করব। মাঝে মাঝে মনে হয়, এই একটি মাত্র উপায়ে আমার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব, আবার ভাবছি এতবড় কাজ হাতে নিতে যাচ্ছি—আমি কি পাগল হলাম !'

১৯০৬-এর ৭ই মে :

'পিয়ের, আমি সারাক্ষণ তোমার কথা ভাবি, আমার মাথা ফেটে যাবে, মনে হয়, বুদ্ধিরও ঠিক নেই। আমি বুঝতে পারছি না এখন থেকে চিরটা কাল তোমার মুখ না দেখে, আমার প্রাণপ্রতিমের সঙ্গে হাসি-গল্প না ক'রে আমি বাঁচব কি ক'রে ?

'দু'দিন হ'লো গাছে নতুন পাতা গজিয়েছে, বাগানটি অপরূপ দেখাচ্ছে।

আজ সকালে ওখানে বাচ্চাদের দেখলাম। আমি ভাবলাম তোমার চোখেও বাগানটি খুব সুন্দর মনে হতো। তুমি আমায় ফুটন্ত পেরিউইঙ্কল আর নার্সিসাস দেখতে ডাকতে। গতকাল সমাধির গায়ে খোদাই করা 'পিয়ের কুরী' শব্দটির তাৎপর্য আমার দুর্বোধ্য ঠেকেছে, গ্রাম্য-সৌন্দর্য সহ্য করা অসম্ভব বোধ হওয়ায় আমি আমার ভেল্ খানা দিয়ে মুখ ঢেকে নিলাম, যাতে আবরণের ভেতর দিয়ে সবকিছু দেখতে পাই।'

১১ই মে:

'আমার পিয়ের, আজ অন্যদিনের তুলনায় অনেক শান্ত হয়ে, ভাল ক'রে ঘুমিয়ে উঠলাম। সে প্রায় মিনিট পঁচিশেক আগের কথা। এখন আবার বুনো জানোয়ারের মতো চিৎকার করতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

১৪ই মে:

'ছোট্ট পিয়ের আমার, লাবুর্নাম ফুটেছে—এই কথাটি তোমায় জানাতে এলাম; উইস্টারিয়া, হথর্ন, আইরিস্ সকলেই ফোটার মুখে—তুমি দেখলে কত যে খুশি হতে!

'তোমায় আরও একটা কথা বলার আছে। আমায় তোমার আসনে বসানো হয়েছে এবং কয়েকজন মূর্খ আমায় অভিনন্দন জানাতে এসেছে।

'শোন, আজকাল আমার সূর্যের আলো, ফুল কিছুই ভাল লাগে না। ওদের দেখলে আমার কষ্ট যেন বাড়ে। শুধু বাচ্চাদের মুখ চেয়ে পরিষ্কার দিনগুলোকে ঘৃণা করতে পারি না, নইলে তুমি যেমন দিনে আমায় ছেড়ে চলে গেলে, তেমনি আঁধার-ঘেরা দিনেই আমি যেন স্বস্তি পাই।'

২২শে মে:

'সারাদিন ল্যাবরেটারিতে কাজ করি; এইটুকুই আমার দ্বারা সম্ভব। এখানেই সবচেয়ে শান্তি পাই। বিজ্ঞানের কাজ ছাড়া আমার আর কিছুই ভাল লাগে না, ভাল লাগার মতো আর কিছু যে আছে, এ আমার ধারণার অতীত, এমন কি, এখানেই যদি আমি সফল হই, তোমায় না জানাবার দুঃখ আমার সইবে না।'

১০ই জুন:

'চারিদিক অন্ধকার। জীবনের কর্তব্যের বোঝা নিশ্চিন্তে আমার পিয়ের-এর কথা ভাববার অবসরটুকু আমায় দেয় না।...'

জ্যাক কুরী ও যোসেফ শ্‌ক্লোদোভ্‌স্কি প্যারী থেকে বিদায় নিলেন। শিগগিরই ব্রনিয়াকে জাকোপেন-এ তাঁর স্বামীর হাসপাতালে ফিরে যেতে হবে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা মারী তাঁর দিদিকে ডেকে নিয়ে এলেন। দুই বোনের একসঙ্গে দিন কাটানোর দিন ফুরিয়ে আসছিল। ব্রনিয়াকে তাঁর শোবার ঘরে মারী ডেকে আনলেন। গ্রীষ্মের মধ্যেও সেই ঘরে দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলছে, মারী ভেতর থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। অবাক হয়ে ব্রনিয়া বোনটির দিকে চেয়ে রইলেন। সে-মুখখানা আরও সাদা আরও রক্তশূন্য দেখাচ্ছিল। কোন কথা না ব'লে মারী আলমারির ভেতর থেকে ওয়াটারপ্রুফ কাগজের একখানা প্রকাণ্ড মোড়ক বের করলেন। তারপর আগুনের সামনে ব'সে প'ড়ে দিদিকে ইশারায় বসতে বললেন। উনুনের কাছেই একখানা কাঁচি রাখা ছিল।

ফিস্‌ফিস্ ক'রে মারী বললেন: 'দিদিভাই, আমায় সাহায্য কর।' ধীরে ধীরে দড়ি আল্‌গা ক'রে মোড়কটা খুলে ফেললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রনিয়া আতঙ্কে চিৎকার করতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলেন। পুঁটলির মধ্যে বীভৎস একরাশ কাদামাখা, রক্তের কালো দাগ লাগা পোশাক। রু-দ প্যাঁ-য়ে লরি-চাপা পড়ার সময়ে পিয়ের-এর গায়ে যে পোশাক ছিল, মারী এতদিন সযত্নে তা' নিজের কাছে রেখেছিলেন।

নিঃশব্দে মারী কাঁচি দিয়ে কালো কোটখানা কাটতে লাগলেন। একটি একটি ক'রে কাটা টুকরোগুলি আগুনে ফেলেন এবং সেগুলি যতক্ষণ না পুড়ে ছাই হয়ে ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে গেল, ততক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ ক্লান্ত অশ্রুরাশিকে বাধা দেবার নিষ্ফল প্রয়াসের মাঝখানে থম্‌কে থেমে গেলেন। আধশুকনো কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে কি যেন খানিকটা অর্ধতরল পদার্থ: কয়েক সপ্তাহ আগে কত মহৎ কল্পনারাজি এবং প্রতিভা-সম্ভূত আবিষ্কারের সূতিকাগার ছিল যে অপূর্ব মস্তিষ্কটি এ তারই অবশিষ্টাংশ মাত্র!

নিবিষ্টচিত্তে মারী এই দূষিত পদার্থটিকে দেখতে লাগলেন, স্পর্শ ক'রে, চুম্বন ক'রে আকুল হলেন, শেষ পর্যন্ত ব্রনিয়া জোর ক'রে কাপড়টা তাঁর হাত থেকে টেনে নিয়ে কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে আগুনে ফেলতে লাগলেন।

শেষ অবধি কাজ ফুরলো। দুই নারীর মধ্যে একটি কথাও হলো না। জড়ানো কাগজটা, কাপড়টা, হাত মোছা-তোয়ালেখানা এক এক ক'রে সবগুলি আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে গেল।

দম বন্ধ হয়ে আসছে এমনি গলায় মারী ভেঙ্গে প'ড়ে বললেন: 'যে সে এসব জিনিসে হাত দেবে, এ আমার সইত না।' তারপর ক্ষণকাল পরে আবার

বললেন : 'এখন বলো, আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকব। আমি জানি, বাঁচতে আমায় হবেই, কিন্তু কি ক'রে ? আমি কি করব ?'

বুকফাটা কান্না, কাশি, চোখের জল আর আর্তনাদে ভেঙে প'ড়ে তিনি ব্রনিয়ার বুকে আশ্রয় নিলেন, দিদি তাঁকে শান্ত ক'রে রাতের পোশাক পরিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন, হতভাগিনী তাঁর সহ্য-শক্তির শেষ সীমায় পৌঁছেছিলেন।

পরদিন সকাল থেকে মারী আবার সেই হিমশীতল যন্ত্রের আবরণে আশ্রয় নিলেন, ১৯শে এপ্রিল থেকে মারীর জায়গায় এঁকেই আমরা দেখতে পাই। ব্রনিয়া ওয়ার্‌স'র ট্রেনে ওঠার সময়ে এই 'যন্ত্র'টিকেই বুকে টেনে নিয়েছিলেন। বহুক্ষণ পর্যন্ত স্টেশন প্ল্যাটফর্মে ওড়না ঢাকা এই যন্ত্রে পরিণত মারীর চেহারাখানা ব্রনিয়ার দৃষ্টি আচ্ছন্ন ক'রে রাখল।

বাড়িতে আবার একপ্রকার 'স্বাভাবিক জীবন'-এর গতি ফিরে এল, পিয়ের-এর স্মৃতি এখনও এত সজীব যে, সন্ধ্যাবেলা অনেক সময়ে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে ক্ষণেকের জন্য মারীর মনে হতো দুর্ঘটনাটি দুঃস্বপ্নমাত্র, এক্ষুণি পিয়েরকে ঘরের মধ্যে দেখা যাবে ; চারপাশে ছোট-বড় সকলেরই মুখের ওপর কেমন যেন প্রত্যাশার ছায়া। পরিকল্পনা, ভবিষ্যতের একটা সঙ্কল্প যেন তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যাবে। শোকে জর্জরিতা আটত্রিশ বছরের এই মহিলা এখন থেকে পরিবারের কর্ত্রী।

সঙ্কল্প তিনি স্থির ক'রে নিলেন। গ্রীষ্মকালে পারীতে থেকে যে শিক্ষকতার দায়িত্ব নিয়েছেন, তার জন্য নিজে প্রস্তুত হবেন। সরবনে তাঁর অধ্যাপনার কাজ পিয়ের-এর উপযুক্ত হওয়া চাই। মারী বই প'ড়ে, নিজের ও স্বামীর নোট প'ড়ে নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নিলেন। আবার তিনি পড়ার মধ্যে ডুবে গেলেন।

এই বিষণ্ণ ছুটিতে মেয়েরা শহর থেকে দূরে খেলা ক'রে বেড়াল : ইর্ভ গেল তার ঠাকুরদাদার সঙ্গে স্যাঁ-রেমি লে শেভর‍্যজ-এ, এবং আইরিন গেল সমুদ্রতীরে ভোকত্-এ মেজমাসীমা হেলা জালের তত্ত্বাবধানে। মারীর এই মেজবোনটি তাঁকে সাহায্য করার ইচ্ছায় গ্রীষ্মকালটা ফ্রান্সে কাটানো স্থির করেছিলেন। শরৎকালে বুলেভার্দ কেলরমানের বাস অসহ্য হওয়ায় মারী নতুন কোথাও গিয়ে থাকতে চাইলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত সো'য় যাওয়াই স্থির করলেন, সেখানেই তো পিয়ের-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, সেখানেই তো আজও তিনি আছেন।

এ পর্যন্ত ব্যবস্থা হলে বৃদ্ধ শ্বশুর ডাঃ কুরী তাঁর জীবনে এই সর্বপ্রথম নিজে এগিয়ে এসে পুত্রবধূকে বললেন : 'মা, এখন যখন পিয়ের নেই, তখন একজন বুড়োমানুষের সঙ্গে সারা জীবন তোমার আবদ্ধ হয়ে থাকার কোন মানে হয় না। আমি একা থাকতে পারব, কিংবা আমার বড় ছেলের কাছে গিয়েও থাকতে পারব। তুমি ভেবে দেখ!'

মারী ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললেন : 'আপনি বলুন, বাবা! আপনি চলে গেলে আমার নিজের কষ্ট হবে ঠিকই, কিন্তু আপনার যা' অভিরুচি তাই করবেন...'

উদ্বেগে তাঁর কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে পড়ল। এই বন্ধু এবং পরম ভরসাস্থল সাথীটিকেও শেষ অবধি হারাতে হবে? ডাক্তার কুরীর পক্ষে এক বিদেশিনী, পোলদেশীয়া মেয়েকে পাহারা দিয়ে পড়ে থাকার চেয়ে বড় ছেলে জ্যাকের কাছে থাকা অনেক বেশী বাঞ্ছনীয় হবার কথা। কিন্তু...

'মারী মা, আমার ইচ্ছের কথা যদি বলো, তবে আমি চিরদিন তোমার কাছেই থাকতে চাই।' মনের পুঞ্জীভূত আবেগ গোপন করার ইচ্ছায় 'তুমি যখন চাইছ'—কথাকটি জুড়ে দিলেন। তারপর চট ক'রে পেছন ফিরে বাগানে চলে গেলেন, নাতনীর উচ্ছ্বসিত আনন্দধ্বনি সেখান থেকে তাঁকে ডাকছিল।

কুরী-পরিবার বলতে এখন দাঁড়াল এক বিধবা, উনআশি বছরের এক বৃদ্ধ, একটি ছোট্ট মেয়ে আর একটি শিশু।

আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের বিধবা পত্নী, যিনি বর্তমানে সরবনে তাঁর স্বামীর আসনে উন্নীত হয়েছেন, তিনি ১৫ই নভেম্বর, ১৯০৬, সোমবার, বেলা দেড়টার সময়ে প্রথম বক্তৃতা দেবেন।

মাদাম কুরী তাঁর প্রথম বক্তৃতায় গ্যাসের পরমাণু বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করবেন এবং তেজস্ক্রিয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করবেন।

বক্তৃতা-সভাঘরে মাদাম কুরীর বক্তৃতার ব্যবস্থা হলো। এই ঘরে প্রায় একশ কুড়িটি চেয়ার থাকে—অধিকাংশ ছাত্রদের জন্য, জনসাধারণ এবং সংবাদ-পত্রের তরফ থেকে যাঁরা আসবেন, তাঁদের জন্য কুড়িখানা চেয়ারের ব্যবস্থা হলো। এই বিশেষ উপলক্ষে সরবনের ইতিহাসে সেই চিরাচরিত রীতি বর্জন ক'রে মাদাম কুরীর প্রথম বক্তৃতার জন্য বিরাট গ্যালারি-ঘরখানা কি ছেড়ে দেওয়া যায় না?

সমসাময়িক সংবাদপত্রাদিতে এই জাতীয় মন্তব্য পড়ে বোঝা শক্ত নয় যে,

কী পরিমাণ আগ্রহ ও অধৈর্যের সঙ্গে প্যারীর জনসাধারণ 'স্বনামধন্যা বিধবা নারীর' প্রথম আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করেছিল।

সাংবাদিকেরা, সমাজের শীর্ষস্থানীয়েরা, সুন্দরীরদল এবং শিল্পকলাবিদেরা— সবাই মিলে বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলীকে চতুর্দিক থেকে ব্যস্ত ক'রে তুলল, 'আমন্ত্রণ-পত্র' না পেয়ে চটে উঠল, অবশ্য এদের অদম্য উৎসাহের মধ্যে না ছিল সমবেদনা, না ছিল জ্ঞানপিপাসা। 'গ্যাসের মধ্যেকার আয়নতত্ত্বে'-র জন্য আদৌ মাথা ব্যথা ছিল না এদের, এই চরম দুর্দিনে মারীর যন্ত্রণা তাদের কৌতূহলের খোরাক জোগাবে মাত্র!

সরবনে সর্বপ্রথম যিনি বক্তৃতা দেবেন, তিনি একাধারে প্রতিভাময়ী নারী ও শোকসন্তপ্তা পত্নী। শুধুমাত্র এই কারণেই নাটকপ্রিয় লোকগুলো এই বিরাট উপলক্ষে ছুটে এসেছিল।

দুপুরে মারী সো'-এ তাঁর স্বামীর সমাধির কাছে গিয়ে, যাঁর আসনে আজ থেকে তিনি বসবেন, সেই অগ্রগামী মহাপুরুষের সঙ্গে নিম্নকণ্ঠে কথা বলছিলেন। ওদিকে গ্যালারি ঘরখানা দখল ক'রে, ফ্যাকাল্‌টি-অব্‌-সায়েন্স-এর যাতায়াতের পথগুলি পরিপূর্ণ ক'রে, বাইরের মাঠটা পর্যন্ত ভরে অপেক্ষা করছে বহু লোক। ঘরের মধ্যে পাশাপাশি বিদগ্ধ আর অজ্ঞ জনের ভিড়, মারীর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা এদিক সেদিক ছড়িয়ে আছেন। অথচ যারা সত্যিই ছাত্র, যারা মারীর বক্তৃতার নোট নিতে এসেছে, তাদের অবস্থাই হলো সবচেয়ে শোচনীয়, কোনরকমে আসন অধিকার ক'রে বসে আছে পাছে জায়গাটুকুও বেহাত হয়ে যায়।

একটা বেজে পঁচিশ মিনিট, কথাবার্তা থম্‌থমে হয়ে এসেছে। ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে কথা চলছে, প্রশ্নের আদানপ্রদান হচ্ছে, বকের মতো ঘাড় উঁচু ক'রে বসে আছে সব যাতে মাদাম কুরীর আবির্ভাবের এতটুকু চোখ এড়িয়ে না যায়! সকলেরই এই হলো মনের কথা, নতুন প্রফেসর প্রথমে কি বলবেন,—সরবনে গুণীজ্ঞানী অধ্যাপকদের মধ্যে আজই প্রথম একমাত্র নারী আসছেন বক্তৃতা দিতে। তিনি কি মন্ত্রীসভাকে আর বিশ্ববিদ্যালয়কে ধন্যবাদ দেবেন? তিনি কি পিয়ের কুরীর কথা বলবেন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলবেন: প্রাক্তন অধ্যাপকের বন্দনা দিয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করার রেওয়াজই তো এতকাল চলে এসেছে। কিন্তু আজকের দিনে যিনি এই সম্মানিত পদের পূর্বতন অধিকারী, তিনি যে নবগতার স্বামী, তাঁর কর্ম-সহচর ছিলেন। কি কঠিন সমস্যা! এ এক অনন্য-সাধারণ, রোমাঞ্চকর মুহূর্ত…

বেলা দেড়টা···পেছনের দরজা খুলে গেল, উচ্ছ্বসিত অভ্যর্থনার ঝড় উঠল। মাদাম কুরী চেয়ারের দিকে এগিয়ে গেলেন। প্রতি-নমস্কারের ভঙ্গীতে সামান্য একটু মাথা নীচু করলেন। ঘরখানা যন্ত্রপাতিতে ভরা; লম্বা টানা টেবিলের প্রান্ত শক্ত হাতে ধরে অভিনন্দনের ঢেউ থেমে যাবার অপেক্ষা করলেন। হঠাৎ সব গোলমেলে ঠেকল, নতুন কিছু দেখার আগ্রহে যারা এসেছিল, এই রক্ত-ছটাহীন মুখের চেষ্টালব্ধ স্থৈর্যের সামনে কী যেন অজানা আবেগে তারা স্তব্ধ হয়ে গেল।

মারী সোজা সামনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন:

'পদার্থবিদ্যার গত দশবছরের ইতিহাস অনুধাবন ক'রে আমরা বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করি, বিদ্যুৎ ও মৌলিক পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কি পর্যন্ত প্রগতির পথে অগ্রসর হয়েছে···'

পিয়ের কুরী যেখানে তাঁর শেষ-বক্তৃতা শেষ করেছিলেন, মাদাম কুরী নির্ভুল ভাবে সেই ছিন্নসূত্রটি তুলে নিয়ে তারপর থেকে তাঁর প্রথম বক্তৃতা আরম্ভ করলেন।

একভাবে, কঠিন ভাবলেশহীন কণ্ঠে, বৈজ্ঞানিক সেদিন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। বৈদ্যুতিক শক্তি সাংগাঠনিক নতুন নিয়মাবলি, আণবিক বিভক্তিকরণ, রেডিয়মরশ্মি বিচ্ছুরণকারী পদার্থ—এই সব বিষয়ে তিনি আলোচনা করলেন। তিনি অবিচলিত ভাবে স্বীয় কর্তব্য পালন ক'রে গেলেন, তারপর যেমন এসেছিলেন তেমনি দ্রুত পায়ে পিছনের ছোট দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

তৃতীয় ভাগ

॥ একাকিনী ॥

১৭

স্বামীর পাশে থেকে যখন মারী সংসার সামলে ঐ অতবড় বৈজ্ঞানিক কাজ করেছিলেন, তখন আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করেছি। এর চেয়েও কঠিনতর জীবন যাপন অথবা আরও বেশী শক্ত কাজ তাঁর দ্বারা সম্ভব হতে পারে, সেকথা তখন আমরা ভাবি নি।

সামনে যে কঠিন জীবন অপেক্ষা করছিল, এখন মনে হয়, তার তুলনায় পূর্বজীবন অনেক বেশী সহনীয় ছিল। "স্বামী হারা মাদাম কুরী"র দায়িত্ব-বোধ দেখে শক্তসমর্থ হাসিখুশি স্বভাবের সাহসী পুরুষও ঘাবড়ে যাবে।

একাধারে দু'টি সন্তানকে মানুষ করা, তাদের এবং নিজের খরচের সংস্থান করা এবং অধ্যাপকের দায়িত্ব সার্থকভাবে পালন করা—সব তাঁর ঘাড়ে এসে পড়েছিল। পিয়ের কুরীর অভিজ্ঞ সহায়তা আর এখন নেই কিন্তু রয়েছে তাঁদের দুইয়ের আরব্ধ গবেষণার কাজ, এবং তা' তাঁকে একলাই চালাতে হবে। তাঁর সহকারী এবং ছাত্রদের আদর্শ বলুন, পরামর্শ বলুন, সবই তাঁকেই দিতে হবে। একটি বড় কাজ তবুও বাকী রইল। পিয়ের-এর স্বপ্ন সফল করতে হবে। একখানা মস্ত ল্যাবরেটারি তৈরি ক'রে অল্পবয়সী গবেষকদের সাহায্যে রেডিও-এ্যাক্টিভিটির নতুন বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

প্রথমে মেয়েদের ও বৃদ্ধ শ্বশুরের জন্য ভাল একটি বাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে। সো'র ৬ নং রু-দ্য-শ্যাম্‌'া দ্য ফেয়র-এ চলনসই বাগিচা সম্বলিত সাদামাটা বাড়ি একখানা তিনি ভাড়া করলেন। আইরিন খুব খুশি হয়ে একখণ্ড জমি দখল ক'রে বসল, সেখানে সে ইচ্ছেমত বাগান করবে। ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে ইভ তার প্রিয় কচ্ছপের সন্ধানে ঘাস চষে ফেলল আর সরু পায়ে চলা-পথ ধরে কালো আর ডোরা-কাটা বেড়ালটার পেছন পেছন দৌড়ে বেড়াল।

এই ব্যবস্থাতে মাদাম কুরীর পরিশ্রম আরও একটু বাড়ল, ল্যাবরেটারি থেকে আধঘণ্টা ট্রেনে ক'রে তাঁকে বাড়ি পৌছতে হতো। প্রতিদিন সকালে তাঁকে দ্রুত পা ফেলে স্টেশনের দিকে হেঁটে যেতে দেখা যেত—যেন কোন

গাফিলতি সেরে নিতে হবে, যেন কোন কাজের তাগিদে এগিয়ে চলেছেন। একই দুর্গন্ধময় ট্রেনের একই সেকেণ্ডক্লাস কামরায় বৈধব্যের কালো পোশাক পরা মহিলাকে যাতায়াত করতে দেখে ক্রমে ক্রমে সহযাত্রীরা এঁকে চিনে নিল।

সো'র ফিরে দুপুরে খাওয়ার সময় তাঁর প্রায়ই হতো না। পুরোনো ল্যাটিন-কোয়ার্টারে দুধ-মিষ্টির দোকানীর সঙ্গে আবার তিনি বন্ধুত্ব ঝালিয়ে নিলেন। সেকালে তিনি আজকের মতোই একা ছিলেন—তফাৎ শুধু সেদিন বয়স ছিল কাঁচা, মনে ছিল অজানা আশা। কিংবা হয়তো জিনিস পত্রে বোঝাই ল্যাবরেটারির এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করতে করতে এক টুকরো পাঁউরুটি কিংবা ফল চিবিয়ে নিতেন।

সন্ধ্যেবেলা প্রায়ই অনেক রাত্রে ট্রেন ধরে তিনি বাড়ি ফিরতেন। শীতকালে প্রথম চিন্তা ছিল বাইরের ঘরে প্রকাণ্ড স্টোভখানা ঠিক আছে কিনা তাতে নতুন ক'রে কয়লা দিয়ে, বাতাসের মুখ ঠিক ক'রে দিয়ে তবে শান্তি। আগুন জ্বলতে শুরু হলে সোফার ওপর গা এলিয়ে দিয়ে মারী সারাদিনের ক্লান্তি জুড়োতেন।

অত্যধিক চাপা স্বভাবের দরুণ মনের দুঃখ তার প্রকাশ হতো না বিশেষ। চোখের জল তাঁর বেরোত না কোনদিন কারুর সামনে, কারুর সান্ত্বনাবাণী, করুণা সহ্য তিনি করতে পারবেন না। নিরাশায় বুকভাঙা কান্না বা বিনিদ্র রজনীর ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের কথাও কেউ জানত না। কিন্তু যখন বিশেষ কোন দিকে লক্ষ্য না করেও হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি স্থির হয়ে আসত, হাত দুটি নিজের অজান্তে নড়তে শুরু করত, অসংখ্য রেডিয়ম-দগ্ধে চিহ্নিত আঙুলগুলি স্নায়বিক দুর্বলতায় পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধাত, তখন আশে-পাশের আত্মীয়-স্বজন তাঁর জন্য অস্বস্তি বোধ করতেন।

মাঝে মাঝে সহ্য-শক্তি এমন হঠাৎ আয়ত্বের বাইরে চলে যেত যে, তিনি মেয়েদের নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দেবার অবসরটুকুও পেতেন না। আমার অতি শৈশবের স্মৃতিগুলির মধ্যে একবারের কথা এখনও স্পষ্ট মনে আছে। —মা অজ্ঞান অবস্থায় সো'-র খাবার ঘরের মেঝেতে পড়ে আছেন, অসম্ভব ফ্যাকাশে তাঁর মুখ, স্থির দেহ।

১৯০৭ সালে মারী তাঁর বাল্যবন্ধু কাজিয়াকে লেখেন :

'প্রিয় কাজিয়া, তোর কাছ থেকে ম'সিয়ে 'ক' এসেছিলেন, কিন্তু আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি নি। যেদিন তিনি এলেন, সেদিন অত্যন্ত অসুস্থ ছিলাম—আজকাল প্রায়ই এরকম হয়। আমার শ্বশুর মশাই ডাক্তার, তিনি

আমায় কারো সঙ্গে দেখা করতে নিষেধ করেছেন, কারণ কথা বললে আমার বিশেষ কষ্ট হয়।

'আর কি লিখব? আমার জীবনে এমন বিপর্যয় ঘটে গেল যে, সারা জীবনেও তা সংশোধিত হবার কোন উপায় নেই। মনে হয় এই ভাবেই কেটে যাবে, অন্ততঃ আমার দিক থেকে এর মোড় ফেরাবার কোন চেষ্টা থাকবে না। সন্তানদের যথাসম্ভব ভালভাবে মানুষ করতে চাই, কিন্তু তারাও আমার মনে কোন সাড়া জাগাতে পারে না। দু'জনেই খুব লক্ষ্মী, মিষ্টি আর বেশ সুন্দর হয়েছে। যথার্থ সুস্থ দেহে ও মনে যাতে এরা বড় হয়ে ওঠে—তার জন্য আমি প্রাণপন চেষ্টা করছি। কোলেরটির বয়স হিসেব ক'রে দেখেছি, ওদের মানুষ হতে আরও কুড়ি বছর সময় লাগবে। জানিনা ততদিন বেঁচে থাকব কিনা, কারণ আমার জীবন অত্যধিক পরিশ্রমে শ্রান্ত এবং শক্তি ও স্বাস্থ্যের ওপর শোকের জুলুমও তো কম নয়।

'আর্থিক সচ্ছলতা পেয়েছি। সন্তানদের মানুষ করার পক্ষে যথেষ্ট অর্থ আমি উপার্জন করি, যদিও স্বামী বেঁচে থাকতে যেমন ছিলাম তার চেয়ে অনেকটা ব্যায় সঙ্কোচ করতে হয়েছে।'

জীবনের আঁধারতম মুহূর্তগুলিতে দু'জন মানুষের সান্নিধ্যে মারী কিছু শান্তি পেতেন। এঁদের একজন ছিলেন মারিয়া কামিএন্স্কা—যোসেফ শ্ক্লোদোভ্স্কির শ্যালিকা। নম্র-মধুর স্বভাবা এই রমণীকে ব্রনিয়া কুরী-পরিবারে সাহায্যকারিণীর পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। নিজের দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বেদনা মারীকে সর্বদাই পীড়া দিত। এই মহিলার উপস্থিতি মারীর সে-দুঃখ কিছুটা লাঘব করেছিল। শারীরিক অসুস্থতায় বাধ্য হয়ে যখন মাদমোয়াজেল কামিএন্স্কা ওয়ারসয় ফিরে গেলেন তখন সে-জায়গায় আইরিন ও ইভের জন্য যে সব পোল দেশীয়া ধাত্রী নিযুক্ত করা হয়, তাঁদের মধ্যে এঁর মতো নির্ভরযোগ্য বা মধুর স্বভাবের কেউই ছিলেন না।

মারীর অন্যতম পরম বন্ধু ছিলেন ডাঃ কুরী স্বয়ং। পিয়ের-এর মৃত্যুতে তিনি যৎপরোনাস্তি মর্মাহত হয়েছিলেন, কিন্তু ভদ্র: লাক তাঁর কঠোর যুক্তিবাদের সাহায্যে কোথায় যেন একটা সাহস সঞ্চয় করেছিলেন, যা মারী পারেন নি। বন্ধ্যা-বেদনা ও শ্মশান-বৈরাগ্যের প্রতি তাঁর ছিল বিতৃষ্ণা।

পুত্রের শেষকৃত্যের পর আর কোনদিন তিনি সমাধিতে ফিরে যান নি। পিয়ের-এর যখন এতটুকু কিছু অবশিষ্ট রইল না, তখন তার স্মৃতির পীড়নে নিজেকে পীড়িত হতে দিলেন না।

তাঁর এই নির্লিপ্ততা মারীর ওপর কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করল। সাধারণ কথাবার্তা হাসিগল্পের মধ্যে স্বাভাবিক জীবন-যাপনে বদ্ধপরিকর বৃদ্ধ শ্বশুরের সামনে মারী নিজের এই শোকার্ত চেহারা নিয়ে দাঁড়াতে লজ্জায় পড়ে গেলেন এবং ফলে বাইরে শান্ত ভাব প্রকাশের চেষ্টা করতে লাগলেন।

ডাক্তার কুরীর উপস্থিতি মারীর কাছে যেমন সান্ত্বনাদায়ক, শিশুদের কাছেও তেমনি আনন্দের। বৃদ্ধের চোখ দু'টো ছিল নীল। ইনি না থাকলে শিশুরা বিষণ্ণ আবহাওয়ায় দম বন্ধ হয়ে মরত। তিনিই তাদের খেলার সাথী এবং মায়ের চেয়েও বড় গুরু ছিলেন কারণ, সেই কোথায় ল্যাবরেটারি ব'লে কি যেন নাম ওরা সারাক্ষণই শোনে, সেখানেই তো মা'কে বেশীরভাগ সময় থাকতে হয়। আন্তরিক যোগাযোগ হওয়ার পক্ষে ইভ খুবই ছোট কিন্তু বড় নাতনীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কোন তুলনা হয় না, ঠিক যেন তাঁর হারানো ছেলে, তেমনি ধীর স্থির, তেমনি বেপরোয়া।

প্রকৃতি-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ্-বিদ্যার গোড়ার কথা দিয়ে শুরু ক'রে তিনি আইরিনকে ভিক্টর হিউগো পড়ালেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে বসে বসে চিঠি লেখাতে শেখালেন; যুক্তিপূর্ণ শিক্ষনীয় কৌতুকমাখা চিঠির মধ্যে তাঁর নিজের সুর এবং লেখার অপূর্ব ভঙ্গী ধরা পড়ত। তার শিক্ষা-সংস্কৃতির পথ নির্দেশ ক'রে দিলেন। বর্তমানের আইরিন জোলিও-কুরীর মানসিক ভারসাম্য, যন্ত্রণার প্রতি আতঙ্ক, বাস্তবের প্রতি প্রচণ্ড অনুরাগ, ধর্মের প্রতি বীতরাগ, এমনকি রাজনৈতিক মতবাদ পর্যন্ত ঠাকুরদাদার কাছ থেকে পাওয়া।

এই চমৎকার মানুষটির কাছে নিজের ঋণ মারী পরম মমতা ও একাগ্র শ্রদ্ধা দিয়ে শোধ দিতেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ফুসফুসে সর্দি বসে ঠাকুরদাদাকে প্রায় গোটা বছরটাই বিছানায় পড়ে থাকতে হলো। অবসরের প্রতিটি মুহূর্ত মারী এই অবাধ্য অস্থির বৃদ্ধ রোগীর পাশে বসে তাঁকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করতেন।

১৯১০-এর ২৫শে ফেব্রুয়ারি বৃদ্ধ মারা গেলেন। সো'র সমাধির উপর তখন বরফ জমে ছিল। যারা কবর খুঁড়ছিল, তাদের মারী হঠাৎ একটা বাড়তি কাজের আদেশ দিলেন, পিয়ের-এর কফিনটা বের ক'রে ডাক্তার কুরীর কফিনটি সেখানে দিয়ে, তার উপর পিয়ের-এর খানা রাখতে বললেন। মৃত্যুর পরেও

তিনি স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চান নি ; পিয়ের-এর কফিনের ওপরেই যেন তাঁকে শোয়ানো হয়, এই ছিল তাঁর বহুদিনের সাধ।

বৃদ্ধ শ্বশুরের মৃত্যুর পর এতদিনে আইরিন ও ইভকে মানুষ করার সম্পূর্ণ ভার মারী কুরীর উপর এসে পড়ল। শৈশবের যত্ন এবং শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর কতগুলি স্থির মতামত ছিল, পরে পরে যে ধাত্রীরা শিশুদের দেখাশোনা করতেন, তাঁদের কমবেশী সাফল্যের সঙ্গে সেই আদর্শ মেনে চলতে হতো।

প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে একঘণ্টা ক'রে মানসিক অথবা শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করতে হতো, মারী সেটুকু শিশুদের পক্ষে আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করতেন। কন্যাদের স্বভাবজাত গুণপনা উদ্ভিন্ন হবার আশায় উদ্‌গ্রীব আগ্রহে তিনি অপেক্ষা করেছিলেন। ধূসর রঙের নোট-বইয়ে আইরিনের গণিতে সাফল্য, ইভের সঙ্গীতে জন্মগত অধিকারের কথা টুকে রাখতেন। দৈনিক কাজটুকু সেরে মেয়েদের খোলা হাওয়ায় পাঠিয়ে দিতেন। সব রকম জল-বাতাসে তারা বহুদূর হাঁটা এবং ব্যায়ামের অভ্যাস করেছিল। সো'র বাগানে ট্রাপিজ, ক্লাইং রিং, স্লিপারি কর্ড সমেত একটি ক্রস্‌বারের বন্দোবস্ত করেছিলেন মারী। বাড়িতে এইভাবে ব্যায়াম করার পর মেয়ে দুটি এক সাধারণ ব্যায়ামাগারে ভর্তি হয়ে সেখান থেকে উদ্যম ও ক্রীড়াকৌশলের জন্য কতগুলি প্রথম পুরস্কার পেয়ে বাড়িতে নিয়ে এল।

হাতে পায়ে তারা সারাক্ষণ কাজ করত। বাগান কোপানো, মাটির কাজ, রান্না, সেলাই সব শিখেছিল। যত ক্লান্তই থাকুন না কেন, সাইকেল চড়ে ওরা বেড়াতে গেলে মারী সঙ্গে যেতেন। গ্রীষ্মকালে তাদের সঙ্গে জলে নেমে সাঁতার শেখাতেন।

বেশী দিনের জন্য পারী ছেড়ে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, সুতরাং হেলা জালের তত্ত্বাবধানেই তারা ছুটির বেশীর ভাগ সময় কাটাল। অনেক ক'টি আত্মীয় ভাইবোনে মিলে তারা চ্যানেল বা সমুদ্রের অপেক্ষাকৃত নির্জন তীরে খেলে বেড়াত। ১৯১১ সালে তারা মায়ের সঙ্গে প্রথমবার পোল্যাণ্ডে যাত্রা করল, পথে ব্রনিয়া জাকোপেন-এ তাঁর হাসপাতালে তাদের অভ্যর্থনা করলেন। বাচ্চারা ঘোড়ায় চড়তে শিখে পাহাড়ের উপর অভিযানে বেরোল, পাহাড়ী বাড়িতে রাত কাটাল। পিঠে থলি বেঁধে, পেরেক মারা বুট পায়ে মারী তাদের পথ দেখিয়ে চললেন।

শারীরিক ক্রীড়াকসরৎ দেখাবার মতো নির্বুদ্ধিতা তাঁর ছিল না, কিন্তু মেয়েদের দৈহিক শক্তি যাতে বাড়ে তার দিকে ছিল তাঁর প্রখর নজর।

আইরিন ও ইভ 'অন্ধকারে ভয়' কাকে বলে জানত না, ঝড় উঠলে বালিশে মাথা লুকনো, কিংবা চোর-ডাকাত, মহামারীতে ভয় পেত না। সেকেলে এই ধরনের আজগুবি সব ভয়ের কথা মারীর জানা ছিল ব'লে মেয়েদের এসব থেকে দূরে রেখেছিলেন। এমন কি পিয়ের-এর সাংঘাতিক মৃত্যুতেও তিনি ভীরু জননীতে রূপান্তরিত হন নি। এগারো-বারো বছরের কন্যারা একা বেরোতে শিখল, অতি অল্প দিনের মধ্যেই তারা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা নিঃসঙ্গ যাতায়াত করতে শিখল।

তাদের মানসিক সাহসের প্রতিও তাঁর আগ্রহের সীমা ছিল না। বাড়ির জন্য অত্যধিক মন-কেমন-করা, মানসিক অবসাদ এবং সহানুভূতির আধিক্যের হাত থেকে তিনি এদের রক্ষা করলেন। একটি বিষয় মনে মনে স্থির ক'রে নিলেন, পিতৃহীনা শিশুদের সামনে কখনও পিতার কথা তুলবেন না। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত 'পিয়ের', পিয়ের-কুরী', 'তোমাদের বাবা', কিংবা 'আমার স্বামী', এই কথাগুলি উচ্চারণ করতে তাঁর বুক ফেটে যেত। কথা বলার সময়ে অসম্ভব কৌশলে তিনি ছোট ছোট স্মৃতি-দ্বীপগুলি পার হয়ে আসতেন। সন্তানদের বিষাদ সাগরে নিমজ্জিত করার চেয়ে বরং ওদের সঙ্গে নিজেকেও এই হৃদয়াবেগ থেকে বঞ্চিত করতেন। পরিবারের মধ্যে যেমন মৃত বৈজ্ঞানিকের প্রভাবকে ধরে রাখলেন না, তেমনি শহিদ পোল্যাণ্ডের স্মৃতিও আঁকড়ে রইলেন না। তাঁর মনের বাসনা ছিল আইরিন ও ইভ পোল ভাষা শিখে তাদের মার মাতৃভূমিকেও ভালোবাসতে শিখুক, কিন্তু সেই সঙ্গে যেন ওরা খাঁটি ফরাসী মেয়েও হয়ে ওঠে। দুই দেশের টানা-পোড়েনের কষ্ট সইতে যেন ওদের না হয়। বৃথা এক অত্যাচারিত জাতির দুশ্চিন্তায় কষ্ট পেতে না হয়।

মেয়েদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা তিনি দিলেন না, ধর্মশিক্ষাও নয়। যেসব গোঁড়ামিতে নিজে বিশ্বাস করেন না, মেয়েদের সে-শিক্ষা দিতে মন উঠল না। এর ভেতর যাজকতা-বিরোধী কোন দলাদলির প্রশ্ন ছিল না। যথার্থ উদার মতাবলম্বী মারী অনেকবারই মেয়েদের পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে তারা যদি ধর্মের প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ করে, তবে তাদের খুশীমতন কাজ করবার পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের রয়েছে।

এক বিষয়ে তাঁর মনে তৃপ্তি ছিল—নিজের জীবনের অস্বস্তিকর শৈশব, বৈচিত্র্য হীন কৈশোর এবং দারিদ্র্য পীড়িত যৌবনের বিস্বাদ থেকে তাঁর সন্তানরা অন্ততঃ বেঁচে গেল। আবার একই সঙ্গে তিনি বিলাসিতার প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায় মনে করতেন। কয়েকবারই এমন সব সুযোগ এসেছে, যাতে তিনি

দুই মেয়ের নামে অগাধ সম্পত্তির ব্যবস্থা ক'রে যেতে পারতেন, কিন্তু তা তিনি করেন নি। বিধবা হবার পর নিজেদের হাতে তৈরি এক গ্রাম রেডিয়ম—যা সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি—তাই নিয়ে কি করবেন সেকথা চিন্তা করতে হলো। ডাক্তার কুরী ও পারিবারিক পরামর্শদাতাদের অনেকের উপদেশ অগ্রাহ্য ক'রে তিনি স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী সেই অমূল্যনিধি ল্যাবরেটারিকে দান করলেন, তার দাম তখন দশ লক্ষ ফরাসী স্বর্ণ মুদ্রা।

তাঁর মতে দারিদ্র্য যেমন অসুবিধাজনক, ঐশ্বর্যও তেমনি অবান্তর নির্লজ্জতার সমান। ভবিষ্যতে মেয়েরা খেটে খাবে, এটাই তো স্বাভাবিক ও সুস্থ চরিত্রের লক্ষণ।

সযত্নে নির্ধারিত শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে একটি মূল কথা বাদ রয়ে গেল; সকল শিক্ষার সার ভদ্রতা। এই বিষাদ ক্লিষ্ট পরিবারে একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবেরাই আসাযাওয়া করতেন, অ্যসতেন পেরিন আর শাভান্‌স্‌দের পরিবার-বর্গ। প্রতি রবিবার আঁদ্রে দ্যবিয়েরন্ বই, খেলনা নিয়ে আসতেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা জন্তুদের মিছিল, নানা মাপের হাতি এঁকে স্বল্পভাষী আইরিনের সঙ্গে ভাব করতেন। যাদের কাছে স্নেহের প্রশ্রয় পাওয়া যায় সেই সব স্নেহপ্রবণ বন্ধুরা ভিন্ন আর কেউ এ বাড়িতে আসত না। সুতরাং নতুন মানুষ দেখলে আইরিন ভয়ে আড়ষ্ট, বোবা হয়ে যেত এবং তাকে দিয়ে কিছুতেই "আপনি কেমন আছেন"—টুকুও বলানো যেত না, এই অভ্যেস দূর হতে তার অনেক সময় লেগেছিল।

মৃদু হেসে, মিষ্টি কথা কয়ে, লোকের বাড়িতে গিয়ে দেখা ক'রে, লোকজনদের বাড়িতে অভ্যর্থনা ক'রে, ভদ্র কথাবার্তা ব'লে বাইরের জগতে যে সৌজন্যতা রক্ষা করে চলতে হয়—আইরিন্ আর ইভ সে-বিষয়ে অজ্ঞ রয়ে গেল। দশ বছর, বিশ বছর পরে তারা জানল দুনিয়ার দাবী আছে, আইন আছে এবং দুর্ভাগ্য-ক্রমে অহেতুক ভাবে "আপনি কেমন আছেন" বলারও প্রয়োজন আছে।

লেখাপড়ায় প্রশংসাপত্র পেয়ে আইরিনের যখন ইস্কুলে যাবার সময় হলো, মারী তখন সেখানের কার্যক্রমের ওপরে এবং বাইরে আরও কিছু তাকে শেখাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

সর্বান্তঃকরণে কর্মী যিনি, সন্তানদের উপর অত্যধিক কাজের চাপ দেখে তিনি চিন্তিত হলেন। আলোবাতাস চলাচলের ব্যবস্থাহীন ঘরের মধ্যে মানব-শিশুদের চেপে রেখে, "উপস্থিতির ঘণ্টা" নামক অনেকখানি বন্ধ্যা সময় তাদের

জীবন থেকে চুরি করা হয়—অথচ এইতো আনের দৌড়ে খেলে বেড়াবার সময়। তাঁর ইচ্ছা আইরিন অল্পই পড়ুক কিন্তু ভাল ক'রে শিখুক। কি ক'রে তার ব্যবস্থা করা যায়?

নিজের মনে চিন্তা ক'রে কূল পেলেন না। তখন নিজের সমপর্যায়ের প্রফেসর-বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন—তাঁরাও তো তাঁরই মতো এক-একটি পরিবারের মাথা। তাঁরই উৎসাহে সমবেত শিক্ষার অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার হলো, বিজ্ঞ-ব্যক্তিরা তাঁদের সকলের ছেলে মেয়ে জড়ো ক'রে পড়াবার ভার নিলেন।

ছেলে মেয়ে মিলিয়ে দশটি খুদে বাঁদর স্কুলের আওতা ছেড়ে পরমোল্লাসে প্রতিদিন নতুন নতুন শিক্ষকের কাছে পড়তে লাগল। একদিন জ্যাঁ-পেরিনের কাছে রসায়নের জ্ঞান অর্জন করতে তারা সরবনের ল্যাবরেটারিতে হানা দিল। পরদিন এই ক্ষুদেবাহিনীকে ফঁতেনে-অ-রোজেস-এ দেখা গেল—পল্ ল্যাংভিন স্বয়ং এদের গণিত শিক্ষা দিচ্ছেন। মাদাম পেরিন ও মাদাম শাভান্স্, ভাস্কর মাগ্র্ এবং অধ্যাপক মূর্ত সাহিত্য, ইতিহাস, প্রচলিত ভাষা-সমূহ, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, মাটির কাজ, অঙ্কন ইত্যাদি শেখান। সবশেষে মাদাম কুরী স্কুল-অব-ফিজিক্সে প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেলে এই দলটিকে পদার্থের গোড়ার কথা বুঝিয়ে দেন—এ জাতীয় শিক্ষা এখানে এই প্রথম।

তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক হয়েছিলেন। তাঁর পড়াবার অপূর্ব পদ্ধতি, তাঁর আন্তরিকতা ও সহৃদয়তার কথা এদের মনে চিরদিন উজ্জ্বল হয়েছিল। প্রাথমিক পাঠ্য পুস্তকের অবাস্তব ও একঘেঁয়ে ভাবে লেখা প্রাকৃতিক ঘটনাগুলিকে তিনি অতি সুন্দরভাবে ছবি এঁকে বোঝাতেন। সাইকেলের বল-বেয়ারিং কালিতে ডুবিয়ে এক হেলানো পাত্রের ওপর ছেড়ে দিতেন, তারপর সেই বল-বেয়ারিংগুলি গড়িয়ে পড়ার সময় অনুবৃত্ত সৃষ্টি হতো এবং পতনোন্মুখ পদার্থের নিয়ম হাতে হাতে প্রমাণিত হয়ে যেত। কাগজের ওপর খড়ির নিয়মিত দোলনের রেখাপাত ক'রে দেখাতেন। ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে-গড়া একখানা তাপযন্ত্র আর পাঁচটা সাধারণ তাপযন্ত্রের মতো কাজ দিচ্ছে দেখে বাচ্চাদের কি মহা আনন্দ!

মারী তাঁর বিজ্ঞান-প্রেম ও কর্মে-আসক্তি এদের মধ্যে সঞ্চারিত করলেন। বহুকালের অভ্যস্ত জীবনের নিয়মানুবর্তিতা তাদের শেখালেন। মানসিক অঙ্কে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল ব'লে শিষ্যদেরও তা অভ্যাস করালেন,—'এমনভাবে মাথার মধ্যে নাও, যাতে কোনদিন ভুল না হয়,' একথা তিনি

বারবারই বলতেন—'এর গোড়ার কথা হলো, খুব তাড়াতাড়ি শেখবার চেষ্টা না করা।' ইলেক্‌ট্রিক পাইল তৈরি করতে গিয়ে নতুন কর্মীরা যদি জিনিসপত্র এলোমেলো করতো কিংবা ময়লা জমতে দিত, তবে মারী রেগে লাল হয়ে যেতেন,—'পরে পরিষ্কার করব, সে-কথা শুনতে চাই না। পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় টেবিল কোনমতেই অপরিষ্কার রাখবে না।'

নোবেল লরিয়েট এই মহীয়সী মাঝে মাঝে ছাত্র-ছাত্রীদের সহজভাবে অনেক সোজা কথা শেখাতেন। একদিন প্রশ্ন করলেন: 'তরল পদার্থভরা এই পাত্রটি গরম রাখতে হলে কি করা উচিত?'

সঙ্গে সঙ্গে ফ্রন্সিস্ পেরিন, জিন্ ল্যাংভিন, ইসাবেল শাভান্স্, আইরিন কুরী-আদি ক্লাসের বিজ্ঞান-তারকারা অভিনব সব উপায় বাতলাতে লাগল; পাত্রের গায়ে পশম জড়িয়ে রাখা উচিত, আর সব জিনিস থেকে সরিয়ে রাখা উচিত ইত্যাদি:

মারী হেসে উত্তর দিলেন: 'বেশ কথা। শোন, আমি হলে প্রথমেই ঢাকনাটি ঢেকে দিতাম!'

এই রকম ঘরোয়া কথার মধ্যে বৃহস্পতিবারের পাঠ শেষ হতো। দরজা খুলে যেত, জলযোগের জন্য বাহকের হাতে অনেকগুলি রোল, চকোলেট-বার, কমলালেবু এসে পৌঁছতো। মুখে খাওয়া এবং তর্ক দুই সমানে চলেছে, এই অবস্থায় হৈ হৈ করতে করতে ছেলেমেয়েরা স্কুলের আঙ্গিনায় নেমে যেত।

(এক নিন্দুক লিখেছিল:) এই ছোট্ট গোষ্ঠী লেখাপড়া শেখে নি, তবু এদের গবেষণা করা, যন্ত্রপাতি তৈরির চেষ্টা করা এবং প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।···সরবন ও রু্য-কুভিয়ের বাড়ি দুটো এখনও ফেটে পড়ে নি এই আশ্চর্য, তবে তার আশঙ্কাও যায় নি এখনও।

সব মানবীয় প্রচেষ্টার মতোই দু'বছর পরে এই যৌথ শিক্ষা-ব্যবস্থার অবসান ঘটল। গুরুজনেরা নিজেদের কাজ সেরে দম নেবার অবসর পেতেন না, এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডিগ্রিখানা আদায় করতে হলেও তো সিলেবাস অনুযায়ী পড়াশোনার প্রয়োজন। আইরিনকে মারী কলেজ সেভিঞে নামে এক বেসরকারি ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দিলেন, এখানে ক্লাসের ঘণ্টা কিছু কম ছিল। এই সুন্দর ইস্কুল থেকে আইরিন সেকেণ্ডারি পাঠ শেষ করে এবং পরে ইভ এখানেই পড়াশোনা করে।

শৈশব থেকে কন্যাদের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের আপ্রাণ চেষ্টা কি মারীর সার্থক হয়েছিল? হ্যাঁ, এবং না,—দুইই বলা যায়। সাহিত্যে কিছু ঘাটতি

থাকলেও "যৌথ শিক্ষাপ্রণালী" বড় কন্যাকে প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞান শিক্ষা দিল —যা' কোন ইস্কুলে সম্ভব ছিল না। নৈতিক শিক্ষা? এখান থেকে অল্প বয়সী ছেলেমেয়ের স্বভাব-চরিত্র সংশোধিত হবার আশা করা অন্যায়, তবে আমার মনে হয় না যে, মায়ের পক্ষপুটের ছায়ায় থেকেও আমাদের খুব একটা অবনতি হয়েছিল। কয়েকটি জিনিস অবশ্য আমাদের মনের মধ্যে বসে গিয়েছিল: যথা কাজের রুচি, আমার নিজের চেয়ে দিদির ভেতরেই এর প্রভাব সহস্রগুণ বেশী দেখতে পাই। টাকা পয়সার প্রতি এক ধরনের নিরাসক্তি এবং সেই সঙ্গে স্বাধীন মনোবৃত্তি, যাতে ক'রে আমরা বিশ্বাস করি যে, দুনিয়ায় যে-কোন অবস্থায় আমরা নিজেদের ভার নিজেরা বইতে সক্ষম।

শোকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আইরিন যথেষ্ট পটু হলেও, আমার ভেতর সে-জোরের একান্ত অভাব। মায়ের শত চেষ্টা সত্ত্বেও আমার শৈশব সুখের হয় নি। একদিক দিয়ে মারীর জয় অনস্বীকার্য; মেয়েদের স্বাস্থ্য, শারীরিক সামর্থ এবং খেলাধুলায় আসক্তির জন্য মায়ের কাছে তারা চিরঋণী। এই অসাধারণ বুদ্ধিমতী এবং সহৃদয়া মহিলার যথাসাধ্য চেষ্টার মোটামুটি ফল এই দাঁড়াল।

যথেষ্ট ভয়ে ভয়ে আমাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের গোড়ার কথা ধরতে আমি চেষ্টা করেছি। সব কিছুর ভেতর থেকে নিতান্ত নিরস, নিয়মানুবর্তী, দৃঢ়বিশ্বাসে কঠিন এক ব্যক্তির সন্ধান পাই ব'লে আশঙ্কা হয়। বস্তুতঃ ব্যাপারটা ঠিক তা' নয়। তিনি আমাদের মজবুত ক'রে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি নিজে অত্যন্ত দুর্বল, অতিশয় কোমল। যিনি নিজে চেষ্টা ক'রে সবরকম আবেগ সংযত ক'রে চলতেন—তিনি নিশ্চয়ই আমাদের কাছ থেকে আদর সোহাগ মনে মনে চাইতেন। বাইরে আমাদের আবেগ প্রকাশ নিষিদ্ধ হলেও, সামান্যতম হৃদয়হীনতার পরিচয়ে তিনি শিউরে উঠতেন। দুষ্টুমির জন্য শাস্তি দিয়ে কখনও তিনি আমাদের "ভাবাবেগ হীনতার" পরীক্ষা নেন নি। যেমন ধরুন, কান মলে দেওয়া, কোণে দাঁড় করিয়ে রাখা, পুডিং থেকে বঞ্চিত করা—এসব ধরনের শাস্তি আমাদের বাড়িতে অচল ছিল। কান্না বা দৃষ্টিকটু ব্যাপারও আমাদের বাড়িতে চলত না। রাগে বা আনন্দে মা কাউকে চেঁচিয়ে কথা বলতে দিতেন না। একদিন আইরিনের ধৃষ্টতার জন্য তিনি "উদাহরণ-স্বরূপ" দুদিন তার সঙ্গে কথা বললেন না। এই সময়টুকু তাঁর নিজের এবং আইরিনের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হলো—কিন্তু দু'জনের মধ্যে

যাঁরাই বেশী কষ্ট পেলেন; অস্থির ভাবে বিষণ্ণ বাড়ির ভিতর, বিমর্ষ মুখে এঘর ওঘর ক'রে বেড়ালেন: মেয়ের চেয়ে শাস্তিটা নিজেরই হলো বেশী।

অনেক বাচ্চার মতো আমরাও বোধ হয় অনুভূতির তারতম্যে কিছুটা স্বার্থপর ও অন্যমনস্ক ছিলাম। কালির দাগ মাখা চিঠির প্রথম লাইনে আমরা যাঁকে "ডার্লিং মা," "আমার মিষ্টি ডার্লিং," "আমার মিষ্টি—" কিংবা প্রায়ই "মিষ্টি মা" বলে সম্বোধন করেছি এবং সেই অর্থহীন চিঠিগুলি যিনি মৃত্যু পর্যন্ত সযত্নে কেকের-বাক্স-বাঁধা-ফিতে দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন, তাঁর সৌন্দর্য, সংযত স্নেহের মাধুরী আমাদের দৃষ্টি এড়ায় নি।

মধুর, অতি মধুর আমাদের মায়ের গলা তো প্রায় শোনাই যেত না— এমনি আস্তে সসঙ্কোচে তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলতেন; ভয় শ্রদ্ধা বা প্রশংসা কোনটাই তিনি আমাদের কাছ থেকে আশা করতেন না। মিষ্টি মা আমাদের—তিনি যে আর সব মায়ের মতো মা নন, দৈনিক কাজের ভারে ভগ্নদেহ এক অধ্যাপিকা নন, তিনি যে এক অসামান্যা মানবী, এক জগদ্বিখ্যাতা নারী—একথা কোন দিনও আমাদের বুঝতে দেন নি।

॥ সাফল্য ও অগ্নিপরীক্ষা ॥

২০

মুখখানা তাঁর কৃশ হয়ে আসছে, কেশে সহসা ধূসরতা নামছে : অতি দুর্বল পাণ্ডুর সেই মহিলাটিকে প্রত্যহ সকালে রুয়্য-কুভিয়েব-এর ইস্কুলের অপ্রশস্ত ঘরে প্রবেশ ক'রে দেয়ালে টাঙ্গানো একখানা কাজের পোশাক নিজের কালো জামার ওপর প'রে কাজে বসতে দেখা যেত।

জীবনের এই বৈচিত্রহীন অবসরে তাঁর বাহ্যিক রূপের চরম বিকাশের বিষয় তিনি অবহিত ছিলেন না। একটা কথা প্রচলিত আছে যে, পরিণত বয়সে মানুষ তার নিজের চেহারা খুঁজে পায়। আমার মায়ের সম্বন্ধে এ কথাটি অবধারিত সত্য হয়ে দেখা দিল। কুমারী মানিয়া ছিল শুধুই "মিষ্টি" ছাত্রী, সোহাগিনী পত্নীরূপে তিনি ছিলেন লাবণ্যময়ী, এখন পরিণত বয়সে শোকে জর্জরিতা বৈজ্ঞানিকের অপূর্ব সৌন্দর্য ফুটে উঠল। স্লাভ দেশীয় মুখের ওপর মননশীল জীবনের দীপ্তি প্রতিভাত হওয়ার ফলে সজীবতা বা প্রফুল্লতা জাতীয় অলঙ্করণের প্রয়োজন আর রইল না। চল্লিশ বছরের পর ক্রমশ ভঙ্গুর দেহে শোকের আগুনে-পোড়া অসীম সাহস তাঁকে অলৌকিক ভূষণে সাজিয়ে তুলল। বহু বৎসর ধরে আইরিন ও ইভের চোখে মায়ের এই আদর্শ রূপ বাসা বেঁধে ছিল—তারপর হঠাৎ একদিন সভয়ে তারা লক্ষ্য করল তাদের মা বুড়ি হয়ে গেছেন।

অধ্যাপিকা, গবেষণাকারিণী, ল্যাবরেটারি-পরিচালিকা মাদাম কুরী এক-ভাবে অসম্ভব পরিশ্রম করতে লাগলেন। সেভর-এর পড়ানো তিনি বন্ধ করেন নি। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে সরবনে অধ্যাপিকা পদে উন্নীত হবার পর পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম এবং সেকালে একমাত্র তিনিই রেডিও-এ্যাকটিভিটি সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে আরম্ভ করেন। কি প্রচণ্ড উদ্যম! ফ্রান্সে সেকেণ্ডারি শিক্ষাপদ্ধতি তাঁর মনঃপূত না হলেও ফরাসী উচ্চ শিক্ষার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। যে সব গুরু একদিন এক পোল্যাণ্ডবাসিনী তরুণীর মনে জ্ঞানের আলোকরহস্য সঞ্চার করেছিলেন, নিজেকে তাঁদের সমপর্যায়ে তোলার প্রবল ইচ্ছা তাঁর ছিল।

বছর দুই অধ্যাপনার কাজ চালিয়ে মারী তাঁর বক্তৃতার বিষয়গুলি লিখতে আরম্ভ করলেন। ১৯১০ সালে এবিষয়ে তিনি এক সমৃদ্ধ পুস্তক প্রকাশ

করলেন : "ট্রিটিস্ অন রেডিও-এ্যাকটিভিটি।" কিছুকাল আগে কুরী-দম্পতি রেডিয়ম আবিষ্কার করার পর থেকে সে-বিষয়ে যতটুকু অগ্রসর হয়েছিলেন ৯৭১ পৃষ্ঠায় তার মূল তথ্যটি লিপিবদ্ধ করলেন। লেখিকার ছবি প্রচ্ছদপটে স্থান পায় নি। তার বিপরীত পৃষ্ঠায় পিয়ের-এর একখানি ছবি দেওয়া হলো। মাত্র দুই বৎসর আগে ১৯০৮ সালে এই ছবিটি ছয়শত পৃষ্ঠার "পিয়ের কুরীর রচনাবলী" নামক বইয়ের শোভাবর্ধন করেছিল, সে-বইখানিও ছিল মারী কুরীর সঙ্কলিত।

পরের বইটির ভূমিকায় পিয়ের কুরীর কর্মজীবন সম্বন্ধে দুটি কথা লিখেছিলেন, অত্যন্ত সংযত ভাবে তিনি স্বামীর অকারণ মৃত্যুর জন্য আক্ষেপ করেছিলেন :

'পিয়ের-কুরীর শেষ ক'টি বছর অত্যন্ত ফলপ্রসূ ছিল। বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণতম বিকাশের সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কৌশলও তাঁর আয়ত্তাধীন হয়েছিল।

'জীবনে প্রবলতর শক্তিশালী এক অভিনব অধ্যায়ের সূচনা এবং সমৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক-চরিত্রের স্বাভাবিক পরিণতির পথ প্রস্তুত হচ্ছিল, হতোও। কিন্তু অদৃষ্টের ইচ্ছা অন্যরূপ এবং তার দুর্বোধ্য সিদ্ধান্তের কাছে আমরা মাথা নত করতে বাধ্য।'

প্রতিদিন মাদাম কুরীর ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। মার্কিন বিশ্ব-প্রেমিক এনড্রু কারনেগি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁকে অনেকগুলি বাৎসরিক ছাত্র-বৃত্তির ব্যবস্থা করায় তিনি র্যু-কুভিয়ের-এ কয়েকজন নতুন ছাত্র নিতে পারলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন-ভোগী সহকর্মীদের সঙ্গে আর কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক যোগ দিল। তাদের মধ্যে একটি লম্বা গড়নের ছেলের অসম্ভব মেধার পরিচয় পাওয়া গেল—সে হলো জ্যাক্ কুরীর ছেলে মরিস্ কুরী। তার সাফল্যে মারী গর্ব বোধ করতেন। এই আত্মীয়টির প্রতি মারীর মাতৃস্নেহ ছিল। মারীর পরম বন্ধু ও প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক আঁদ্রে দ্যবিয়ের্ন মারীর সঙ্গে এই আট-দশটি ছেলের শিক্ষার ভার গ্রহণ করলেন।

মাদাম কুরী নতুন গবেষণার কর্মপদ্ধতি স্থির ক'রে নিলেন। ক্রমশ স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়া সত্ত্বেও নির্দিষ্ট কার্যসূচী অনুসারে কাজ ক'রে গেলেন। কয়েক ডেসিগ্রাম রেডিয়ম-ক্লোরাইড বিশুদ্ধ ক'রে তার থেকে এর আণবিক ওজন নির্ণয় করলেন। এরপর তিনি রেডিয়মকে ধাতু থেকে বিচ্ছিন্ন করার কাজে মন দিলেন। এ পর্যন্ত যখনই বিশুদ্ধ রেডিয়ম তৈরি করেছেন, তখনই তা একমাত্র নির্ভরযোগ্য ক্লোরাইড বা ব্রোমাইড জাতীয় রেডিয়ম-লবন

থেকে করেছিলেন। আঁদ্রে ড্যবিয়েরনের সঙ্গে যোগ দিয়ে মারী প্রাকৃতিক কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি এমন মূল ধাতু নিয়ে পড়লেন। ইতিহাসে কঠিনতম কাজগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। ভবিষ্যতেও কখনও আর এমন হয় নি।

পোলোনিয়ম এবং এর বিকীর্ণ রশ্মি-কণিকা যাচাই করার সময়েও আঁদ্রে ড্যবিয়েরন মারীকে সাহায্য করেছিলেন। অবশেষে মারী নিজস্ব পদ্ধতিতে নির্গত ভস্মের পরিমাণ থেকে রেডিয়মের ওজন নির্ণয় করার এক পন্থা বের করলেন।

কুরী-থেরাপির বিশ্বব্যাপী উৎকর্ষতার দরুন 'এই অমূল্য নিধির ক্ষুদ্রতম কণিকাগুলিকে নির্ভুলভাবে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াল। এক মিলিগ্রামের সহস্র ভাগের এক ভাগের প্রশ্ন যেখানে, সেখানে দাঁড়িপাল্লায় কি করবে? মারীর মাথায় এল রেডিও-এ্যাক্‌টিভ পদার্থগুলিকে তাদেরই নিষ্ক্রান্ত ভস্মের সাহায্যে মাপা যায় কিনা। এই অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত ক'রে নিজের ল্যাবরেটারিতে "পরামর্শ কার্য" চালু ক'রে দিলেন—যেখানে বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, এমনকি সাধারণ নাগরিক্ক পর্যন্ত এসে সক্রিয় মূল ধাতু কিংবা প্রকৃতিজ উৎপন্ন দ্রব্য ওজন করিয়ে তাদের ভিতরে রেডিয়ম পরিমাণের নিদর্শন-পত্র লাভ করতেন।

"ক্লাসিফিকেশন অব রেডিও-এলিমেণ্টস" রচনা ও প্রকাশ ক'রে তিনি সাধারণের অসাধারণ উপকার করলেন। রেডিয়মের আন্তর্জাতিক মান নির্ধারিত হলো। একুশ মিলিগ্রাম রেডিয়ম-ক্লোরাইড পূর্ণ একটি হালকা কাঁচের টিউব মারী আবেগ-ভরে নিজের হাতে বন্ধ করলেন। পাঁচটি মহাদেশ এটিকে মানের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করল এবং পারীর উপকণ্ঠে "ওয়েটস এণ্ড মেজার্স" আফিসে সাড়ম্বরে সংরক্ষিত হলো।

কুরী-দম্পতির যশোগাথার পরে মাদাম কুরীর ব্যক্তিগত প্রশংসা হাউই-এর মতো মুহূর্তে উচ্চে উঠে গেল এবং চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হলো। সম্মানিত ডক্টর ডিপ্লোমা বা বিদেশী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি থেকে সভ্যপদে অভিষিক্ত ক'রে ডজন ডজন চিঠি সো'র বাড়ির টেবিলগুলি ভরিয়ে ফেলল, অবশ্য লরিয়েট স্বয়ং সেগুলি কাউকে দেখাবার বা একটা ফর্দ ক'রে রাখার কথা পর্যন্ত কল্পনা করতে পারতেন না।

স্বদেশের গুণীজ্ঞানীকে জীবিতকালে সম্মান দেখাবার মাত্র দু'টি উপায় ফ্রান্সে জানা ছিল। লেজিওঁ দু' অনর এবং আকাদেমিতে গ্রহণ করা।

১৯১০-এর ক্রস শেভালিয়ার তাঁকে দেবার প্রস্তাব করা হলো. কিন্তু পিয়ের কুরীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

কয়েকমাস পরে তাঁর অত্যুৎসাহী ভক্তবৃন্দের ঐকান্তিক অনুরোধ রক্ষা করতে তিনি বিজ্ঞান-আকাদেমির সদস্য পদের জন্য আবেদন করলেন, কিন্তু তখন কেন তিনি রাজী হলেন? তাঁর স্বামীর বেলায় বাড়ি বাড়ি ধর্ণা দেবার অপমান, পরাজয়ের গ্লানি, এমনকি জয়ের মধ্যেও ফাঁকটুকু কি তাঁর মনে ছিল না? নিজের চারপাশে হিংসার যে জাল ছড়িয়ে রয়েছে, তাও কি তাঁর অগোচর ছিল?

হ্যাঁ, বাস্তবিক তিনি কিছুই জানতেন না। তার চেয়েও বড় কথা ছিল এই যে, সরলা পোল রমণী ভেবেছিলেন, তাঁর আশ্রয়দায়িনী ফ্রান্স তাঁকে বিশেষ সম্মান দিতে উন্মুখ, এ-হেন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে নিজেকে অহংকারী বা অকৃতজ্ঞ বলে মনে হবে।

এডুয়ার্ড ব্রান্লী নামক একজন উঁচুদরের বৈজ্ঞানিক এবং সুপরিচিত ক্যাথলিক তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়ালেন। কুরী পক্ষীয় ও ব্রান্লী পক্ষীয়দের মধ্যে, স্বাধীন মতাবলম্বী ও যাজকীয়দের মধ্যে, আকাদেমিতে এক নারীর আবির্ভাবের মতো অবস্থার সপক্ষ ও বিপক্ষ দলের মধ্যে চারিদিক থেকে লড়াই লাগল। নিরুপায়, নিরাশ ভাবে মারী এই অভাবনীয় সংঘর্ষ প্রত্যক্ষ করলেন।

আঁরী পোয়ঁ্যাকারে, ডাক্তার রোঅ, এমিল পিকার্ড, অধ্যাপক লিপমান, অধ্যাপক বাউটি এবং দার্বো -আদি সমসাময়িক শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিকদের মাথায় রেখে তাঁর অনুকূলে এক বিরাট বাহিনী প্রস্তুত হলো; কিন্তু অপর পক্ষও অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল।

আট বছর আগে মঁসিয়ে আমাগা নামে যে ভদ্রলোক পিয়ের কুরীর বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন, তিনি কঠোর স্বরে প্রতিবাদ করলেন: 'ফরাসী ইউনিভার্সিটিতে নারীর স্থান হতে পারে না।' 'সহৃদয়' সংবাদ-বাহকেরা ঘোষণা করলেন, মারী হলেন ইহুদি ক্যাথলিক!

১৯১১-র ২৩শে জানুয়ারি, নির্বাচনের দিনে সভাপতি উপস্থিত জনমণ্ডলীকে শুনিয়ে উচ্চকণ্ঠে দ্বাররক্ষীদের আদেশ দিলেন:

'মেয়েদের বাদ দিয়ে আর সবাইকে ঢুকতে দেবে।'

মারীর তরফের এক বিদগ্ধ পৃষ্ঠপোষক অনুযোগ করলেন যে, জাল ভোটের কাগজ তাঁর হাতে গুঁজে দেওয়া হয়েছিল, তিনি আরেকটু হলেই মারীর বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে ফেলতেন।

আমেরিকার সময় উত্তেজিত সাংবাদিকের দল অপরাজয়ের কাহিনী লিখবার জন্তে কোমর বেঁধে ছুটে এল, মাত্র একটি ভোটে মারী কুরী হেরে গেলেন। রু-কুভিয়ের-এ স্বয়ং মারীর চেয়ে তাঁর সহকারীবৃন্দ, এমন কি তাঁর ল্যাবরেটারির ভৃত্য পর্যন্ত অত্যন্ত অধৈর্যের সঙ্গে রায়ের জন্তে অপেক্ষা করছিল। জয় অবশ্যম্ভাবী জেনে তারা টেবিলের নীচে প্রকাণ্ড এক ফুলের তোড়া লুকিয়ে রেখেছিল। পরাজয়ের সংবাদে তারা হতভম্ব হয়ে গেল। যান্ত্রিক লুঈ রাগে মনের দুঃখ মনে চেপে তোড়াটি সরিয়ে ফেলল। তরুণ কর্মীরা নিঃশব্দে সান্ত্বনার কথা ভাবতে বসল, কিন্তু তার কোন প্রয়োজনে হলো না। মারী তাঁর ছোট্ট আফিস-ঘর থেকে বেরিয়ে এঘরে এলেন। এই সাময়িক পরাজয় তাঁকে স্পর্শ মাত্র করতে পারে নি এবং সে-বিষয়ে একটি কথাও তাঁর মুখ থেকে বেরোল না।

সব দেখেশুনে মনে হয়, কুরীদের জীবন-গাথায় ফ্রান্সের দৃষ্টিভঙ্গী সংশোধন করার কাজ যেন নিয়েছিল বিভিন্ন দেশ। ডিসেম্বর মাসে সুইডেনের বিজ্ঞান-আকাদেমি, স্বামীর মৃত্যুর পর বিজ্ঞান-জগতে এই নারীর অপূর্ব অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯১১ সালের রসায়নের নোবেল পুরস্কার তাঁকে অর্পণ করলেন। পুরুষ কি রমণী—কোনো লরিয়েটই এপর্যন্ত দু'-দু'বার এই অমূল্য পুরস্কার লাভ করেন নি। আজ পর্যন্তও কেউ তা করেন নি।

দুর্বল ও অসুস্থ মারী দিদি ব্রনিয়াকে সুইডেনে সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন। এবার তিনি বড় মেয়ে আইরিনকে সঙ্গে নিলেন। গাম্ভীর্যপূর্ণ সভায় আইরিন উপস্থিত ছিল। চব্বিশ বছর পরে এই একই কক্ষে সে নিজেও এই পুরস্কার পেয়েছিল।

চিরাচরিত অভ্যর্থনা এবং রাজভবনে নিমন্ত্রণ ছাড়াও এবার মারীর সম্মানে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। এক কৃষাণ-উৎসবের আনন্দ-স্মৃতি তাঁর বহুদিন মনে ছিল; শত শত রঙীন পোশাক পরা স্ত্রীলোক মাথায় জলন্ত মোমবাতি নিয়ে নেচেছিল, একরাশ দোদুল্যমান রাজমুকুট যেন।

মারী তাঁর প্রতি নিবেদিত শ্রদ্ধাঞ্জলি যে পিয়ের কুরীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি তারই উল্লেখ করলেন তাঁর প্রকাশ্য বক্তৃতায়:

"আলোচ্য বিষয়বস্তুর প্রারম্ভে আমি একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, রেডিয়ম এবং পোলোনিয়ম আবিষ্কারের সময়ে পিয়ের কুরী আর আমি একসঙ্গে কাজ করেছিলাম। তেজস্ক্রিয়তার রাজ্যে সেই শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের অবদানে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। মূল সূত্রগুলো একা তিনি

নিজেই কিংবা আমাকে সঙ্গে নিয়ে কিংবা সহকর্মীদের সাহচর্যে লিপিবদ্ধ করেন।

'রসায়নের যে অংশে রেডিয়মকে খনিজ লবন অবস্থায় বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং নতুন মৌলিক পদার্থ হিসেবে আবিষ্কার করা হয়, তার মধ্যে আমার কাজ আছে স্বীকার করি, কিন্তু আমাদের যৌথ কাজের সঙ্গে এর অন্তরঙ্গ যোগাযোগ আছে। সুতরাং আমি বিশ্বাস করি যে, যে-বিশেষ সম্মান আকাদেমি আজ আমায় দিলেন, তা' আমাদের এই যৌথ কাজের পুরস্কার এবং এতদ্বারা পিয়ের-এর স্মৃতিকেও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হলো।'

এক বিরাট আবিষ্কার, জগত-জোড়া যশোগাথা এবং দু'বার নোবেল পুরস্কার লাভ ক'রে সমসাময়িক বহু গুণীজ্ঞানীর শ্রদ্ধা মারী অর্জন করেছিলেন, আবার একই কারণে তাঁর শত্রুরও অভাব ছিল না।

বিদ্বেষের দুর্যোগ তাঁর চারিদিকে ঘনঘটা ক'রে এল, এবং তাঁকে ধ্বংস করতে উদ্যত হলো। চুয়াল্লিশ বছরের এক ক্ষীণকায়া, পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত, নিঃসঙ্গ, অসহায়া রমণীর বিরুদ্ধে পারী নগরীতে বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্র চলতে লাগল।

মারী—যিনি পুরুষের জীবিকা বরণ করেছিলেন, সুতরাং এই কারণেই পুরুষদের মধ্যেই তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল—অন্তরঙ্গ ছিলেন তিনি সবার সঙ্গেই,—বিশেষতঃ একজনের উপর তাঁর প্রভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল। আর অধিক কি প্রয়োজন ? কর্মপ্রাণা এক বৈজ্ঞানিক, যাঁর অত্যধিক গম্ভীর, চাপা স্বভাব ইদানিং বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল, তাঁকে ঘর-ভাঙ্গানী অপবাদ দিয়ে স্বামীর নামের কলঙ্ক ব'লে রটনা করা হলো।

কে এই আক্রমণের সূচনা করেছিল, অথবা কি অসহায় ভাবে, নিদারুণ বেদনায় মারী এই কাদায় পড়ে ছটফট করতেন, এ সব কথা আমার বিচার্য নয়। যারা এই নিঃসহায় মহিলাকে উড়ো চিঠি দিয়ে উন্মুক্ত রাজপথে আক্রমণ এমন কি মৃত্যুভয় পর্যন্ত দেখিয়েছিল, সেই সব সংবাদিকদের কথা বলতেও ইচ্ছে করে না। এদের মধ্যে অনেকে পরে এসে মা'র কাছে ক্ষমা চেয়ে গেছে, অনুতাপে চোখের জল ফেলে গেছে। কিন্তু অনিষ্ট যা হবার তা' ঘটে গিয়েছিল ; আত্মহত্যা এবং মাথা খারাপের কিনারা পর্যন্ত এরা মাকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল, মা আমাদের মারাত্মক অসুখে পড়লেন।

এর মধ্যে সবচেয়ে কম ক্ষতিকর কিন্তু জঘন্যতম আঘাতের কথা আমি এখানে বলব। সারা জীবন ধরে তাঁকে এই হীনতা বরদাস্ত করতে হয়েছিল।

১৯১১ সালের দুঃসহ দিনগুলির মতো যখনই এই বিদুষী মহিলাকে অপমান করার সুযোগ আসত—যথা কোন মর্যাদাসূচক উপধি, পুরস্কার বা আকাদেমির শ্রেষ্ঠ সম্মান থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হতো,—তখনই জঘন্যভাবে জন্মসত্বগুলি তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হতো। রুশ, জার্মান, ইহুদি বা পোলদেশীয়—যখন যা' খুশি তাঁর নামের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বলা হতো এক "বিদেশিনী" অন্যায়ভাবে পারীতে এসে উঁচু পদ হাতিয়ে নেবার অপচেষ্টায় আছে! আবার যখনই মারী কুরীর অতুলনীয় কীর্তির ফলে ফ্রান্সের বিজ্ঞান অলংকৃত হতো, বিদেশে তার জয়জয়কার উঠত এবং অশ্রুতপূর্ব প্রশংসা বর্ষিত হতো, তখন একই সংবাদপত্রে একই লেখকের সাক্ষরে "ফরাসী মহিলা রাষ্ট্রদূত," "আমাদের জাতীয় প্রতিভার পবিত্রতমা প্রতিনিধি," এবং "জাতীয় গৌরব" ইত্যাদি বিশেষণের ধুম লেগে যেত। সমান অবিচারে—তাঁর যা ছিল পরম গর্বের জিনিস, তাঁর সেই পোল দেশের জন্মাভিমান—সে-কথাটি এরা এড়িয়ে চলতো।

বিপদে বন্ধুই ভরসা। এই সব ইতরামির ফলে বাইরে যে সহানুভূতি ও বিরক্তির ঢেউ উঠেছে, সেই খবর বহন ক'রে চেনা-অচেনা বহু নামে মারীর কাছে চিঠি আসতে লাগল। আঁদ্রে দ্যাবিয়েরন্, ম'সিয়ে ও মাদাম জ্যঁা-পেরিন, ম'সিয়ে ও মাদাম শাভানস, মিসেস আয়ারটন নাম্নী এক ইংরেজ বান্ধবী—এঁরা সবাই মারীর জন্যে লড়াইয়ে নামলেন। মারীর ছাত্রবৃন্দ ও সহকারীর দল এই সংগ্রামে যোগ দিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক এমিল বরেল সপরিবারে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। এমনি অনেকে—যাঁদের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও হয় নি—এই অকরুণ মুহূর্তে তাঁর কাছে এলেন। যোসেফ, ব্রনিয়া ও হেলা ছোট বোনটিকে সাহায্য করতে ফ্রান্সে ছুটে এলেন। পিয়ের-এর দাদা জ্যাক্ কুরী এই দুঃসময়ে তাঁর সবচেয়ে বড় রক্ষক হয়ে দাঁড়ালেন।

ভালোবাসার এই নিদর্শনে মারী প্রাণে বল পেলন। কিন্তু প্রতিদিন তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়তে লাগল। সো'য় যাতায়াত করার শক্তিও অবশিষ্ট রইল না; কাজেই পারীতেই ৩৬ নং কে-দ্য বেতুনে ঘর ভাড়া করলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস থেকে সেখানেই থাকা স্থির হলো। কিন্তু অতদিন সবুর সইল না। ২৯শে ডিসেম্বর মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হলো। সেই ঘোর কাটিয়ে উঠলেন বটে, কিন্তু কিডনিতে অত্যন্ত জখম হওয়ায় অপরেশনের প্রয়োজন হলো। দু'মাসের মধ্যে মারীকে কয়েকবারই হাসপাতাল আর বাড়ি, বাড়ি আর হাসপাতাল করতে হলো—ফলে

একেবারে রক্তশূন্য হয়ে পড়লেন। তাঁর ইচ্ছা অপারেশন মার্চে হয়, তার আগে নয়, কারণ ফেব্রুয়ারির শেষে পদার্থবিদ্‌দের এক সভায় তিনি উপস্থিত থাকতে চান।

মস্ত সার্জেন চার্লস্ ওয়ালথার নিখুঁত অপরেশন করলেন এবং রোগিনীর সব রকম যত্ন তিনি নিজের তদারকে করতে লাগলেন, কিন্তু বহুকাল পর্যন্ত তাঁর অবস্থা সংশয়মুক্ত হতে পারে নি। মারী অসম্ভব রোগা হয়ে গেলেন, দাঁড়াতে পর্যন্ত পারেন না। জ্বর ও কিডনির ব্যথা যেভাবে নিঃশব্দে তিনি সহ্য করেছিলেন, তাতে যে-কোন মেয়ে অথর্ব হয়ে যেত।

শারীরিক রুগ্নতা এবং মানুষের হীনমন্যতায় পশ্চাদ্ধাবনের হাত থেকে তিনি লুকিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। দিদিরা তাঁর জন্য পারীর কাছে ক্রনোয় ব'লে এক জায়গায় "দ্‌লুস্কা"দের নামে একখানা ছোট্ট বাড়ি ভাড়া করলেন। রোগিনী সেখানে কিছুকাল কাটিয়ে থোনোনে ছদ্ম-পরিচয়ে কয়েক সপ্তাহ বিশ্রাম করলেন। গ্রীষ্মে বান্ধবী মিসেস আয়ারটন্ ইংল্যাণ্ডের উপকূল ভাগে নিরিবিলি এক বাড়িতে তাঁকে আর তাঁর মেয়েদের অভ্যর্থনা করলেন। এইখানে তিনি পেলেন সেবা, পেলেন আশ্রয়।

ঠিক যে-মুহূর্তে মারীর মনে হচ্ছিল ভবিষ্যৎ অন্ধকার, ঠিক সেই সময়ে এল এক অভাবনীয় প্রস্তাব। তাঁর মন আবেশ ও অনিশ্চয়তায় দুলে উঠল। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পর থেকে জারের প্রতাপ ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছিল এবং ওয়ার্‌সয়ের জনজীবনেও তার ছাপ পড়ছিল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে পোলাণ্ডের অপেক্ষাকৃত স্বাধীন এবং যথেষ্ট উৎসাহী এক বিজ্ঞানমণ্ডলী মারীকে "সম্মানিত সদস্য" পদে অভিষিক্ত ক'রে নিল। কয়েক মাস পরে এঁরা চমৎকার এক উপায় বের করলেন। ওয়ারসতে রেডিও-এ্যাক্‌টিভিটির এক ল্যাবরেটারি প্রতিষ্ঠা ক'রে জগৎশ্রেষ্ঠ এই বৈজ্ঞানিককে তাঁর মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে আনার কর্মসূচী নিয়ে তাঁরা আন্দোলন শুরু করলেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে পোল দেশীয় অধ্যাপক-মণ্ডলী মারীর বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। লেখক হাইনরিক্ সিনকিভিচ্, সে সময়ে পোল্যাণ্ডের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন, ব্যক্তিগত পরিচয় না থাকলেও হৃদয়গ্রাহী আন্তরিক ভাষায় তিনি মারীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন:

'পরম শ্রদ্ধেয়া মহাশয়া, অনুগ্রহপূর্বক আপনার অপূর্ব বৈজ্ঞানিক কার্য-কলাপ আমাদের দেশে, আমাদের রাজধানীতে স্থানান্তরিত করা হউক।

অধুনা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান কি কারণে পতনোন্মুখ, সেকথা মহাশয়ার অজ্ঞাত নহে। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির উপর আস্থা হারাইয়াছি, এই অধোগমন শত্রুপক্ষের দৃষ্টির অগোচর নাই, ভবিষ্যতের সকল আশায় আমরা জলাঞ্জলি দিয়া বসিয়া আছি।

'...আমাদের দেশের জনসাধারণ আপনাকে শ্রদ্ধা করে এবং আপনাকে আপনার স্বদেশে, আপনার নিজের নগরীতে কার্যরতা দেখিলে অত্যন্ত বাধিত হইবে। সারা দেশবাসীর ইহাই হইল একান্ত বাসনা। ওয়ারস'তে আপনাকে আমাদের মধ্যে লাভ করিয়া নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে আমাদের আস্থা ফিরিয়া পাইব এবং বর্তমান বিবিধ দুর্ভাগ্যের ভরাডুবি হইতে মাথা তুলিতে সক্ষম হইব। আমাদের এই আশা যেন নিরাশ না হয়। আমাদের প্রসারিত বাহু অবহেলা ভরে প্রত্যাখ্যান করিবেন না।'

আর যে কোন ব্যক্তি, যার কর্তব্যবোধ মারীর মতো এত তীক্ষ্ণ নয়, ফ্রান্সের এই হীনতা ও নিষ্ঠুরতার প্রতি পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করার এমন সুবর্ণ সুযোগ হারাতো না। কিন্তু মারী কখনও বিদ্বেষের মনোভাব অবলম্বন করতে পারেন নি। একান্ত সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে তিনি কর্তব্যের পথই অনুসন্ধান করতেন। মাতৃভূমিতে ফেরার চিন্তায় তিনি একাধারে বিহ্বল ও ভীত হলেন। বর্তমান শারীরিক অবস্থায় যে কোন সিদ্ধান্ত ভয়ানক মনে হলো, এ অবস্থায় ফ্রান্স ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া মানে, চিরদিনের মতো এত কালের স্বপ্নকে বিসর্জন দেওয়া।

জীবনের যে মুহূর্তে মারী আদৌ কোন কাজে হাত দেবার মতো সমর্থ নন, ঠিক সেই সময়ে দুই সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী কর্তব্যের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে দ্বিধায় পড়লেন। মাতৃভূমিতে ফেরার জন্য মন তাঁর মন ব্যাকুল হয়েছিল, তা সত্বেও অতি দুঃখে অনেক কষ্ট বুকে চেপে তিনি ওয়ারস'র প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রে চিঠি লিখলেন। তবু এত দূর থেকেই তিনি সেখানকার নতুন ল্যাবরেটারি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে দুই পোল যুবক, দানিশ ও ভার্টেনস্টাইন নামক সেরা সহকারীদের কর্মভার দিয়ে পাঠালেন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে অত্যন্ত দুর্বল দেহে মারী ওয়ারসয় গিয়ে রেডিও-এ্যাকটিভিটি-ভবনের প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এলেন। রুশ কর্তাব্যক্তিরা ইচ্ছা করেই তাঁর উপস্থিতি অগ্রাহ্য করল, তাঁর সম্মানার্থ যে উৎসবাদির আয়োজন হয়েছিল তাতে যোগ দিল না। এবং সেই কারণেই স্বদেশে অভ্যর্থনার উত্তেজনা যেন বাঁধন-ছাড়া হলো, হলো অনেক বেশী উপভোগ্য।

জীবনে এই প্রথম মারী ঘরভরতি শ্রোতার সামনে পোলভাষায় বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা দিলেন।

(মারী তাঁর এক সহকর্মীকে লেখেন :) 'ফিরে যাবার আগে আমার যথাসাধ্য ক'রে যাব। মঙ্গলবার জনসাধারণের সামনে বক্তৃতা দিয়েছি। এছাড়া আরও অনেকগুলি সভা-সমিতিতে যোগ দিতে হয়েছে, আরও হবে। এখানে যে সদিচ্ছার সন্ধান পেয়েছি, তাকে কাজে লাগানো প্রয়োজন। এই হতভাগ্য দেশ এক অন্যায় ও নিষ্ঠুর রাজশাসনে থেকেও এর নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন উন্নত করার যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। এমন একদিন আসতে পারে যেদিন এই উৎপীড়নের অবসান ঘটবে, সে-সময় পর্যন্ত টিকে থাকা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবিক জীবনের এ কি চেহারা! এ কী অবস্থা!...'

'আমার শৈশব ও যৌবনের স্মৃতিজড়িত জায়গাগুলো আবার দেখে এলাম। ভিশ্চুলা নদীর ধারে বেড়িয়ে এলাম আর গোরস্থানের সমাধিগুলো ঘুরে ঘুরে দেখে এলাম। এই তীর্থযাত্রায় মধু আছে, দুঃখও আছে, কিন্তু না এসে উপায়ও থাকে না।'

বাইশ বছর আগে মারী যে 'মিউজিয়ম-অব-ইণ্ডাষ্ট্রি-এণ্ড এগ্রিকালচার'-এর বাড়িতে প্রথম পদার্পণ করেছিলেন, সেই বাড়িতে একটি অনুষ্ঠান হলো। পরদিন পোলরমণীরা "মাদাম শ্ক্লোদোভ্স্কা কুরীকে" এক সভায় নিমন্ত্রণ করলেন। অতিথিদের জন্য নির্ধারিত চেয়ারে এক পক্ককেশ বৃদ্ধাকে এই বৈজ্ঞানিকের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেতে দেখা গেল। ছোট্ট মানিয়া মাথাভরা সোনালী চুল নিয়ে যে বোর্ডিং-স্কুলে প্রথম পড়াশোনা করতে এসেছিল, ইনি ছিলেন সেই স্কুলের পরিচালিকা মাদমোয়াজেল সিকোর্স্কা। নিজের জায়গা থেকে নেমে মারী ফুলে-ঢাকা টেবিলগুলোর মধ্যে পথ ক'রে নিয়ে বৃদ্ধার কাছে এগিয়ে গেলেন এবং ছেলেবেলায় পুরস্কার বিতরণের দিনে যেমন ক'রে এঁর দু'গালে চুমু দিতেন, সেইভাবে বৃদ্ধার দুই গালে চুমু দিলেন। মাদমোয়াজেল সিকোর্স্কার দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল, দর্শকমণ্ডলী হৈ হৈ ক'রে উঠল।

স্বাভাবিক জীবন ধারায় ফিরে আসার মতো শরীর সারল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে দেহের শক্তি পরীক্ষা করার ইচ্ছায় তিনি পিঠে থলে বেঁধে এনগাজইনের দিকে কন্যাদের সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। পুত্রসহ আইনস্টাইন এঁদের সঙ্গ নিলেন। বেশ কিছুকাল যাবৎ অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন এই

বৈজ্ঞানিকদ্বয়—মাদাম কুরী ও আইনস্টাইনের ভেতর মধুর এক প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। শ্রদ্ধা, মৈত্র ও পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের বলে সে-বন্ধুত্ব পাকা হয়েছিল; কখনও ফরাসী, কখনও জার্মান ভাষায় তাঁর পদার্থবিদ্যার তত্ত্বমূলক অজস্র অন্ধি সন্ধি ঘেটে বেড়াতেন। অভিযানবাহিনীর আগে আগে ছেলেমেয়েরা আনন্দে নাচতে নাচতে চলেছে, ভ্রমণে তাদের মহা স্ফূর্তি। পেছনে আইনস্টাইন, মাথাভরা দুর্বোধ্য তত্ত্বের ভার পার্শ্ববর্তিনীর কাছে সোৎসাহে চালান দিতে দিতে এগোচ্ছেন। অসাধারণ গণিত চর্চার ফল মারীর ধরতে অসুবিধা হচ্ছিল না, যদিও সারা ইউরোপে এসব তত্ত্ব বুঝতে পারে এমন লোক ক'জনই বা ছিলেন।

আইরিন আর ইভের কানে ছাড়া-ছাড়া দুর্বোধ্য কথা এসে ঢুকছে, অন্য-মনস্ক ভাবে, গভীর খাদের ধার দিয়ে, খাড়া পাথরের ওপর দিয়ে ভদ্রলোক হেঁটে চলেছেন—এসব দিকে তাঁর দৃষ্টি যায় না। হঠাৎ থেমে মারীর হাত ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন: 'বুঝতে পারছ, লিফটের ভেতর দিয়ে যাত্রীরা যখন শূন্য দিয়ে নাবে, তখন তাদের ঠিক কি অবস্থা হয় সেইটুকুই আমার জানা দরকার।'

শূন্য দিয়ে লিফট পতনের কল্পনার পেছনে যে "আপেক্ষিকতার" সমস্যা ঢাকা পড়ে আছে, সে-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না থাকায় বাচ্চারা এই কাল্পনিক পতনের কথায় হো হো ক'রে হেসে উঠল।

সামান্য ক'দিনের ছুটি ভোগ ক'রে মারী ইংল্যাণ্ডে চলে গেলেন, সেখানে নানা বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠানাদির জন্য তাঁর আহ্বান এসেছিল। বার্মিংহাম থেকে আবার তিনি "অনরিস্ কসা" ডক্টর উপাধি পেলেন। এই প্রথম এ ধরনের অনুষ্ঠান তিনি হাসি মুখে সহ্য করলেন, তার গল্প আইরিনের কাছে সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করেছিলেন:

'ওঁরা আমায়, আমার হতভাগ্য সঙ্গীদের মতো, অর্থাৎ আমারই মতো যে বৈজ্ঞানিকরা ডক্টর উপাধি পাবেন, তাঁদের মতো সবুজ মগজি দেওয়া চমৎকার লাল পোশাক পরিয়ে দিলেন। আমাদের প্রত্যেকের কীর্তিকলাপ বর্ণনা ক'রে শোনানো হলো, তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহাশয় আমাদের ডিগ্রি দিলেন। তখন আমরা প্ল্যাটফর্মে নিজেদের জায়গায় গিয়ে বসলাম। শেষে সমবেত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর-ডক্টরদের সঙ্গে আমরা সার বেঁধে চলে এলাম। এঁদের সকলেরই পোশাক প্রায় একরকম। আগাগোড়া সবটাই বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। আমায় শপথ করতে হলো, বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনকানুন মেনে চলব ব'লে।'

চিঠি পড়ে আইরিনের উৎসাহের আর শেষ নেই। সে মার চিঠির উত্তর লিখল:

'মা-মণি, সবুজ মগজি দেওয়া লাল পোশাক পরা তোমায় যেন আমি দেখতে পাচ্ছি, না জানি তোমায় কতো সুন্দর দেখাচ্ছিল! তুমি পোশাকটা রেখে দিয়েছ তো, না, শুধু অনুষ্ঠানের জন্যই সেটা তোমায় ওঁরা ধার দিয়েছিলেন?'

ফ্রান্সে ঝড় থেমে গেছে, বৈজ্ঞানিক তাঁর প্রশংসার শিখরে উঠেছেন। গত দুই বৎসর যাবৎ ফরাসী স্থপতি-শিল্পী নেনো রু-পিয়ের কুরীতে তাঁর জন্য নির্ধারিত জমির ওপর ইনস্টিটিউট-অব-রেডিয়ম তৈরির কাজে লেগে গেছেন।

অবশ্য এতো সহজে কিছুই এগোয় নি। পিয়ের মারা যাবার পরেই কর্তৃপক্ষ মারীকে প্রস্তাব পাঠালেন যে, কুরী ইনস্টিটিউট তৈরি করার জন্য একটি জাতীয় চাঁদা-ভাণ্ডার খোলা যেতে পারে। রু-দোপ্যাঁর সাংঘাতিক দুর্ঘটনাকে অর্থকরী বন্দোবস্তে পরিণত করতে নারাজ হয়ে মারী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। কর্তৃপক্ষ তাঁদের স্বাভাবিক শিথিল গতিতে ফিরে গেলেন। কিন্তু ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে পাস্তুর ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডাঃ রোঅব-এর মাথায় মারীর জন্য একটা ল্যাবরেটারি তৈরি করার মহান ও দুঃসাহসিক চিন্তা এল। সে-চিন্তা বাস্তবে পরিণত হলে হয়তো মারী সরবন ছেড়ে দিয়ে পাস্তুর ইন্‌স্টিটিউটের একজন প্রখ্যাতা তারকা হয়ে যেতেন।

বিশ্ববিদ্যলেয়ের কর্তাদের কান খাড়া হয়ে উঠল। মাদাম কুরী কি বেহাত হয়ে যাবেন? অসম্ভব। যেন-তেন-প্রকারেণ অফিসর গোষ্ঠীর মধ্যে তাঁকে ধরে রাখতেই হবে, খরচ যা হয় হোক!

ডাক্তার রোঅব আর উপাধ্যক্ষ লিয়ার্ডের মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে সব বচসার নিষ্পত্তি হলো। বিশ্ববিদ্যালয় ও পাস্তুর ইনস্টিটিউট দু'তরফ থেকেই ৪,০০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা খরচ ক'রে রেডিয়ম-প্রতিষ্ঠান গড়া হবে। তার ভেতর দুটি ভাগ থাকবে, একাংশে মারী কুরীর পরিচালনায় রেডিও-এ্যাকটিভিটির জন্য ল্যাবরেটারি থাকবে, অপরাংশ শরীরতত্ত্বের গবেষণা ও কুরী-থেরাপির জন্য ব্যবহার হবে। এই অংশে প্রসিদ্ধ চিকিৎসক প্রফেসার ক্লোদ রেগো একসঙ্গে ক্যানসার সম্বন্ধে গবেষণা ও ক্যানসার রোগীর চিকিৎসা—দুই কাজই চালাবেন। এই দুই স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভাগ একযোগে রেডিয়ম বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করবে।

মারী এখন প্রায়ই র‍্যু-কুভিয়েরে থেকে মিস্ত্রিদের ভারাবাঁধা মাচানগুলোর

কাছে ছুটে ছুটে আসেন, সেখানে বসে প্ল্যান আঁকেন, স্থপতিশিল্পীর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেন। চুলে তাঁর পাক ধরছে। মাথায় তাঁর নতুন আধুনিক সব ধারণা। তিনি নিজের কাজের কথা ভাবছিলেন, একথা সত্যি, কিন্তু এমন একটা ল্যাবরেটারি তিনি গড়তে চান যা আগামী ত্রিশ বছর, পঞ্চাশ বছর, তিনি চলে যাবার পর বহুকাল পর্যন্ত, জগতের কল্যাণে লাগবে। ঘরগুলো হবে প্রকাণ্ড, বড় বড় জানালা দিয়ে প্রচুর আলোবাতাস গবেষণার ঘরগুলো ভাসিয়ে দেবে। এবং যদিও তাঁর ব্যায়-সাপেক্ষ প্রস্তাবে সরকারী ইঞ্জিনিয়ারের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, তবু লিফট একখানা রাখতেই হবে।

বরাবরই মারীর বাগানের প্রতি দুর্বলতা ছিল, তাকে তিনি নিজহাতের স্নেহস্পর্শে জাগিয়ে তুলবেন। যারা জায়গা বাঁচাবার তালে ছিল, তাদের যুক্তিকে সম্পূর্ণ বাতিল ক'রে দিয়ে বাড়িগুলোর মাঝখানে যে কয়ফুট জমি পাওয়া যাবে ততটুকুই সন্তর্পনে বাঁচিয়ে নিলেন। তারপর পাকা সমঝদারের মতো একটি একটি ক'রে বাছাই-করা গাছের চারা নিজে দাঁড়িয়ে লাগিয়ে দিলেন। তখনও বাড়ির ভিৎ গাঁথার অনেক দেরী। বন্ধুদের বললেন: "টাটকা টাটকা বড় পাতা গাছ আর লেবু গাছগুলো বেড়ে উঠে ঝাড় শুদ্ধ ফুলে ফুলে ছেয়ে যাবে। কিন্তু সাবধান, মঁসিয়ে নেনোকে আমি এখনও জানাই নি!'

বলতে বলতে ধূসর চোখদুটি ছেলেমানুষী খুশিতে চক্‌চক্ ক'রে উঠত। অসমাপ্ত প্রাচীরের পাশে সহস্তে খুরপি দিয়ে মাটি খুঁড়ে বুনো গোলাপের চারা লাগালেন। প্রতিদিন নিজের হাতে গাছের গোড়া পরিষ্কার ক'রে যখন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতেন, তখন মনে হতো তিনি যেন একই সময়ে মৃত-প্রস্তর ও জীবিত চারা গাছগুলির ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করছেন।

একদিন যখন রু্য-কুভিয়েরে-এ নিজের ল্যাবরেটারিতে কাজের মধ্যে ডুবে আছেন, এমন সময়ে তাঁর প্রাক্তন ল্যাবরেটারি-ভৃত্য পেতিৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল। স্কুল-অব-ফিজিক্স-এর প্রাঙ্গণে নতুন নতুন ঘর উঠছে। পিয়ের ও মারীর সেই বিশ্রী স্যাঁৎসেঁতে আটচালাটি এতদিনে মিস্ত্রিদের শাবলের ঘায়ে ভূমিশয্যা নেবে। অতীতের বহু দুঃখের সাথী সেই ভৃত্যের সঙ্গে মারী রু-লমোঁ-র কাছে শেষ-বিদায় নিতে এসে দাঁড়ালেন। তখনও সেই আটচালা তেমনি অচল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সশ্রদ্ধ যত্নে পিয়েরের কুরীর হাতের লেখা কয়েকটি লাইন তখনও ব্ল্যাক্‌বোর্ডের গায়ে অক্ষত রয়েছে। মনে হলো এই বুঝি দোর খুলে দীর্ঘকায় পরিচিত মূর্তিটি ঘরে এসে দাঁড়াবে।

রু-লমোঁ, রু-কুভিয়ের, রু-পিয়ের কুরী···তিনটি ঠিকানা, তিনটি ধাপ। সেদিন মারী তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবনকে প্রথম থেকে আর একবার ফিরে দেখলেন—যদিও এর মহিমায় অপূর্ব সুন্দর অথচ দুঃখের দিকটা তাঁর চোখে পড়ল না। তাঁর সামনে ভবিষ্যৎ পরিষ্কার ছকে বাঁধা আছে। শরীরতত্বের ল্যাবরেটারি সবে শেষ হয়েছে, প্রফেসর ক্লোদ রেগো'র সহকারীবৃন্দ কাজ শুরু ক'রে দিয়েছে, রাত্রে এই নতুন বাড়ির আলোয় উজ্জ্বল জানালাগুলি দূর থেকে সুন্দর লাগে। দিন কয়েকের মধ্যে মারী পি. সি. এন. ছেড়ে নিজের যন্ত্রপাতি নিয়ে রু-পিয়ের কুরীতে উঠে আসবেন।

মহীয়সীর অদৃষ্টে ভাগ্যদেবী যখন সুপ্রসন্ন হলেন, তখন তাঁর না ছিল বয়স, না ছিল শক্তি, না ছিল মনে আনন্দ। কিন্তু চতুপার্শে নতুন শক্তির দিকে তাকিয়ে উৎসাহী বৈজ্ঞানিকদের ভরসায় তিনি সামনের পরীক্ষা তুচ্ছ জ্ঞান করলেন। না, এখনও খুব বেশী দেরী হয় নি।

ছোট সাদা বাড়িটার আপদমস্তক আলো ঝল্মল্ করে। সদর দরজার মাথায় পাথরে খোদাই করা শব্দগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠছে, 'ইনস্টিটিউট-দ্যু-রেডিয়ম প্যাভেলিয়ন কুরী'। এই সুনির্মিত দেয়াল এবং গৌরবময় খোদিত শব্দগুলির সামনে দাঁড়িয়ে মারী পাস্তুরের বাণী স্মরণ করলেন :

'যদি মানবীয় বিজয়বার্তা তোমাদের হৃদয় স্পর্শ করে, যদি বৈদ্যুতিক বেতার কার্য, আলোকচিত্র, চেতনানাশক ঔষধ -আদি অন্যান্য বহুবিধ অপূর্ব আবিষ্কারের সম্মুখে বিস্মিত বোধ কর, তোমার স্বদেশের এবংবিধ কীর্তিকলাপ দেখিয়া অন্তরে ঈর্ষা অনুভব কর—তবে আমি বিশেষভাবে তোমাদের অনুরোধ করি—অগ্রসর হইয়া আইস, ল্যাবরেটারি নামক তীর্থ সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি কর! তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিভূষিত করিতে সাহায্য কর। ইহারা ভবিষ্যতের ঐশ্বর্য ও কল্যাণের মন্দির। ইহাই মনুষ্যত্বের বিকাশ, পরিবর্ধন ও উৎকর্ষ সাধনের একমাত্র ক্ষেত্র। প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপ, প্রগতির ইতিহাস এবং বিশ্বব্যাপী সামঞ্জস্যের শিক্ষা মানবজাতি এই স্থানে লাভ করে, অথচ আপন কার্যের ফলে প্রায়ই বর্বরতা, কুসংস্কার ও ধ্বংসের অবতারণা করে।'

সেই অপূর্ব জুলাই মাসে রু-পিয়ের কুরীর এ হেন "ভবিষ্যৎ মন্দিরের" নির্মানকার্য সমাধা হলো। এখন সে-মন্দির তার রেডিয়ম, তার কর্মীবৃন্দ এবং তার পরিচালিকাকে অভ্যর্থনা করতে প্রস্তুত।

কিন্তু এই জুলাই ছিল ১৯১৪ সালের জুলাই।

। যুদ্ধ ।

২১

গ্রীষ্মের দিনগুলি নিশ্চিন্তে কাটাবার জন্য ব্রিটানীতে মারী একখানা ছোট্ট বাড়ি ভাড়া করলেন। একজন ধাত্রী ও একজন পাচকের সঙ্গে আইরিন ও ইভ আগেই রওনা হয়ে গেল, কথা রইল ৩রা আগস্ট মা তাদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দেবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ষশেষ হওয়ার জন্য তাঁকে পারী থেকে যেতে হলো। এভাবে একা একা থাকা তাঁর অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। কে-দ্য-বেতুনের ভৃত্যহীন শূন্য গৃহে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গভাবে তিনি এই গ্রীষ্মের দিনগুলি কাটিয়ে দিলেন। সারাদিন ল্যাবরেটারিতে কাটিয়ে বাড়ি ফিরতেন এবং সম্ভবতঃ অনেক রাত্রে যেমন-তেমন ক'রে ঘরখানা একটু পরিষ্কার ক'রে নিতেন।

১লা আগস্ট ১৯১৪, মারী তাঁর কন্যাদের লিখলেন :

'স্নেহের আইরিন, স্নেহের ইভ,—দিন দিন অবস্থা আরও বেশী সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে, যে-কোন মুহূর্তে যুদ্ধের ডাক আসতে পারে। এখনও বুঝতে পারছি না, আমার পক্ষে আদৌ এখান থেকে যাওয়া সম্ভব হবে কিনা। শান্ত হয়ে ধৈর্য ধরে থাক, যদি যুদ্ধ না লাগে, আমি সোমবারে তোমাদের কাছে পৌঁছব। যদি লাগেই তবে যতশীঘ্র সম্ভব তোমাদের এখানে নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করব। আইরিন, তুমি আর আমি নিজেদের কাজে লাগাতে চেষ্টা করব।'

২রা আগস্টের চিঠি :

'আমার আদরের মেয়েরা,—যুদ্ধ শুরু হয়েছে এবং যুদ্ধ ঘোষণা না করেই জার্মানরা ফ্রান্স আক্রমণ করেছে। এখন কিছুদিনের মতো তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা স্থগিত রইল।

'পারী এখনও শান্ত হয়ে আছে এবং দেশের সন্তানদের যুদ্ধে পাঠাবার দুঃখ সহ্য করেও স্থির হয়ে আছে।'

৬ই আগস্টের চিঠি :

'আমার আদরের আইরিন, আমিও তোমাদের ফিরিয়ে আনতে চাই, কিন্তু বর্তমানে তা' অসম্ভব। ধৈর্য ধর।

'জার্মানরা যুদ্ধ করতে করতে বেলজিয়ম পেরিয়ে আসছে। ছোট্ট সাহসী বেলজিয়ম কিন্তু বিনা যুদ্ধে এদের পেরিয়ে আসতে দেয় নি। ফরাসীরা যথেষ্ট

আশা রাখে এবং কঠিন সংগ্রামের আশঙ্কা সত্ত্বেও সবকিছু ভালোর দিকেই মোড় নেবে বলে মনে হয়।

'পোল্যাণ্ডের খানিকটা জার্মানদের অধীনে চলে এসেছে। তারা চলে যাবার পর কীই বা সেখানে অবশিষ্ট থাকবে: আমরা বাড়ির লোকদের কোন খবরই পাচ্ছি না।'

মারীর চতুর্দিক শূন্যতায় ভরে উঠেছে। তাঁর সহকর্মীরা এবং ল্যাবরেটারির সমস্ত ছেলেরা সৈন্যবিভাগের কাজে যোগ দিয়েছে, শুধু তাঁর যান্ত্রিক লুঁঈ রাগো দুর্বল-হার্টের জন্য যেতে পারে নি এবং একজন বেঁটে ঠিকে-ঝি, যার উচ্চতা টেবিলকেও ছাড়ায় না, তাঁর সঙ্গে রয়ে গেল।

মারী ভুলে গেলেন যে, ফ্রান্স তাঁর গ্রহণ-করা স্বদেশ। সন্তানদের সঙ্গে মিলিত হবার স্বপ্নও তিনি ভুলে গেলেন। দুর্বল, ক্লিষ্ট মারী নিজের অসুস্থতাকে গ্রাহ্য করলেন না, এবং ভবিষ্যতের সুদিনের অপেক্ষায় নিজের কাজকর্ম চাপা দিয়ে রাখলেন। দ্বিতীয়-মাতৃভুমির সেবাই এখন তাঁর ধ্যানজ্ঞান হয়ে দাঁড়াল। এই দারুণ অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে তাঁর সহজ উপলব্ধি এবং নেতৃত্বের ক্ষমতা আরও একবার প্রমাণিত হলো।

ল্যাবরেটারি বন্ধ ক'রে আর পাঁচজন সাহসী ফরাসী মহিলাদের মতো সাদা ওড়না মাথায় বেঁধে নার্সের কাজে যোগদান করার সহজ পথ তিনি এড়িয়ে গেলেন।···চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানে নাম লিখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা ব্যাপার আবিষ্কার করলেন। কর্তৃপক্ষের অবশ্য তা' নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা দেখা গেল না, কিন্তু তাঁর কাছে তা অত্যন্ত অন্যায় বলে মনে হলো। ব্যাপারটি এই :—কি যুদ্ধ ক্ষেত্রে, কি যুদ্ধের অন্তরালে কোনও হাসপাতালে এক্স-রের বন্দোবস্ত নেই।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে রঞ্জেনের এক্স-রে আবিষ্কারের ফলে মানুষের দেহের ভেতর দৃষ্টি চালিয়ে অস্থি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ছবি তুলে রোগ নির্ণয় করা সহজ হয়েছিল; ১৯১৪-য় ফ্রান্সে রঞ্জেন-আবিষ্কৃত যন্ত্র অল্প কয়েকজন ডাক্তারের কাছেই ছিল। যুদ্ধের সময়ে সৈন্যবিভাগীয় স্বাস্থ্য-সংস্থা দু'একটি বড় বড় কেন্দ্রে এ হেন 'বিলাসিতার' ব্যবস্থা ক'রেছিলেন—ব্যাস, ঐ পর্যন্তই!

যার সাহয্যে রাইফেলের বুলেট অথবা গোলার একটি টুকরো একপলকে আবিষ্কার করা যায়—তাকে বলে বলা হলো বিলাসিতা!

মারী নিজে কোন দিন এক্স-রে নিয়ে চর্চা করেন নি কিন্তু সরবনে

প্রতিবছর তাঁকে এ বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে হতো। কাজেই বিষয়টি তাঁর ভালরকম জানা ছিল। স্বতঃস্ফূর্ত বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার সাহায্যে তিনি অনায়াসে ধরতে পারলেন যে এই ব্যাপক হত্যার প্রতিরোধ করতে হলে এক্ষুণি অনেকগুলি রেডিও-শক্তিকেন্দ্র গঠন করা উচিত এবং সৈন্যদের গতি-বিধির সঙ্গে এ যন্ত্রকে চলতে হলে এর ওজনও যথেষ্ট হালকা হওয়া প্রয়োজন।

মারী তাঁর কর্মক্ষেত্র ঠিক ক'রে নিলেন। কয়েকঘণ্টার ভেতর বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটারিগুলির যন্ত্র তালিকা প্রস্তুত করলেন, নিজেরটিও বাদ গেল না। এক্স-রে উৎপাদক যারা তাদের কারখানায়ও মারী হাজির হয়ে তালিকা তৈরি করলেন, যতগুলি কাজের উপযুক্ত এক্স-রে সরঞ্জাম পাওয়া গেল, সংগ্রহ করলেন, তারপর পারীর আসেপাশে সব হাসপাতালে বিতরণ ক'রে এলেন। প্রফেসর, ইঞ্জিনিয়র, বৈজ্ঞানিক—সবার ভেতর থেকে স্বেচ্ছাসেবক-কর্মী নির্বাচন করা হলো।

কিন্তু ক্রমাগত যে অসংখ্য আহত সৈন্যদের বয়ে আনা হচ্ছিল, তাদের কি ব্যবস্থা করা যায়? কয়েকটি হাসপাতালে বৈদ্যুতিক যন্ত্র ব্যবহার করার মতো বিদ্যুতের কোন ব্যবস্থাই ছিল না।

মাদাম কুরী উপায় বের করলেন। ফ্রান্সের মহিলা-প্রতিষ্ঠানের টাকা দিয়ে তিনি প্রথম "রেডিও শক্তি সমন্বিত মোটর যান" তৈরি করলেন, সাধারণ একখানা মোটর গাড়িতে রঞ্জেনের যন্ত্র ও ডায়নামো জুড়ে দিলেন। মোটর গাড়ির যন্ত্রই প্রযোজনীয় বিদ্যুৎ শক্তির যোগান দিল। ১৯১৪-র আগস্ট মাস থেকে গাড়ি বিভিন্ন হাসপাতালে ঘুরে ঘুরে এক্স-রে তুলল; মার্নের যুদ্ধের সময় পারীতে আহতদের পরীক্ষা করার জন্য একমাত্র এই গাড়িটাই সম্বল ছিল।

জার্মানদের দ্রুত অগ্রগতিতে মারীকে এক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হলো। পারীতেই থাকবেন, না, ব্রিটানীতে মেয়েদের কাছে চলে যাবেন? শত্রুপক্ষ রাজধানী দখল করলে চিকিৎসা বিভাগের সঙ্গে তিনিও কি অন্যত্র সরে যাবেন?

ধীর স্থির ভাবে বিবেচনা ক'রে নিজের কর্তব্য তিনি ঠিক করলেন: যাই ঘটুক না কেন, তিনি পারীতেই থাকবেন। শুধু যে নতুন কাজের দায়িত্ব তাই নয়, তাঁর ল্যাবরেটারি রু-কুভিয়ের-এর সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি রু-পিয়ের কুরীর নতুন ঘরগুলো—সবই তো এখানে! ভাবলেন: 'যদি আমি উপস্থিত থাকি, তবে

জার্মানরা দোষ হয় এসবে হাত দেবে না, কিন্তু আমি যদি চলে যাই তবে সব ধ্বংস হয়ে যাবে।'

মনকে চোখ ঠেরে এইসব যুক্তি তুললেন এবং না-যাবার যুক্তিসঙ্গত অজুহাত খুঁজে বের করলেন। আসলে জেদী একগুঁয়ে দাম্ভিক মারী পালানোর কথা ভাবতেই পারলেন না। ভয় পাওয়া মানে শত্রুকে স্বীকার করা। পরিত্যক্ত কুরী-ল্যাবরেটারি বিজয়ী শত্রু অনায়াসে দখল ক'রে নেবে, দুনিয়ার কোন কিছুর বিনিময়ে মারী তা বরদাস্ত করতে পারেবেন না।

সন্তানদের সঙ্গে বিচ্ছেদের সম্ভাবনাকে তিনি মনে মনে মেনে নিলেন এবং সেই ভাবে তিনি তাঁর ভাসুর জ্যাকের হাতে মেয়েদের ভার দিলেন।

১৯১৪, ২৮শে আগস্ট মারী লিখলেন আইরিনকে:

'এরা পারী আক্রমণ আশঙ্কা করছে এবং তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এক্ষেত্রে তোমাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবার আশঙ্কা আছে। তাই যদি হয়, সাহসে ভর ক'রে সহ্য ক'রো, কারণ যে-মহাযুদ্ধ লেগেছে, তার কাছে আমাদের পারিবারিক ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন মূল্যই নেই। যদি যতদিন আশা করছি, তার চেয়েও বেশীদিন তোমাদের ছেড়ে থাকতে হয়, তবে তুমি তোমার বোনের ভার নেবে।'

২৯শে আগস্ট লিখলেন:

'স্নেহের আইরিন, আমরা যে আরও অনেক দিন ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকব, তা হয়তো নাও হতে পারে। ...তবুও সবরকম অবস্থার জন্যই তো প্রস্তুত থাকা আমাদের উচিত। ...যুদ্ধ সীমানার এত কাছে এসে গেছে যে পারীতে জার্মানরা অনায়াসে হানা দিতে পারে। তবে তাই বলে যে আমরা হেরে যাব এমন কোন কথা নেই। সুতরাং মনে সাহস রেখো, ভরসা রেখো। নিজেকে এখন থেকে বড়দিদি ভাবতে শুরু ক'রো।'

১৯শে আগস্ট ১৯১৪, লিখলেন:

'তোমার শনিবারের মিষ্টি চিঠিখানা প'ড়ে তোমায় চুমু খাবার ইচ্ছেটা এত প্রবল হয়ে উঠল যে চোখে প্রায় জল এসে গিয়েছিল। এদিকের ব্যাপার সুবিধের নয় এবং আমরা সবাই ভারাক্রান্ত মনে বিচলিত অবস্থার মধ্যে রয়েছি। প্রচুর সাহসের প্রয়োজন, আশাকরি তার অভাব হবে না। দুর্দিনের পর সুদিন দেখা দেবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমার বুকজুড়ানো ধনেরা এই আশায় আমি তোমাদের বুকে ক'রে আছি।'

শত্রু-বেষ্টিত, বিধ্বস্ত, পরহস্তগত প্যারীতে বেঁচে থাকার কথাও তিনি স্থির মনে ভাবতে পারেন, পারেন না শুধু একটি মাত্র সম্পদ শত্রুর হাতে তুলে দিতে : তাঁর ল্যাবরেটারিতে সযত্নে সংরক্ষিত সেই আদিতম একগ্রাম রেডিয়ম-কণিকা ! কোনও দূতের হাতে তুলে দিতেও ভরসা হয় না, কাজেই নিজে হাতে বর্দোতে নিয়ে যাওয়া স্থির করলেন।

সুতরাং সরকারী কর্মচারী ও প্রধান নাগরিকদের জন্য নির্ধারিত একখানা ছোট্ট রাতকাটানোর সরঞ্জাম নেবার থলে হাতে একগ্রাম রেডিয়ম নিয়ে মারী চললেন, অর্থাৎ থলের ভেতর সীসের ঢাকনা পরানো ছোট ছোট অনেকগুলি টিউব একটা ভারী বাক্স বোঝাই ক'রে নিয়েছিলেন। দৈবচক্রে মাদাম কুরী বেঞ্চের একপ্রান্ত খালি পেয়ে সেখানে বসে ভারী প্যাকেটখানা সামনে নাবিয়ে রাখলেন। গাড়ির ভেতরে হতাশাপূর্ণ আলোচনা থেকে নিজেকে জোর ক'রে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে জানালার ভেতর দিয়ে বাইরে আলোয় ভরা পৃথিবীর দিকে চেয়ে রইলেন। কিন্তু সেখানেও সবকিছুর মধ্যে পরাজয়ের বার্তা : রেলপথের পাশ দিয়ে বরাবর রাস্তা চলে গেছে, সেখানে পশ্চিমে ধাবমান অপ্রতিহত গাড়ির মিছিল !

ফরাসীরা বোর্দো ছেয়ে ফেলেছে। কুলি, ট্যাক্সি, হোটেলের খালি কামরা—কিছুই পাওয়া যায় না। রাত হয়ে গেছে, মারী তখনও তাঁর বোঝা নামিয়ে স্টেশনের মধ্যে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন। বোঝা বইবার শক্তি যেন আর নেই তাঁর। তাঁর স্বাভাবসিদ্ধ কোমলতার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ জনতা তাঁকে ধাক্কা মেরে ঠেলেঠুলে এগিয়ে চলেছে, নিজের অবস্থায় তিনি কৌতুক বোধ করলেন। দশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক মূল্যের এই বাক্সখানা পাহারা দিয়ে তাঁকে কি সারারাত দাঁড়িয়ে কাটাতে হবে ? না। মন্ত্রী-তরফের এক কর্মচারী তাঁর সঙ্গে ট্রেনে আসছিলেন, তিনি সহযাত্রীর বিপদ বুঝে এগিয়ে এসে তাঁকে উদ্ধার করলেন। এক গৃহস্থের বাড়িতে তিনি তাঁর জন্য একখানা ঘর জোগাড় ক'রে দিলেন, কেসশুদ্ধ কুড়ি কিলোগ্রাম ওজনের রেডিয়ম আশ্রয় পেল ! পরদিন সকালে মারী এই অসুবিধা জনক সম্পত্তিটা ব্যাঙ্কের সুরক্ষিত ভল্টে জমা দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে প্যারীতে আবার ফিরে চললেন।

যাবার সময়ে বিশেষ কেউ তাঁকে নজর ক'রে দেখে নি, কিন্তু ফেরার পথে তাঁকে নিয়ে রীতিমতো উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। এই অত্যাশ্চর্য "নারী, যিনি আবার সেখানে ফিরে চলেছেন"—তাঁর চারপাশে ভিড় জমে গেল। 'নারী' তাঁর পরিচয় গোপন ক'রে গেলেন, কিন্তু স্বভাববিরুদ্ধ আলোচনার ভেতর

দিয়ে তীক্ষ্ণ জনরবকে শান্ত করার ইচ্ছায় বললেন : 'প্যারী আত্মরক্ষা করবেই, সেখানের বাসিন্দাদের কোন বিপদের আশঙ্কা নেই।'

এবার যে ট্রেনে উঠলেন তিনি; সেটি সৈনিকদের ট্রেন এবং অসম্ভব ধীরে ধীরে চলছিল। মাঠের মাঝে ঘণ্টার পর ঘণ্টা থেমে রইল। জনৈক সৈনিক তার থলে থেকে এক খণ্ড রুটি বের ক'রে দিল, মারী তাই চিবোলেন। আগের দিন ল্যাবরেটারি ছাড়ার পর থেকে তাঁর খাবার সময় হয় নি।

সেপ্টেম্বরের গোড়ার কথা; শান্ত, শঙ্কিত প্যারী যেন অভিনব রূপে দেখা দিল। এমন রত্ন কি হেলায় হারানো চলে? কিন্তু জোয়ারের স্রোতের মতো পথে পথে বার্তা রটে গেল। পথের ধুলোয় ধূসরিত মারী সোজা অনুসন্ধান-আফিসে চলে গেলেন: জার্মানদের গতি ছত্রভঙ্গ ও মার্নের সংগ্রাম শুরু হয়েছে।

সুপরিচিত নর্ম্যাল ইস্কুলে মারী অধ্যাপক আপ্লেল ও বরেলের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলেন। "জাতীয় সাহায্য"—এই সংজ্ঞায় এঁদের পরিচালিত চিকিৎসা-ব্যবস্থায় তিনি সেই মুহূর্তে যোগ দিতে উৎসুক। দাতব্য চিকিৎসা-বিভাগের সভাপতি পোল আপ্লেল এই ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মহিলাকে দেখে করুণায় বিগলিত হলেন। তিনি মারীকে সোফায় শুইয়ে দিয়ে তাঁকে ক'দিনের বিশ্রাম নিতে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। মারী সে-কথায় কানও দিলেন না। কিছু করতে হবে, কোন কাজে নিজেকে লাগাতেই হবে···পোল-আপ্লেল পরে তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেন: 'ঐ খানে ঐ সোফায় রক্তহীন পাণ্ডুর মুখখানার ভেতর মস্ত দু'টি চোখের আলোয় তাঁর সর্বাঙ্গ যেন জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মতো জ্বলছিল।'

১৯১৪-র ৬ই ডিসেম্বর মারী আইরিনকে লেখেন:

'···ঠিক এই মুহূর্তে যুদ্ধের রঙ্গমঞ্চে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। শত্রুরা যেন প্যারী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আমরা সবাই মনে ভরসা রেখেছি, শেষ-জয়ের সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস আছে।

'বাচ্চা ফার্নাণ্ড শাভানকে দিয়ে পদার্থবিদ্যার প্রব্লেমগুলো কষিয়ে নিও। যদি বর্তমান ফ্রান্সের জন্যে কিছু করতে না পারো, এর ভবিষ্যতের কাজে লেগো। যুদ্ধের পরে আমাদের মধ্যে অনেককেই হারাতে হবে। এবং তাদের সব জায়গা ভরানো চাই। তুমি নিজে অঙ্ক আর পদার্থবিদ্যার পাঠ যথাসম্ভব এগিয়ে রেখো।'

পারী রক্ষা পেল। নির্বাসনের জীবন যাপন করতে আর রাজী নয় তাঁর কন্যারা। মারী তাদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করলেন। ইভ পুরোনো ইস্কুলে ফিরে গেল, আইরিন নার্স-ডিপ্লোমা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

এ যুদ্ধের পরিণতি যে ক্রমশই ভয়ঙ্কর রূপ নেবে, আহতদের ওপর অস্ত্র-চিকিৎসার প্রয়োজন হবে এবং অধিকাংশ অস্ত্রোপচার যুদ্ধক্ষেত্রেই করতে হবে —মারী যেন এ চিত্র মনে মনে দেখতে পেলেন। এম্বুলেন্সের আগেভাগে সার্জন ও রেডিওলজিস্টদের প্রস্তুত থাকতে হবে। অসংখ্য রঞ্জেন-যন্ত্র তৈরির আশু প্রয়োজন এবং অমূল্য কার্যকলাপের জন্য রেডিও-সমন্বিত যানের অপরিহার্যতা—এ সমস্তই মাদাম কুরী আগে থেকে বুঝেছিলেন।

সৈন্যবিভাগে এই গাড়িগুলিকে "লিটল কুরীস" নাম দেওয়া হয়েছিল। আমলাতন্ত্রের ঔদাসীন্য বা প্রছন্ন-বিদ্বেষ অগ্রাহ্য ক'রে ল্যাবরেটারিতে ব'সে মারী একটি একটি ক'রে এই গাড়িগুলিতে যন্ত্রপাতি ভরে দিতেন। আমাদের সেই ভীরু মা-মণি হঠাৎ এক ব্যক্তিত্ব সম্পন্না কর্ত্রীপদে উন্নীত হলেন। অলস সরকারি কর্মাচারীদের উত্যক্ত ক'রে তাদের কাছ থেকে পাশ, ভিসা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আদায় করতেন। তারা অসুবিধা সৃষ্টি করত, তাঁর কাছে আইন কানুনের আস্ফালন দেখাত। 'দেশের জনসাধারণের জন্য আমাদের মাথা ব্যথা নেই—' এদের মধ্যে অনেকেরই মনের কথা ছিল এই কিন্তু মারী ছাড়তেন না, তর্ক ক'রে লেগে থেকে তিনি শেষ অবধি জিতে আসতেন।

বিশেষ বিশেষ নাগরিককে তিনি নির্দয়ভাবে ধরে পড়তেন। মারকীজ ছ্যা গানে এবং রাজকুমারী ম্যুরার মতো কোমল প্রকৃতির মহিলারা তাঁর অনুরোধে তাঁদের দামী গাড়ি দান করলেন—সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতর রেডিও-চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ভরা হয়ে গেল। মৃদু হেসে ঠাট্টা ক'রে তিনি এঁদের আশ্বাস দিলেন: 'যুদ্ধের পর তোমাদের গাড়ি ফিরিয়ে দেব। সত্যি বলছি, যদি ততদিনে একেবারে অকেজো না হয়ে যায়, তবে তোমাদের গাড়ি নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দেব!'

এই রকম কুড়িখানা গাড়িকে মারী ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়ে পরিণত ক'রে ছিলেন, তার ভেতর একখানা ভোঁতানাকের লরির মতো গাড়ি নিজের হাতে রেখেছিলেন। ফৌজী ধূসর রঙের গাড়ির কাঁচের গায়ে রেডক্রশ ও ফরাসী জাতীয়পতাকা লাগানো গাড়িখানায় চড়ে তিনি বাইরে সর্বত্র ঘুরে ঘুরে দারুণ রোমাঞ্চকর এক মস্ত সেনাধ্যক্ষের জীবন যাপন করছিলেন।

একটা টেলিগ্রাম বা টেলিফোনে মাদাম কুরীকে খবর দেওয়া হতো, এক গাড়ি আহত সৈনিকের চিকিৎসার জন্য এক্ষুণি এক্স-রে যন্ত্রপাতি চাই। সঙ্গে সঙ্গে মারী নিজের গাড়িখানায় সব ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে রঞ্জেন-যন্ত্র ও ডায়নামো জুড়ে নিতেন। সৈন্যবিভাগের মোটর-চালককে পাহারা রেখে বাড়ির ভেতর থেকে নিজের কালো ক্লোক, নরম গোল টুপিখানা এবং হলুদে রংচটা ছাল ছাড়ানো ডাক্তারি ব্যাগ নিয়ে তৈরি হয়ে আসতেন।

ড্রাইভারের পাশে বসে ঝড়বাতাসের ঝাপটা খেতে খেতে যেতেন এবং এবং সেই পেটমোটা ভারী গাড়িটা পূর্ণ গতিতে অর্থাৎ ঘণ্টায় কুড়ি মাইল বেগে আমিঞ্র, ইপ্রি, ভার্দে্যা অভিমুখে ছুটত।

পথে অনেক বাধা, অবিশ্বাসী পাহারাওয়ালাদের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়ায় অযথা সময় নষ্ট ক'রে হাসপাতালের দেখা পাওয়া যেত। তারপরেই কাজ! মাদাম কুরী একখানা ঘর রেডিও-চিকিৎসার জন্য বেছে নিয়ে সঙ্গের জিনিসপত্র সেখানে আনিয়ে নিতেন। একটি একটি ক'রে যন্ত্রপাতি মোড়ক থেকে বের ক'রে সেগুলি দিয়ে একখানা সমগ্র রঞ্জেনযন্ত্রে পরিণত করতেন। তার দিয়ে গাড়ির ডায়নামোর সঙ্গে তাকে যুক্ত করা হতো। তারপর তাঁর ইঙ্গিত পেয়ে ড্রাইভার ডায়নামো চালিয়ে দিত, তিনি বৈদ্যুতিক প্রবাহের শক্তি নির্ণয় ক'রে নিতেন। আহতকে পরীক্ষা করার আগে এক্স-রের সাহায্যে ছবি তোলার পর্দাটা সাজিয়ে নিতেন এবং হাতের কাছে ডাক্তারি-দস্তানা, চশমা, দাগ দেবার বিশেষ পেন্সিলগুলো একং কামানের গোলা-সন্ধানী সীসের তৈরি নির্দেশক যন্ত্র—সব গুছিয়ে রাখতেন। অঙ্গের কালো পর্দা বা হাসপাতালের সাধারণ কম্বল দিয়ে জানালা ঢেকে ঘর অন্ধকার ক'রে ফেলতেন। এ হেন ছবিতোলার ডার্করুমের মধ্যে ছবির প্লেট ধোয়া রাসায়নিক জিনিসগুলো একদিকে গুছিয়ে নিতেন। পৌঁছবার আধঘন্টার ভেতর মারী সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলতেন।

তারপর শুরু হতো কষ্টকর কাজ। সেই অন্ধকার ঘরে মাদাম কুরীর সঙ্গে সার্জেনও বন্দী হতেন, সেখানে যন্ত্রপাতি ঘিরে এক রহস্যময় আলো। একটির পর একটি সৈনিককে স্ট্রেচারে ক'রে আনা হতো। আহত সৈনিককে রেডিও-চিকিৎসার টেবিলে শোয়ানো হতো। থেঁতলানো মাংসের ওপর যন্ত্র ঘুরিয়ে মারী আলো ফেলতেন যাতে ভালো ক'রে দেখা যেতো। হাড় বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকার পরিষ্কার হয়ে উঠত···এবং তার ভেতর কালো মোটা সীসের টুকরো ধরা পড়ত।

একজন সহকারী ডাক্তারি পরীক্ষার ফলাফল লিখে নিত, মারী তাড়াতাড়ি ক্ষতের ছবি এঁকে নিতেন যাতে পরে সার্জেনের পক্ষে গোলার খণ্ডটুকু বের করতে সুবিধে হয়। আবার কখনও "রশ্মির নীচেই" সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রোপ্রচার করা হতো এবং রেডিও-স্কোপিক পর্দার ওপর সার্জেন ক্ষতের ভেতর ডাক্তারি-চিমটে চালিয়ে হাড়ের বাধা এড়িয়ে গোলার টুকরো বের ক'রে নিতেন,— তার ছবিও উঠে যেত।

এমনি ভাবে দশজন আহত লোক এল…এল পঞ্চাশ একশো…ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যেত, সময়ে সময়ে দিনের পর দিন কেটে যেত। যতক্ষণ একটি রোগীও আছে, মারীকে এক মুহূর্তের জন্যেও অন্ধকার ঘরের বাইরে বের করা যেত না। হাসপাতাল ছেড়ে আসার আগে সেখানে রেডিও-চিকিৎসার একটা ব্যবস্থার কথা ভাবতে বসতেন। তারপর নিজে যন্ত্রপাতি গুটিয়ে নিয়ে সামনের সীটে উঠে বসে তঁরে যাদুর পক্ষীরাজে চেপে পারী ফিরে আসতেন।

শিগগিরই আবার সেই হাসপাতালে তাঁকে দেখা যেত। দুনিয়া ওলট পালট ক'রে একখানা যন্ত্র তিনি খুঁজে বের করতেন এবং সেটিকে সেই হাসপাতালে দিয়ে আসতেন। একজন কাজের লোক তাঁর সঙ্গে যেত, কোন-রকমে এ লোকটিকে খুঁজে বের ক'রে তাকে কাজ চালাবার মতো শিখিয়ে নিতেন। তারপরে এই হাসপাতালে এক্স-রে ঘর চালু ক'রে দিয়ে আসতেন, যাতে ভবিষ্যতে তাঁকে আর এদের না ডাকতে হয়।

কুড়িখানা মোটর গাড়িকে চলন্ত হাসপাতালে পরিণত করা ছাড়াও তিনি দুশোটা রেডিও-চিকিৎসার উপযোগী কক্ষ তৈরি করেছিলেন। এই দুশো কুড়ি খানা স্থায়ী ও ভ্রাম্যমাণ রেডিও-চিকিৎসাগারে যে-সব আহত সৈনিকদের পরীক্ষা করা হয়েছিল তাদের মোট সংখ্যা দাঁড়াল দশ লক্ষের উপর। বিজ্ঞান ও সাহসই মাত্র তাঁর সহায় ছিল না, মারীর অশেষ গুনাবলীর মধ্যে এক অমূল্য গুণ ছিল "কাজ চালিয়ে যাওয়ার" ক্ষমতা। যুদ্ধের সময়ে ফরাসীরা "সিস্টেম ডি" নাম দিয়ে কৌশলে সরকারি মারপ্যাঁচকে পরাস্ত করার এক অভিনব পথ বের ক'রেছিল। তিনি সেই "সিস্টেম ডি" প্রয়োগে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। নিজেকে এক সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার মধ্যে এনে ফেললেন, একধারে রঞ্জেন-যন্ত্র ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন, নিখুঁৎ রেডিও-চিকিৎসার জন্য শরীরতত্ত্ব আয়ত্ব করা, মোটর গাড়ি চালনা, লাইসেন্স পাওয়ার জন্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, নিজেকে যান্ত্রিকে পরিণত করা—সব কাজ একসঙ্গে চলতে লাগল।

ড্রাইভার না এসে পৌঁছলে নিজেই গাড়ির স্টিয়ারিং-হুইল ধরে কোন গতিকে বিশ্রী রাস্তাগুলোর ওপর দিয়ে চলে যেতেন। তাঁকে প্রচণ্ড শীতে অবাধ্য গাড়িটার হাতল ধরে টানাটানি করতেও দেখা যেত। জ্যাকের ওপর শরীরের সমস্ত শক্তি ঢেলে দিয়ে তাঁকে টায়ার বদলাতেও দেখা যেত। বৈজ্ঞানিকের নিখুঁৎ কাজে অভ্যস্ত হাতে ভ্রূকুঞ্চিত অখণ্ড মনোযোগে তাঁকে কার্‌বরেটরের ময়লা সাফ করতেও দেখা যেত। যদি ট্রেনে ক'রে কোন যন্ত্র নিয়ে যেতে হতো, তবে তিনি নিজের হাতে সেটি গাড়িতে তুলতেন এবং যথাস্থানে পৌঁছে নিজেই সেটি নাবিয়ে মোড়ক থেকে খুলে নিতেন—এতটুকু এদিক-ওদিক না হয়, সেদিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

আরাম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন মারী কোন বিশেষ অনুগ্রহ বা সহৃদয়তার মুখাপেক্ষী ছিলেন না। কোন স্বনামধন্যা নারীকে কখনও এমন অনাড়ম্বর হতে দেখা যায় নি। যেমন হোক খাওয়া হলেই হলো। হ্যম্‌স্টেড হাসপাতালের মতো কোন জায়গায় ধাত্রীর ঘরে, কিংবা খোলা ময়দানে তাঁবুর মধ্যে—যেখানেই হোক ঘুমোলেই হলো। ছাত্রী জীবনে যিনি একদিন চিলে কুঠুরিতে ঠাণ্ডায় ঠক্ ঠক্ ক'রে কেঁপে ছিলেন, আজ অনায়াসে তিনি মহাযুদ্ধে একজন সৈনিক হয়ে দাঁড়ালেন।

১৯১৫-র ১লা জানুয়ারি, মারী পল্ ল্যাঙ্গেভিন্‌কে লেখেন :

'আমি কবে যাব তার কোন ঠিক নেই, কিন্তু তার যে খুব দেরী আছে, মনে হয় না। চিঠি পেলাম যে সেণ্ট পোলে রেডিও-ব্যবস্থাযুক্ত যে গাড়িখানা কাজ চালাচ্ছিল, সেটি জখম হয়েছে। তার মানে সারা উত্তর দিকটাতেই রেডিও-চিকিৎসা অচল হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বেরোবার আপ্রাণ চেষ্টা করছি, দেহের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় ক'রে আমার দ্বিতীয় মাতৃভূমিতে নিয়োজিত করব, কারণ শতবর্ষব্যাপী অত্যাচারে পীড়িত আমার মাতৃভূমি আজ রক্তাক্ত জেনেও তার জন্যে কিছু করারই ক্ষমতা আমার নেই।'

পারীতে আইরিন ও ইভ যুদ্ধরত সৈনিকের সন্তানদের মতো দিন কাটাচ্ছিল। যতক্ষণ না কিডনির ব্যথায় জর্জরিত হয়ে বেশ কিছু দিনের জন্যে বিছানা নিতে হতো, ততক্ষণ মারী নিজেকে ছুটি দিতেন না। তাঁকে বাড়িতে দেখলেই বোঝা যেত, তিনি অসুস্থ। যুদ্ধের সময় তিন-চারশো ফরাসী আর বেলজিয়ান্ হাসপাতাল গড়ে উঠেছিল; তিনি যখন সুস্থ থাকতেন, তখন সুইপস্, রেম্‌স্, ক্যালে, পোপারিঙ্গে ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় হাসপাতালে সেবা ক'রে বেড়াতেন। ইতিহাস কিংবা ফরাসী ভাষায় ইভের সাফল্য বর্ণনা

ক'রে চিঠিগুলো যার ঠিকানায় পাঠানো হতো এবং সে-ঠিকানাও প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছিল : যেমন,

"মাদাম কুরী, অতেল দ্য লা নৌবল্—রোজ, ফার্নস।"

"মাদাম কুরী, অক্সিলিয়ারি হস্‌পিটাল নং ২, মোরাভিলার্স, (আ ম্যঁ)।"

"মাদাম কুরী, হস্‌পিটাল নং ১১২।"

নানা জায়গা থেকে পথ-চল্‌তি লোকের হাতে তাড়াহুড়োর মধ্যে লেখা পোষ্টকার্ডে পারীতে যৎসামান্য খবর পৌঁছত ; ২০শে জানুয়ারি ১৯১৫ : প্রিয় বাচ্চারা, আমরা এখন আমিন্‌সে আছি, এখানেই রাত কাটিয়েছি, শুধু হু'খানা টায়ার ফেটে গেছে। সবাই আমার আদর নিও—মা মণি।'

ঐ একই দিনে : 'আবেভিলে পৌঁছলাম। গাড়িশুদ্ধ জঁ্যা পেরিন একটা গাছের গায়ে ধাক্কা খেয়েছেন, বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নি। বুলোঁর দিকে এগিয়ে চল্‌লাম।...মা।'

২৪ জানুয়ারি ১৯২৫ :

'প্রিয় আইরিন্ অনেক ঘটনার পর আমরা পোপারিঙ্গেতে এসে পৌঁছেছি, কিন্তু হাসপাতালে কিছুটা অন্ততঃ সংস্কার না ক'রে নিলে, কাজ করা অসম্ভব।

'আহতদের প্রকাণ্ড আস্তানায় ওরা গাড়িটার জন্য একটা ছাউনি আর রেডিও-চিকিৎসার জন্যে খানিকটা জায়গা আলাদা ক'রে দিচ্ছে। এই সবের জন্য আমার দেরী হচ্ছে, কিন্তু আর উপায়ও তো দেখি না।

'কয়েকটি জার্মান বিমান ডানকার্কের ওপর বোমা ফেলেছে, কয়েকজন লোক মারা গেছে, কিন্তু জনতা একটুও বিচলিত হয় নি। পোপারিঙ্গেতেও এ জাতীয় ঘটনা ঘটে, কিন্তু অনেক কম। প্রায় সারাক্ষণ কামানের গর্জন কানে আসছে। বৃষ্টি নেই, শুধু একটু বরফ জমেছে। হাসপালে এরা আমায় খুব আদর ক'রে অভ্যর্থনা করল। আমায় একটা ছোট্ট সুন্দর ঘর দিয়েছে, আগুনের ব্যবস্থাও করেছে। হাসপাতালেই খেয়ে নিই। তোমরা আমার আদর জেনো। মা।'

১৯১৫-র মে মাসের চিঠি :

'ডার্লিং, শ্যালোনে আমায় আট ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো এবং সবে আজ সকাল পাঁচটায় ভার্দেঁাতে এসে পৌঁছেছি। গাড়িটাও এসে গেছে, আমরা তৈরি হচ্ছি। মা।'

১৯১৫-র এপ্রিল মাসের এক সন্ধ্যায় মারী যেন একটু বেশী ফ্যাকাশে ও

অতিরিক্ত ক্লান্ত চেহারা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। সকলের ব্যস্ত প্রশ্নের জবাব না দিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন।

ফোর্জ থেকে ফেরার পথে ড্রাইভার স্টিয়ারিং-হুইলে এমন এক মোচড় দিয়েছিল যে, গাড়িটা খানায় গড়িয়ে পড়েছিল। উল্টে-পড়া গাড়ির ভেতর ভারী বাক্সের নীচে যন্ত্রপাতির মধ্যে মারী চাপা পড়েছিলেন। নিজের চোট লেগেছে বলে নয়, রেডিও-চিকিৎসার ছবি তোলা প্লেটগুলো গুঁড়িয়ে যাচ্ছে ভেবে তাঁর দারুণ রাগ হয়েছিল। বাক্সগুলোর চাপে দম বেরিয়ে যাচ্ছিল, তবু যখন বুঝলেন অল্পবয়সী ড্রাইভার বেচারা দারুণ ঘাবড়ে গিয়ে গাড়ির চারপাশে দিশেহারা ভাবে ছুটোছুটি ক'রে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বারে বারে ডাকছে: 'মাদাম! মাদাম! আপনি কি মারা পড়লেন?' তখন আর তিনি হাসি চাপতে পারেন নি।

এই বিপদের গল্প বাড়িতে আর করলেন না; দরজা বন্ধ ক'রে কাটা-ছড়া জায়গাগুলোর খানিক পরিচর্যা করলেন। খবরের কাগজে অবশ্য এই দুর্ঘটনার কথা প্রকাশ হয়ে গেল, তাঁর কাপড় ছাড়ার ঘরে কয়েকটা রক্তমাখা কাপড় পাওয়া যেতে সবই জানাজানি হয়ে গেল। কিন্তু ততক্ষণে তিনি আবার বেরোবার জন্য তৈরি হয়ে নিয়েছেন—সঙ্গে প্রকাণ্ড হলদে ব্যাগ, গোল টুপি, কালো চামড়ার বিরাট আকারের পার্স; এটা "যুদ্ধে যাবার জন্য"ই বিশেষ ক'রে কেনা।

১৯১৮-য় এই পার্সটাকে তিনি একটা দেরাজের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। ১৯৩৪-এ মৃত্যুর পর এটায় আবার হাত পড়ে, এর মধ্যে এটাকে আর কেউ খুলেও দেখে নি। এর ভেতর থেকে তাঁর যুদ্ধক্ষেত্রের পরিচয় পাওয়া গেল—একটা কার্ডে, "মাদাম কুরী, রেডিও-চিকিৎসা সংসদের পরিচালিকা" লেখা পাওয়া গেল। যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র, কামান, গোলা ইত্যাদি বিভাগের সহ-সম্পাদকের লেখা আরেকখানা চিঠি এর মধ্যে পাওয়া গেল, তার দ্বারা "মাদাম কুরীকে ফৌজী গাড়িগুলো ব্যবহার করার অনুমতি" দেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়া ফরাসী নারী-সঙ্ঘের তরফ থেকে প্রায় দশখানা "বিশেষ কর্তব্য" জ্ঞাপক চিঠি উদ্ধার হলো। চারখানা ফটো রয়েছে—একখানা নিজের, একখানা তাঁর বাবার, আর দু'খানা তাঁর মা মাদাম শ্ক্লোদোভ্স্কা'র। দু'খানা ছোট থলি, তার মধ্যে রয়েছে গাছের বীজ। নিশ্চয় ঘোরাঘুরির ফাঁকে ফাঁকে নতুন ল্যাবরেটারির বাগানে ফুলগাছের বীজ পুঁতে দিয়ে আসতেন। থলে দুটোর গায়ে লেখা ছিল: 'এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে বাগানে লাগানোর জন্য রোজমারী বীজ।'

এই আশ্চর্য জীবনধারার জন্যে মাদাম কুরী কিন্তু কোন বিশেষ পোশাক তৈরি করান নি। তাঁর সমস্ত পুরোনো পোশাকের আস্তিনে রেড-ক্রশের ব্যাণ্ড সেলাই ক'রে নিলেন মাত্র। তিনি নার্সদের মাথাঢাকা ওড়না কোনদিনও পরেন নি। হাসপাতালে কাজ করার সময়ে খালি মাথায় সাধারণ একখানা ল্যাবরেটারির ব্লাউস পরেই কাটাতেন।

(তাঁর ভাসুরের ছেলে মরিস কুরী ভোকোয়াতে গোলন্দাজ সৈনিকের কাজ নিয়েছিল, সে লিখল:) 'আইরিনের মুখে শুনলাম তুমি ভার্দোঁর কাছাকাছি কোথাও আছ। রাস্তায় যে কটা ডাক্তারি গাড়ি চোখে পড়ে, প্রত্যেকটাতে নাক গলিয়ে দেখি কিন্তু শুধু একরাশ ডোরা-কাটা টুপির সাক্ষাৎ মেলে। মনে হয় না সেনাবিভাগের কর্তারা খোঁপায় হাত দিতে ভরসা পাবে, যদিও তোমার খোঁপাটা যুদ্ধের আইন-কানুনের আওতার সম্পূর্ণ বাইরে। ...'

এই যাযাবরের পক্ষে নিজের সংসারের তদ্বির করা হয়ে ওঠে নি। সেখানে এক ধরনের বিশৃঙ্খলা সয়ে এসেছিল। আইরিন আর ইভ তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছিল, দেশের সৈনিকদের জন্য সোয়েটার বুনতো আর খাবার ঘরের দেয়াল-জোড়া মানচিত্রের গায়ে আলপিনের মাথায় ছোট ছোট নিশান দিয়ে যুদ্ধের প্রধান প্রধান ঘাটিগুলো চিহ্নিত ক'রে রাখত। মারী এবার ছুটিতে তাঁকে বাদ দিয়েই বাচ্চাদের আনন্দ করতে বললেন,—কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বোমা পড়ার সময়ে তিনি আইরিন ও ইভকে নীচে ঠাণ্ডা ভাড়ার ঘরে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে রাখলেন। ১৯১৬ সালে যে সব চাষীরা যুদ্ধে গেছে তাদের জায়গায় মাটি চষবার নতুন দলের সঙ্গে মেয়েদের নাম লিখিয়ে দিলেন। এক পক্ষ কাল ধরে তারা শস্য কাটল আঁটি বাঁধল, মাড়াই করল। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বিগবার্থা ধ্বংস হওয়া সত্ত্বেও ওরা পারীতেই রয়ে গেল। বোধ হয় মেয়েরা অতিরিক্ত হিসেবী, অতিরিক্ত দাবীদার হয়, মারী তা চাইতেন না।

ইভ এখনও খুব কাজের হয় নি, কিন্তু সতেরো বছরের আইরিন স্কুল-সার্টিফিকেটের পড়া ও সরবনে পড়ার সঙ্গে রেডিওলজি পড়তে শুরু করল। প্রথমে সে মায়ের "সহকারী" হিসেবে কাজ করল, পরে তাকে কিছু কাজের ভার দেওয়া হলো। মারী তাকে হাসপাতালগুলোতে পাঠাতে লাগলেন, অত অল্প বয়সে ফার্নস, হুগস্টেড আর আমিনসেন সেনানিবাসে তাকে কাজের মধ্যে থাকতে হবে—মারীর কাছে এ স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই মনে হলো। মাদাম কুরীর সঙ্গে তাঁর এই যুবতী কন্যার এক মধুর বন্ধুত্ব

গড়ে ওঠে। এতদিনে মারী আবার তাঁর সঙ্গী খুঁজে পেলেন। এতদিনে আবার তিনি তাঁর কাজের কথা, ব্যক্তিগত দুশ্চিন্তার কথা আলোচনা করার মতো সমব্যথী সঙ্গী খুঁজে পেলেন।

যুদ্ধের গোড়ার দিকে আইরিনের সঙ্গে তিনি এক জরুরী পরামর্শ করতে বসলেন। মেয়েকে বললেন : 'সরকার বলছে নাগরিকরা তাদের সোনা-দানা এনে দিক, তাহলে শিগগিরই কয়েকটা জাতীয় ঋণের ব্যবস্থা করা যায়। আমার যেটুকু আছে, সেটুকু আমি দিতে চাই। সেই সঙ্গে আমার বিজ্ঞানের পদকগুলোও দিয়ে দেব। সেসব আমার কোন কাজে আসবে না। আর একটা ব্যাপার আছে ; শুধু কুঁড়েমি ক'রে আমার দ্বিতীয় নোবেল পুরস্কারের টাকাটা আমি স্টকহলমে সুইডিস ক্রাউনে ফেলে রেখেছি। মোটমাট আমাদের এই হলো সম্বল, আমি সে-টাকা তুলে এনে এখানে যুদ্ধের জন্যে যে জাতীয় ঋণের ব্যবস্থা হবে, তার মধ্যে দিয়ে দেব ভাবছি। দেশের এখন এ টাকার প্রয়োজন আছে। শুধু মনের মধ্যে কোন সংশয় রাখতে চাই না। এ টাকাটা বোধ হয় আর ফিরে পাওয়া যাবে না। তুমি সমর্থন না করলে আমি একাজ করতে রাজী নই।'

সুইডিস ক্রাউনগুলো ফ্রাঙ্কে রূপান্তরিত হ'য়ে "জাতীয় চাঁদা" অথবা "স্বেচ্ছা সাহায্য" বণ্ডে পরিবর্তিত হলো এবং মারী যেমন ভেবেছিলেন, দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল। মারী তাঁর সোনা নিয়ে উপস্থিত হলেন। সরকারি কর্মচারীরা টাকাটা বিনা আপত্তিতে নিলেও অপূর্ব গৌরবউজ্জ্বল স্মৃতিচিহ্ন পদকগুলি গলিয়ে নিতে কিছুতেই রাজী হলো না। মারী এতে আদৌ খুশি হলেন না। জড়-পদার্থের প্রতি অন্ধভক্তি তাঁর কাছে যুক্তিহীন বলে মনে হলো। নিরুপায় ভাবে ঘাড় নেড়ে আবার সেসব ল্যাবরেটারিতে ফিরিয়ে আনলেন।

যখন ঘণ্টাখানেক ছুটি পেতেন, তখন মাদাম কুরী রু-পিয়ের কুরীর বাগানে বেঞ্চে গিয়ে বসতেন, সেখানে এতদিনে লেবু গাছগুলো পাতা মেলতে শুরু করেছে। নতুন অথচ পরিত্যক্ত রেডিয়ম ইনস্টিটিউটের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। সহকর্মীরা সব যুদ্ধক্ষেত্রে। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সহকারী পোল দেশের ছেলে ইয়ান দানিশ বীরের মতো প্রাণ দিয়েছে সেখানে। বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস পড়ল। কবে এই রক্তাক্ত বিভীষিকার শেষ হবে? আবার কবে তাঁর পদার্থবিভার কাজে ফিরে আসতে পারবেন!

শূন্য স্বপ্নে সময় নষ্ট করার মানুষ ছিলেন না তিনি, যুদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ধীরে ধীরে শান্তির জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। র‍্যু-কুভিয়েরের ল্যাবরে-

টারির সমস্ত জিনিস এনে ক্যু-পিয়ের কুরীতে তুলে দিলেন। বাক্স বোঝাই করা, জিনিসপত্র ওঠানো-নামানো, একখানা রেডিও-চিকিৎসার গাড়ি ক'রে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি পর্যন্ত দৌড়াদৌড়ি করা, ধৈর্য ধরে সব কিছু একহাতে করলেন। শিগগিরই তার ফল দেখা দিল, নতুন ল্যাবরেটারি একেবারে কাজের জন্য তৈরি হয়ে রইল। বাড়ানো যে দিকটায় রেডিও-এ্যাকটিভ জিনিসগুলো ছিল, তার চারপাশে পুরু ক'রে বালির ব্যাগ দিয়ে সেদিকটা সুরক্ষিত ক'রে দিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বোর্দোঁতে গিয়ে সেই রেডিয়মের গ্রামটি ফিরিয়ে এনে দেশের জিম্মায় দিয়ে দিলেন।

এক্স-রের মতো মনুষ্য দেহের ওপর রেডিয়মেরও কতকগুলি রোগ সারানো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। ১৯১৪-য় ফ্রান্সে চিকিৎসার কোন সুনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান ছিল না, সুতরাং মারীকে আবার নিজের থেকে সব তৈরি করতে হলো। তিনি এই অমূল্য প্রথম গ্রাম রেডিয়ম "নিষ্ক্রমণ কার্যে" উৎসর্গ করলেন ; প্রতি সপ্তাহে তিনি এই রেডিয়ম থেকে নিষ্ক্রান্ত গ্যাস নিয়ে টিউবে টিউবে ভরে গ্রাণ্ড প্যালেসের হাসপাতালে এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিতেন। বিষিয়ে-ওঠা ক্ষতস্থান আর নানাধরনের চর্মরোগ সারানোর জন্য এই ব্যবস্থা অব্যর্থ।

রেডিও-শক্তি-সমন্বিত গাড়ি, রেডিও-চিকিৎসা কেন্দ্র, নিষ্ক্রমণ কার্য।... আরও কিছু কাজ বাকী ছিল। শিক্ষিত কর্মীর অভাব মারীর দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল। তিনি রেডিও-চিকিৎসা শিক্ষা দেবার জন্যে একটা ক্লাস করতে চাইলেন। অল্প সময়ের মধ্যে রেডিয়ম-ইনস্টিটিউটে কুড়িজন নার্স এই পাঠ নিতে এসে হাজির হলো। বিদ্যুৎ ও এক্স-রে সম্বন্ধে তথ্যজ্ঞান, হাতে কাজ শেখা এবং শরীরতত্ত্ব—এগুলি ছিল শিক্ষা-তালিকার অন্তর্ভুক্ত। অধ্যাপনার দায়িত্ব নিলেন অধ্যাপিকারা : মাদাম কুরী, আইরিন কুরী এবং আরও একজন বিদূষী মহিলা মাদ্‌মোয়াজেল ক্লিন।

১৯১৬ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত এইভাবে শিখিয়ে মারী যে দেড়শ জন নিপুণ কর্মী পেলেন, তাদের মধ্যে সব শ্রেণীর লোক ছিল। কয়েকজনের বিদ্যা বিশেষ কিছুই ছিল না। মাদাম কুরীর নাম দেখে এরা প্রথমে এসে ঢোকে, কিন্তু শিগগিরই বৈজ্ঞানিকের আন্তরিকতা ও সহৃদয় অভ্যর্থনা এদের বশ ক'রে ফেলল। বিজ্ঞানকে সাধারণের বোধগম্য করার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল মারীর। ঠিকমতো কাজ করলে তিনি দারুণ খুশী হতেন। একবার এক

ছাত্রী, প্রাক্তন গৃহস্থ ঘরের এক ঝি, নিপুণ শিল্পীর মতো একখানা রেডিও-ছবির প্লেট ডেভেলপ করায় তাঁর উচ্ছ্বসিত আনন্দ দেখে মনে হলো, এ যেন তাঁর নিজেরই সাফল্য।

একের পর এক ফ্রান্সের মিত্রদেশগুলো তাঁকে আহ্বান জানাল। ১৯১৪ থেকে তিনি বেলজিয়ান হাসপাতালগুলোয় প্রায়ই যাতায়াত করতেন। ১৯১৮-য় ইতালী সরকারের অনুরোধে তাঁকে উত্তর ইতালীতে যেতে হলো। সেখানে গিয়ে সে-দেশের রেডিও-এ্যাকটিভ পদার্থগুলির খোঁজ নিলেন। এর কিছুকাল পরে মার্কিন অভিযাত্রী বাহিনীর কুড়িজন সৈনিক তাঁর ল্যাবরেটারিতে স্থান পেল—তাদের রেডিও-এ্যাকটিভিটি সম্বন্ধে শেখাবার দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি।

তাঁর নতুন কাজে তিনি বিভিন্ন চরিত্রের মানুষের সংস্পর্শে এলেন। কয়েকজন সার্জেন—যারা এক্স-রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে—তারা তাঁকে মস্ত সহায়ক ও অমূল্য সহকর্মী বলে মনে করতো। অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ যারা, তারা যন্ত্রটিকে নিতান্ত অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখল। কয়েকটি রেডিও-ছবির পরীক্ষামূলক ফলাফল দেখে তারা অবাক হলো : সত্যিই এটা কাজের জিনিস এবং যখন মারী দেখিয়ে দিলেন—গোলার যে টুকরোটি দেহের আহত অঙ্গের ভেতর কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছিল না, সেটি কত সহজে রশ্মির সাহায্যে ডাক্তারি ছুরির আগায় ধরা দিল, তখন তারা নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। হঠাৎ তাদের মনের ভাব পরিবর্তন হলো, বস্তুটির উপর অলৌকিক ঘটনার মতো শ্রদ্ধার ভাব জন্মাল।...হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ. এই যেমন-তেমন পোশাক পরা, নিজের নাম বলতেও যার ভুল হয় এ হেন পক্ককেশ বৃদ্ধার দিকে অবহেলার দৃষ্টি হেনে মাঝে মাঝে তাঁর প্রতি অধস্তন কর্মচারীর মতো ব্যবহার করতো। মারী তাদের এই ব্যবহার দেখে মনে মনে হাসতেন। এ জাতীয় ঔদ্ধত্য যখন তাঁর মনে যৎসামান্য বিরক্তির সূচনা করতো, তখন তিনি হুগস্টেড হাসপাতালে তাঁর দুই নীরব, ধৈর্যশীল কর্মসাথী এক ধাত্রী আর এক সৈনিকের কথা মনে ক'রে শান্তি পেতেন। তাঁরা হলেন বেলজিয়মের রানী এলিজাবেথ ও সম্রাট এল্‌বার্ট।

স্বভাবতঃ উদাসীন ও নিঃসঙ্গ প্রকৃতির মানুষ হলেও মারী আহতদের সঙ্গে ভারী মিষ্টি ব্যবহার করতেন। কৃষক শ্রমিকেরা কখনও কখনও ভয় পেয়ে

জিজ্ঞেস করত রঞ্জেন-যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করলে ব্যথা লাগবে কিনা! মারী তাদের আশ্বাস দিতেন: 'দেখ, ঠিক ছবি তোলার মত ব্যাপার!'

যে জিনিসটা সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল মারীর কাছে তা তারা পেত: মিষ্টি কণ্ঠস্বর, আলতো দুটি হাত, অসীম ধৈর্য আর জীবনের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা। মানুষের জীবন রক্ষা করতে বা কষ্ট লাঘব করতে অঙ্গচ্ছেদ অথবা বিকলাঙ্গ রোধ করতে তিনি যারপরনাই কষ্ট স্বীকার করতে রাজী ছিলেন। যখন সব চেষ্টাই ব্যর্থ হতো, মাত্র তখনই তিনি হাল ছেড়ে দিতেন।

এই চার বছর ধরে যে কষ্ট, যে বিপদের মধ্যে তাঁর কেটে গেল, সেকথা তিনি কখনও উল্লেখ করতেন না। অমানুষিক শারীরিক ক্লান্তি, নিজের প্রাণসংশয়কারী পীড়িত অঙ্গের ওপর এক্স-রে, বা রেডিয়মের নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়ার কথাও কখনও বলতেন না। তাঁর কর্মসহচরদের সামনে সম্পূর্ণ নির্বিকার, এমন কি আগের তুলনায় অনেক বেশী প্রফুল্ল ভাব দেখাতেন। যুদ্ধের ভেতর দিয়ে তিনি শিখলেন, সাহসের সবচেয়ে ভাল মুখোশ হলো প্রফুল্লতা।

মনে কিন্তু তাঁর আনন্দের লেশমাত্র ছিল না। অসমাপ্ত কাজের জন্য পোল দেশে আপন আত্মীয়বর্গ,—যাদের কোন খবরই তিনি পাচ্ছিলেন না,—তাদের জন্যে নিজের মনে উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। তার সঙ্গে দুনিয়াজোড়া এই ক্ষ্যাপামির আতঙ্ক যুক্ত হলো। সহস্র সহস্র ক্ষত-বিক্ষত মানুষের চেহারা তাঁর চোখের ওপর ভাসতে লাগল, আহতদের আর্তনাদের করুণ ক্রন্দনধ্বনি বহুদিন পর্যন্ত তাঁর জীবন বিমর্ষতায় ছেয়ে রাখল।

সেদিন ল্যাবরেটাতিতে বসে কামানের গর্জনের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ থামার ঘোষণা কানে আসতে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। ইনস্টিটিউটের মাথায় জাতীয় পতাকা ওড়াবার ইচ্ছায় সঙ্গিনী মার্থা ক্লিন্‌কে সঙ্গে নিয়ে আশেপাশের দোকানে পতাকা খুঁজে বেড়ালেন। কোথাও কিছু না পেয়ে তিন রঙা তিন টুকরো কাপড় কিনে আনলেন। তাঁর ঘরের কাজ করতো মাদাম বার্দিনে। সে হাত চালিয়ে সেই তিনটে টুকরো সেলাই ক'রে দিল, তিনি জানালায় সাজিয়ে দিলেন। উত্তেজনায়, আনন্দে, মারী স্থির থাকতে পারছিলেন না, তিনি আর মাদ্‌মোয়াজেল ক্লিন্‌ চারবছর যুদ্ধে পোড়-খাওয়া রেডিও-চিকিৎসার গাড়িটায় উঠে বসলেন। পি. সি. এন-এর এক দারোয়ান স্টিয়ারিং ধরে বসল। তারপর রাস্তায় একাধারে আনন্দিত ও বিমর্ষ জনসমুদ্রের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত এঁদের নিয়ে ঘুরে বেড়াল। প্লাস্‌ দ্য লা কঁকর্দের ভিড়

গাড়িটা রুখে দিল। গাড়ির পা-দানিতে আর ছাতের ওপর লোক চড়ে বসল। গাড়ি যখন আবার চলতে শুরু করল, তখন বারো জন বাড়তি আরোহী। এরা সারা সকাল ধরে গাড়িতে ঐভাবে এঁদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরল।

মারীর পক্ষে একটি নয়, দু'টি বিজয় এক সঙ্গে দেখা দিল। দেড়শো বছরের দাসত্বের শৃঙ্খল কেটে পোল্যাণ্ড আবার ধুলো ঝেড়ে স্বাধীন হয়ে দাঁড়াল।[১]

শৈশবের মাদমোয়াজেল শক্লোদোভস্কার চোখের ওপর তাঁর অত্যাচারিত বাল্যজীবন এবং যৌবনের সংগ্রামের ছবি ভেসে উঠল। ছেলেবেলায় জারের কর্মচারীর সঙ্গে কপটতা ক'রে, যৌবনে "ফ্লোটিং ইউনিভার্সিটির" সাথীদের সঙ্গে গোপনে যোগ দিয়ে, ওয়ার্‌সয় তাদের অপরিসর ঘরে সভা ডেকে, সজস্থকিতে কৃষকদের ছোট ছোট ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে তিনি যে জারের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, সেসব তো মিথ্যে হবার নয়। যে "স্বাধীনতা-স্বপ্নে"র কাছে তিনি নিজের কাজ, এমনকি পিয়ের কুরীর ভালোবাসাকেও আরেকটু হলে বিসর্জন দিচ্ছিলেন, তা' এতদিনে তাঁর চোখের সামনে বাস্তবে পরিণত হলো। মারী ১৯২০-র ডিসেম্বর মাসে দাদা যোসেফকে লেখেন :

'অবশেষে এতকাল পরে আমরা "দাসত্বের মাঝে জন্ম, শৃঙ্খলিত জন্মাবধি"[২] আমাদের আজন্মের স্বপ্ন স্বদেশের বন্দীদশার অবসান সচক্ষে দেখলাম। ঠিক এই মুহূর্তে বেঁচে থাকব আশা করি নি কোন দিন, এমনকি সন্তানদের বরাতেও এ ঘটনা ঘটবে বলে ভাবি নি, অথচ বাস্তবিক তাই তো ঘটল। একথা সত্যি যে, এই স্বাধীনতা অর্জন করতে আমাদের দেশকে বহুদিন ধরে অত্যধিক মূল্য দিতে হয়েছে, ভবিষ্যতেও হয়তো আর দিতে হবে। কিন্তু বিপ্লবের পরেও যদি পোল্যাণ্ড পরাধীন ও খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে থাকত, তবে যে নিদারুণ দুঃখ ও নৈরাশ্যে আমরা ভেঙ্গে পড়তাম, তার তুলনায় বর্তমান মেঘাচ্ছন্ন অবস্থার কোন তুলনাই হয় না। তোমার মতোই ভবিষ্যতের ওপর আমার আস্থা আছে।'...

১ কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে রুশ দেশের অক্টোবর বিপ্লব সফল হওয়ার পর জার-সাম্রাজ্যাধীন যেসব দেশ স্বাধীন স্বতন্ত্রভাবে থাকতে চেয়েছিল, রুশ শ্রমিকশ্রেণী তাদের স্বাধীনতা মেনে নেয়। এই মার্ক্সবাদী নীতি অনুসরণের ফলেই পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ স্বাধীন হয়।

২ **Adam Miokievioz : *Messer Thaddeus.***

ব্যক্তিগত সমস্যার ক্ষেত্রে মারী কুরীর এই আস্থা ও এই ভবিষ্যতের স্বপ্ন তাঁর মনে সান্ত্বনা আনত। তাঁর বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম এই যুদ্ধের সময়ে প্রচণ্ড বাধা পায়। যুদ্ধ তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে দিয়েছে, যুদ্ধ তাঁর সর্বনাশ করেছে। দেশকে যে টাকা তিনি তিনি ধার দিয়েছিলেন তা বরফের মতো গলে বেরিয়ে গেছে। যখন তিনি আবার নিজের বাস্তব সংস্থানের বিষয়ে মাথা ঘামাতে বসলেন, তখন রীতিমতো চিন্তায় পড়লেন। পঞ্চাশের কিছু উর্ধ্বে বয়স পেরিয়ে গেছে, এদিকে প্রায় নিঃস্ব বললেই হয়। নিজের এবং মেয়েদের মানুষ করার জন্যে কেবল মাত্র তাঁর অধ্যাপিকার মাইনে বাৎসরিক বারো হাজার টাকাই সম্বল। কর্মজগত থেকে অবসর নেবার যে অল্প কয়েক বৎসর বাকি আছে, তার মধ্যে শিক্ষকতা ক'রেও ল্যাবরেটারি পরিচালনার কাজ চালানো কি সম্ভব হবে?

যুদ্ধের কাজে ইস্তফা না দিয়েও (কারণ আরও দু'বৎসর ধরে রেডিও-চিকিৎসার জন্যে রেডিয়ম-ইনস্টিটিউটে নতুন নতুন ছাত্রের আবির্ভাব হতেই থাকল—) মারী আবার তাঁর জীবনের সাধনা পদার্থবিদ্যা নিয়ে মেতে গেলেন। তাঁকে "রেডিওলজি ইন ওয়ার" নামে একখানা বই লিখতে বলা হয়েছিল। এর ভেতর তিনি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের এক মহৎ প্রয়োগ এবং চিরন্তন গবেষণা ও তার মানবিক মূল্যের অপূর্ব আলোচনা করেছিলেন। আপন দুঃখের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বিজ্ঞান-সাধনার নতুন নতুন কারণের সন্ধান পেয়েছিলেন।

কয়েকটি বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কি প্রচণ্ড পরিমাণ কাজে লাগে, যুদ্ধকালীন একটি রেডিও-চিকিৎসার গল্প থেকে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

যুদ্ধের আগে পর্যন্ত এক্স-রের ব্যবহার অত্যন্ত পরিমিত ছিল। সর্বনাশের মুহূর্তে যখন অসংখ্য মানব-জীবন এই রাক্ষসীর পায়ে বলি যাচ্ছিল, তখন যেন-তেন-প্রকারেণ যা' কিছু বাঁচানো যায়, তাকে বাঁচাবার জন্য, মানুষের জীবন রক্ষার জন্য, সব রকম প্রচেষ্টার কোন অন্ত ছিল না।

সঙ্গে সঙ্গে এক্স-রের কাছ থেকে যথাসাধ্য কাজ আদায়ের প্রচেষ্টা দেখা দিল। প্রথমে যা কঠিন মনে হয়েছিল, তা সহজ হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। যাদু মন্ত্রে যেন বস্তু ও ব্যক্তির সংখ্যাবৃদ্ধি হলো। যারা কিছুই বুঝত না, তারা মেনে নিল; যারা কিছুই জানত না, তারা শিখে নিল;

যারা উদাসীন ছিল, তারা বিশ্বাসী ভক্ত হয়ে দাঁড়াল। এই ভাবে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তার নিজস্ব স্বাভাবিক একটি ক্ষেত্র জয় ক'রে নিল। রেডিয়ম-চিকিৎসার বেলাতেও একই ব্যাপার ঘটল, অর্থাৎ রেডিও-এ্যাকটিভ পদার্থ থেকে নিষ্ক্রান্ত শক্তির সাহায্যে চিকিৎসা প্রসার লাভ করল।

উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে বিজ্ঞানের এই অভাবনীয় প্রগতি দেখে কি বোঝা যায়? মনে হয় নিরস গবেষণা-কাজে প্রাণ সঞ্চার করতে এবং তার প্রতি আমাদের আস্থা ও শ্রদ্ধা বর্ধন করতে এ প্রেরণা যোগাবে।

বিষয়বস্তুতে ঠাসা নিরস এই সংক্ষিপ্ত বইটিতে মারী কুরীর নিজস্ব প্রচেষ্টার মূল্য নিরূপণ করা সম্ভব নয়। কি দারুণ কৌশলে তিনি নিজেকে লোক-চক্ষুর অন্তরালে সম্পূর্ণ সত্ত্বা-বিবর্জিত ছায়াময়ী কায়া ক'রে রাখতেন! 'অহং'-এর প্রতি বিতৃষ্ণা ছিল মারীর, তাঁর চোখে 'অহং'-এর অস্তিত্বই ছিল না। রহস্যে ঘেরা, কয়েকটি সংস্থার মাধ্যমে তিনি নিজের কাজগুলিকে বাইরের জগতে চালাতেন, তাদের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি কোথাও বলেছেন "চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান" অথবা "তাহারা" অথবা যেখানে এড়ানো অসম্ভব হয়েছে, সেখানে বলেছেন "আমরা"। এমনকি, নিজেদের রেডিয়ম আবিষ্কারের মতো ঘটনাকেও "উনবিংশ শতকের শেষভাগে আবিষ্কৃত বিজ্ঞানের অভিনব বিচ্ছুরণ শক্তি সমূহ—" এই কথার মধ্যে নিজের অবদানকে প্রচ্ছন্ন ক'রে রেখেছেন। যখন তিনি নিজের সম্বন্ধে উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছেন, তখন অজ্ঞাতনামা অনেকের ভিড়ের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছেন :

'অপর অনেকের মতো সদ্য অতিক্রান্ত বৎসরগুলিতে জাতীয় সংরক্ষণ কার্যে নিজেকে নিয়োজিত করার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মন রেডিও-বিদ্যার প্রতি ধাবিত হয়।'...

মাত্র একটি স্থানে মারী যে তাঁর সাধ্য মতো ফ্রান্সকে সাহায্য করেছেন, এবং সে-বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন তারই উল্লেখ দেখা যায়। তিনি আগে একবার এবং ভবিষ্যতে আরও একবার "লিজিওঁ দ্য' অনার" নামক জাতীয় সম্মানটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা জানেন যে, তাঁকে যদি ১৮১৮-য় সৈনিক হিসেবে বীরযোদ্ধা পদক দেবার কথা উঠত, তাহলে তিনি সেটি গ্রহণ করতে রাজী হতেন। এ ছাড়া অন্য কোন সম্মানভূষণ তিনি গ্রহণ করবেন না।—

তাঁর আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার জন্য তাঁকে আরও বঞ্চিত হতে হলো। 'বহু মহিলা' সম্মানপদক ও কাপড়ের গোলাপ পুরস্কার লাভ করলেন। তাঁকে কিছুই দেওয়া হলো না। এই প্রচণ্ড জীবন-মরণ নাটকে তিনি যে অতুলনীয় কাজ করলেন, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই লোকে তা ভুলে গেল এবং যদিও তাঁর নিজস্ব কাজের ধারাই ছিল সম্পূর্ণ সতন্ত্র, তবু মাদাম কুরীর পোশাকে সম্মানিত যোদ্ধার ছোট্ট ক্রশ চিহ্নটি পর্যন্ত এঁটে দেবার কথা কারুর মাথায় এল না।

॥ শান্তি ঃ লারকুয়েস্তে বিশ্রাম ॥

২২

ধরিত্রী আবার তার শান্তি ফিরে পেল। মারীর মনে আশা ভরসা দুই-ই ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হয়ে আসছিল। তিনি দূর থেকে শুধু এই শান্তির উদ্যোক্তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য ক'রে যাচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন উইলসন্ পন্থী, স্বভাবতই লীগ-অব-নেশানস্-এ তাঁর যথেষ্ট আস্থা ছিল। তিনি একাগ্র মনে মানুষের বর্বরতা রোধ করার উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন এবং দুনিয়া থেকে দ্বেষ, হিংসা চিরদিনের মতো নিশ্চিহ্ন করা যায়—এমন এক শান্তির স্বপ্ন দেখছিলেন।

বিজিত ও বিজেতা-দেশের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে আবার সেই আগের সম্পর্ক ফিরে এল। মাদাম কুরীও সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের কথা ভুলতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর কয়েকজন সহকর্মীর মতো এত শীঘ্র বন্ধুত্ব জাহির করার আগ্রহ তিনি দমন করলেন। কোনো জার্মান পদার্থবিদের সঙ্গে দেখা করার আগে তিনি খোঁজ নিতেন : 'ভদ্রলোক নিরানব্বই ধারার সনদ-পত্রে সই দিয়েছেন কিনা?' এই প্রশ্নের উত্তর যদি শুনতেন : 'হ্যাঁ,' তবেই তিনি তাঁর সঙ্গে সাধারণ ভদ্রতা রক্ষা ক'রে কথা বলতেন, তার বেশী কিছু নয়। অন্যথায় আরও একটু সৌহার্দ্য প্রকাশ ক'রে নিঃশঙ্ক চিত্তে ভদ্রলোকের সঙ্গে বিজ্ঞান আলোচনা করতেন—যেন যুদ্ধবিগ্রহ কিছুই ঘটে নি।

সাময়িক হলেও এর থেকে বোঝা যায় যে, যুদ্ধের সময়ে জ্ঞানী পণ্ডিতদের কর্তব্য সম্বন্ধে মারীর কি অসম্ভব উঁচু ধারণা ছিল। তাঁর একবারও এ কথা মনে হয় নি যে, উচ্চস্তরের মস্তিষ্কগুলিকে "রণ ক্ষেত্রের ঊর্ধ্বে" রক্ষা করার প্রয়োজন আছে। চার বছর ধরে তিনি পরম বিশ্বাসের সঙ্গে ফ্রান্সের সেবা করেছেন, মনুষ্য-জীবন রক্ষা করেছেন। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি বুদ্ধিজীবীদের হস্তক্ষেপ সমর্থন করতেন না। তাঁর মতে, যে বিদ্বান ব্যক্তি চিরদিন সংস্কৃতি ও স্বাধীন চিন্তাধারাকে সমর্থন করেন না, তিনি হন আদর্শ ভ্রষ্ট। যুদ্ধলিপ্সু তিনি ছিলেন না, আবার এই মহাযুদ্ধে তাঁকে বিশেষ দলীয়ও বলতে পারা যাবে না। একজন সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক হিসেবেই তাঁকে আমরা ১৯১৯-এ পাই তাঁর গবেষণাগারের প্রধানার পদে।

রু-পিয়ের কুরীর বাড়িগুলি কবে কর্মগুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠবে, তিনি সেই দিনটির পথ চেয়ে ছিলেন। তাঁর প্রথম কর্তব্য হলো যুদ্ধের সময়ে যে বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ কাজে তিনি হাত দিয়ে ছিলেন, সেটি নষ্ট না করা। যুদ্ধ-শেষে সৈনিকরা আবার তাদের নাগরিক জীবনে ফিরে আসার পর ডাক্তার রেগো শরীরতত্ত্ব বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, রেডিয়ম নিষ্ক্রান্ত উপ-পদার্থ ছোট ছোট "সক্রিয়" টিউবে ভরে বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠাতে লাগলেন। পদার্থবিদ্যা বিভাগে মাদাম কুরী ও তাঁর সহকর্মীরা বাধাপ্রাপ্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজের সূত্র আবার তুলে নিলেন এবং আরও নতুন নতুন কাজ আরম্ভ করলেন।

অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক জীবনধারা এই বয়স্কা মহিলাকে এবার তাঁর সুস্থ সবল কন্যাদ্বয় আইরিন ও ইভের ভবিষ্যতের প্রতি আরেকটু সচেতন হবার অবকাশ দিল, ইতিমধ্যে দু'জনেই মাথায় তাদের মাকে ছাড়িয়ে উঠেছে। বড়টি একুশ বছরের ছাত্রী, শান্ত ও অত্যন্ত স্থির বুদ্ধি সম্পন্না, জীবনের প্রধান দায়িত্ব বেছে নিতে তার এক মুহূর্তও দ্বিধা আসেনি মনে, সে হবে পদার্থবিদ, অতি অবশ্যই সে রেডিয়ম সম্বন্ধে গবেষণা করবে। বাবা মার প্রচণ্ড যশ তাকে এতটুকু ভয় দেখাতে বা নিরুৎসাহ করতে পারে নি। প্রশংসনীয় সরলতা ও স্বাভাবিকতার ভেতর দিয়ে সে পিয়ের কুরী ও মারীর প্রদর্শিত পথের দিকে এগিয়ে গেল। মার মতো অতো উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তার হবে কি না, এ প্রশ্ন তার মনে এল না। এতো বড নামের ভারে তার মন দমল না। বিজ্ঞানের প্রতি তার প্রকৃত অনুরাগ, তার নিজস্ব গুণাবলী তাকে একটি মাত্র বিষয়েই অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম হলো, এবং তা হলো যে ল্যাবরেটারিকে সে চোখের সামনে গড়ে উঠতে দেখেছে এবং যেখানে ১৯১৮ সালেই তাকে সহকারীর পদে গ্রহণ করা হয়েছে, সেখানে আজীবন বিজ্ঞান সাধনা করবে সে।

নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং আইরিনের চমৎকার উদাহরণে মারীর মনে বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর মেয়েরা জীবনের গোলকধাঁধায় তাদের পথ সহজেই খুঁজে নিতে সক্ষম হবে। তিনি ইভের মানসিক উদ্বেগ ও দিক্‌ভ্রষ্টের মতো বারবার দিক্ পরিবর্তনে বিচলিত হলেন।

অল্প বয়সের স্বাধীনতার ওপর অগাধ আস্থা এবং মেয়েদের বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে অতিরিক্ত বিশ্বাসের দরুন তিনি এই কিশোরীর ওপর নিজের শাসনদণ্ড কখনও তোলেন নি। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইভেরও যথেষ্ট দক্ষতা ছিল, সে যদি ডাক্তারি লাইনটা বেছে নিয়ে রেডিয়ম চিকিৎসার ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতো, তবে

মারী খুশি হতেন। কিন্তু মেয়ের ওপর নিজের ইচ্ছা তিনি চাপালেন না। পরম সহানুভূতির সঙ্গে তিনি কন্যাকে খেয়ালখুশি মতো জীবনের পথ বেছে নিতে দিলেন, তাকে গান শিখতে দেখে খুশি হলেন এবং শিক্ষক নির্বাচন, কর্মপদ্ধতির ভার তারই ওপর ছেড়ে দিলেন। এইভাবে এক দ্বিধা-বিভক্ত মনের ওপর তিনি অতিরিক্ত স্বাধীনতা দিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশিত পথে চলতে বাধ্য করলে ইভের হয়তো বেশী উপকারই হতো। প্রচণ্ড বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে, প্রতিভাসম্পন্ন অনুভূতির নির্ভুল পরিচালনায় যিনি নিজের পথে নিজেই এগিয়ে চলেছিলেন—তাঁর চোখে এ ত্রুটি ধরা পড়বার কথা নয়।

তাঁর দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মেয়েদের মধ্যে কোনও রকম পক্ষপাতিত্ব না দেখিয়ে পথের শেষ পর্যন্ত এগিয়ে দেবার জন্য তাঁর সস্নেহ দৃষ্টি সদা জাগ্রত হয়ে থাকত। জীবনের প্রতিটি ঘটনায় আইরিন ও ইভ তাঁর মধ্যে পেয়েছিল এক রক্ষিত্রী, এক পরম সুহৃদকে। শেষে আইরিনের বিবাহ ও সন্তান লাভের পরেও মারী দুটি বংশলতিকাকে আপন স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন।

২৯শে ডিসেম্বর ১৯২৮: মারী আইরিন ও ফ্রেডরিক জোলিও কুরীকে লেখেন:

'স্নেহের সন্তানরা, তোমরা আমার নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেনো—অর্থাৎ, আনন্দ ও কল্যাণকর কাজের মধ্যে তোমাদের আরও একটি বৎসর অতিবাহিত হোক্! বৎসরের প্রতিটি দিন তোমরা বেঁচে থাকার আনন্দ উপভোগ করো। মাধুরীহীন দিন যাপনের গ্লানির মধ্যে শুধু ভবিষ্যতের সুখের আশায় বর্তমানের যেন অপমৃত্যু না ঘটে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অনুভব করে যে, বর্তমানকে উপভোগ করা উচিত: এও জীবনের এক অমূল্য সম্পদ।

তোমাদের ছোট্ট হেলেনের কথা ভেবে আমি তার সুখের কামনা করছি। তার কাছে তোমরাই সব, সে জানে সবরকম দুঃখ যন্ত্রনার হাত থেকে একমাত্র তোমরাই তাকে রক্ষা করতে পার। সে জানে সবরকম দুঃখ থেকে তোমরাই তাকে রক্ষা করতে পার। একদিন সে বুঝবে তোমাদের সামর্থে ততটা কুলোয় না, যাই হোক্ অন্ততঃ নিজের সন্তানদের জন্যে মানুষ সাধ্যমতো করতে চায়। আর কিছু না হোক্, সন্তানের ভালো স্বাস্থ্য-গঠনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। শৈশবে শান্তময় পরিচ্ছন্ন এক

স্নেহের পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত, যেখানে তারা যতদিন সম্ভব নির্ভর করতে পারে।'

৩রা সেপ্টেম্বর ১৯১৯, মারী তাঁর কন্যাদের লিখলেন :

'...আমাদের সামনে যে প্রচণ্ড কার্য সম্ভার নিয়ে নতুন বছর উপস্থিত হচ্ছে, তার কথা প্রায়ই আমার মনে হয়। তাছাড়া তোমরা প্রত্যেকে আমায় যে মধুর আনন্দ ও যত্নের আস্বাদ দিয়েছ, সে কথা আমার মনে সবসময় উদয় হয়। তোমরাই আমার পরম সম্পদ এবং আশা করি তোমাদের নিয়ে আরও কয়েকটা বছর আমার সুখে কেটে যাবে।'

যুদ্ধের ক্লান্তির পরে শরীরটা সারছিল বলেই হোক, কিংবা বয়সের জন্যই হোক্ পঞ্চাশের পর মারী যেন অনেকটা শান্তি পেলেন। সময়ে দুঃখ-কষ্ট রোগের জ্বালা জুড়িয়ে আসছিল : নতুন কোন সুখের সন্ধান পেলেন না বটে, কিন্তু এরই মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট আনন্দ মারীকে এখন তৃপ্তি দেয়। আইরিন ও ইভ যাঁর স্নেহ-ছায়ায় বড় হয়ে উঠেছে, তাঁকে চিরদিন রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দেখেছে, এখন তাঁর বার্ধক্যের রেখাচিহ্নিত সেই মুখখানির সঙ্গে এক নবীনতর সুহৃদের সন্ধান পেল। খেলাধুলোয় আইরিনের সমান বড় একটা কাউকে চোখে পড়ত না। সে তার মাকে নিজের খেলাধুলোর মধ্যে টানতে চেষ্টা করত, তাঁর সঙ্গে পায়ে হেঁটে অনেক অনেক দূর পাড়ি দিত, তাকে স্কেট করতে, ঘোড়ায় চড়তে, এমনকি একটু-আধটু 'স্কী' করতেও টেনে নিয়ে যেত।

গ্রীষ্মকালে মারী ব্রিটানীতে তাঁর মেয়েদের কাছে চলে গেলেন। অভদ্র রকম ভিড় ছাড়িয়ে অনেক দূরে লারকুয়েস্ত নামে এক গ্রামে তিন বন্ধুতে পরমানন্দে কাটালেন। চ্যানেলের ওপর পেম্পোলের কাছে এই ছোট্ট গ্রামখানি নাবিক, কৃষক ও সরবনের প্রফেসরদের আড্ডা হয়ে উঠল। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ঐতিহাসিক সেইঞ্রোবোস্ ও শরীরতত্ত্ববিদ্ লুই লাপিকের আবিষ্কৃত এই লারকোয়েস্ত স্থানটি বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকেদের কাছে কলোম্বাসের প্রথম অভিযানের মতোই অমূল্য কীর্তির রূপ নিল। এক রসিক সাংবাদিক পণ্ডিতদের এই উপনিবেশকে "বিজ্ঞানের বন্দর" নাম দিয়েছিল। মাদাম কুরীর এখানে পৌছোতে একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল, তিনি প্রথমে এক গ্রামবাসীর বাড়িতে উঠলেন, পরে একখানা বাংলো ভাড়া ক'রে, পরে সেটা কিনেই নিলেন।

সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন, প্রচণ্ড বাতাসের মুখে শান্ত সমুদ্র তীরের বাড়িটি বেছে নিলেন, সেদিকে একরাশ ছোট-বড় দ্বীপ থাকায় সমুদ্রের ঢেউ তীরে এসে ভাঙতে পারত না; বাতিঘরের প্রতি তাঁর একটা দুর্বলতা ছিল। গ্রীষ্মের ছুটিতে যে ক'টি বাড়ি তিনি ভাড়া করতেন, সবই প্রায় একরকম দেখতে হতো: প্রকাণ্ড মাঠের মাঝখানে অপরিসর বাড়ি, ঘরগুলোর থাকত না কোন ছিরিছাঁদ, আসবাবের সংস্পর্শ বর্জিত ও অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভায় সমৃদ্ধ পরিবেশের মধ্যে তিনি খুশি হতেন।

প্রতি সকালে যে অল্প ক'জন পথচারীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হতো, তাদের মধ্যে থাকত কুব্জদেহ ব্রিটান রমণী, ধীরগামী কৃষকের দল, কিংবা বাচ্চাদের দল, তারা পোকা-খাওয়া দাঁতে হেসে ব্রিটানের দীর্ঘচ্ছন্দ উচ্চারণে ডাকত, "স্বাগত, মাদাম কু-উ-উ-রী!!" এবং মারীও এদের এড়বার চেষ্টামাত্র না ক'রে একই রকম টানে হেসে জবাব দিতেন: "স্বাগত মাদাম লেগফ, স্বাগত মঁসিয়ে কুইন্‌চিন্।" কিংবা যখন কাউকে চিনতে পারতেন না, তখন শুধু সলজ্জ "স্বাগত" দিয়েই সারতেন। অবশ্য যখন তিনি বুঝতেন যে, গ্রামবাসীদের এই শান্ত "স্বাগত"টুকু সমানে সমানে চলে, তার মধ্যে শুধু বন্ধুত্ব ছাড়া কোন বাছবিচার বা অহেতুক কৌতূহল নেই, তখনই কেবল এই সাড়াটুকু দিতেন। রেডিয়ম আবিষ্কার বা সংবাদপত্রে বহু ঘোষিত নাম মারীর প্রতি এদের দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ ছিল না। দু'তিনটে ঋতুর ভেতর যখন টেনে চুল-বাঁধা সুচলো সাদা টুপি মাথায় গ্রামবাসিনীরা বুঝল, ইনি তাদেরই মতো একজন কৃষক রমণী, তখন শ্রদ্ধায় তাদের মন ভরে উঠল। আর পাঁচজনের মতোই অতি সাধারণ একখানা বাড়ির অধিবাসিনী ছিলেন মাদাম কুরী। লারকুয়েস্তে যে বাড়ি খানার সত্যি কোন বিশেষ সত্বা ছিল, সেটি একটি খোলার ছাদ ওয়ালা নিচু বাংলো, আপাদমস্তক ভার্জিনিয়া লতা, প্যাশন-ফ্লাওয়ার আর মস্ত মস্ত সন্ধ্যা মালতীর ঝাড় দিয়ে সাজানো—বাড়িটা যেন কলোনীর মধ্যমণি হয়ে বিরাজ করত। তাদের ভাষায় তারা এই বাড়িটির নাম দিয়েছিল—"তাশেন-ভিহান" —"ছোট কুঞ্জবন"। কোন বিশেষ ঢঙে নয়; এমনি একখানা ঢালু বাগান তাশেনের চারপাশ থেকে রঙের ঝরণা বইয়ে দিত। পূবে বাতাসের সময়টুকু ছাড়া, বাকী সারা বছর বাড়ির দরজা হাঁ ক'রে খোলা থাকত। সেখানে সরবনের ইতিহাস-বিভাগের প্রফেসর শার্ল সেইঞোবোস্ নামে এক যাদুকর বাস করতেন। ছোট্ট খাট্ট অসম্ভব কর্মঠ এই বৃদ্ধের পিঠে ছোট একটি কুঁজের

আভাস ছিল, সারাক্ষণ রংচটা, তালিমারা কালো ডোরাকাটা একটা সাদা স্যুট পরে থাকতেন বৃদ্ধ। সেখানের অধিবাসীরা তাঁকে "ম'সিয়ে সেইঞ্জো" বলে ডাকত, বন্ধুরা নাম দিয়েছিলেন "কাপ্তেন"। তাঁর চারিত্রিক কোন্ বৈশিষ্ট্যের গুণে তিনি এত লোকের ভক্তি প্রীতি অপরিমিত শ্রদ্ধা ও মৈত্রীর কেন্দ্রস্থল হয়ে ছিলেন, তা ভাষায় বোঝানো শক্ত। পুরুষ নারী নির্বিশেষে দুই বৎসর থেকে আশী বৎসর বয়স্ক ত্রিশ চল্লিশ জন বন্ধু এই অকৃতদার বৃদ্ধকে সারাক্ষণ ঘিরে থাকত।...

লনে উপসাগরের মাথায় একটা খাড়া পায়ে-চলা পথ দিয়ে মারী তাশেনে নেমে যেতেন। তার আগেই প্রায় জনপনেরো প্রতিদিনের মতো বাড়িটার সামনে এসে জড়ো হয়ে দ্বীপে যাবার জন্যে অপেক্ষা করত। এই জনতার মধ্যে মাদাম কুরীর আবির্ভাব কোন রকম আলোড়ন জাগত না, এদের মধ্যে বেশীর ভাগই থাকত উপনিবেশবাসী ও একদল স্থানীর যাযাবর। শার্ল সেইঞ্জোবোসের চোখ দুটি ক্ষীণ দৃষ্টির জন্য চশমায় ঢাকা থাকত, তিনি অভিবাদন জানিয়ে নিরস বন্ধুত্বের সুরে বলতেন: 'আরে! মাদাম কুরী যে! আসুন! আসুন!' আরও কয়েকটি "স্বাগত'-প্রতিধ্বনিত হ'তে শোনা যেত, মাদাম কুরী মাটিতে ব'সে প'ড়ে ভিড়ের মধ্যে নিজের জায়গা ক'রে নিতেন।

তাঁর টুপির কাপড়খানা ধুয়ে ধুয়ে তার আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। পরনের স্কার্টখানা বহু পুরোনো। একখানা দুর্ধর্ষ রাজহাসের চামড়ার ডবল্-ব্রেষ্ট কোট গ্রাম্য দরজি এলিজা লেফ তৈরি ক'রে দিয়েছিল, সেটি থাকত তাঁর গায়ে। এলিজা একটা মাপ অনুসারে এই কোটটি সেলাই করেছিল, সে-মাপটা সে পুরুষ, রমণী, বৈজ্ঞানিক, ধীবর নির্বিশেষে সকলের জন্যেই চালিয়ে দিত। মাদাম কুরী খালি পায়ে চটি পরতেন। আর পনেরোটা থলের মতো তাঁর সামনেও একখানা পেটমোটা থলের ভেতর স্নানের জামাকাপড় তোয়ালে ইত্যাদি থাকত। ঐ শান্ত জনসমষ্টির মধ্যে যে কোন সাংবাদিক আনন্দের খোরাক খুঁজে পেতে পারত। মাটির ওপর আলস্যভরে শুয়ে-থাকা ফরাসী ইন্-স্টিটিউটের কোন সভ্যের ঘাড়ে না পড়ে যায়, কিংবা নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত কারুর গায়ে পা না ঠেকে যায়—এ বিষয়ে তাকে যথেষ্ট সাবধান হতে হতো। পাণ্ডিত্যের এ হেন সমারেশ কোথায় পাবে? পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে জানতে চাইলে জ্যাঁ পেরিন, মারী কুরী, আঁদ্রে দ্যবিয়েরন্, ভিক্টর অগর্ রয়েছেন। গণিত-সমাকলনের বিষয় জানতে চাও? আলথাল্লা-শোভিত রোম সম্রাটের

মতো পা ঢাকা স্নানের পোশাক পরা এমিল বরেলের কাছে যাও। শরীরতত্ত্ব কিংবা গ্রহবিজ্ঞানের পদার্থবিভাগ সম্বন্ধে কিছু জানতে চাও? লুই লাপিক বা চার্লস মোরেন তোমার কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পারেন। আর যাদুকর শার্ল সেইঞোবোস্ সম্বন্ধে বাচ্চারা কানিকানি করে, সব কিছুই যে ওঁর জানা!

কিন্তু এই সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীর বিশেষত্ব ছিল এই যে, তাঁদের ভেতর কেউই পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস, শরীরবিদ্যা বা গণিত আলোচনা করতেন না। পদমর্যাদা, ঐশ্বর্য এমন কি প্রচলিত ভদ্রতার নিয়মগুলিও এঁরা সব সময়ে মেনে চলতেন না। এখানে গুরু-শিষ্য, বৃদ্ধ-যুবকের ভেদ নেই, এঁদের চারটি মোট শ্রেণীতে গোষ্ঠীবদ্ধ করা হতো। যথা: "অসংস্কৃত"—অপরিচিত যারা এখানে এসে ভিড়ত, তাদের যথাশীঘ্র সম্ভব দলের বাইরে সরিয়ে দেওয়া হতো। "গজ"—অর্থাৎ নৌবিদ্যায় যাদের বিশেষ দক্ষতা ছিল না, সেই সব বন্ধুদের বরদাস্ত করা হতো বটে, কিন্তু তাদের নিয়ে যথেষ্ট হাসি-তামাসা করা হতো। তারপর হলো "নাবিক"। লারকুয়েস্তবাসীরা বাস্তবিকই নাবিক নামের উপযুক্ত। সবশেষে উপসাগরের তরঙ্গলীলার মাঝে ছিল কুশলী অতি-নাবিকের দল,—কি সাঁতারে, কি নৌচালনায় অপূর্ব দক্ষ "কুমীর" গোষ্ঠী। মাদাম কুরী একদিনের জন্যেও "অসংস্কৃত" গোষ্ঠীতে পড়েন নি, "কুমীর" গোষ্ঠীভুক্ত হওয়াও তাঁর সাধ্যাতীত ছিল। প্রথম কিছুদিন "গজের" স্তরে থেকে পরে "নাবিক" গোষ্ঠীতে মাদাম কুরীর পদোন্নতি হলো।...শার্ল সেইঞোবোস্ তাঁর দলের সবাইকে গুনে নিয়ে রওনা হবার সঙ্কেত দিলেন। উপকূলস্থ দু'খানা পালতোলা নৌকো ও দু'খানা দাঁড়িনৌকোর মধ্যে থেকে মাদাম কুরী ও জিন মোরেনের সঙ্গে সেখানের কয়েকজন ছোক্‌রা ভৃত্য মিলে সেদিন সকালের নির্বাচিত "বড়নৌকো" ও "ইংলিশ-নৌকো" দুটোকে যে জায়গায় ভাঙা পাথরের মধ্যে বেশ একটা স্বাভাবিক বন্দর তৈরি হয়েছে, সেদিকে সরিয়ে আনলেন। নৌ-চালকের দল এরই মধ্যে তীরে এসে ভিড় জমিয়েছেন। সেইঞোবোসের হঠাৎ ছল্‌কে-ওঠা ঠাট্টা-সুরের কথাগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল: 'নৌকোয় উঠে পড় সব! নৌকোয় উঠে পড় সব!' তারপর নৌকোগুলো যাত্রীতে ভরে গেলে আবার বলতেন: 'প্রথমে কোন দল যাবে? আমি টানের মুখে বাইব, মাদাম কুরী গোলুইয়ে যান, পেরিন ও বরেল দাঁড় ধরবে, ক্রজিস্ হাল ধরবে।'

বহু পণ্ডিত হয়তো এই সব আদেশ শুনে ঘাবড়ে যাবেন, কিন্তু সেখানে সেই

মুহূর্তে এই আদেশ কার্যে পরিণত করা হলো। সরবনের চারজন স্বনামধন্য অধ্যাপক নিজের নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড় হাতে নিয়ে নৌকোর পরিচালক তরুণ ফ্রান্সিস্ পেরিনের আদেশের অপেক্ষায় সবিনয়ে বসে রইলেন—যেহেতু নৌকোর হাল তার হাতে।

জলের ওপর ঘা দিয়ে শার্ল সেইঞোবোস্ তাঁর সাথীদের দাঁড় চালানোর ছন্দ বুঝিয়ে দিলেন। তার পেছনে বসে জ্যাঁ পেরিন এমন ভাবে দাঁড় চালালেন যে নৌকোখানা একেবারে বোঁ ক'রে ঘুরে গেল। তাঁর পেছনে এমিল বরেল আর মাদাম কুরী গলুয়ে বসে দাঁড় বাইতে লাগলেন।

সূর্যতপ্ত সমুদ্রের ওপর সবুজ রঙের নৌকোটি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। তরুণ হাল-মাঝির কঠোর কিন্তু উচিত সমালোচনা মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে : 'দু নম্বর কিন্তু ঢিলে দিচ্ছেন!' (এমিল বরেল প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করলেন বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের অলসতা সংশোধন ক'রে জোরে জোরে দাঁড় চালাতে লাগলেন।)

'গলুয়ের দাঁড়টানার ছন্দ মেনে চলছে না—' (ঘাবড়ে গিয়ে মারী কুরী ভুল সংশোধন ক'রে ছন্দমাফিক দাঁড় বাইতে লাগলেন।)

প্রাণোচ্ছাসপূর্ণ অপূর্ব কণ্ঠ মাদাম চার্লস্ মোরেন নৌকো বাওয়া গানের প্রথম কলি গেয়ে উঠলেন; সঙ্গে সঙ্গে পেছনের যাত্রীরা মিলিত কণ্ঠে তার সঙ্গে যোগ দিলেন :

'বাড়ি করলো আমার বাবা
(বন্ধ করোনা দাঁড় বাওয়া)
মিস্ত্রি ছিল আশি যুবা…

এক উত্তুরে হাওয়া এই ধীর ছন্দময় সুরপ্রবাহকে দ্বিতীয় নৌকোর দিকে উড়িয়ে নিয়ে চলল, নৌকোটিকে খুব তাড়াতাড়ি উপসাগরের অপর দিক থেকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। ইংলিশ নৌকোর দাঁড়িরা আবার আরেকখানা গান ধরল। এই উপনিবেশের ভাণ্ডারে এমন তিন-চারশ খানা গান জমা ছিল এবং শার্ল সেইঞোবোস লারকুয়েস্তবাসীদের এই গান শিখিয়ে আসছেন। বড় নৌকোখানাকে দু' তিনটি গানের ধাক্কায় লা ট্রিনিটির দিকে এগিয়ে আনা গেল। হাল-মাঝি তার হাত-ঘড়িটা দেখে নিয়ে হাঁক দিল : 'সেচ্ছাসেবকবাহিনী'! দাঁড়ি-মাঝিরা বাস্তবিক ক্লান্ত হয়েছেন কি না সে খোঁজে তার দরকার কি? নিয়ম মত শুরু থেকে দশমিনিট পার

হয়ে গেছে, সুতরাং মারী কুরী, পেরিন, বরেল, সেইঞ্জোবোস যে যার জায়গা ছেড়ে উঠে পড়লেন আর তাঁদের জায়গায় অন্য চারজন উচ্চ শিক্ষাবিভাগের সভ্য এসে স্থান গ্রহণ করলেন। চ্যানেলের খরস্রোত পেরিয়ে রসম্ব্রা নামে প্রকাণ্ড বেগুনী রঙের পাথরের জনমানবশূন্য দ্বীপে পৌছবার জন্যে নতুন নৌ-চালনাশক্তির প্রয়োজন; এখানে প্রায় প্রতিদিন সকালে এইসব লারকুয়েস্তবাসীরা স্নান করতে আসতেন।

বাদামী সমুদ্রের আগাছায় ভরা জলের ধারে শূন্য নৌকোগুলোর পাশে পুরুষরা কাপড় ছাড়তেন; মহিলারা রবারের মতো এক শ্রেণীর আগাছায় ঘেরা কোণে বস্ত্র পরিবর্তন করতেন।

রসম্ব্রার গভীর ঠাণ্ডা স্বচ্ছ জলের মধ্যে মারী কুরী সাঁতার দিচ্ছেন—আমার স্মৃতিপটে এই আনন্দময় ছবি আজও আঁকা আছে। তাঁর মেয়েরা ও তাদের বন্ধুরা সাঁতার কাটতে ভালোবাসত। তিনি কিন্তু আইরিন ও ইভের সাহায্যে চমৎকার চিৎ-সাঁতার দিতে শিখে ছিলেন। ছিপছিপে পাতলা গড়ন, ধপধপে সাদা দু'খানি হাত এবং ছেলেমানুষের মতো তাঁর সরল প্রাণবন্ত ব্যবহারের জন্য স্নান-টুপি ঢাকা সাদা চুল আর বয়সের রেখা-বহুল মুখখানার কথা ভুলে যেতে হতো। নিজের কর্মতৎপরতা ও জলক্রীড়ায় দক্ষতা সম্বন্ধে মাদাম কুরীর যথেষ্ট গর্ব ছিল। খেলাধুলো নিয়ে সরবনের সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর নিজের ভেতরে ভেতরে বেশ একটু প্রতিযোগিতার ভাবও ছিল। রসম্ব্রার ছোট গণ্ডীর ভেতর বৈজ্ঞানিক ও তাঁদের স্ত্রীদের দিকে মারী যথেষ্ট লক্ষ্য রাখতেন,—কে বেশ গম্ভীরভাবে উপর-হাতা চালে সাঁতার দিলেন, কে একজায়গায় ছপছপ ক'রে সেখানেই রয়ে গেলেন, এগোতে পারলেন না। প্রতিদ্বন্দ্বীরা কে কতদূর এগোলো সেদিকে তাঁর নির্ভুল দৃষ্টি ছিল এবং খোলাখুলি রেস দেবার প্রস্তাব না ক'রেও, তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষকগোষ্ঠির গতি ও দূরত্বের রেকর্ড ভাঙার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন।

মারী কোন সময়ে হয়তো বললেন: 'আমার মনে হয় ম'সিয়ে বরেলের চেয়ে আমি ভাল সাঁতার দিতে পারি।'

'সে কথা আর বলতে! কোন তুলনাই হয় না মা।'

'আজ জ্যাঁ পেরিন বেশ সাঁতার কাটল, কিন্তু আমার মনে আছে, আমি গতকাল ওর থেকেও দূরে গিয়েছিলাম।'

'আমিও দেখেছি। খুব ভাল হয়েছিল। তুমি গত বছরের থেকে এবছরে অনেক ভাল সাঁতার দিচ্ছ।'

তিনি জানতেন এই স্তুতিবাক্যের মধ্যে মিথ্যার ভেজাল ছিল না, তাই এতে আনন্দ পেতেন। পঞ্চাশোর্ধ বয়সে তিনি সমসাময়িক সাঁতারুদের মধ্যে স্থান ক'রে নিলেন।

সাঁতার শেষে ফিরে যাবার আগের সময়টুকু তিনি রোদে বসে শরীরটা গরম ক'রে নিতে নিতে শুকনো রুটি চিবোতেন। খুশি হয়ে হয়তো বলে উঠলেন: 'কি আরাম!' কিংবা পাহাড়, আকাশ আর জলের এই অপূর্ব ছবির দিকে চেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন: 'কি অপূর্ব!' লারকুয়েস্ত জায়গাটি যে জগতের মধ্যে সবচেয়ে মনোরম, এখানকার সমুদ্রের জল যে ভূমধ্য সাগরের মতো নীল, অন্যান্য আর সব সমুদ্রের তুলনায় অনেক বেশী আরামদায়ক ও বিচিত্র, এবিষয়ে তাঁরা এমন নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, এই সব প্রসিদ্ধ লারকুয়েস্ত-বাসীদের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার বিস্তারিত বিশ্লেষণের মতো এ বিষয়েও কোন আলোচনাই চল্‌ত না। কেবলমাত্র "অসংস্কৃত"রাই চারদিকে তাকিয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠত কিন্তু প্রচণ্ড বিদ্রূপবাণ সহ্য ক'রে বেশীদিন টিঁকতে পারত না।

দুপুরবেলা ভাটার সময়ে নৌকোগুলো সাবধানে "এনটেরেন চ্যানেলের" ভিজে চষা ক্ষেতের মতো দেখতে চাপ-চাপ আগাছার ভেতর দিয়ে বের হয়ে আসতো। হাজার বার যাত্রীরা লক্ষ্য করতেন, হয়তো কোন নৌকো ঠিক একই জায়গায়, একই যাত্রা থেকে ফেরার সময়ে ভাটার টানে চার ঘণ্টার জন্যে আটকে পড়েছে। তখন ক্ষুধার্ত যাত্রীরা পরিত্যক্ত আগাছার ভেতর ছোট ছোট মাছ, কাঁকড়া খুজে বেড়াতেন। গানের পর গান, আর মাঝি বদলের পালা চলতেই থাকত। শেষ অবধি তাশেনের নীচে ভাটার সময়ে নৌকো ভেড়াবার মতো আগাছায় ঢাকা তীরে এসে নৌকো লাগত। খালি পায়ে চটিজোড়া আর স্নানের বড় জামাটা উঁচু ক'রে ধরে, স্কার্টটিকে গুটিয়ে তুলে, গোড়ালি পর্যন্ত কালো দুর্গন্ধ কাদার ভেতর ডুবিয়ে নির্ভয়ে শুকনো ডাঙ্গার দিকে এগিয়ে যেতেন। কোন লারকুয়েস্তবাসী বয়সের খাতিরে তাঁকে সাহায্য করতে হাত বাড়ালে বা তাঁর থলেটা বয়ে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করলে, তিনি বিস্মিত ও বিরক্ত হতেন। এখানে কেউ কাউকে সাহায্য করত না এবং এই গোষ্ঠীর নিয়মাবলীর পয়লা নম্বর নিয়ম ছিল, 'নিজেকে সামলাও!'

নাবিকেরা যে যার মতো খেতে চলে যেতেন। বেলা ছুটোর সময়ে আবার সব এসে তাশেনে জড়ো হতেন। লারকুয়েস্তে "এগ্লানটাইন" নামে একখানা সাদা পাল তোলা নৌকো ছিল—সেটি ছিল এখানের শোভা, সেটিকে বাদ দিলে লারকুয়েস্তের শোভা বহুপরিমাণে ক্ষুন্ন হতো। এরা প্রতিদিন এই নৌকোয় ক'রে বেড়াতে যেতেন। এসময়ে কিন্তু মাদাম কুরীর দেখা পাওয়া যেত না। নৌকোয় অলস সময় কাটাবার সময় তাঁর ছিল না। ততক্ষণ নিজের বাতিঘরে একা বসে কন্যাদের অনুপস্থিতিতে কিছু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সংশোধন করতেন। অথবা যন্ত্রপাতি, খুরপি, গাছ-কাটা কাঁচি বের ক'রে বাগানে কাজ করতেন। হলুদ ফুল আর কাঁটা গাছের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তিনি যখন বাইরে আসতেন, তখন দেখা যেত, চুল্‌কে চুল্‌কে রক্ত বের করেছেন, সারা পায়ে কাটা-ছড়ার দাগ, মাটি মাখা হাত দুটিতে কাঁটা বোঝাই। ভাগ্য ভাল থাকলে ঐটুকুতেই ক্ষান্ত হতেন। কখনও কখনও আইরিন ও ইভ এসে দেখত উৎসাহের মাথায় মা তাদের গোড়ালিতে মোচড় খেয়ে কিংবা হাতুড়ির ঘায়ে আধখানা আঙুল থেঁতলে বসে আছেন।

বিকেল ছটার সময়ে আর এক দফা স্নানের জন্যে মারী ঢালু পথে নেমে যেতেন এবং স্নান সেরে পোশাক বদলে তাশেনের চির উন্মুক্ত দ্বার দিয়ে ভেতরে ঢুকতেন। সমুদ্রের দিকে প্রশস্ত জানালার পেছনে মাদাম মারিলিয়র নামে একজন অতি প্রাচীনা অতি রসিকা এবং সুন্দরী ভদ্রমহিলা বসে থাকতেন। তিনি ছিলেন এই বাড়িরই বাসিন্দা এবং প্রতি সন্ধ্যায় নৌ-চালকদের ঘরে ফেরার পথ চেয়ে বসে থাকতেন। এখানে মারীও তাঁর সঙ্গে অস্তগামী সূর্যের আলোয় রাঙানো সমুদ্রের ওপর "এগ্লানটাইনের" ফেরার জন্য অপেক্ষা করতেন। নৌকো তীরে ভিড়লে যাত্রীর দল পাড়ে উঠে আসত। আইরিন ও ইভের মুখে হাতে রোদে-পোড়া রঙ লাগত, পরনে খাটো সস্তা জামা। শার্ল সেইঞোবোসের বাগানে লাল টুকটুকে ফুল আলো ক'রে থাকত। নৌকো ছাড়বার আগে শার্ল সেইঞোবোস্‌ যাত্রীদের এই ফুল উপহার দিতেন। তাঁদের উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টিতে 'ট্রো'য়ের মোহনা বা 'মোডেজ' দ্বীপ পর্যন্ত অভিযানের উত্তেজনা ফেটে পড়ত। সে-দ্বীপের ছোট ছোট ঘাসের উপর দুরন্ত প্রিস্‌নার্সবেস্‌ খেলার চিহ্ন চোখে পড়ত; প্রত্যেকে, এমনকি সত্তর বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত এই খেলায় অংশ গ্রহণ করতেন। এখানে ডিপ্লোমা বা নোবেল পুরস্কারের কোন মূল্যই ছিল না। তৎপর বৈজ্ঞানিকরা

নিজেদের সম্মান বাঁচাতে পারতেন বটে, তবে অপেক্ষাকৃত মন্দগতি ভদ্রলোকেরা দলপতিদের শাসন মেনে চলতে বাধ্য হতেন।

শিশুসুলভ অথবা 'বর্বরোচিত' অর্ধনগ্ন অবস্থায় জলে-বাতাসে পড়ে থাকার এই রীতি পরে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের মধ্যেই প্রচলিত হয়। কিন্তু যুদ্ধের অব্যবহিত পরে এ জাতীয় আচরণ দলের বাইরে বহুলোকের উগ্র নিন্দার ঢেউ তুলেছিল।

সাঁতারের প্রতিযোগিতা, সূর্যস্নান, পরিত্যক্ত দ্বীপগুলিতে অভিযান আদি সমুদ্রসৈকতের বিভিন্ন আমোদ-প্রমোদ সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হবার পনের বছর আগে এসব গর্হিত খেলা বলেই ধরে নেওয়া হতো। বাইরের চেহারার দিকে আদৌ মনোযোগ দেবার সময় বা ইচ্ছা ছিল না; শতস্থানে শতবার রিপু করা একখানা স্নানের জামা, একখানা ডবল ব্রেস্ট কোট, বাড়িতে তৈরি দু'-তিনখানা সুতীর পোষাক—এই ছিল আইরিন ও ইভের গ্রীষ্মাবরণ। পরে লারকুয়েস্তের অবস্থা যখন পড়ে এল, তখন "অসংস্কৃত" গোষ্ঠীর প্রভাব মোটরবোটের আবির্ভাবে নষ্ট হয়; এখানের কাব্যময় পরিবেশ ছলাকলার অন্তরালে আত্মগোপন করে।

সান্ধ্য-আহারপর্ব সমাধা ক'রে মারী কুরী পুরোনো আলখাল্লাখানা গায়ে দিয়ে মেয়েদের হাত ধরে খানিক পায়চারি করতেন। আঁধার-ঘেরা ঢালু পথ বেয়ে তিনজনে তাশেনে পৌঁছতেন। তাশেন, চিরকালই সেই তাশেন! দিনের মধ্যে এই তৃতীয়বার লারকুয়েস্তবাসীরা সেই বড় ঘরখানায় জড়ো হতেন। প্রকাণ্ড টেবিল ঘিরে ততক্ষণে "লেটার্স" খেলাটি জমে উঠত। বাক্সের ভেতর থেকে কাগজের অক্ষর বের ক'রে জটিলতম কথা তৈরির ওস্তাদ ছিলেন মারী। তাঁকে নিজেদের দলে টানবার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। মোমবাতিগুলো ঘিরে আর সকলে হয় পড়তেন, নয় দাবা খেলতেন।

বিশেষ বিশেষ দিনে অপেশাদার শিল্পী, নাট্যকারের দল সে-বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা সব বর্ণনা ক'রে অঙ্গভঙ্গী সহকারে গান করতেন। যেমন ধরুন,—প্রতিদ্বন্দ্বী দুই পক্ষের নাবিকের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ প্রতিযোগিতার পুনরালোচনা; নৌকো ভিড়োবার পথ আটকে-থাকা প্রকাণ্ড এক শিলাখণ্ডকে প্রচণ্ড উৎসাহী কর্মীর দল কিরকম বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে স্থানান্তরিত করল তার বর্ণনা, 'পূবের বাতাসের' যাবতীয় দুষ্কর্মের প্রতি সমবেত জনমণ্ডলীর

ভর্ৎসনা; জাহাজ-ডুবির এক করুণ বিদ্রূপাত্মক ব্যঞ্জনা; থেকে থেকেই তাশেনের আনাজ-বাগান ধ্বংসকারী এক ভুতুড়ে ভামের দুষ্কর্মের বর্ণনা…এমনি সব।

আলো, গান, সরল হাসি, মধুর শান্তি, নবীন ও প্রবীণদের মধ্যে অগাধ বন্ধুত্ব—সব মিলিয়ে যে অপূর্ব মাধুরীর সৃষ্টি হতো তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এই যে প্রায় কখনই কিছু ঘটছে না, যাকে দাম দিয়ে কিনতে হয় না, যেখানে প্রতিটি দিন তার আগের দিনের মতো—এর অমূল্য স্মৃতি মারী ও তাঁর মেয়েদের মধ্যে চিরদিন আঁকা ছিল। এ হেন অনাড়ম্বর পরিবেশ তাঁদের কাছে জীবনের শ্রেষ্ঠ বিলাসিতার পর্যায়ে রয়ে গেল। ব্রিটানীর এক কোণে সরবরনের সংস্কারমুক্ত এই পণ্ডিত-গোষ্ঠী, সমুদ্রের কাছ থেকে যে পবিত্র, অমূল্য ও সূক্ষ্ম আনন্দের আস্বাদ আহরণ করেছিলেন, কোন ক্রোরপতি দুনিয়ার কোন সমুদ্র-উপকূলে সে-আনন্দের কণামাত্র উপভোগ করেন নি। এ অভিযানের কেন্দ্র ছিল যে কোন আর পাঁচটি গ্রামের মতোই ছোট্ট একখানি গ্রাম মাত্র, সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এর স্থান-মাহাত্ম্য বৎসরান্তে মিলিত বৈজ্ঞানিকদের উপর নির্ভর করত।

এই জীবনী রচনাকালে অনেকবারই আমার মনে হয়েছে যে, পাঠক হয়তো ঠোঁটের কোণে শ্লেষ মাখানো হাসি হেসে মনে মনে বলছেন: 'কি কাণ্ড! এঁরা সকলেই এমন ভয়নক ভালো লোক ছিলেন? কী সব সরল মন, সহানুভূতি ও পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের কী দারুণ ঘটা!'

কথাটা সত্যি। এই কাহিনীর মধ্যে "সহৃদয় চরিত্রের" অভাব নেই। সেটা আমার দোষ নয়, তাঁরা তাই ছিলেন এবং ঠিক আমি যেমনটি লিখেছি, সেইরকমই ছিলেন। মারীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যাঁরা তাঁর সঙ্গী-সাথী হয়েছিলেন, তাঁরা অপরাধী চরিত্র-চিত্রনে কুশলী ঔপন্যাসিকদের বিষয়বস্তু হিসেবে আদৌ উৎরবেন না। শক্লোদোভস্কি এবং কুরী—দুই পরিবারকেই অসাধারণ আখ্যা দেওয়া চলে। এখানে জনক-জননী, সন্তান-সন্ততির মধ্যে ঘৃণা ছিল না, ছিল মমতা আর পরিপূর্ণ স্নেহের সম্পর্ক। এখানে কেউ কারোর ওপর নজর রাখতো না, বিশ্বাসঘাতকতা বা উত্তরাধিকারের কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবত না, এখানে বাস্তবিক প্রত্যেকে খাঁটি সাধুপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই ফরাসী ও পোল দেশীয় আশ্চর্য লোকেদের চরিত্রে আর পাঁচজনের মতোই ত্রুটি হয়তো ছিল, কিন্তু এমন এক আদর্শের

প্রতি এঁরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, যেখানে বিতৃষ্ণা বা বিশ্বাসঘাতকতার কোন স্থান ছিল না।

ব্রিটানীতে থাকা কালীন আমাদের আনন্দের এক মোক্ষম চাল আমি টেবিলের ওপর চেলে রেখেছি। অহঙ্কার বা গোপন ঈর্ষা কখনই এই অতুলনীয় গ্রীষ্মের অবসরগুলি মসিলিপ্ত করে নি, একথা ভেবে পাঠক বোধ হয় সন্দেহভরে নিজের কাঁধ দু'টি একবার ঝাঁকিয়ে নিলেন। লারকুয়েস্তে অত্যন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন বিচারকের পক্ষেও শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ গবেষক, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্যের সন্ধান পাওয়া কঠিন হতো। ব্রিটানীর রোদে, জলে আমি একবারও কাউকে টাকার কথা বলতে শুনি নি। এবিষয়ে আমাদের গুরু শার্ল সেইঞোবোস্ সবচেয়ে ভাল দৃষ্টান্ত ছিলেন; নিজেকে ইতিহাস বা তথ্যাদির অধিনায়ক হিসেবে জাহির না ক'রে এই মুক্ত-হৃদয় বৃদ্ধ নিজের সম্পত্তি আমাদের সবাকার জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। মুক্তদ্বার বাড়িখানি, এগ্লান্টাইন্ বড় নৌকোটি, ছোট্ট নৌকোগুলো সবই তাঁর ছিল নিজস্ব, এখনও আছে। কিন্তু তিনি নিজে ছাড়া বাকি আর সকলেরই যেন ওসবের ওপর অধিকার বেশী। আমরা যখন চিনে-লণ্ঠনের ভেতর মোমবাতি জেলে ঘর সাজিয়ে, একর্ডিয়ানে পোল্কা, লান্সার্স অথবা ব্রিটানীর গ্রাম্য-তালে গৎ বাজিয়ে নাচের মজলিস জমে উঠত, তখন নাচিয়েদের মধ্যে মনিব-ভৃত্য, ফরাসী ইন্স্টিটিউটের সভ্য ও কৃষককন্যা, ব্রিটানীর নাবিক ও পারীবাসিনীদের জোড়া মিলিয়ে নাচতে দেখা যেত।

আমাদের মা ছিলেন এইসব উৎসবের নীরব দর্শক। বন্ধুরা তাঁর ভীরু মনের সঙ্কিত দুর্বলতা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। মা এত চাপা স্বভাবের ছিলেন যে, বাইরে থেকে দু'এক সময়ে তাঁকে রূঢ় মনে হতো। তবু আইরিন ভাল নাচে বা ইভের পোশাকটি সুন্দর মানিয়েছে, এখবর দিতে তাদের ভুল হতো না। এবং সেই মুহূর্তে মারীর শ্রান্ত মুখের কোণে তৃপ্তির অপূর্ব হাসি ফুটে উঠত।

॥ আমেরিকা ॥

২৩

১৯২০-র এক সকাল। রেডিয়ম ইনস্টিটিউটের প্রতীক্ষাগারে এক মহিলা এলেন। নাম তাঁর মিসেস উইলিয়াম ব্রাউন মেলোনী, নিউইয়র্কের এক বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদিকা। ব্যবসায়িক কথাবার্তার জন্যে তিনি এসেছেন, একথা তাঁর চেহারা দেখে বোঝা সম্ভব ছিল না। রোগা চেহারা, ছেলেবেলায় আকস্মিক:দুর্ঘটনার ফলে তাঁর একটা পা খোঁড়া। মাথার চুল ধূসর, সুন্দর ফ্যাকাশে মুখে কবি-সুলভ কালো দুটি চোখ। যে ভৃত্য দরজা খুলে দিল, কম্পিত ভীত কণ্ঠে তাকে জিজ্ঞেস করলেন : 'মাদাম কুরী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের কথা ভুলে যান নি তো?'

বহুবৎসর যাবৎ তিনি এই দিনটির প্রতীক্ষায় ছিলেন। মাদাম কুরীর জীবন ও কর্মধারা সম্বন্ধে সম্মোহিত লোকসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল—এই মহিলা সেই দলেরই একজন। তাঁর চোখে নারীত্বের শ্রেষ্ঠ প্রতীক ছিলেন এই প্রতিভাময়ী বৈজ্ঞানিক। আর এই মার্কিন আদর্শবাদিনী নিজে ছিলেন সাংবাদিক। তিনি তাঁর আরাধ্যা নারীর কাছে আসবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন।

সাক্ষাৎ প্রার্থনা ক'রে কয়েকবার অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন, কিন্তু তার কোন জবাব পান নি। শেষপর্যন্ত উভয়ের পরিচিত এক বৈজ্ঞানিকের মারফৎ তিনি আবেদন জানিয়ে ক'টি কথা লেখেন :

'আমার বাবা ডাক্তার ছিলেন, তিনি বলতেন, মানুষের গুরুত্বহীনতার অতিরঞ্জন অসম্ভব। কিন্তু কুড়ি বৎসর যাবৎ আপনার গুরুত্ব আমার কাছে অমূল্য এবং মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য আমি আপনার সাক্ষাৎ কামনা করি।'

পরদিন সকালে মারী তাঁর লাইব্রেরিতে মিসেস মেলোনীকে অভ্যর্থনা করেন। মিসেস মেলোনী পরে লিখেন :[১] 'দোর খুলতে দেখলাম কালো-পোশাক পরা ছোট্ট ভীরু ফ্যাকাশে এক মহিলা। এমন করুণ মুখ আর আমি দেখি নি। তাঁর করুণার্দ্র ধীর স্থির সুন্দর মুখে পাণ্ডিত্যের চিহ্ন আঁকা। হঠাৎ যেন নিজেকে অনাহূত মনে হলো।...

১ এঁর লেখা "পিয়ের কুরী" শীর্ষক মাদাম কুরীর সংক্ষিপ্ত জীবনীর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

'আমার ভীরুতা তাঁকেও ছাপিয়ে গিয়েছিল। কুড়ি বছর যাবৎ সংবাদ সংগ্রহ করার দক্ষতা আমার ছিল। কিন্তু এই সুতীর কালো পোশাক পরা শান্ত-শ্রী মহিলাকে আমি একটি প্রশ্নও করতে পারলাম না। বলার ইচ্ছে ছিল যে, মার্কিন মহিলারা তাঁর বিরাট কাজে অত্যন্ত বিস্মিত, মুগ্ধ; কিন্তু বলার সময়ে দেখি তাঁর অমূল্য সময়ের ওপর অনধিকার হস্তক্ষেপ করার জন্য আমি মার্জনা চাইছি। আমায় সহজ ক'রে নেবার জন্য মাদাম কুরী আমেরিকার বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

'তিনি বললেন: আমেরিকায় প্রায় পঞ্চাশ গ্রাম রেডিয়ম আছে। বাল্টিমোরে—চার, ডেনভারে—ছয়, নিউইয়র্কে—সাত। এই ভাবে প্রতি কণা রেডিয়মের আবাস উল্লেখ ক'রে গেলেন বিজ্ঞানী।

'আর ফ্রান্সে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'আমার ল্যাবরেটারিতে এক গ্রামের বেশী নেই।'

'আপনার মাত্র এক গ্রাম?'

'আমার? ওঃ, আমার কিছু নেই। আমার ল্যাবরেটারির জিনিস ওটা।'

'আমি সত্বাধিকারের প্রাপ্য অর্থের প্রসঙ্গ তুললাম। এ জাতীয় সত্বাধিকার থেকে আপনি প্রচুর অর্থোপায় করতে পারতেন।'

শান্ত স্বরে তিনি জবাব দিলেন: ' কারুর ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করা রেডিয়মের কাজ নয়। রেডিয়ম মৌলিক পদার্থ মাত্র। তার ওপর সবার সমান অধিকার।'

আমি হঠাৎ আবেগের স্বরে প্রশ্ন ক'রে বসলাম: 'ধরুন, যদি সারা দুনিয়া আপনার সামনে মেলে ধরা যায়, তার মধ্যে থেকে আপনি কোন্‌টা পছন্দ করবেন?' অত্যন্ত বোকার মতো প্রশ্ন হলেও কথাটা যেন কাজে লেগে গেল।

আমি সেই সপ্তাহেই শুনেছিলাম যে এক গ্রাম রেডিয়মের দাম এক লক্ষ ডলার; এও শুনেছিলাম যে নতুন তৈরি হলেও মাদাম কুরীর ল্যাবরেটারিতে যথেষ্ট যন্ত্রপাতির অভাব আছে। আর সেখানে যেটুকু রেডিয়ম আছে, তা ক্যানসার রোগ চিকিৎসার কাজে লাগানো হয়।

এই মার্জিতরুচি মার্কিন মহিলার বোধহয় বিস্ময়ের অবধি রইল না। ইউনাইটেড স্টেটস-এর বিরাট সব ল্যাবরেটারি, বিশেষতঃ প্রাসাদোপম এডিসন ল্যাবরেটারির সঙ্গে এঁর পরিচয় ছিল। সেই সব অট্টালিকার পরে ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বাড়িগুলির মতো ছোট ক'রে গড়া নতুন পরিচ্ছন্ন

রেডিয়ম ইনস্টিটিউটটিকে নিশ্চয় সম্পদহীন বলে তাঁর মনে হয়েছিল। পিটসবুর্গের যে সব কারখানায় পর্বতপ্রমাণ রেডিয়ম সম্বলিত আকরের শোধন করা হয়, মিসেস মেলোনীর সেগুলিও দেখা ছিল। তাদের চিমনির গগনচুম্বী কালো ধোঁয়া এবং ঐ অমূল্য পদার্থবিশিষ্ট কার্নোটাইট বোঝাই মোটর গাড়ির লম্বা লাইন তাঁর চোখের ওপর ভেসে উঠল।

এখানে প্যারীতে আফিসের অব্যবস্থার মধ্যে রেডিয়ম আবিষ্কারিণী মহিলার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন: 'আপনি কোন জিনিসটা সবচেয়ে পছন্দ করেন?'

মৃদুস্বরে মাদাম কুরী বললেন: 'আমার গবেষণার কাজ চালিয়ে যাবার জন্য এক গ্রাম রেডিয়মের প্রয়োজন, আমার কেনার সাধ্য নেই, বড্ড দাম।'

মিসেস মেলোনীর মাথায় এক চমৎকার উপায় খেলে গেল, তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের সাহায্যে মাদাম কুরীকে এক গ্রাম রেডিয়ম উপহার দেবার কথা তাঁর মনে হলো। নিউইয়র্কে ফিরে গিয়ে এই উপহার কেনার জন্যে তিনি দশজন অত্যন্ত ধনী মহিলার কাছ থেকে দশ হাজার ক'রে ডলার ভিক্ষা চাইলেন, কিন্তু ব্যর্থ হলেন। মাত্র তিনজন বিত্তশালিনীকে রাজী করানো গেল। তখন তিনি মনে মনে ভাবলেন: 'দশজন কেন? আমেরিকার ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের কাছ থেকে চাঁদা তোলার ব্যবস্থা করলেই তো এ কাজ হতে পারে।'

মিসেস মেলোনী একটি কমিটি গঠন করলেন, তার সক্রিয় সদস্য রূপে এলেন মিসেস উইলিয়ম ভন্ মুডি, মিসেস রবার্ট জি মিড, মিসেস নিকোলাস এফ ব্র্যাডি এবং ডাক্তার রবার্ট এবে ও ফ্রান্সিস কার্টার উড। সবাই মিলে আমেরিকার সমস্ত বড় বড় শহরে "মারী কুরী রেডিয়ম ফণ্ড" নামে একটি জাতীয়-চাঁদার ভাণ্ডার খুললেন এবং কালো পোশাক পরা এই বৈজ্ঞানিক-মহিলার সঙ্গে সাক্ষাতের মাত্র এক বছরের মধ্যে মিসেস মেলোনী মাদাম কুরীকে লিখলেন: 'টাকার ব্যবস্থা হয়েছে, আমরা আপনাকে রেডিয়ম উপহার দেব।'

এই সহৃদয়া মার্কিন মহিলা মারী কুরীকে অত্যন্ত সাহায্য করেছিলেন, অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তিনি বিনম্র অনুরোধ জানালেন; 'আপনি আমাদের দেশে একবার আসুন না। আমরা আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।'

মারী দ্বিধায় পড়লেন, চিরদিন ভিড় থেকে দূরে থাকাই হলো তাঁর স্বভাব।

আমেরিকা হলো বিজ্ঞাপনের দেশ, সেখানে যাওয়ার ক্লান্তি আর হৈ-চৈ-এর কথা ভেবে তিনি-ভয় পেলেন।

মিসেস মেলোনী বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন এবং তাঁর আপত্তিগুলো একটার পর একটা খণ্ডন ক'রে গেলেন।

'আপনি বলছেন, মেয়েদের ছেড়ে থাকতে আপনার আপত্তি। বেশ তো, তারাও আসুক না কেন? উৎসব অনুষ্ঠানে আপনার ক্লান্তি আসে? আমরা আপনার অভ্যর্থনার জন্য একান্ত সীমাবদ্ধ ও উপযুক্ত ব্যবস্থাই করবো। আপনি আসুন। আপনার যাত্রা যাতে সুখের হয়, তার জন্য আমাদের চেষ্টার ত্রুটি থাকবে না এবং হোয়াইট হাউসে ইউনাইটেড স্টেটস্ এর রাষ্ট্রপতি নিজে হাতে আপনাকে রেডিয়ম কণিকাটি উপহার দেবেন।'

মাদাম কুরীর মন গলে গেল। রেডিয়ম আনতে এবং আমেরিকার এই সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানাতে তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর চুয়ান্ন বছরের জীবনে এই প্রথম মস্ত বড় এক সরকারি সফরে সম্মত হলেন।

কন্যারা সোৎসাহে যাত্রার তোড়জোড় করতে লেগে গেল। ইভ জেদ ক'রে মাকে দিয়ে দু'একখানা নতুন পোশাক কেনালো। মাদাম কুরীর চারপাশে সাড় সাড় পড়ে গেল। আতলান্তিকের অপর পারে মারীকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য যে-সব উৎসব অনুষ্ঠানের উদ্যোগ চলছিল, সংবাদপত্রে তার বিবরণ প্রকাশিত হলে কর্তৃপক্ষের টনক নড়ল, তাঁরা তখন ভাবতে বসলেন দুনিয়া জোড়া মর্যাদার উপযুক্ত কি কি উপাধিতে ভূষিত ক'রে এই বৈজ্ঞানিককে ইউনাইটেড স্টেটস-এ পাঠানো যায়। মাদাম কুরীকে যে পারীর বিজ্ঞান-আকাদেমির সভ্য পদ থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত করা হয়েছে, সে-কথা আমেরিকা বুঝবে না। লেজিওঁ দ্য অনর-এর ছোট্ট ক্রশটুকুও তাঁর নেই। লজ্জার ব্যাপার সন্দেহ নেই। সঙ্গে সঙ্গে লেজিওঁর ক্রশখানি তাঁকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হলো। দ্বিতীয়বার তিনি সেটি প্রত্যাখ্যান করলেন।

২৭শে এপ্রিল ১৯২১, *Fe Sais Taut* পত্রিকার উদ্যোগে পারীর গ্র্যাণ্ড-অপেরা হল-এ রেডিয়ম ইনস্টিটিউটের কল্যাণে মারীর জন্য বিদায়-উৎসবের আয়োজন করা হয়। লিয়ঁ বেরার্ড, অধ্যাপক জ্যঁা পেরিন ও ডঃ ক্লোদ রেগো বক্তৃতা দিলেন, পরে উৎসবের উদ্যোক্তা সাশা গিত্রির সুব্যবস্থায় সঙ্গীত ও বিখ্যাত অভিনেতারা বিচিত্রানুষ্ঠান করলেন; বৃদ্ধ, প্রায় অথর্ব সারা বের্নর্ড ও লুসিয়ঁা গিত্রি তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন।

দিন কয়েক পরে মাদাম কুরী "ওলিম্পিক" জাহাজে রওনা হলেন। দুই কন্যা তাঁর সঙ্গে চলল। তিনজনের যাবতীয় পোশাক একটি মাত্র ট্রাঙ্কেই ধরে গেল। জাহাজের সবচেয়ে ভাল ঘরখানায় তাঁদের ব্যবস্থা হয়েছে। মারী এই বন্দোবস্তের প্রশংসা করলেন বটে, কিন্তু অতি বিলাসী আসবাব ও অতি জটিল খাদ্য ব্যবস্থা দেখে সন্দিগ্ধ কৃষক-কন্যার মতো ওষ্ঠ কুঞ্চিত করলেন।

যাঁরা কিছুতেই তাঁকে নিজের মনে থাকতে দেবে না, তাদের এড়াবার জন্যে, ঘরের ভেতর থেকে দরজা এঁটে দিয়ে সরকারি দায়িত্বের কথা ভোলবার আশায় নিজের দৈনন্দিন অনাড়ম্বর জীবনের শান্তিপূর্ণ স্মৃতি-সাগরে ডুব দিলেন।

১৯২১-এর ১০ই মে, মাদাম কুরী মাদাম জ্যাঁ পেরিনকে লিখলেন :

'প্রিয় আঁরীয়েতা :

জাহাজে তোমার চিঠি পেয়ে খুব আনন্দ হলো, কারণ ফ্রান্স ছেড়ে এত দূরে আমার স্বভাব ও অভ্যাস-বিরুদ্ধ হৈ চৈ করতে বেরোবার সময়েই মনে মনে যথেষ্ট ভয় হয়েছিল। সমুদ্র পার হতে একেবারে ভাল লাগে নি। দারুণ অন্ধকার, বিমর্ষ, হিংস্র হয়ে উঠেছিল সমুদ্র। গা ঘোলায় নি বটে, তবে মাথা ঘুরেছিল, বেশীর ভাগ সময় কেবিনেই পড়ে রইলাম। মেয়েদের দেখে মনে হয়, তারা খুব খুশী। মিসেস মেলোনী আমাদের সঙ্গেই চলেছেন, তিনি মেয়েদের হৃদয় জয় করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। বেচারী ভারি নরম, মিষ্টি স্বভাবের মানুষ।

'...আমি এখান থেকে লারকুয়েস্তের স্বপ্ন দেখছি, শিগগিরই আবার বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সেখানে মিলব। তুমিও সেই বাগানে গিয়ে ঘণ্টাকয়েক শান্তিতে কাটিয়ে যাবে। আমাদের দু'জনের প্রিয় সেই নীল সাগর এই গোমড়া মুখো, খিটখিটে সমুদ্রের তুলনায় অনেক বেশী অতিথি-বৎসল। তোমার মেয়ের ভাবী সন্তানের কথা মনে হচ্ছে ; সে হবে আমাদের দলের কনিষ্ঠতম সভ্য, নতুন বংশধরদের অগ্রজ। এটির পরে পরে আমাদের সন্তানদের আরও অনেকের সন্তান হবার সম্ভাবনা আসবে।'

তন্বী, দুঃসাহসিকা মনোহারিণী নিউইয়র্ক নগরী ঝরঝরে দিনের সূক্ষ্ম অবগুণ্ঠন মোচন ক'রে চোখের সামনে এসে দাঁড়াল। সঙ্গিনী মিসেস মেলোনী মারীকে সতর্ক ক'রে দিলেন, সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার ও চলচ্চিত্র জগতের রথী-বৃন্দ তাঁর জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে। জাহাজের জেটি পর্যন্ত বিপুল জন-

সমাবেশ বৈজ্ঞানিকের আগমন প্রতীক্ষা ক'রে আছে। সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরে "মানব জাতির কল্যাণসাধিকা" ব'লে যাঁর নাম ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁকে দেখবার জন্য পাঁচ ঘণ্টা এই কুতূহলী জনতাকে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হয়েছে। দলে দলে গার্লগাইড আর ইস্কুলের ছাত্রীদের দেখা গেল। এছাড়া ইউনাইটেড স্টেটস-এর পোলবাসীদের প্রতিষ্ঠান থেকে সাদা ও লাল গোলাপ হাতে মহিলা সমাবেশও হয়েছে। হাজার হাজার সমবেত স্কন্ধ ও উত্তেজিত মুখের ওপর মার্কিন, ফরাসী ও পোলদেশের জাতীয় পতাকাগুলি উজ্জ্বল বর্ণ-বৈচিত্রে ঝল্‌মল্‌ ক'রে উঠল।

"ওলিম্পিক" জাহাজের ডেকের ওপর মস্ত আরাম কেদারায় মারীকে বসানো হলো। তাঁর কাছ থেকে হাত-ব্যাগ ও টুপি সরিয়ে নেওয়া হলো। 'মাদাম কুরী, এদিকে তাকান, ডান দিকে মাথা ঘোরান, মাথা উঁচু করুন! এ দিকে তাকান! এদিকে! এদিকে!...' সেই বিস্মিত, ক্লান্ত মুখখানাকে অর্ধ চন্দ্রাকারে ঘিরে চল্লিশটি ক্যামেরা ও চলচ্চিত্র যন্ত্র থেকে অবিরাম ক্লিক্‌ ক্লিক্‌ শব্দ হচ্ছিল, সে-শব্দ ছাপিয়ে ফটোগ্রাফাররা তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল।

এই চরম ক্লান্তিময় রোমাঞ্চকর সপ্তাহগুলিতে আইরিন ও ইভ মায়ের দেহ-রক্ষী হয়ে রইল। বে-সরকারি গাড়িতে বেড়িয়ে নিমন্ত্রণ সভার আদর-আপ্যায়নে জনসাধারণের প্রশংসাবাক্যে এবং সাংবাদিকদের বার্তাপ্রবাহের ভেতর দিয়ে ইউনাইটেড স্টেটসকে চেনা দুই কন্যার পক্ষে অসম্ভব ছিল। বাহ্যিক প্রথায় এই দেশ দেখে আমেরিকা সম্বন্ধে তারা বিশেষ কিছুই জানতে পারল না, কিন্তু তার বদলে তাদের নিজেদের মা'কে তারা অনেক বেশী ক'রে চিনতে পারল। মাদাম কুরীর নিজেকে লোকচক্ষুর বাইরে সরিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা ফ্রান্সে আংশিকভাবে সার্থক হয়েছিল। তাঁর সহকর্মীদের, অন্তরঙ্গ আত্মীয়-বন্ধুদের পর্যন্ত, তিনি বোঝাতে পেরেছিলেন যে, মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক হওয়া এমন কিছু মস্ত কথা নয়। নিউইয়র্কে পা দেওয়ামাত্র মুখ খুলে গেল, আইরিন ও ইভ হঠাৎ আবিষ্কার করল যে, যে-মানুষটির এত কাছে তারা আজন্ম কাটালো, দুনিয়ার চোখে সেই অন্তর্মুখী রমণীর কি অতুল মর্যাদা! প্রতিটি বক্তৃতা, জনসাধারণের প্রতিটি ব্যবহার, সংবাদপত্রে প্রতিটি সংবাদ এই একই বাণী প্রচার করছে। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হবার আগেই আমেরিকা তাঁর পায়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন ক'রে বসেছিল

এবং জীবিত শ্রেষ্ঠ নরনারীর মধ্যে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট করেছিল। এখন তাঁকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে হাজার হাজার মানুষ "ক্লান্ত পথিকের সরল মাধুরীর" দাস হয়ে গেল এবং "ছোট্ট ভীরু রমণী," "অনাড়ম্বর বৈজ্ঞানিকের" পায়ে প্রথম দর্শনেই আত্মনিবেদন ক'রে দিল।

একটা সমগ্র জাতির মনের কথা বোঝাবার চেষ্টা করছি না—বলাবাহুল্য সংবাদপত্রের মাথায় চোখে-লাগা মস্ত মস্ত অক্ষরের লেখাগুলিও বিচার করতে বসি নি। তবু একথা সত্যি যে, মার্কিন নরনারীর অদম্য উৎসাহের জোয়ারের একটা কিছু অর্থ আছে। যাইহোক, মারী কুরীর পায়ের কাছে আদর্শবাদের ঢেউ এসে লাগল। আত্মসচেতন, দাম্ভিক, নিজের আবিষ্কারের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ কোন এক মাদাম কুরী হয় তো এদের কৌতূহল জাগাতে পারতেন, কিন্তু এমন সমবেত ভালোবাসার উদ্রেক করতে পারতেন না। ভীরু বৈজ্ঞানিককে ঘিরে চতুর্দিক থেকে জীবনের প্রতি অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীর জয়-জয় রব উঠল: তার কারণ হলো তাঁর ব্যক্তিগত লাভের প্রতি বিতৃষ্ণা, জ্ঞানমার্গের একনিষ্ঠ সাধনা, তাঁর সেবা করার ঐকান্তিক আগ্রহ।

তাঁর দেশভ্রমণের ভ্রমণ-সূচী তৈরি ক'রে দিল একটি পরামর্শসভা। আমেরিকার প্রতিটি বড় বড় শহর, প্রতিটি কলেজ ও প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয় মারীকে আমন্ত্রণ জানাল। বহু পদক, সম্মানিত উপাধি এবং ডক্টর ডিগ্রি তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করেছিল।

মিসেস মেলোনী প্রশ্ন করলেন: 'আপনি নিশ্চয়ই আপনার টুপি আর গাউন সঙ্গে এনেছেন! এসব ক্ষেত্রে সেগুলি কিন্তু অপরিহার্য।'

মারীর সরল স্মিত হাসি দেখে সবাই বিস্মিত হলো। ইউনিভারসিটি-গাউন তিনি আনেন নি, কারণ, সে-পোশাক তো তাঁর কোনকালেই ছিল না। সরবনের প্রফেসররা গাউন পরতে বাধ্য কিন্তু যেহেতু মারী সেখানে একমাত্র মহিলা, সেই কারণে পোশাকের ব্যবস্থার ভার ভদ্রলোকদের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দরজী ডেকে কালো সিল্কের ওপর ভেলভেটের মগজি দেওয়া অপূর্ব পোশাক সেলাই হয়ে গেল, পোশাকের ওপর দিয়ে ডক্টর ডিগ্রির উপযুক্ত উজ্জ্বল হুড দেওয়া হলো। যখন মারীকে পরিয়ে দেখা হলো ঠিকমত পোশাকটি গায়ে হয়েছে কিনা, মারী অধৈর্য ভাব প্রকাশ ক'রে বললেন, জামার হাতাগুলো ভারি অসুবিধেজনক, কাপড়টা বড্ড গরম, রেডিয়ম আর পোড়া-আঙুলগুলোতে সিল্কের ঘষা লেগে জ্বালা করছে যে!

অবশেষে ১৩ই মে গোছগাছ সারা হলো, এনড্রু কার্নেগির বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিউইয়র্ক শহরে এক চক্কর ঘুরে মাদাম কুরী, মিসেস মেলোনী, আইরিন ও ইভ উল্কা বেগে দেশভ্রমণে বেরোলেন। রৌদ্রজ্জ্বল রাস্তার ছু'ধার দিয়ে সাদা পোশাক পরা হাজার হাজার মেয়ে ঘাসে-ছাওয়া ঢালু মাঠের ওপর দিয়ে মাদাম কুরীর গাড়ির দিকে দৌড়ে এল। তাদের হাতে নিশান আর ফুল; একসঙ্গে পা ফেলে হৈ চৈ ক'রে দল বেঁধে গান করতে করতে তারা এগিয়ে চলল। স্মিথ, ভাসার, ব্রাইন্ ম্যর, মাউণ্ট হোলিওক্-এর মেয়েদের কলেজগুলোর দৃশ্য মোটামুটি এইরকম। সর্বপ্রথমে এই উৎসাহী তরুণী ছাত্রীদের সঙ্গে মারীর পরিচয় করিয়ে দেবার পরিকল্পনা যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত হয়েছিল।

দিন কয়েক পরে নিউইয়র্কের কার্নেগি হল্‌এ ইউনিভারসিটি নারী-প্রতিষ্ঠানের এক বিরাট সভায় এই সব কলেজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আবার মারীর দেখা হলো। তাঁরা মারীর সামনে অভিবাদন ক'রে একজন "আমেরিকান বিউটি" গোলাপ, তারপরে জলজ লিলি এইভাবে পরে পরে মারীকে উপহার দিয়ে গেল। মার্কিন অধ্যাপক, ফরাসী ও পোলদেশীয় রাজপ্রতিনিধি এবং পুরোনো বন্ধু ইনেস প্যাডারিউইস্কির সামনে মাদাম কুরী বহু উপাধি, উপহার পদক ও সেইসঙ্গে তৎকালীন দুর্লভ মর্যাদা নিউইয়র্ক শহরের 'স্বাধীনতা পদক' লাভ করলেন।

পরের ছুই দিনের অনুষ্ঠানে মার্কিন বৈজ্ঞানিক সঙ্ঘগুলি থেকে পাঁচশ সাঁয়ত্রিশজন প্রতিনিধি ওয়ালডর্ফ এস্টোরিয়ায় তাঁর সম্বর্ধনার জন্য জমায়েত হলেন। এরই মধ্যে ক্লান্তিতে মারীর শরীর ভেঙ্গে আসছিল। বলিষ্ঠ, বিপুল, উত্তেজিত উচ্ছ্বসিত জনতা এবং কনভেনটের জীবনে অভ্যস্ত ছুর্বল রমণীর মধ্যে আকাশপাতাল ব্যবধান। আনন্দ-কল্লোল আর অভিনন্দনের ঘটা দেখে মারী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলেন। এত লোকের দৃষ্টির সামনে তিনি ভয় পেলেন; যখন তাঁরা মাঝপথ দিয়ে এগোচ্ছিলেন, তখন তাঁকে একবার চোখের দেখা দেখবার জন্য এত লোকের ভিড় দেখে তাঁর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। তাঁর মনে কেমন যেন একটা অস্পষ্ট আশঙ্কা হলো হয়তো বা ভিড়ের মধ্যে তিনি পিশে যাবেন। এক অন্ধভক্ত এমন জোরে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলেন যে, ভদ্রমহিলা হাতে ব্যথা পেলেন, এক কব্জিতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে স্লিংয়ে ঝোলানো অবস্থায় বৈজ্ঞানিককে ভ্রমণ পর্ব শেষ করতে হলো—সম্মানের গুঁতো কাকে বলে!

সেই মহাদিন এল। "তাঁর কীর্তির প্রতি সম্মান···প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা···হোয়াইট হাউসে গুণী-জ্ঞানী শোভিত সভা কর্তৃক জগদ্বিখ্যাতা নারীকে সুযোগ্য মর্যাদা প্রদান··· ।"

সেই মাসের ২০ তারিখে ওয়াশিংটন শহরে প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং মাদাম-কুরীকে এক গ্রাম রেডিয়ম,—অথবা তার প্রতীক উপহার দেন। এই অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষ ক'রে টিউবগুলি রাখার জন্যে ভেতরে সীসে দেওয়া একটি ঝাঁপি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এই টিউবগুলি এতই দুর্মূল্য ও তাদের বিচ্ছুরণ-শক্তি এতই বিপজ্জনক যে, সেগুলি ফ্যাক্টরী থেকে আনা হলো না। বড় বড় রাজনীতিবিদ্, শাসন-বিভাগ, সৈনিক ও নৌবিভাগের মহারথীরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে হোয়াইট হাউসের পূব-মহলে জমায়েৎ হলেন, সেই ঘরের মাঝ-বরাবর টেবিলের ওপর সেই ঝাঁপিতে নকল রেডিয়ম দিয়ে সাজিয়ে রাখা হলো।

চারটে বাজল। শোভাযাত্রার প্রবেশ পথে দু'পাল্লার প্রকাণ্ড দরজাটি খুলে গেল: ফরাসী রাষ্ট্রদূত মঁসিয়ে ইউসেরাদের হাত ধরে মিসেস হার্ডিং, প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং-এর হাত ধরে মাদাম কুরী, পরের সারিতে মিসেস মেলোনী, আইরিন ও ইভ, শেষে "মারী কুরী সমিতি"র মহিলারা প্রবেশ করলেন।

বক্তৃতা শুরু হলো। শেষে ইউনাইটড স্টেটস-এর প্রেসিডেণ্ট—"সুচরিতা, পতিগতপ্রাণা পত্নী, স্নেহময়ী জননী, যিনি প্রাণান্তকর পরিশ্রমের পরেও নারী-জীবনের সকল ধর্মই পালন করেছেন"—তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানালেন। তিন রঙা রিবন বাঁধা পার্চমেণ্ট কাগজের মোড়ক তিনি মারীকে উপহার দিলেন এবং রেশমী দড়িতে ঝোলানো ছোট্ট চাবি মারীর গলায় পরিয়ে দিলেন: ঐ ঝাঁপির চাবি।

ধন্যবাদ জানিয়ে মারী সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলে সবাই স্তব্ধ হয়ে শুনলেন; তারপর প্রফুল্ল অন্তরে অতিথিরা ব্লু-রুমে চলে গেলেন, সেখান থেকে একজন একজন ক'রে বৈজ্ঞানিকের সামনে দিয়ে পার হয়ে যাবেন। মারী কুরী বসে আগন্তুকদের মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হাসছিলেন, তাঁর হয়ে তাঁর কন্যাদের সঙ্গে করমর্দন করছিলেন এবং মিসেস হার্ডিং এদের যে যে দেশের লোক বলে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন, সেইভাবে ইংরাজী, পোল বা ফরাসী ভাষায় তারা ভদ্রতা রক্ষা করে গেল। ·· ····

যাঁদের এই সভায় উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল এবং যে সাংবাদিকরা

সংবাদপত্রের মাথায় ঘোষণা করলেন যে, "রেডিয়ম আবিষ্কর্ত্রীকে মার্কিন সুহৃদ মণ্ডলীর তরফ হইতে অমূল্য উপহার প্রদান করা হলো," তাঁরা শুনে অবাক হবেন যে, প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং উপহারটি তাঁকে দেবার আগেই মারী কুরী সত্ত্ব ত্যাগ ক'রে বসেছিলেন। অনুষ্ঠানের আগের দিন সন্ধ্যায় মিসেস মেলোনী তাঁর মতামত জানবার জন্য দলিলখানা মারীর হাতে দিলেন। তিনি সাবধানে আগাগোড়া পড়ে ধীর কণ্ঠে বললেন :

'এই দলিলের সংশোধন প্রয়োজন। আমেরিকা আমায় যে রেডিয়ম কণিকাটি উপহার দিল—তার উপর অধিকার থাকবে একমাত্র বিজ্ঞানের। আমি যতদিন আছি, ততদিন ওটা বিজ্ঞানের সেবায় ব্যবহার হবে, সেকথা বলাই বাহুল্য, কিন্তু এই অবস্থায় থাকলে আমার মৃত্যুর পর রেডিয়মটি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হবে, তখন হবে আমার মেয়েদের সম্পত্তি। এ উচিত নয়! আমি এটিকে ল্যাবরেটারিকে দান করতে চাই। একজন উকিল ডাকতে পারেন মিসেস মেলোনী?'

মিসেস মেলোনী ঘাবড়ে গিয়ে বললেন : 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই! আপনি যদি চান, তবে সামনের সপ্তাহে একাজ হতে পারে।'

'সামনের সপ্তাহে নয়, কাল্‌কেও নয়। দেরী নয়, আজ রাত্রের মধ্যেই। দানসত্ত্ব আইনসঙ্গত হওয়া চাই। তাছাড়া আমি হয়তো কয়েকঘণ্টার মধ্যে মরেও যেতে পারি।'

সুতরাং সেই গভীর রাত্রে অতি কষ্টে একজন উকিল জোগাড় ক'রে মারীর সঙ্গে বসে আইনের কথা পাকা ক'রে আরেক খানা দলিল তৈরি হলো। এবং তিনি তক্ষুণি সই ক'রে দিলেন।

রাজধানী ছেড়ে বেরোবার আগে মাদাম কুরীকে ওয়াশিংটনের নতুন নীচু তাপমাত্রার ল্যাবরেটারি-অব-মাইন্‌স্‌-এর উদ্বোধন ক'রে যেতে হলো। শেষ মুহূর্তে ইঞ্জিনিয়রদের খবর দেওয়া হলো যে, এতগুলি ইঞ্জিন-ঘর পরিদর্শন তাঁর শক্তিতে কুলোবে না। তারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে এক অভিনব ব্যবস্থা ক'রে দিল, যার দ্বারা একটি মাত্র সুইচ টিপে তিনি একসঙ্গে সবক'টি মোটর চালু ক'রে দেবেন। যথারীতি অনুষ্ঠান আরম্ভ হলো। মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তা যা' বলার বললেন, তারপর গলায়

স্বর উঁচু ক'রে ঘোষণা করলেন: 'এখন এই ল্যাবরেটারির যন্ত্রগুলি মাদাম কুরী দ্বারা চালিত হবে।'

কয়েক মুহূর্তের বিরতির পর সহকারী প্রাণপণে বৈজ্ঞানিকের মনোযোগ আকর্ষণ করবার চেষ্টা করল, কিন্তু কোন ফল হলো না। মিনিট পাঁচেক আগে তাঁকে একখণ্ড চমৎকার কার্নোটাইট্ উপহার দেওয়া হয়েছিল, তিনি অখণ্ড মনোযোগে সেটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিলেন। মনে মনে নিশ্চয় তিনি ভেবে দেখছিলেন পারীতে তাঁর রেডিয়ম ইন্‌স্টিটিউটের কোন্ বিশেষ জায়গায়, কোন্ বিশেষ তাকের উপর এই অপূর্ব পদার্থটিকে রাখা হবে।

বক্তা আরেক বার ঘোষণা করলেন এবং সন্তর্পণে সবিনয়ে ঠেলা দিয়ে তাঁকে পারী থেকে ওয়াশিংটনে ফিরিয়ে আনলেন! বিব্রত হয়ে তাড়াতাড়ি তিনি ম্যাজিক-বোতাম টিপে দিলেন এবং হাজার হাজার অদৃশ্য শ্রোতা, যারা এই অভাবনীয় দেরি দেখে অবাক হচ্ছিল, তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

ফিলাডেলফিয়া। বে-সরকারি খেতাব, ডক্টর উপাধি। মাদাম কুরী এবং শহরের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-উদ্যোক্তাদের মধ্যে উপহারের আদান-প্রদান হলো; এক কারখানার মালিক পঞ্চাশ মিলিগ্রাম মেসোথোরিয়ম্ উপহার দিলেন। মার্কিন দার্শনিক-সমাজ তাঁকে জন্-স্কট্ পদকে ভূষিত করলেন। ধন্যবাদ স্বরূপ মারী এঁদের তাঁর জীবনের প্রথম গবেষণার সময়ের সেই "ঐতিহাসিক" পিজ্যো-ইলেক্‌ট্রিক-স্ফটিকখানা উপহার দিলেন।

তিনি পিটস্‌বুর্গে রেডিয়ম-কারখানা পরিদর্শনে গেলেন, এইখানে তাঁর জন্য সেই বিখ্যাত রেডিয়ম গ্রামটিকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। এখানকার ইউনিভারসিটি আবার তাঁকে ডক্টর ডিগ্রি দিয়ে সম্বর্ধিত করলেন…গাউনটি তাঁকে পরতে হলো আবার।

অনুষ্ঠানের সময়ে পড়ে যাবার ভয়ে তিনি শক্ত হয়ে রইলেন, ফুলের তোড়া উপহার নিলেন, বক্তৃতা, সমবেত সঙ্গীত শুনলেন। কিন্তু পরদিন সকালে এতদিনের আশঙ্কা জনসমাজে ঘোষণা করতে হলো: শারীরিক অসুস্থতার কারণে মাদাম কুরীর দেশ-ভ্রমণ আপাততঃ স্থগিত রইল। ডাক্তারের পরামর্শানুযায়ী পশ্চিমের শহরগুলি পরিদর্শনের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করলেন, যে সব জায়গায় তাঁর অভ্যর্থনার জন্য যে ব্যবস্থা হয়েছিল, সেসব বাতিল করা হলো।

মার্কিন সাংবাদিকেরা উচ্ছ্বসিত সহানুভূতিতে দুর্বল, প্রৌঢ়া মহিলাকে তাঁর সাধ্যের অতীত পরীক্ষার ভেতর টেনে আনার জন্য নিজেদের দেশের ওপর দোষারোপ করল। সাবলীলতা ও বাস্তব-ধর্মীতায় প্রবন্ধগুলি প্রশংসনীয় হয়েছিল।

একটি খবরের কাগজ বড় বড় হরফে ঘোষণা করল: 'আতিথেয়তার আতিশয্য," "বৈজ্ঞানিককে সাহায্য ক'রে মার্কিন মহিলারা যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু সমালোচক অনায়াসে একথা বলতে পারেন যে, শুধুমাত্র আমাদের অহঙ্কার চরিতার্থ করার জন্য মাদাম কুরীকে আপন স্বাস্থ্যের মূল্যে পুরস্কারটি গ্রহণ করতে হয়েছে।'

আরেকটি সংবাদপত্র নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করল: 'যে কোন সার্কাস বা বিচিত্রানুষ্ঠানের কর্তা এর অর্ধেক পরিশ্রমের বদলে মাদাম কুরীকে এর চেয়ে বেশী টাকা যোগাতে পারত।' নৈরাশ্যবাদীরা সখেদে ব্যাপারটি গ্রহণ করলেন: 'আমাদের আগ্রহাতিশয্যে আমরা মার্শাল জোফ্রকে মেরেছি, এবার কি মাদাম কুরীর পালা?'

মারী তাঁর ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে সরল সহজ ব্যবহার করেছিলেন, সুতরাং এই সব লেখার ফল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফলতে শুরু করল। এর পর থেকে উদ্যোক্তরা যেন-তেন-প্রকারেণ তাঁর শক্তি সংরক্ষণের কৌশল খুঁজে বের করতে লাগলেন। ট্রেনের পিছনের দরজা দিয়ে নেমে রেললাইন পেরিয়ে সামনের প্ল্যাটফর্মের অপেক্ষমান জনসমুদ্রের হাত থেকে রেহাই পাবার অভ্যাস মাদাম কুরী আয়ত্ব করলেন। যখন বাফেলোতে তাঁর আগমন-বার্তা ঘোষিত হলো, ততক্ষণে তিনি তার আগের স্টেশন নায়গ্রার বিখ্যাত জলপ্রপাত দেখতে নেমে গেছেন। অল্পসময়ের বিরতি। বাফেলোর অভ্যর্থনা-সমিতি মাদাম কুরীকে চাক্ষুষ দেখার আশা ছাড়লেন না। মোটরের স্রোত বয়ে চলল নায়গ্রা জলপ্রপাতের দিকে এবং সেখানে 'পলাতকা'র সন্ধান মিলল।

প্রথমে আইরিন ও ইভ মায়ের দেহরক্ষী হিসেবেই ছিল কিন্তু পরে নাটকীয় ভাষায় যাকে "ডাবল্" বলে তারা তাই হয়ে দাঁড়াল। ইউনিভারসিটি-গাউন পরে আইরিন মায়ের হয়ে অনরিস-কসা ডিগ্রি গ্রহণ করল। ষোড়শী ইভকে সম্বোধন ক'রে বক্তারা বৈজ্ঞানিকের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত বক্তৃতা দিলেন। তাঁর "চমৎকার কীর্তি," তাঁর "দীর্ঘ পরিশ্রমী জীবন" সম্বন্ধে আলোচনা

করেছেন। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত মিসেস মেলোনী তাঁর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ও প্রিয় বন্ধু হয়ে রইলেন।

এই অসাধারণ অভিযানের কোন কোন স্মৃতি মারীর মনে উজ্জ্বল হয়ে রইল। মার্কিন ইউনিভারসিটি-জীবন, উৎসবাদির অসীম আনন্দপ্রবাহ আর সবচেয়ে বড় কথা কলেজগুলিতে খেলাধুলো ও শরীরচর্চার অপূর্ব ব্যবস্থা তাকে মুগ্ধ করেছিল। মহিলা সঙ্ঘের যে অসীম ক্ষমতায় তাঁর দেশভ্রমণের রাজকীয় ব্যবস্থা হলো, তা দেখে তিনি অবাক হলেন। সবশেষে বিজ্ঞান-ল্যাবরেটারিগুলির নিখুঁত যন্ত্রপাতির আয়োজন, কুরী-থেরাপির সাহায্যে ক্যানসার চিকিৎসার ব্যবস্থাযুক্ত অসংখ্য হাসপাতাল দেখে তাঁর মনে ক্ষোভ জন্মাল। ভেবে দেখলেন ততদিনে—১৯২১ সালে—রেডিয়ম চিকিৎসার জন্যে ফ্রান্সে একটি হাসপাতালও গড়ে ওঠে নি!

যে রেডিয়মের জন্যে এতদূর আসা, সেটি তাঁরই সঙ্গে একই জাহাজে ক'রে চলল। এই রেডিয়ম-কণিকা মারী কুরীর জীবনের এক বিশেষ দিকে আলোকপাত করে। এই ছোট্ট কণাটুকু কেনার জন্যে এক মহাদেশ ব্যাপী ভিক্ষাঝুলির আয়োজন করতে হয়েছিল। বিভিন্ন শহরে সশরীরে উপস্থিত থেকে মারীকে ধন্যবাদ জানিয়ে আসতে হলো।

বহু বৎসর আগে সত্বাধিকারের দাবী জানিয়ে দলিলপত্রে একটা সই দিলে অনেক ভাল হতো কিনা, এ প্রশ্ন মনে কি তাঁর একবারও জাগে নি? যদি নিজের টাকা থাকতো, তবে মারী কুরী দেশে ল্যাবরেটারি আর হাসপাতাল স্থাপন করতে পারতেন কিনা? বিশ বৎসর ব্যাপী দীর্ঘ-সংগ্রামে জর্জরিত মারীর মনে কি কোনো দুঃখ নেই? সম্পদকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান ক'রে নিজের কাজের অগ্রগতির পথ অবাস্তব ক'রে তুলেছেন, এ কথা কি তার মনে একবারও জাগে নি?

আমেরিকা থেকে ফিরে এসে দিনপঞ্জীর কয়েকটি সংক্ষিপ্ত লেখায় মাদাম কুরী নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেছেন। উত্তরও নিজেই দিয়েছেন:

'আমার অনেক বন্ধুর বিশ্বাস—এবং তা বোধহয় অমূলক নয়—যে, পিয়ের কুরী আর আমি যদি আমাদের সত্ব দাবী ক'রে রাখতাম, তবে আজ অবধি আমার যে সব অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে, তেমন কোন অসুবিধায় না ঠেকে অনায়াসে আমরা মনের মতো রেডিয়ম ইনষ্টিটিউট গড়বার মতো যথেষ্ট আয় করতে পারতাম। যাই হোক, আজও আমার বিশ্বাস, আমরা ভুল করি নি।'

সংসারের মঙ্গলচিন্তা না ভুলে, নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়েও যাঁরা সবচেয়ে বেশী কাজ ক'রে যেতে পারেন, তেমন বাস্তববাদী মানুষের দরকার আছে বৈকি! কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে কোনো কাজে লেগে থেকে শুধুমাত্র তার চিন্তায় যাঁরা সাংসারিক লাভালাভের চিন্তা বিসর্জন দেন, তেমন স্বপ্নপ্রবণ মানুষেরও প্রয়োজন কম কিসে ?

নিঃসন্দেহে এটুকু বলা যায় যে এ ধরনের ত্বনিয়ার-বার মানুষের অর্থে প্রয়োজন নেই, কারণ অর্থ তাঁদের কাম্য নয়। সেইজন্যেই যে কোনও সুসংবদ্ধ সমাজের উচিত এই সব কর্মীদের কাজের উপযোগী অর্থের যোগান দেওয়া, যাতে তাঁরা সাংসারিক দায়মুক্ত হয়ে আজীবন গবেষণার পায়ে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারেন।

২৪

আমার মনে হয় আমেরিকার অভিযান থেকে মা কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। মা বুঝতে পেরেছিলেন, স্বেচ্ছালব্ধ নির্বাসনের ফল বিপরীত হয়। ছাত্র জীবন চিলে-কুঠরিতে বন্দী হয়ে পড়াশোনা করা, বা গবেষক হিসেবে সমসাময়িক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যক্তিগত সাধনায় মগ্ন হয়ে থাকার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু পঞ্চান্ন বছর বয়সে মাদাম কুরী যখন বিজ্ঞান জগতে এক নতুন ধারা, চিকিৎসার এক অভিনব পন্থা আবিষ্কারের প্রতীক হিসেবে গণ্য হয়েছেন, তখন বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপনের উপায় আর তাঁর নেই। এমন নামী তিনি হয়েছেন এখন যে, জনসাধারণের কল্যাণের জন্যে যে-কোন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তাঁর সামান্য ইঙ্গিত, শুধুমাত্র উপস্থিতি পর্যন্ত সাফল্য নির্দেশ করত। এখন থেকে তিনি এইসব সৎকার্যের জন্য নিজের জীবনে এক বিশেষ ব্রত গ্রহণ করলেন।

মারীর সবকটি অভিযানের গল্প ক'রে লাভ নেই, মোটামুটি সবই প্রায় এক ধরনের। বিজ্ঞান-কংগ্রেস, বক্তৃতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং ল্যাবরেটারি পরিদর্শন—এসব ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করতেন। বেশীর ভাগ সময়েই অনিশ্চিত স্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে তাঁকে যুদ্ধ করতে হতো।

সরকারি কর্তব্য শেষ করার পর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর প্রতি তিনি আকর্ষণ অনুভব করতেন। ত্রিশ বৎসর ব্যাপী কঠিন পরিশ্রম বিশ্বের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধার ভাব বহুল পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। ছোট্ট শান্ত ইতালীয় জাহাজ দক্ষিণ আতলান্তিক পার হবার সময়ে তিনি ছেলে-মানুষের মতো খুশি হয়ে উঠেছিলেন। সে সময়ে তিনি ইভকে লেখেন :

'কয়েকটি উড়ুক্কু মাছ আমাদের চোখে পড়েছে। দেখলাম আমাদের ছায়া ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেল, সূর্য মাথার ওপর চড়ে বসল। ধ্রুবতারা, কালপুরুষ এই সব পরিচিত নক্ষত্রদের দেখলাম সমুদ্রের তলায় তলিয়ে যেতে।

এখানকার আকাশে যে সব তারা দেখা যায়, তাদের বিষয় আমি বিশেষ কিছুই জানি না…'

আইরিনকে নিয়ে রায়ো-ডি-জেনেরিওতে বক্তৃতা দেবার জন্য চার সপ্তাহ কাটিয়ে এলেন,—মন্দ কাটে নি ছুটিটুকু। প্রত্যেকদিন সকাল বেলা ছদ্মবেশে উপসাগরে সাঁতার দিতেন; বিকেলে হেঁটে, মোটরে, এমনকি জলযানে চেপে বেড়াতে বেরোতেন।…

অনেকবার অনেক অনুষ্ঠানে তাকে ইতালী, হল্যাণ্ড আর ইংল্যাণ্ডে যেতে হয়েছিল। ১৯৩২-এ ইভকে নিয়ে স্পেনের সেই অবিস্মরণীয় যাত্রায় বেরিয়েছিলেন। তাঁরই মতো এক কৃষক প্রেসিডেণ্ট মাসারিক তাঁকে চেকোস্লোভাকিয়ায় নিজের দেশের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন। ব্রুসেল্‌সে প্রতি বছর সল্‌ভে-কংগ্রেসে যোগ দিতে যেতেন, সেখানের লোকেরা তাঁকে বিশিষ্টা প্রবাসিনী মনে না ক'রে প্রতিবেশী বন্ধুর মতো মনে করত। এই সব সভায় যাঁদের তিনি ''পদার্থবিদ্যার প্রেমিক" বলে আখ্যা দিয়েছিলেন, তাঁরা নতুন নতুন আবিষ্কার, নতুন সব পদ্ধতি নিয়ে আলোচন করতেন, সেইজন্য তাঁর খুব ভাল লাগত।

পৃথিবীর এমন কোনও অঞ্চল ছিল না যেখানে মারীর নাম পৌঁছয় নি। চীনদেশের এক প্রাচীন প্রাদেশিক রাজধানী তাইয়ান-ফুর কনফ্যুসিয়সের মন্দিরে দেশবিদেশের পণ্ডিতবর্গ—দেকার্তে, নিউটন, বুদ্ধ ও চীন সম্রাটের ছবির সঙ্গে "মানব জাতির মঙ্গল সাধকগণ"-এর মধ্যে মাদাম কুরীর ছবিও রাখা হয়েছিল।

১৯২২-এর ১৫ই মে লীগ-অব-নেশনস্‌-এর সদস্যদের সমবেত ভোটে মাদাম কুরী শক্লোদোভস্কাকে জ্ঞানী-সম্প্রদায়ের সভ্য হিসেবে নির্বাচন করা হয়। মাদাম কুরী শক্লোদোভস্কা এ সম্মানে সম্মানিত হতে সম্মত হলেন।

মারীর জীবনে এই দিনটির বিশেষ তাৎপর্য ছিল। যেদিন থেকে তাঁর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, সেদিন থেকে শত শত দাতব্য সংগঠন, সঙ্ঘ, প্রতিষ্ঠান তাঁর নাম নিজেদের মধ্যে টানার চেষ্টা করেছে, মারী তাতে একবারও রাজী হন নি। যেখানে কোন কাজের কাজ করতে পারবেন না, সেখানে শুধু নামে সভ্য হয়ে থাকতে তিনি চান নি। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা রক্ষা করতে চেষ্টা করতেন। কোন রকম রাজনৈতিক দলাদলির মধ্যে জড়িয়ে "বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক" নামের মর্যাদা

খোয়াড়ে তিনি রাজী ছিলেন না, এমন কি অত্যন্ত নির্বিরোধী ইস্তাহারেও সই দিতে তিনি রাজী হতেন না।

এই হিসেবে লীগ-অব-নেশনসে যোগ দেওয়ার বিশেষ অর্থ ছিল। এই সর্বপ্রথম তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণার বাইরে গেলেন।

আন্তর্জাতিক জ্ঞানী-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক গুণী মনীষীদের নাম পাওয়া যায়: বার্গসঁ, গিলবার্ট মারে, যুলে দেত্রে, এলবার্ট আইনস্টাইন, প্রফেসর লোরেনজ, পল পেনলেভে—এমনি আরও অনেকে। মারী ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ পেলেন। তিনি অনেকগুলি সুদক্ষ কর্মীসঙ্ঘের সভ্য ও পারীর জ্ঞানী-সম্প্রদায়-বিভাগের কর্তৃপক্ষদের মধ্যে একজন সভ্য হিসেবে নির্বাচিত হলেন।

যদি মনে করা হয় যে, সাধারণ ধারণার মিথ্যা বিড়ম্বনার মাঝে বাস্তব কর্মী মারী উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন, তবে ভুল করা হবে। মারী কুরী জেনেভাতেই কাজে লেগে গেলেন—এবং আরেকবার বিজ্ঞানের সেবা করতে সক্ষম হলেন।

দুনিয়ায় "বৈজ্ঞানিক কাজের রাজ্যে অরাজকতার" বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করেছিলেন এবং তাঁর সাথীদের কাছ থেকে কতকগুলি ব্যাপার পরিষ্কার ক'রে নিতে চেষ্টা করলেন। প্রশ্নগুলি শুনতে সহজ মনে হলেও তার ওপরেই জ্ঞানের প্রসার নির্ভর করে, যথা: আপন ক্ষেত্রে অন্যান্য কর্মীদের ফলাফলের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য আন্তর্জাতিক গ্রন্থ সমন্বয়; গবেষণাতত্ত্বের সমালোচনা-পত্রে ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদির ফর্মায় বৈজ্ঞানিক সাঙ্কেতিক চিহ্ন ও শব্দবিন্যাসের একতা এবং পদার্থের পরিমাণ জ্ঞাপক সংখ্যাগুলির তালিকা নির্ণয়।

বহুদিন পর্যন্ত ইউনিভারসিটি ও ল্যাবরেটারিগুলিতে শিক্ষকতার কাজে তাঁর অনেক সময় গেছে। তিনি এই শিক্ষাপদ্ধতি সংস্কার করতে চাইলেন। তিনি "পরিচালিত কার্যের" এক কর্মসূচীর বহুল প্রচার শুরু ক'রে দিলেন,—যার ফলে গবেষকদের সব চেষ্টার সমন্বয় হবে; পরিচালকদের মধ্যে যোগাযোগ থাকবে, ইউরোপ মহাদেশে এক প্রকৃত অধ্যাপক-গোষ্ঠী বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করবেন।

সারা জীবন ধরে একটি চিন্তা তাঁর মন ভারাক্রান্ত ক'রে রেখেছিল, এবং তা হলো অদৃষ্টের তাড়নায় কত শত প্রতিভা হেলায় নষ্ট হয়ে যায় তারই সমস্যা। হয়তো ঐ কৃষক, ঐ শ্রমিকের ভেতর সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক, চিত্রকর সঙ্গীতকার লুকিয়ে আছে···

মারী কাজ কর্ম কমিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। তিনি সর্বান্তঃকরণে

আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক ছাত্র প্রতিষ্ঠানের উন্নতি করে আত্মনিয়োগ করলেন।

'সমাজ কি চায়?' (একখানা রিপোর্টে তিনি প্রশ্ন করেন:) 'বৈজ্ঞানিক কীর্তি কলাপের উন্নতি-সাধনকে সমর্থন করাই কি তার কর্তব্য নয়? তা যদি হয়, তবে এ বিষয়ে যে সব সুবিধে পাওয়া যাচ্ছে, তাদের বিসর্জন দেবার মতো সম্পদ কি সমাজের আছে? বরং আমার মনে হয়, প্রকৃত বিজ্ঞান সাধনার জন্য যে জাতীয় চারিত্রিক গুণাবলীর প্রয়োজন, তা এতই অমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য সম্পদ যে, তাকে হারানো শুধু অন্যায় নয়, অচিন্তনীয়; সেদিকে সযত্ন দৃষ্টি রেখে তাকে ফলবতী হবার সকল সুযোগ দেওয়া কর্তব্য।'

সর্বশেষে একটি বিপরীত ব্যাপার ঘটল। যে পদার্থবিদ্ সবরকম পার্থিব লাভ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন, তিনি আজ তাঁর বন্ধুদের জন্যে "বৈজ্ঞানিক সম্পদের" শ্রেষ্ঠ উদ্যোক্তা হয়ে দাঁড়ালেন; ব্যবসায়িক সুবিধার ভিত্তিস্বরূপ এই নিঃস্বার্থ কাজের পুরস্কার হিসেবে তিনি বৈজ্ঞানিকদের জন্য গ্রন্থস্বত্বের দাবী করলেন। এই উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের লাভ থেকে সাহায্য নিয়ে ল্যাবরেটারিগুলির দুর্দশা দূর করার স্বপ্ন দেখলেন তিনি।

একবার "কৃষ্টির ভবিষ্যৎ" সম্বন্ধে এক বিতর্কে সভাপতিত্ব করার জন্য তিনি মাদ্রিদে যান। ১৯৩৩-এ এই একটি বার শুধু তিনি বিজ্ঞানের উন্নতির কাজ থেকে ছুটি নেন। সেখানে সব দেশের সাহিত্যিক ও শিল্পীরা মিলিত হয়েছিলেন; এই সভার উদ্যোক্তা পল ভ্যালেরি এঁদের "কাল্পনিক শত্রুর সহিত যুদ্ধরত জন কুইকজোটের আত্মা" এই নাম দিয়েছিলেন। বিনয়ের সঙ্গে কর্তৃত্ব এবং সেই সঙ্গে মধ্যস্থতার ভূমিকার মধ্য দিয়ে তিনি সকলের বিস্ময় উদ্রেক করলেন। এখানে দেখা গেল কংগ্রেসের ভীত সভ্যরা বিশেষজ্ঞ হওয়া এবং বিজ্ঞানকে মানের উপযোগী করাকে নিন্দাবাদ করলেন এবং পৃথিবীতে "সংস্কৃতির সমূহ বিপত্তি"র জন্য বিজ্ঞানকে কতকাংশে দায়ী করলেন। এখানে আবার আমরা দেখি সকল যোদ্ধার মধ্যে মাদাম কুরীকে পরম দুঃসাহসিকতা ও অদম্য উৎসাহভরে সেই পুরোনো দিনের আবেগ নিয়ে সবচেয়ে বেশী দৃঢ়তার সঙ্গে বিজ্ঞানের মর্যাদা রক্ষা করতে উদ্যত হয়েছেন।

(তিনি বললেন:) 'বিজ্ঞানের অপূর্ব সৌন্দর্যে যাদের আস্থা আছে, আমি হলেম তাদেরই একজন। ল্যাবরেটারিতে যখন একজন বৈজ্ঞানিক কাজ করেন তখন তিনি শুধু শিল্পী নন, শিশু যেমন রূপকথায় ডুবে থাকে, তেমনি

পরিদৃশ্যমান জগতকে নিয়ে ডুবে থাকেন, তিনি যেন এক মহাশিশু। যদিও যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, মোটরের গিয়ারিং ইত্যাদিরও নিজস্ব সৌন্দর্য আছে তবু একথা বিশ্বাস করা উচিত নয় যে, সবরকম বৈজ্ঞানিক-প্রগতিই যন্ত্রের মধ্যে সমাপ্তি লাভ করবে।

'দুঃসাহসিক অভিযানের প্রবৃত্তি আমাদের পৃথিবী থেকে আজও মরে যায় নি। যখনই আমার আশেপাশে কোন শক্তি চোখে পড়ে, তখনই সেই অবিনাশী দুঃসাহসী প্রবৃত্তি, যা কৌতূহলের গা ঘেঁসে চলে, তার দেখা পাই...'

বিভিন্ন জাতীয় কৃষ্টির প্রতি আস্থা রেখে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির জন্য সংগ্রাম; যেখানেই ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা চোখে পড়ে সেখানেই তাদের রক্ষা করার চেষ্টা; জগতে বিজ্ঞান-শক্তির পুষ্টিসাধন; "নৈতিক নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তির জন্য সংগ্রাম"—মাদাম কুরী এই ধরনের দ্বন্দ্বযুদ্ধে মেতে উঠলেন। অবশ্য অনায়াসে জয় হবে, এ আশা তাঁর ছিল না।

১৯২৯-এর জুলাই মাস, মারী কুরী কন্যা ইভ কুরীকে লেখেন:

'আন্তর্জাতিক কাজ যে যথেষ্ট কঠিন সে-কথা মানি, তা সত্বেও যথেষ্ট চেষ্টা করতে হবে; প্রকৃত নিঃস্বার্থ মন নিয়ে একাজে শিক্ষানবিশী করারও বিশেষ প্রয়োজন আছে। যতই অসম্পূর্ণ হোক্ না কেন, জেনেভার প্রচেষ্টায় যে মহত্ব আছে, তাকে সমর্থন করা দরকার।'

মাদাম কুরী তিন চারবার পোল্যাণ্ডে ঘুরে এলেন।

নিজের আত্মীয়-স্বজনের কাছে মনের ভার হাল্‌কা করার আশায় বা বিশ্রামের জন্য মাদাম কুরী দেশে ফেরেন নি। আজ তাঁর মাতৃভূমি আবার স্বাধীন হয়েছে। মারীর মাথায় এক চমৎকার পরিকল্পনা খেলে বেড়াচ্ছে; তাঁর ইচ্ছে যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও ক্যানসার চিকিৎসার জন্য ওয়ারস'য় একটি রেডিয়ম ইনস্টিটিউট খোলা হয়। শুধু মাত্র নিজের জেদ দিয়েই সব বাধা জয় করার উপায় ছিল না। বহুদিন দাসত্বের ফলে পোল্যাণ্ড অত্যন্ত দরিদ্র দেশ, অর্থাভাবের সঙ্গে শিল্পীরও অভাব রয়েছে সেখানে। আর মারীর নিজের হাতেও সব বন্দোবস্ত করা বা যথেষ্ট টাকা জোগাড় করার সময় ছিল না।

প্রথম তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন যিনি তাঁর নাম করা বাহুল্য মাত্র। বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত কিন্তু ত্রিশ বছর আগের মতোই উৎসাহী, কর্মঠ

রনিয়া সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে লাগলেন। একাধারে তিনি হলেন শিল্পী, সহকারী ও কোষাধ্যক্ষ। সারা গ্রামাঞ্চল মারীর মুখের ছবি দেওয়া টিকিট আঁটা প্রাচীরপত্রে ছেয়ে গেল। অর্থ সাহায্য—না, বরং ইট ভিক্ষার ধূম পড়ে গেল; "মারী শক্লোদোভস্কা" কুরী ইনস্টিটিউটের জন্য ইট কিনুন!" হাজার হাজার পোস্টকার্ডে বৈজ্ঞানিকের অনুরোধ ঘোষিত হলো: "আমার একান্ত ইচ্ছা যে, ওয়ারস'য় রেডিয়ম্ ইন্‌স্টিটিউট তৈরি হয়—।" সরকারের তরফ থেকে ওয়ার্‌স শহরের ভেতর এবং বড় বড় পোলদেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে এই উদ্যোগে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গেল। ইটের ভাণ্ডার বেড়ে চল্‌ল… ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মারী এই বাড়ির ভিত্তি স্থাপন করতে ওয়ার্‌স'য় এলেন। অতীতের স্মৃতি আর ভবিষ্যতের আশায়-ভরা এ যেন এক বিজয়িনীর যাত্রা।

একজন বক্তা তাঁর নাম দিলেন: 'আমাদের মহৎ প্রতিষ্ঠান পোল-গণতন্ত্রের প্রথম সেবিকা,'—একটি সমগ্রজাতি আবেগভরে যাঁর সঙ্গে চলেছে। সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষানিকেতন ও বড় বড় শহর তাঁকে শ্রেষ্ঠ সম্মানিত উপাধিতে ভূষিত করলেন। এক রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতে রাষ্ট্রপতি ইনস্টিটিউটের প্রথম ভিত্তি প্রস্তর, মাদাম কুরী দ্বিতীয় ও ওয়ার্‌স'র প্রধান নাগরিক তৃতীয় প্রস্তরখানি স্থাপন করলেন।

এইসব অনুষ্ঠানে সরকারী নিয়মকানুনের বাধানিষেধের বালাই ছিল না। রাষ্ট্রপতি স্তানিস্লাফ্‌ ওয়োজসিচোভস্কি—এতকাল দেশের বাইরে থাকার পরেও মাদাম কুরী এমন শুদ্ধ মাতৃভাষায় কথা বলছেন শুনে যে বিস্ময় প্রকাশ করলেন, সে শুধু ভদ্রতার খাতিরেই নয়। তিনি পারীতে মাদমোয়াজেল শক্লোদোভস্কা'র বন্ধু ছিলেন; তাঁদের মধ্যে একটার পর একটা পুরোনো দিনের আলোচনা চলল। রাষ্ট্রপতি মারীকে বললেন: 'তোমার মনে আছে, তেত্রিশ বছর আগে আমি কি এক গোপনীয় কাজে পোল্যাণ্ডে ফিরে আসি, তখন তুমি আমায় একখানা কুশন পথে ব্যবহার করতে দিয়েছিলে? সেটা আমার খুব কাজে লেগেছিল।'

মারী হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন: 'আমার আরেকটু বেশীই মনে আছে। তুমি সেটিকে আর ফেরৎ দাও নি!'

অতি প্রবীণ, প্রখ্যাত ম'সিয়ে কোটারবিন্‌স্কি পোল্যাণ্ড থিয়েটারের অত্যধিক জনাকীর্ণ মঞ্চ থেকে মাদাম কুরীকে সম্বর্ধনা জানিয়ে ভাষণ দিলেন।

বছরের পর বছর ঘুরে গেল; ইট থেকে প্রাচীর উঠল। মারী ও ব্রনিয়ার কাজ শেষ হতে তখনও অনেক বাকী রয়ে গেল। দু'জনেই নিজেদের সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশ এই ইনস্টিটিউটের জন্য খরচ করলেন, তবু টাকার অভাবে ক্যানসার চিকিৎসা শুরু করার জন্য রেডিয়ম কেনা বাকী রইল।

মারী মনের জোর হারালেন না, চারিদিকে তাকিয়ে তিনি আবার পশ্চিমে ইউনাইটেড্ স্টেটস্-এর দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। একবার যেখান থেকে অমূল্য সাহায্য পেয়েছিলেন, সেখানে—মিসেস্ মেলোনীর দিকে—আবার তিনি হাত বাড়ালেন। এই সদাশয় মার্কিন মহিলা জানতেন যে, ওয়ার্স'র এই ল্যাবরেটারি মারীর নিজের ল্যাবরেটারির মতোই প্রিয়। তিনি আবার এক অদ্ভুত ব্যাপার করলেন, আবার রেডিয়ম কেনার টাকা জোগাড় করলেন,—এটি আমেরিকার তরফ থেকে মাদাম কুরীকে দ্বিতীয় গ্রাম রেডিয়ম প্রদান। ১৯২১-এর ঘটনা সমূহের পুনরাবৃত্তি হলো; ১৯২৯-এর অক্টোবর মাসে মারী এবার পোল্যাণ্ডের তরফ থেকে আমেরিকাকে ধন্যবাদ জানাতে জাহাজে চললেন। ১৯২১-এর মতোই তাঁকে আবার সম্মানে সম্মানে ছেয়ে ফেলা হলো। এ যাত্রায় তিনি রাষ্ট্রপতি হুভারের অতিথি হয়ে বেশ কিছু দিন হোয়াইট্ হাউসে ছিলেন। (এইসময়ে ইভকে তিনি লেখেন:) 'আমাকে ছোট্ট সুন্দর একখানি হাতির দাঁতের তৈরি হাতি উপহার দিয়েছেন, আরেকখানা আরও ছোট। এই জন্তুটি হলো রিপাবলিকান পার্টির প্রতীক, হোয়াইট হাউসের সর্বত্র নানা মাপের একা কিংবা দলবল সহ হাতির ছড়োছড়ি দেখতে পাচ্ছি।'

অর্থ সমস্যায় বিপন্ন আমেরিকাকে এবার ১৯২১ খৃষ্টাব্দের তুলনায় বেশী গম্ভীর দেখাল, কিন্তু তার অভ্যর্থনায় আন্তরিকতার কিছুমাত্র অভাব দেখা গেল না। জন্মদিনে অজানা, অচেনা বন্ধুদের কাছ থেকে প্রচুর উপহার এল,—ফুল, বই আরও অন্যান্য নানা ধরনের উপহার, ল্যাবরেটারির উদ্দেশ্যে চেক্, এমনকি পদার্থবিদদের প্রেরিত গ্যাল্ভ্যানোমিটর, 'র‍্যাডন্'ভরা কয়েকটি শিশি, কয়েক শ্রেণীর দুষ্প্রাপ্য মাটির নমুনা। ফিরে আসার আগে মিস্টার ওয়েন্. ডি. ইয়ং তাকে সেণ্টলরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে গেলেন; সেখানে সদর দরজার ওপর মাদাম কুরীর সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি খোদাই করা হয়েছে। এডিসনের জুবিলি অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন তিনি: প্রতিটি ভাষণ, এমনকি

দক্ষিণ মেরু থেকে কমাণ্ডার বেয়ার্ড যে পত্র পাঠিয়েছিলেন, তার মধ্যেও তাঁর প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করা ছিল।

১৯৩২-এর ২৯শে মে মারী কুরী, ব্রনিয়া দ্লুস্কা ও পোল সরকারের সমবেত প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করল। মাদাম কুরী, রাসায়নিক গবেষণার সহচর অধ্যাপক রেগে, বন্ধু রাষ্ট্রপতি মোসিকির উপস্থিতিতে ওয়ারস'র বিরাট রেডিয়ম ভবনের দ্বার উন্মোচন হলো। ব্রনিয়ায় সুরুচি বোধের ফলে বাড়িটি বিস্তৃত ও সুসমঞ্জস আকারে গঠিত হয়েছিল। ইতিমধ্যেই কুরী-থেরাপি পদ্ধতিতে চিকিৎসার জন্য এখানে রোগী আসতে আরম্ভ করেছিল।

মারীর এই শেষবার পোল্যাণ্ডে আসা। এই শহারের পথঘাট, ভিশ্চুলা নদী—যখনই তিনি এখানে আসেন, তীব্রভাবে তাঁকে আকর্ষণ করে। কনিষ্ঠা কন্যা ইভের কাছে চিঠিতে বার বার এই নদীর কথা তিনি লিখেছেন:

'গতকাল সকালে একা একা ভিশ্চুলা নদীতীরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বিরাট বিস্তৃতির ওপর দিয়ে নদীটি অলসভাবে মোড় খেয়ে গেছে… তীরের দিকে সবজে নীল রেখা দেখা যায়। খামখেয়ালী আঁকা বাঁকা জলের পাড় দিয়ে অপূর্ব বালুকাবেলা সূর্যের আলোয় ঝল্‌মল্ করে। এই সব তীরভূমির প্রান্তে উজ্জ্বল আলোর সূক্ষ্মরেখা দেখে গভীরতর জলের সীমানার নির্দেশ পাওয়া যায়। এমন একটি উজ্জ্বল চমৎকার নদী তীরে আপনমনে ঘুরে বেড়াবার অদম্য ইচ্ছা মনের মধ্যে বার বার জাগে। আমার নদীর এই চপলতা কোন আত্মসচেতন নাব্য জলরাশির উপযুক্ত নয় একথা আমি স্বীকার করি। এমন একদিন আসবে, যেদিন সৌন্দর্য খর্ব করেও এর খামখেয়ালিপনা ঘোচাবার প্রয়োজন হবে।

'ভিশ্চুলা সম্বন্ধে একটি গান আছে, যার অর্থ হলো "পোলদেশের এই জলরাশির সৌন্দর্যে একবার যে পাগল হয়েছে, কবরে গিয়েও তার সে প্রেম অক্ষুণ্ণ থাকবে,"—আমার সম্বন্ধে একথা ধ্রুব সত্য। এ আমায় এমন ক'রে টানে যে, তার কোন কারণ আমি খুঁজে পাই না।

'আজ তবে আসি, মানিক আমার! আমার হয়ে আইরিন দিদিকে চুমু দিও। আমার অন্তর জুড়ে তোমরাই আছ। তোমাদের দু'জনকে আমার স্নেহের আলিঙ্গনে জড়িয়ে রাখি।

তোমাদের মা।'

ফ্রান্সে…

রেডিয়ম ইন্সটিটিউটের বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসার কাজে সাহায্য করার জন্য দান এবং চাঁদার ভাণ্ডার হিসেবে ব্যারন আঁরী-ভ-রথস্‌চাইল্ডের উদ্যোগে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে 'কুরী-ফাউণ্ডেশন্' নামে এক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে চিকিৎসা-আকাদেমির পঁয়ত্রিশ জন সভ্য তাঁদের সহকর্মীদের কাছে নিম্নলিখিত আবেদন পাঠালেন :

'আকাদেমির নিম্নোক্ত সভ্যরা মনে করেন যে, রেডিয়ম-তথা কুরী-থেরাপি-খ্যাত চিকিৎসার অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কারের পুরস্কার স্বরূপ মাদাম কুরীকে স্বাধীন সহকর্মী সভ্যা পদে সম্মানিত করা কর্তব্য।'

এটি সত্যই এক যুগান্তকারী দলিল। এর দ্বারা শুধু যে একজন মহিলাকে আকাদেমিতে আসন দেবার প্রস্তাব হয়েছে তাই নয়, আকাদেমিতে সভ্যপদ প্রার্থীদের চিরাচরিত নির্বাচনের রীতি লঙ্ঘন ক'রে তাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আহ্বান করা হলো। চৌষট্টি জন সভ্য সোৎসাহে এই দলিলে স্বাক্ষর দিলেন। এইভাবে আকাদেমির বিজ্ঞান-বিভাগের ভাইবেরাদারদের যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হলো। শূন্য আসনে মাদাম কুরীর অধিকার জ্ঞানে আর কেউ প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ালেন না। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী নির্বাচন কার্য সমাধা হলো। আকাদেমির সভাপতি ম'সিয়ে চশার্দ বক্তৃতামঞ্চ থেকে মাদাম কুরীকে সম্বোধন করলেন : 'আপনার মধ্যে যে বিরাট বৈজ্ঞানিক, যে মহীয়সী নারী, কর্মজীবনে, বিজ্ঞানসাধনায়, কি যুদ্ধে, কি শান্তিতে সর্বদাই স্বীয় কর্তব্যের অনেক বেশী কাজ করেছেন, তাঁকে আমাদের নমস্কার জানাই। এখানে আপনার উপস্থিতিতে নামের গৌরবের সঙ্গে নৈতিক উৎকর্ষের উদাহরণ স্বরূপ আপনাকে আমরা পেয়েছি। আমাদের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আপনার আগমনে আমরা গর্বিত। ফ্রান্সের আকাদেমিতে নারীর এই প্রথম পদক্ষেপ, কিন্তু এমন উপযুক্ত রমণী আর কে দেখেছে?'

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কুরী-ফাউণ্ডেশন্ রেডিয়ম আবিষ্কারের পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হবার উৎসব করবে বলে স্থির করল। সরকার থেকে এ উদ্যোগের সমর্থন এল এবং সমবেত ভোটের দ্বারা লোকসভার মাধ্যমে এক আইন পাশ করা হলো যা দ্বারা "জাতীয় ক্ষতিপূরণ" হিসেবে মাদাম কুরীকে বছরে চল্লিশ হাজার ফ্রাঙ্ক বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা হলো এবং ভবিষ্যতে আইরিন ও ইভ এই বৃত্তির উত্তরাধিকার পাবে এমন কথাও স্থির হয়ে গেল।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞান আকাদেমির যে অধিবেশনে মাদাম কুরী, পিয়ের কুরী ও জি বেমোঁর সকলিত সুপ্রসিদ্ধ প্রবন্ধ : "পিচব্লেণ্ডে অবস্থিত এক শক্তিশালী ও অভিনব রেডিও-এ্যাকটিভ উপাদান" পাঠ করা হয়েছিল, তার পঁচিশ বছর পরে এক বিশাল জনতা সরবনের গ্যালারি-ঘরে উপস্থিত হলো। ফ্রান্সের এবং বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়, বহু বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান, নাগরিক ও সৈনিক বিভাগের কর্তৃপক্ষ, বহু উচ্চ বিদ্যালয় ও ছাত্র-প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদপত্রগুলির তরফ থেকে প্রতিনিধি পাঠানো হলো। বক্তৃতা মঞ্চে বসলেন রাষ্ট্রপতি আলেক্সাঁদর মিলের, শিক্ষাবিভাগের সভাপতি লিওঁ বেরার্দ, আকাদেমির আচার্য ও কুরী-ফাউণ্ডেশনের সভাপতি পোল আপ্পেল, বিদেশী বৈজ্ঞানিকদের তরফ থেকে বক্তা ডক্টর আঁতোয়ান বেক্লেয়ার।

এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝে জনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে দুইজন প্রৌঢ়া রমণীকে চোখের জল মুছতে দেখা গেল। ওয়ারস থেকে হেলা, ব্রনিয়া ও যোসেফ এসেছেন তাঁদের মানিয়ার বিজয় উৎসবে যোগ দিতে। শক্লোদোভস্কি পরিবারের সর্ব কনিষ্ঠার ওপর যশের ধারা বর্ষিত হয়েছে, তাতে ভাই-বোনেরা আনন্দাপ্লুত। আবেগে, গর্বে এত উজ্জল তাঁদের আর কখনও দেখা যায় নি।

কুরী-পরিবারের বন্ধু আঁদ্রে দ্যবিয়েরন রেডিও-এ্যাকটিভ পদার্থ সম্বন্ধে তাঁদের আবিষ্কারের ওপর প্রবন্ধ পাঠ করলেন। রেডিয়ম ইনষ্টিটিউটের প্রধান কর্মী ফার্নাণ্ড হলওয়েক আইরিন কুরীর সাহায্যে রেডিয়মের কয়েক রকম পরীক্ষা ক'রে দেখালেন। রাষ্ট্রপতি মারী কুরীকে "তাঁর প্রতি বিশ্বব্যাপী উচ্ছ্বসিত আবেগ, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার যৎসামান্য কিন্তু আন্তরিক নিদর্শন স্বরূপ" জাতীয় পেনসনের প্রস্তাব করলেন। লিওঁ বেরার্দ ঘোষণা করলেন যে, এই প্রস্তাব—যাতে সারা ফ্রান্সের প্রতিনিধিদের সই আছে, তাকে আইনসঙ্গত ও কার্যকরী করার জন্য সরকার এবং দুটি হাউস মাদাম কুরীর বিনয় ও ঔদাসীন্য অগ্রাহ্য করতে মনস্থ করেছেন।

সবশেষে অবিরাম অভিনন্দনের ভেতর মাদাম কুরী উঠে দাঁড়িয়ে প্রতি-নমস্কার জানালেন। যাঁরা তাঁকে এই উপহার দিয়েছেন, সংযত স্বরে তাঁদের প্রত্যেকের নাম ধরে ধন্যবাদ দিলেন। যে মানুষটি আজ অনুপস্থিত, সেই পিয়ের কুরীর কথা তুললেন। তারপর এল ভবিষ্যতের কথা, নিজের সংক্ষিপ্ত ভবিষ্যৎ নয়; রেডিয়ম ইনষ্টিটিউটের ভবিষ্যতের জন্য তিনি আবেগ কম্পিত কণ্ঠে সকলের কাছে সাহায্য ও ভরসা চাইলেন।

জীবনের সায়াহ্নকালে আমরা মাদাম কুরীকে ডজনের ভিড়ের মধ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রপতি, সম্রাট ও সর্বদেশের রাজন্যবর্গের কাছ থেকে বারবার আমন্ত্রণ পেতে দেখেছি।

এইসব উৎসব আয়োজন, জনসমাগম ও সর্বদা একই রকম রক্তচ্ছটাহীন, ভাবলেশহীন, প্রায় উদাসীন আমার মা'র মুখের ছবিখানি আমার স্মৃতিপটে স্পষ্ট আঁকা আছে।

নিজে তিনি এতটুকু বদলান নি, ভিড়ের ভয়ে তাঁর হাত ঠাণ্ডা হতো, গলা শুকিয়ে যেত, সবচেয়ে বড় কথা এই যে, অহঙ্কার তাঁকে স্পর্শ করত না, যথেষ্ট চেষ্টা করেও মাদাম যশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলেন না। তাঁর ভাষায় "অন্ধভক্তি"র কোন প্রকাশ তিনি সইতে পারতেন না।

(একবার বিদেশ থেকে আমায় লেখেন:) 'তোমাদের দু'জনের থেকে বহুদূরে চলে এসেছি এবং যে ধরনের আতিশয্য আমার মোটে বরদাস্ত হয় না, তার সম্মুখীন হতে হয়েছে বলে মনটা সকাল থেকে ভার হয়ে আছে।

'আমার সঙ্গে একই ট্রেনে মুষ্টিযোদ্ধা ডেমপসিও আসছিলেন। ভদ্রলোক বার্লিনে নামতে স্টেশন-প্লাটফর্মে প্রচণ্ড ভিড় হৈ হৈ শব্দে ফেটে পড়ল। তাঁকে দেখে বেশ পরিতৃপ্ত মনে হলো। বাস্তবিক ডেমপসিকে সম্বর্ধনা করা আর আমাকে সম্বর্ধনা করার মধ্যে আদতে তফাৎ কোথায়? আমার মনে হয় এই উচ্ছ্বাসের পেছনে উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন, এ ধরনের হল্লা ক'রে কাউকে মাথায় তোলার মধ্যে গৌরব নেই। অথচ এও বুঝি না ঠিক কি ভাবে এগোলে ভাল হয়, বা ব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধে দুনিয়া কি ধারণা পোষণ করে সে-কথা তাকে জানাবার রাস্তাই বা কি হওয়া উচিত...'

বয়স বেড়ে চলেছে, এদিকে ভেতরের সেই চিরদিনের ব্যাকুল ছাত্রী তো তেমনি সজাগই আছে; এমন যে নারী তাঁর কাছে পঁচিশ বছরের পুরোনো আবিষ্কারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কতদিন ভাল লাগতে পারে? খ্যাতি তো মানুষের অনেক কিছুর অকালমৃত্যু ঘটায়। তার বিরুদ্ধে তাঁর মনোভাব নৈরাশ্যব্যঞ্জক কথার ভেতর দিয়ে ঝরে পড়তে লাগল। মাঝে মাঝে বলতেন: 'যখন ওরা আমার "অপূর্ব কীর্তির" কথা আলোচনা করে, তখন মনে হয় আমি বুঝি মরেই গেছি; আমি যেন নেই—আমার মৃতদেহের দিকে আমি যেন চেয়ে আছি!' তারপর বিরক্তিমাখা স্বরে বলতেন: 'আমার যারা এখনও যে কাজ

সম্ভব তার প্রতি ওদের বিশেষ কৌতূহল নেই, আমি মরে গেলে ওরা আরও সহজে আমার গুণগান করতে পারে।'

আমার বিশ্বাস তাঁর এই অতৃপ্তি, তাঁর এই প্রত্যাখ্যান যেন আরও বেশী ক'রে জনসাধারণকে সম্মোহিত করেছিল। জনপ্রিয় "তারকা"বৃন্দ, রাজনীতি-বিদ সম্রাট, মঞ্চ বা পর্দার অভিনেতা, অভিনেতৃ—এঁরা সকলেই প্ল্যাটফর্মে পা দেওয়া মাত্র ভক্তদের জালের মধ্যে স্বেচ্ছায় গা ঢেলে দেন, কিন্তু মারী যে সব অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন, সেখানে তিনি আতিশয্যের হাত থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতেন।

অনেক বেশী অমায়িক, সুন্দর ও প্রসিদ্ধ বহু ব্যক্তি পৃথিবীতে মাদাম কুরীর চেয়ে হয়তো বেশী সম্মান পেয়েছেন, কিন্তু কেউই বোধহয় এমন স্তব্ধ, বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন মুখ দুনিয়ার সামনে তুলে ধরেন নি। অভিনন্দন-প্রবাহের মাঝে কাউকে বোধ হয় এমন নিঃসঙ্গ মনে হয় নি।

২৫

কোন বিশেষ ভ্রমণপর্ব শেষ ক'রে মারী যখন বাড়ি ফিরতেন, তখন তাঁর মেয়েদের মধ্যে একজন স্টেশন-প্লাটফর্মে তাঁকে আনতে যেত। ওয়াগান-দ-লুক্সের জানলায় মাদাম কুরীর সেই ব্যস্তসমস্ত, শীর্ণ চেহারার প্রতীক্ষায় থাকত···জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মারীর সেই চেহারাই রয়ে গেল। বহুদিন আগে পোলদেশীয় মহিলা-প্রতিষ্ঠান থেকে যে খয়েরী রঙের হাতব্যাগ-খানা মারী পেয়েছিলেন, সেটিকে হাতের ভেতর শক্ত ক'রে ধরে থাকতেন। কাগজপত্র, সরকারি দলিল এবং চশমার খাপে ব্যাগটি বোঝাই হয়ে থাকত। পথে আসতে আসতে কেউ হয়তো অতি সাধারণ ফুল দিয়েছে, সেগুলি শুকিয়ে গেলেও কনুইয়ের ভাঁজের মধ্যে ধরে রাখতেন; বহন করবার যতই অসুবিধা হোক না কেন, ফেলে দেবার ইচ্ছে তাঁর হতো না। জিনিসপত্র নামিয়ে, হালকা হয়ে বৈজ্ঞানিক তরতর করে ইল্‌-সাঁ-লুসে তাঁর লিফ্‌ট্‌ বিহীন তিনতলা বাড়িতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতেন, যতক্ষণ তিনি চিঠিপত্র পড়তেন, ইভ ততক্ষণে তাঁর সামনে মেঝের ওপর বসে ব্যাগ খুলে জিনিসপত্র ঠিক ক'রে রাখত।

পরিচিত জামাকাপড়, ভেল্‌ভেট্‌ আর সিল্কের টুপির ভেতর থেকে নতুন, নতুন বে-সরকারী উপাধি, চামড়ার বাক্সের ভেতর থেকে মেডেল, পার্চমেণ্ট কাগজের মোড়ক আর অতি যত্নে সংরক্ষিত মারীর নিমন্ত্রণাদির খাদ্য-তালিকা উদ্ধার করত। শক্ত কার্ডবোর্ডে তৈরি এই খাদ্য-তালিকাগুলিতে অঙ্কের হিসেব কষতে ভারি সুবিধা হতো।

সবশেষে টিস্যু কাগজ খোলার খস্‌খসানি শব্দে বোঝা যেত এতক্ষণে আইরিন ও ইভের জন্য মা'য়ের আনা উপহার হাতে উঠেছে। অতি সাধারণ অথচ চমৎকার দেখে তিনি কিছু না কিছু নিয়ে আসতেন মেয়েদের জন্য।

প্রস্তরীভূত কাঠের টুকরো টেক্সাস্‌ থেকে বয়ে এনেছেন, দিব্যি কাগজ-চাপা হবে; হয়তো বা টলেডো থেকে খোদাই কাজ করা ধাতব ফলা বইয়ের পাতা কাটবার জন্য নিয়ে এসেছেন।

পোলদেশী পাহাড়ীদের হাতে বোনা খস্‌খসে পশমের ছোট ছোট কার্পেট এনে টেবিলে পেতে দিলেন। গ্রাণ্ড কেনিয়ন থেকে আনা ছোট্ট ছোট্ট গহনা মারী কালো ব্লাউসের গলার কাছে পরতেন ; রূপোর তৈরি এই অমসৃণ গহনা-গুলোর ওপর রেড ইণ্ডিয়ানরা বিদ্যুতের মতো আঁকা বাঁকা রেখা খোদাই করতো—কাপড়ে আঁটকাবার জায়গায় একখানা গোমেদের আংটা ছিল, তারের কাজ করা একখানা সোনার হার, একটা অতি পুরোনো পদ্মরাগ মনির ব্রুচ্‌— এই ছিল আমার মা'র সমগ্র গহনার সঞ্চয়। সব শুদ্ধ বেচে দিলে তিনশ' ফ্রাঙ্ক পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ।

কে-দ্য-বেতুনের যে বাড়িতে মাদাম কুরী বাইশটি বছর কাটালেন, সেটি যথেষ্ট বড় হলেও, বিশেষ সুবিধের ছিল না : অনেকগুলি করিডোর ও আভ্য-ন্তরীণ সিঁড়ি থাকায় সপরিবারে বাস করার পক্ষে অসুবিধা ছিল। চতুর্দশ লুইয়ের সময়ে তৈরি বাড়িখানা মানানসই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আরামকেদারা এবং সোফা ইত্যাদির জন্যে বৃথাই কেঁদে মরত। ঠাকুরদাদার কছে থেকে পাওয়া মেহগনি কাঠের আসবাবগুলো মস্তবড় বৈঠকখানায় যেমন তেমন ক'রে বিছিন্নভাবে পড়ে থাকত। ঘরখানায় জনা পঞ্চাশ লোক অনায়াসে বসতে পারে অথচ ক্বচিৎ কদাচিৎ চারজনের বেশী লোক এ ঘরে দেখা যেত। চমৎকার পালিশ করা দামী কাঠের মেঝে, এঘরে না ছিল কার্পেট, না পর্দা : প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দরজার কাঠের পাল্লা কোন সময়েই বন্ধ করা হতো না, পাতলা পর্দা শুধু ঝুলতো। চক্‌চকে মেঝে, খোলা কাঁচের জানালা, সূর্যের এক রশ্মি আলোও তাঁর কাছ থেকে চুরি করতে না পারে, এইছিল মা'র লক্ষ্য। সীন নদী, সামনের জেটিগুলো, মহানগরীর পরিপূর্ণ মনোহারিণী দৃশ্য তিনি উপভোগ করতেন।

বহুবৎসর পর্যন্ত নিজের জন্য একখানি সুন্দর আশ্রয় গড়তে পারেন নি। এখন সে-ইচ্ছেও আর নেই। তাছাড়া নিজের চারপাশে অনাড়ম্বর যে-পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন, তা পরিবর্তন করার মতো সময়ও তাঁর হাতে ছিল না। যাইহোক, বাইরে থেকে ভাল ভাল উপহার এসে শূন্য ঘরগুলো ভরিয়ে ফেলত। কোন ভক্ত হয়তো মাদাম কুরীকে জলরঙে ফুলের ছবি এঁকে পাঠাল ; কারখানার সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে ভাল নীল আলোর আভাযুক্ত ফুলদানি কোপেনহেগেন থেকে কে পাঠিয়ে দিল ; রুমানিয়াতে তৈরি একখানা সবজে-খয়েরিতে মেশানো কাপ, একখানা জমকালো কাজ-

করা রূপোর ফুলদানি এল। একটিমাত্র জিনিস মাদাম কুরী দাম দিয়ে কিনেছিলেন—সেটি হলো ইভের জন্ম মস্ত বড় একটি পিয়ানো। সে-বেচারী ঘণ্টার পর ঘণ্টা অভ্যাস ক'রে যেত। কিন্তু দ্রুত বাজনার শব্দঝঙ্কার নিয়ে মাদাম কুরীকে কখনই অভিযোগ করতে শোনা যায় নি। আইরিন মায়ের উদাসীনতার কিছুটা পেয়েছিল। ইভ তার নিজের প্রকাণ্ড ঘরখানা সাজাতে চেষ্টা করত, কিন্তু প্রায়ই সে-চেষ্টায় অঘটন ঘটত বেশী। আবার যখন টাকা পয়সায় কুলিয়ে যেত, তখন নতুন ক'রে ঘর সাজাবার ধুম্ পড়ে যেত।

বাড়িতে যে ঘরে মারী কাজ করতেন, একমাত্র তার ভেতরেই যা' কিছু প্রাণের সাড়া পাওয়া যেত। পিয়ের কুরীর একখানা ছবি, কাঁচের আলমারি বোঝাই বিজ্ঞানের বই, পুরোনো আসবাব কয়েকটা, সব মিলে ঘরের মধ্যে একটা আভিজাত্যের আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল।

অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিবেশের মধ্যে বাড়িখানা পছন্দ করা হয়েছিল; কিন্তু দুনিয়াতে এত শব্দবহুল বাড়িও বোধহয় আর দেখা যায় না! পিয়ানো বাদিনীর স্বরসাধনা, অবিরাম টেলিফোনের শব্দ, একটা কালো বেড়াল যার বিশেষত্বই ছিল সমানে কড়িডোরের ভেতরে অদৃশ্য শত্রুকে আক্রমণের প্রচেষ্টায় ফ্যাসফেঁসিয়ে দৌড়ে বেড়ানো, দরজার ঘন্টির গম্ভীর টানা আওয়াজ—এ বাড়ির উঁচু দেওয়ালগুলোতে ধাক্কা খেয়ে এই সব প্রতিটি শব্দ বিরাট হয়ে প্রতিধ্বনিত হতো। সীন নদীর বুকে বাষ্পীয় নৌকোগুলির অবিশ্রাম গর্জনে আকৃষ্ট হয়ে একাকী তরুণী ইভ জানালার সার্সিতে চোখ রেখে পর পর ষ্টিমারগুলি গুনতে বসত: মাস্কেটিয়ার, এথোস্, পার্থোস্—বিভিন্ন গোষ্ঠীর জাহাজ। মার্টিন, লিণ্টে, সোয়ালো···পাখীই বা কতরকম···

ভোরবেলা আটটা বাজার আগেই আনাড়ী ঝিয়ের কাজের শব্দ ও মাদাম কুরীর হাল্‌কা পায়ে দ্রুত চলা-ফেরার শব্দে বাড়ির সকলের ঘুম ভেঙ্গে যেত। পৌনে ন'টার সময়ে মাদাম কুরীর ছোট্ট বন্ধ গাড়িটা গাড়ি-বারান্দায় এসে তিনবার হর্ন দিত। কোট, টুপি চাপিয়ে মারী দ্রুত পায়ে নীচে নেমে যেতেন। ল্যাবরেটারি যে তাঁর জন্তে অপেক্ষা ক'রে আছে!

সরকারি জাতীয়-পেন্সন্ এবং এক মার্কিন সাহায্য-ব্যবস্থার ফলে তাঁর সাংসারিক অভাব বলতে আর কিছু নেই। অনেকের কাছে মাদাম কুরীর আয় হাস্তকর রকমের কম বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তাঁর যৎসামান্ত

প্রয়োজনের পক্ষে তাই যথেষ্ট মনে হতো। অবশ্য নিজে তিনি টাকার সুখ কোনদিনই ভোগ করেন নি, কারণ কিভাবে শুধু টাকা দিয়ে ঝিয়েদের হাতের সেবা কেনা যায়, তা' তিনি কোনদিনই শিখে উঠতে পারেন নি। গাড়িতে ড্রাইভারকে যদি দু'চার মিনিট তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে হতো, তাতেই তাঁর মনে অপরাধ-বোধ জাগত। ইভকে নিয়ে দোকানে ঢুকে দাম যাচাই করবার ইচ্ছে তাঁর কখনই হতো না, কেমন ক'রে যেন তিনি আন্দাজে সবচেয়ে সাদামাটা পোশাক আর সবচেয়ে সস্তা টুপিটাই বেছে নিতেন, সেগুলোই তাঁর পছন্দ হতো।

চারা গাছ, পাথর আর গ্রামের বাড়ির পেছনে টাকা খরচ করতে তিনি ভালোবাসতেন। দু'খানা বাড়ি তিনি করেছিলেন,—একখানা লারকুয়েস্তে, আরেকখানা দক্ষিণে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্রিটানীর চেয়েও উষ্ণ সমুদ্র ও তপ্ত সূর্যের সন্ধানে ভূমধ্যসাগরের দিকে গেলেন। ক্যাভেলিয়ারে তাঁর বাড়ির খোলা বারান্দায় শুয়ে সামনের উপসাগরের সঙ্গে অদূরের হেয়ের্স দ্বীপপুঞ্জের দৃশ্য উপভোগ করতেন এবং পাহাড়ের গায়ে ইউক্যালিপটাস্, মিমোসা, সাইপ্রেস্ গাছের চারা পুঁতে বাগান করার আনন্দ পেতেন। তাঁর দু'জন প্রতিবেশী বন্ধু মাদ্‌মোয়াজেল্ ক্লেমেণ্ট তার মাদাম সালেনেভ সভয়ে তাঁর জলক্রীড়ার তারিফ করতেন। ইতস্ততঃ ছড়ানো অসমান পাথরের ভেতর মারী একটি থেকে অন্যটিতে সাঁতার কেটে যাতায়াত করতেন এবং তাঁর এ সব কীর্তি বিস্তৃত ব্যাখা সহকারে মেয়েদের লিখে জানাতেন।

আগেকার দিনের মতো শীতকালটা পারীর বাইরে সো'য় গিয়ে বাস করার ইচ্ছে তাঁর হতো। সেখানে জমি কিনে বাড়ি করার কথাও বলতেন। বছর ঘুরে যেত, মন স্থির করতে পারতেন না ; প্রতিদিন দুপুরবেলা ল্যাবরেটারি থেকে পায়ে হেঁটে লা'টুর্নেলের সাঁকো পেরিয়ে আগের মতোই তাড়াতাড়ি পা ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে ইল্ সাঁ লুসের বাসার সিঁড়ি বেয়ে তাঁকে উঠতে দেখা যেত।

পুরোনো দিনের কথা···ইভ তখনও শিশু, মাদাম কুরীর সহকারী আইরিন মায়ের কাজে সাহায্য করত, সে-সময়ে খাবার টেবিলে খেতে খেতে মা ও তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক কথাবার্তা চলত। পারিভাষিক শব্দগুলি ইভের কানে ঢুকত, সে তখন সেসব নিজের মতো ক'রে বুঝতে চেষ্টা করত। যেমন ধরুন, মা আর দিদির কথার মধ্যে বীজগণিতের শব্দগুলি ছোট্ট মেয়েটির কানে ভারি মজার ঠেকত, বিবি "প্রাইম", বিবি "স্কোয়ার।"

ইভের ধারণা হয়েছে এই অপরিচিত "বেবিরা", যাদের কথা মা আর দিদি সর্বদাই আলোচনা করে, তারা নিশ্চয়ই খুব সুন্দর···কিন্তু "স্কোয়ার" বেবি কেন? আর "প্রাইম" বেবিই বা কেন? তাদের বিশেষত্ব কি হতে পারে?

১৯২৬-এর এক সকালে আইরিন ধীরকণ্ঠে রেডিয়ম ইন্সটিটিউটের সবচেয়ে মেধাবী আর সেরা ছেলে ফ্রেডরিক জোলিওর সঙ্গে নিজের বিয়ের কথা তুলল। সারা বাড়ির অবস্থাটা ওলট্‌পালট হয়ে গেল। এই বাড়িতে যেখানে বাস করত শুধু তিনজন মেয়ে—আঁদ্রে দ্যবেয়েরন্, মরিস কুরী, পেরিন, বরেল ও মোরিয়ান-দের পরিবার ছাড়া বিশেষ কেউ কখনও যেখানে আসত না—হঠাৎ সেখানে একটি তরুণ যুবকের যাতয়াত শুরু হলো। এরা প্রথমে কে দ্য বেতুনে কিছুকাল থেকে পরে নিজেরা একখানা ফ্লাট ভাড়া ক'রে সেখানে উঠে গেল। মেয়েকে সুখী দেখে মারীর মনটাও খুশি হয়ে উঠেছিল, কিন্তু যে মেয়ের সঙ্গে এতদিন একসঙ্গে কাটিয়ে এলেন, তাকে এখন ছেড়ে একলা থাকার ব্যথা একটা থেকেই গেল, বৃথা তাকে চাপা দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

তারপর যখন দৈনন্দিন ঘনিষ্ঠতায় ফ্রেডরিক জোলিওকে আরেকটু ভাল ক'রে চিনলেন, তখন এই সুরূপ, আলাপী, প্রাণ-প্রাচুর্যে উচ্ছ্বসিত ছেলেটির মধ্যে অসাধারণ গুণ লক্ষ্য ক'রে খুশি হলেন। এখন তাঁর চিন্তার ভাগ নিতে, গবেষণার বিষয় আলোচনা করতে, তাঁর কাছ থেকে উপদেশ নিতে, কখনও বা তাঁকে নতুন নতুন চিন্তার খোরাক যোগাতে একজনের জায়গায় দু'জন সহকারী হলো। জোলিও-দম্পতি সপ্তাহে চারদিন মাদাম কুরীর সঙ্গে খেতে আসে।

এবং আবার তারা খেতে খেতে "বেবিস স্কোয়ার" এবং "বেবিস্ প্রাইম" নিয়ে আলোচনা করে।

'মা ল্যাবরেটারিতে যাচ্ছ না!'

বেশ কিছুকাল যাবৎ ঐ সুন্দর ধূসর-ছোঁয়া চোখদু'টি কাঁচকড়ার ফ্রেমে বাঁধানো চশমার আড়ালে ঢাকা পাড় গিয়েছিল। শান্ত অসহায় চোখে হাতের দিকে চেয়ে জবাব দিলেন: 'হ্যাঁ, আজ একটু দেরীতে যাব সেখানে।

১ B B-র উচ্চারণ বে বে।

প্রথমে আমায় 'আকাদেমি অব মেডিসিনে' যেতে হবে। সেখানে তিনটের আগে মিটিং শুরু হবে না, কাজেই ভাবছি—হ্যাঁ, ফুলের বাজারে একবার আর লুক্সেমবুর্গ বাগানেও দু'এক মিনিট থেমে যাব।'

বাড়ির সামনে বার তিনেক গাড়িখানার হর্নের শব্দ হলো, কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফুলের বাজারে মারী নানা জাতের ফুলের পাত্র আর কলমের ঝুড়িগুলোর মাঝখান দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ল্যাবরেটারির বাগানের জন্য কিছু চারাগাছ বেছে নিয়ে সাবধানে খবরের কাগজে মুড়ে নিয়ে চললেন।

আড়াইটা। লুক্সেমবুর্গ বাগানের ফটকের কাছে মারী নামলেন। দ্রুত পা ফেলে তিনি এগিয়ে চললেন। বিকেল হতে না হতে অনেক বাচ্চা এই বাগানে এসে হুটোপাটি আরম্ভ ক'রে দেয়। তাদের মধ্যে একটি ছোট্ট মেয়ে তাঁকে দেখবামাত্র ছোট্ট ছোট্ট পায়ে প্রাণপণ ছুটে তাঁর দিকে এগিয়ে আসত; এটি আইরিনের কন্যা হেলেন জোলিও। বাইরে থেকে মাদাম কুরীকে যথেষ্ট গম্ভীর রাশভারী দিদিমা মনে হলেও, প্রতিদিন অনেকখানি সময় নষ্ট ক'রে, অনেক ঘুর পথে গিয়ে তিনি এই লাল জামা পরা নাতনীর সঙ্গে দেখা ক'রে আসতেন: সে তখন প্রশ্নের পর প্রশ্নে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলত।

'তুমি কোথায় যাচ্ছ? আমার কাছে আরেকটু থাকনা!'

সেনেটের ঘড়িতে তিনটে বাজতে আর দশ মিনিট বাকী। এবার হেলেন আর তার বালির কেক্ ছেড়ে মারীকে উঠতেই হবে।

রু-বোনাপার্ট-এর বিরাট সভাঘরে মারী তাঁর পুরোনো বন্ধু ডঃ রুয়ের পাশের চেয়ারে গিয়ে বসতেন এবং ষাট জন শ্রদ্ধেয় সহকর্মীর মধ্যে একমাত্র তিনিই মহিলা যিনি তাঁদের সঙ্গে মিলে আকাদেমির দায়িত্ব বহন করতেন।

'উঃ কি দারুণ ক্লান্তি।'

বয়সে, পরিশ্রমে মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে যেত, রোজই সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে ঐ একই কথা বলতেন। অনেক দেরীতে প্রায় সাড়ে সাতটা-আটটার সময়ে তিনি ল্যাবরেটারি থেকে ফিরতেন। বাড়ি ফিরে রোজই তাঁর মনে হতো সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে যেন বেশী কষ্ট হচ্ছে। চটি পায়ে কালো পশমী জামাটা কাঁধের ওপর ফেলে যতক্ষণ না খাবারের ডাক পড়ত ততক্ষণ দিন-শেষের নিঃস্তব্ধ বাড়িতে উদ্দেশ্য-বিহীনভাবে ঘুরে বেড়াতেন। মেয়ে বৃথাই বকে মরত: 'তুমি বড্ড বেশী পরিশ্রম করছো।

পয়ষট্টি বছর বয়সে কোন মহিলার তোমার মতো দিনে বারো ঘণ্টা, চোদ্দ ঘণ্টা ক'রে পরিশ্রম করা উচিত নয়।' ইভ বেশ ভাল ক'রে বুঝত যে, এর থেকে কম পরিশ্রম করা মা'র পক্ষে সম্ভব নয়, বরং কাজ কমিয়ে চলতে শুরু করলেই বোঝা যাবে যে, তাঁর দিন ফুরিয়ে এসেছে। বেচারী ছেলেমানুষী বুদ্ধিতে মনে মনে প্রার্থনা করতো, আরও বহুকাল পর্যন্ত মা যেন দিনে এইরকমই চোদ্দ ঘণ্টা কাজ করার শক্তি পান।

আইরিন কে দ্য বেতুন ছেড়ে যাবার পর থেকে ইভ একাই মায়ের সঙ্গে খেতে বসত। দীর্ঘদিনের ঘটনা মারীর মন আছন্ন ক'রে রাখত, তিনি সেইসব বিষয়ে জোরে জোরেই আপন মনে বলে যেতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় এই বিচ্ছিন্ন মন্তব্য থেকে, ল্যাবরেটারির অজস্র রহস্যময় কাজের সঙ্গে মাদাম কুরীর দেহমন কি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তার পরিচয় পাওয়া যেত। যে সব যন্ত্রপাতি ইভ জীবনে দেখে নি, সেগুলি তার কাছে পরিচিত হয়ে উঠল; মারী তাঁর সহকর্মীদের সম্বন্ধে অত্যন্ত স্নেহপরবশ অন্তরে আবেগ-জড়িত স্বরে বহু বিশেষণ যোগ ক'রে কথা বলতেন, শুনে শুনে ইভ তাদের চিনে ফেলল।

'আমার ছোট্ট গ্রেগরীর কাজে আমি ভারি খুশি হয়েছি। জানতাম যে ছেলেটার মধ্যে একটা ক্ষমতা আছে।' (তারপর স্যুপ খাওয়া শেষ ক'রে) 'ভেবে দেখ একবার আজ আমি সাল্ দ্য ফিজীতে আমার চীনা শিষ্যটির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমরা ইংরিজিতেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করলাম। চীনদেশে কারুর কথার প্রতিবাদ করা অসভ্যতা ; ধরো আমি একটা সম্ভাবনার কথা বললাম যেটা সে খানিক আগেই ভুল বলে প্রমাণ করেছে, তবু সে ভদ্রতার খাতিরে আমার কথাতেই সায় দিয়ে যাবে। কখন যে সে আপত্তি করছে, সেটুকু আমাকে আন্দাজে ধরে নিতে হবে। দূর প্রাচ্যদেশের এই সব ছাত্রদের সামনে আমি আমার অভদ্রতার জন্য লজ্জিত বোধ করি। ওরা আমাদের চেয়ে কত বেশী সভ্য!'

চিনির রসে জরানো ফল মুখে দিয়ে আবার বলেন: 'ও, ইভ! একদিন আমার এবছরের পোল ছাত্রটিকে বাড়িতে ডেকে খাওয়াতে হয়। বেচারার নিশ্চয় পারীতে এসে একা একা লাগে।'

টাওয়ার অব ব্যাবেল, অর্থাৎ রেডিয়ম ইন্সটিটিউটে বিভিন্ন দেশের কর্মীদের শুভাগমন হতো। এদের মধ্যে সর্বদা একটি ক'রে পোল ছাত্র

থাকত। যখন মাদাম কুরী সহকারীদের মধ্যে কোন একজনকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃত্তির ব্যবস্থা করতে গিয়ে দেখতেন, যোগ্যতর আর কোন ছাত্রের উপর অবিচার হচ্ছে, তখন তিনি ওয়ারস থেকে আগত ছাত্রটিকে নিজের থেকে টাকা দিতেন, সে-ছেলেটি কিন্তু কোনদিনই এই উদারতার কথা জানতে পারত না।

হঠাৎ এই ল্যাবরেটারির ঘোর থেকে নিজেকে যেন বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে মেয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বরে মারী প্রশ্ন করতেন: 'আচ্ছা মা মণি, এবার তুমি কিছু বল শুনি। দুনিয়ার কিছু খবর শোনাও!'

তখন তিনি যা খুশী তাই শুনতে চাইতেন—একেবারে নেহাৎ ছেলেমানুষী গল্পতেও আপত্তি ছিল না। ইভ তৃপ্তিভরে তাঁর গাড়ি "মোটামুটি ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ মাইল ছোটে"—এই হিসেব দিতে গিয়ে দেখে তার মা অত্যন্ত নিবিষ্ট হয়ে তার কথা শুনছেন। নিজে তিনি অত্যন্ত সুদক্ষ ও সতর্কভাবে মোটর চালাতেন, কাজেই তাঁর নিজের ফোর্ড গাড়িটার ওপর তাঁর মায়া পড়ে গিয়েছিল। নাতনী হেলেনের গল্প, শিশুমুখের এতটুকু কথার পুনরুক্তি শুনে কিশোরী-সুলভ উচ্ছ্বাসে হাসতে হাসতে চোখে প্রায় জল এসে যেত।

রাজনৈতিক আলোচনার মধ্যে তার অন্তরের জ্বালা ধরা পড়ত। আ: স্বাধীনতার কি অপূর্ব আরাম! ফরাসীরা তাঁর সামনে শাসনতন্ত্রের প্রশংসা করলে, তিনি অত্যন্ত মৃদু স্বরে উত্তর দিতেন: 'আমি পরাধীনতার জ্বালা আর উৎপীড়নের মধ্যে মানুষ হয়েছি। তোমরা তা হও নি। স্বাধীন দেশে থাকার যে কি সৌভাগ্য, তা তোমরা ঠিক বুঝতে পার না…।'

প্রতিহিংসাপরায়ণ বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে তাঁর একই আপত্তি ছিল: 'লাভয়সিয়েরকে গিলোটিনে চাপিয়ে তোমরা দেশের মঙ্গল করেছ, একথা কিছুতেই বিশ্বাস করব না।' কিন্তু সেই অল্পবয়সী "প্রগতিশীল" পোলবালার তেজ ও দুঃসাহস তাঁর ভেতরে আগের মতো আজও বিদ্যমান রয়েছে। ফ্রান্সে হাসপাতাল ও বিদ্যালয়ের অভাব, অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার ভিতর হাজার হাজার পরিবারের বাস, নারীর অধিকারের সমস্যা—এই সব দুশ্চিন্তায় তিনি জর্জরিত হতেন।

মারী কোনদিনও তাঁর মেয়েদের তেমন ক'রে শিক্ষা দিতে পারেন নি। কিন্তু আইরিন, ইভ তাঁর কাছে যে অমূল্য জিনিসটি পেয়েছিল, তার দাম কোনদিনও কমবে না; এক মনীষিণীর সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠার

সুযোগ তারা পেয়েছিল, শুধু প্রতিভায় নয়, মানুষের যাবতীয় নীচতা, ক্ষুদ্রতার প্রতি আন্তরিক বিতৃষ্ণা ছিল তাঁর। অন্যান্য মহিলাদের তুলনায় নিজেকে আদর্শ রমণী বলে জাহির করার এতটুকু প্রচেষ্টা তাঁর ছিল না। প্রশংসা-মুখর বান্ধবীদের শান্ত করার জন্য মাঝে মাঝে তিনি বলতেন : 'আমার মতো প্রকৃত-বিরুদ্ধ জীবন যাপন করার কোন প্রয়োজন দেখি না। আমি বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অনেকখানি সময় বিজ্ঞান-সাধনায় ঢেলে দিয়েছি···মেয়েরা সাধারণ পারিবারিক জীবন যাপন করবে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের পছন্দমতো কোন কাজ করবে···এই আমি চাই।'

সান্ধ্যভোজের শান্ত পরিবেশে মাঝে মাঝে মা-মেয়েতে প্রেম নিয়েও আলোচনা হতো। দুঃসহ বেদনায় জর্জরিতা মারী প্রেম সম্বন্ধে বিশেষ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতেন না। এক নামজাদা ফরাসী লেখকের সূত্র অনায়াসে মেনে নেওয়াই তাঁর পক্ষে সহজ হতো : 'মর্যাদা দেওয়া চলে—এমন কোন আবেগের পর্যায় প্রেমের স্থান নেই।'

(একবার ইভকে লেখেন তিনি :) 'আমার মনে হয়, যে আদর্শ আমাদের প্রচেষ্টাকে করে সুমহান, স্বপ্নকে উচ্চ শিখরে তুলে ধরে অথচ অহঙ্কার জাগায় না—তাই হলো মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস-স্বরূপ। আরও একটি কথা আমার মনে হয়, প্রেমের মতো এমন উদ্দাম হৃদয়াবেগের ওপর জীবনের সমস্ত চাহিদা মেটাবার দায় ছেড়ে দিলে নৈরাশ্যের সূত্রপাত হয়···'

সবরকম গোপন কথা তাঁর কানে আসত, তিনি এমন যত্ন ক'রে অন্তরের নিভৃততম কোণে সেসব গোপন ক'রে রাখতেন যে, মনে হতো কোন কালে সেসব কথা তিনি শোনেন নি। বিপদ অথবা অশান্তির আশঙ্কায় নিজে থেকে সাহায্য করতে ছুটে যেতেন। কিন্তু প্রেমের আলোচনায় কখনও তাঁর অন্তরের সাড়া পাওয়া যেত না। এবিষয়ে তাঁর বিচার, তাঁর দর্শন ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, শোকাচ্ছন্ন অতীতের দুয়ার খুলে মারী কখনও সেখান থেকে কোন শিক্ষা, কোন স্মৃতি উদ্ঘাটন করেন নি। এই এক রাজ্যে তাঁর অন্তরের নিকটতম ব্যক্তিরও প্রবেশাধিকার ছিল না।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের দু'টি বোন ও এক ভাইয়ের জন্য তাঁর মন কাঁদত—এইটুকুমাত্র মেয়েরা টের পেত।···প্রথম জীবনে বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন

হয়ে প্রবাসী জীবন, পরে বৈধব্যের দরুন সেই মধুর নিবিড় পারিবারিক পরিবেশ থেকে নির্বাসিতা তিনি !…

বন্ধুদের সঙ্গে এত অল্প দেখা হওয়ার দুঃখে দুঃখিত অন্তঃকরণে চিঠি লিখতেন মঁপেলিয়েরে জ্যাক্ কুরীকে, যোসেফকে, হেলা আর ব্রনিয়াকে—যার জীবনের ওপর দিয়ে নিজের মতোই ঝড় বয়ে গেছে সেই ব্রনিয়াকে চিঠি লিখতেন। ব্রনিয়া দুটি সন্তান হারিয়েছিলেন এবং ১৯৩০-এ স্বামী কাসিমির দ্লুস্কি ইহলোক ত্যাগ করেন।

১৯৩২-এর ১২ই এপ্রিল মারী ব্রনিয়াকে লেখেন :

'প্রিয় ব্রনিয়া,

তোমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমারও মন ভার হয়ে থাকে। তবু তোমার একটা সান্ত্বনা এই যে, তোমরা তিন জনে ওয়ার্সয় আছ, পরস্পরের সান্নিধ্যে পরস্পরের প্রতি নির্ভর করতে পার। বিশ্বাস করো, সংসারে পারিবারিক যোগাযোগই একমাত্র খাঁটি জিনিস। আমি এ থেকে বঞ্চিত বলেই হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারি। এর মধ্যেই কিছু সান্ত্বনা আমাদের খুঁজে নিতে হয়। তোমরা পারীবাসিনী বোনটিকে ভুলো না, যতটা বেশী সম্ভব আমরা পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে চেষ্টা করব…।'

সন্ধ্যের খাওয়া শেষ ক'রে ইভের যদি কোথাও বেরোবার থাকত মাদাম কুরী তার ঘরে ডিভানে শুয়ে তার সাজগোজ করা দেখতেন।

পোশাক পরিচ্ছদ ও নারীর রুচিবোধ সম্বন্ধে দু'জনের মধ্যে ধারণার অনেক তফাৎ ছিল। কিন্তু মারী নিজের ইচ্ছা মেয়েদের ওপর চাপাবার চেষ্টা করতেন না। কাজেই দু'জনের মধ্যে আলোচনাটা বেশীর ভাগ পড়াশোনার গণ্ডীর ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকত। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে মেয়ের পোশাকের ওপর দু'একটি মন্তব্য করতেন :

'আহা, বাছারে আমার! জুতোর হিলটা কি মারাত্মক! না, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করব না যে, মেয়েরা রণপায় চড়ে হাঁটবে এমন কোন কথা ছিল! আর জামার পিঠের দিকে ঐ অতখানি কাটা, ও আবার কোন্ দেশী ফ্যাশান? গলার দিকে খানিকটা নীচু ক'রে কাটা কোনমতে সহ্য করা যেত, কিন্তু পিঠের দিকে ঐরকম মাইলের পর মাইল কাটা থাকবে! প্রথমতঃ এটা অশালীন, দ্বিতীয়তঃ প্লুরিসি হবার ভয় থাকে, তৃতীয়তঃ দেখতে কুৎসিত

লাগে। আর কোন কারণে না হোক, তৃতীয় কারণটা অন্ততঃ মনে ধরা উচিত। যাইহোক, এসব বাদ দিয়ে তোমার পোশাকটা সুন্দর, তবে রঙটা বড্ড বেশী কালো, তোমার বয়সে চলে না…'

মুখ-পরিষ্কারের বাক্সটা নিয়েই হতো যত মুশকিল। অনেকটা সময় নিয়ে ইভের যখন মনে হতো প্রসাধন সম্পূর্ণ হলো, তখন বলতেন : 'এদিকে ফেরো তো দেখি, তোমায় প্রশংসা করা যায় কিনা!' মাদাম কুরী প্রথমে নিরপেক্ষ ভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে, পরে বিস্ময়ের সঙ্গে তাকে লক্ষ্য ক'রে বলতেন : 'এই সব ঘষা-মাজায় আমার বাস্তবিক কোন আপত্তি নেই। জানি, এ-জিনিস অনেককাল থেকে চলে এসেছে। প্রাচীন মিশরের মেয়েরা এর চেয়ে ঢের বেশী জঘন্য ব্যাপার করত।…একটা কথাই শুধু আমার মুখে আসছে, আমার চোখে এসমস্ত অতি কুৎসিৎ ঠেকে। ভুরুটাকে কষ্ট দাও, অথবা ঠোঁট দুটোকে রঙ মাখাও…'

'কিন্তু মা, বিশ্বাস করো—এই ভাল!'

'ভাল? শোন কথা! নিজের মনকে প্রবোধ দেবার জন্যে কাল সকালে তোমার মুখে প্রলেপ চড়াবার আগেই আমি চুমু খেয়ে যাব। তোমার কারুকার্যবিহীন চেহারাই আমার ঢের ভাল লাগে। এবার তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে পড় তো, মানিক আমার! আর শোন, পড়ার মতো কোন বই থাকলে আমায় দিয়ে যেও।'

'নিশ্চয়! কি ধরনের বই চাই মা বল।'

'ঠিক জানি না, কিছু দাও, যাতে মনটা ভার না হয়ে ওঠে। বিষাদ-ভরা, মন-কেমন-করা উপন্যাস উপভোগ করতে হলে তোমাদের মতো অল্পবয়স হওয়া দরকার।'

রুশ উপন্যাস আবার করে পড়ার ইচ্ছে তাঁর হতো না, এমনি কি এককালে ডস্টয়েভস্কি'র লেখা তাঁর খুব প্রিয় ছিল—তাও আর নতুন ক'রে পড়তে চাইতেন না। মায়ের সঙ্গে সাহিত্যে রুচিভেদ থাকলেও ইভ আর মা দু'জনেই কয়েকজন লেখকের ভক্ত ছিলেন কিপলিং, কোলেৎ…। নেসাঁস-দ্যু-জ্যুর, অরণ্য কাহিনী, সিডে বা কিম্ বইখানা পড়তে তাঁর ক্লান্তি ছিল না, কারণ তাঁর জীবনের সান্ত্বনা, তাঁর নিজস্ব সত্বার অংশ-স্বরূপ "প্রকৃতি"র অপূর্ব বর্ণনায় পূর্ণ ছিল বইগুলি। ফরাসী জার্মান, রুশ, ইংরাজী ও পোলভাষায় অন্ততঃ হাজার কবিতা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল।…

ইভের দেওয়া বইখানা হাতে নিয়ে নিজের পড়ার ঘরে ঢুকে লাল মখমলে ঢাকা লম্বা আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে মাথার নীচে পালকের কুশনটা টেনে নিয়ে কয়েক পৃষ্ঠা উল্টে দেখতেন।

কিন্তু আধঘণ্টা, হয়তো বা ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই বইখানা রেখে উঠে পড়তেন। তারপর পেন্সিল, নোটবই আর বৈজ্ঞানিক পত্রিকাগুলির মধ্যে রাত দুটো, তিনটে অবধি অভ্যাস মতো কাজ ক'রে যেতেন।

ইভ বাড়ি ফিরে অপ্রশস্ত করিডোরের প্রান্তে গোল জানালার সার্সির ভেতর দিয়ে মায়ের পড়ার ঘরে আলো জ্বলতে দেখে করিডোর পেরিয়ে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকত।

প্রতি রাত্রে একই দৃশ্য। চারপাশে কাগজ, হিসেব কষার রুলার, মনোগ্রাফ ইত্যাদি ছড়িয়ে মাদাম কুরী মেঝেতে বসে আছেন। ডেস্কের সামনে চেয়ারে বসে কাজ করা অভ্যাস তাঁর কোনকালেও হলো না। তাঁর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও গ্রাফের ঘরকাটা কাগজ ছড়িয়ে বসার জন্য তাঁর অনেক জায়গার দরকার হতো।

কি একটা অঙ্কের মধ্যে এমন ডুবেছিলেন যে, মেয়ে ফিরে এসেছে তা টের পেয়েও মুখ তুলে চাইলেন না। ভুরুতে একটু টান পড়ল মাত্র, মুখখানা গভীর চিন্তায় আচ্ছন্নই রয়ে গেল।

হাঁটুর ওপর নোটবই। সাঙ্কেতিক রেখা আর ফরমূলা সেই নোটবইয়ে লেখা হয়ে যাচ্ছে। ঠোঁট দুটি সামান্য নড়ছে, ফিসফিসিয়ে কি যেন বলে যাচ্ছেন।

আসলে নীচু গলায় সংখ্যা গণনা করছিলেন মারী। ষাট বছর আগেকার মাদমোয়াজেল সিকোর্স্কা'র ইস্কুলে অঙ্ক ক্লাসের ছাত্রীটির মতোই সরবনের এই অধ্যাপিকা আজও পোল ভাষাতেই গণনা করেন।

২৬

'মাদাম কুরী আছেন এখানে ?'

'মাদাম কুরীকে চাই, তিনি এসেছেন কি ?'

'মাদাম কুরীর সঙ্গে দেখা হয়েছে ?'

অল্পবয়সী ছেলের দল, ল্যাবরেটরির ব্লাউস গায়ে মেয়ের দল, রেডিয়ম ইন্সটিটিউটের যে দিক দিয়ে মাদাম কুরী আসবেন সেখানে জড়ো হয়ে পরস্পরকে প্রশ্ন করছিল।

সকালে এইরকম পাঁচ-ছয়…দশ-বারোজন কর্মীকে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে দেখা যেত। 'তাঁকে বিরক্ত না ক'রে প্রত্যেকেই তাঁর কাছ থেকে মুখে মুখে কিছু উপদেশ, কিছু উৎসাহ, কিছু বা নতুন কোন কাজের প্রস্তাব নিয়ে আসত। এঁদের ঠাট্টা ক'রে মারী নাম দিয়েছিলেন : "সোবিয়েত।"

এদের বেশী অপেক্ষা করার দরকার হতো না। ন'টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো গাড়িখানা রু-পিয়ের কুরীর ফটকের ভেতর ঢুকতে দেখা যেত। লোহার দরজা খোলার ঝন্‌ঝন্ শব্দ ভেসে আসত, সঙ্গে সঙ্গে বাগানের প্রবেশ-দ্বারে মাদাম কুরীর দেখা মিলত। উৎফুল্ল শিষ্যের দল তাঁকে ঘিরে ধরত। ভীরু গলায় কেউ ঘোষণা করত তার কাজ শেষ করার কথা ; কিংবা কেউ বা পোলোনিয়ম দ্রবনের সংবাদ দিত ; আবার অনুরোধ করত মাদাম কুরী যদি একবার উইলসন্ যন্ত্রটিকে দেখে যান, তবে চমৎপ্রদ ফলাফল লক্ষ্য করতে পারবেন।

মাঝে মাঝে অনুযোগের স্বর তাঁর গলায় শোনা গেলেও, দিনের আরম্ভে এই যে কর্মব্যস্ততা, এই যে অজানাকে জানার কৌতূহল তাঁকে অভ্যর্থনা করত, এ তাঁর সত্যই ভাল লাগত। নিজের কাজের মধ্যে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার চেয়েও টুপি মাথায়, কোট গায়ে এইসব নতুন কর্মীদের মাঝে দাঁড়িয়ে যেতে তাঁর ঢের বেশী ভাল লাগত। আগ্রহে উজ্জ্বল প্রতিটি মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর নিভৃতে চিন্তা করা কোন পরীক্ষার কথা মনে পড়ে যেত।

'মঁসিয়ে ফোনিয়ের, তুমি যে বিষয়ে আমায় জানিয়েছিলে, তার কথা আমি ভেবে দেখেছি। তোমার ধারণা চমৎকার, কিন্তু যে ভাবে তুমি এগোতে চাইছ, তা সম্ভব নয়। আরেকটা পথের কথা আমি ভেবেছি, সেভাবে কাজ করলে ফল পাওয়া যাবে।...মাদাম কোতেল, শেষ পর্যন্ত কোন্ সংখ্যাটা পেলেন ? আপনি ঠিক জানেন হিসেবে কোন গোলমাল নেই ? গত রাত্রে আমি কষে দেখেছি, উত্তর সামান্য তফাৎ হচ্ছে। যাইহোক, চলুন দেখি...'

এইসব আলোচনার মধ্যে কোথাও কিছু গোঁজামিল বা আন্দাজের ঠাঁই থাকত না। যে সময়টুকু কোন গবেষণার জন্যে নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছিলেন, সেই সময়ের মতো মাদাম কুরী সম্পূর্ণ তারই সমস্যার ভেতর ডুবে যেতেন, তার নাড়িনক্ষত্রের খবর রাখতেন। পরমুহূর্তে তিনি অন্য আরেকজনের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠতেন। তাঁর মস্তিষ্ক যেন এ-হেন ক্রিয়াকৌশলের জন্যেই তৈরি হয়েছিল। এই ল্যাবরেটারিতে যেখানে এতগুলো উদ্যোগী বুদ্ধিদীপ্ত ছেলেমেয়ে একাগ্রচিত্তে পরিশ্রম ক'রে চলেছে, তাদের মাঝখানে তাঁকে দেখে মনে হতো, কোন পাকা দাবা খেলোয়াড় ঘুঁটিগুলোর দিকে না তাকিয়েই যেন একসঙ্গে ত্রিশ চল্লিশ হাত চেলে যাচ্ছেন। লোকে পাশ দিয়ে যাবার সময়ে থমকে দাঁড়িয়ে নমস্কার ক'রে যেত। 'সোবিয়েত' বেড়ে চল্‌ল। শেষ অবধি মারী সিঁড়ির ধাপে বসে পড়ে অত্যন্ত ঘরোয়াভাবে কাজের কথাবার্তা চালিয়ে যেতেন। চার পাশে কর্মী ছেলেমেয়েদের ভিড়, কেউ বা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে ; এদের দিকে মুখ তুলে চেয়ে তিনি যখন উপদেশ দিতেন, তখন ঠিক একজন প্রধান অধ্যাপিকার মতো তাঁকে দেখাত না বটে, কিন্তু তবু প্রত্যেকের কর্মক্ষমতা বেশ ক'রে যাচাই ক'রে নিয়ে তিনি ল্যাবরেটারির কাজের জন্য শিষ্য বেছে নিতেন। প্রায় সর্বদাই এদের কাজ তিনি স্থির ক'রে দিতেন। পরীক্ষার কোন্ গলদটুকুর জন্য কাজ ভুল হচ্ছে মাদাম কুরী ঠিক তা খুঁজে বের ক'রে দেবেনই—এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে শিষ্যেরা তাঁর কাছে আসত।

চল্লিশ বছর বিজ্ঞান সাধনার ফলে ভদ্রমহিলা অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তিনি যেন রেডিয়মের জীবন্ত লাইব্রেরী। যে পাঁচটি ভাষায় তাঁর দখল ছিল, সেইসব ভাষায় প্রকাশিত যাবতীয় বই থেকে তিনি ল্যাবরেটারির গবেষণামূলক বিষয়সমূহ সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে-ছিলেন। পরিচিত দ্রব্যগুলির নবতর বিকাশ তিনি লক্ষ্য করতেন,

নতুন নতুন ক্রিয়াকৌশলের আবিষ্কার তিনিই করেন। সর্বোপরি এক অমূল্য গুণের অধিকারিণী ছিলেন তিনি। শিষ্যদের সৃষ্টিকরা সূক্ষ্ম চমৎকার অথচ কষ্টকল্পিত সূত্রগুলি তিনি তাঁর পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রখর যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করতেন। এ হেন দুঃসাহসিক অথচ বিচক্ষণ গুরুর তত্ত্বাবধানে কাজ করার নিশ্চিন্ততা কত!

ক্রমে ক্রমে সিঁড়ির মুখের এই সভা ভঙ্গ হতো। মারী যাদের সেদিনের কাজ বুঝিয়ে দিয়েছেন, তারা খুশি হয়ে যে যার কাজে চলে যেত। তাদের মধ্যে কোন এক শিষ্যের সঙ্গে হয়তো ফিজিক্স হল্ বা কেমিষ্ট্রি হল্ পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে একটা যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মারী আলোচনা চালিয়ে যেতেন। শেষ পর্যন্ত এদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে নিজের ল্যাবরেটারির দিকে পা বাড়াতেন। সেখানে গিয়ে কালো মস্ত ঢিলে জামাটা গায়ে দিয়ে কাজের মধ্যে ডুবে যেতেন।

কিন্তু নিঃসঙ্গতা সাময়িক মাত্র। কে যেন দরজায় ধাক্কা দিল। পাণ্ডুলিপি হাতে কোন এক গবেষক দ্বারপথে দেখা দিল। তার পেছনে আরেকজনকে অপেক্ষা করতে দেখা গেল। সোমবারে সাধারণতঃ বিজ্ঞান-আকাদেমির সাপ্তাহিক সভায় যে সব লেখককে উপস্থিত হতে হতো, তারা মাদাম কুরীর কাছে তাদের রিপোর্ট পৌঁছে দিয়ে যেত।

এইসব কাগজ পড়ার জন্যে মারী একটি ছোট্ট ঘরে গিয়ে বসতেন। এতবড় এক বৈজ্ঞানিকের পাঠাগার ব'লে ঘরখানাকে চেনবার জো ছিল না। ওক্ কাঠের এক অফিস-ডেস্ক, একটি ফাইল, বইয়ের কয়েকটা তাক্, একটা পুরোনো টাইপ-রাইটার, একখানা হাতল দেওয়া চেয়ার, টেবিলের ওপর একখানা মার্বেলের দোয়াতদান আর বইয়ের পাহাড়। ছাত্র সংঘের উপহার—একখানা কারুকার্য খচিত পাত্রে রাখা অনেকগুলি কলম আর পেন্‌সিল, আর তারই পাশে ইশিয়ায় ভূগর্ভে প্রাপ্ত একখানা হল্‌দে-বাদামী রঙের অপূর্ব মৃৎপাত্র।

যে হাত দুটি মাদাম কুরীর দিকে রিপোর্টখানা এগিয়ে দিত, প্রায়ই সে-হাত দুটি থর থর ক'রে কাঁপতে দেখা যেত, কারণ লেখক জানত যে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সহজ নয়। মারীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কোন লেখাই যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন বা শুদ্ধ মনে হতো না। পারিভাষিক ত্রুটি চিহ্নিত করেই তিনি শান্ত হতেন না, বাক্য রচনার ভুল সংশোধন ক'রে গোটা

লাইনটা আবার লিখে দিতেন। তারপর তরুণ বৈজ্ঞানিকের হাতে কাজটা ফিরিয়ে দিয়ে বলতেন: 'বোধহয় এবার চলতে পারে।'

কিন্তু কাজ পছন্দ হলে মৃদু হেসে যখন বলতেন: 'বেশ বেশ, চমৎকার হয়েছে!' তখন পদার্থবিদের সব পরিশ্রম যেন সার্থক হতো, প্রফেসর পেরিনের ল্যাবরেটারির দিকে সে তখন ডানা মেলে উড়ে যেত। নিয়মানুযায়ী জ্যঁ পেরিন সেটিকে রেডিয়ম ইন্সটিটিউটের কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করতেন।

অধ্যাপক পেরিন সকলের কাছে বলতেন: 'মাদাম কুরী কেবল যে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক তা নয়, তাঁর মতো এমন ল্যাবরেটারি পরিচালনা করতে আমি কাউকে দেখি নি।'

কিসের জোরে তিনি এমন দক্ষতা অর্জন করেছিলেন? রেডিয়ম ইন্সটিটিউটের প্রতি যে ঐকান্তিক প্রযত্ন মারীকে উদ্দীপ্ত করত, সেই অনুভূতি ছিল তাঁর সাফল্যের গোড়ায়। এই প্রিয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে তিনি ছিলেন যেন সতত সজাগ প্রহরী।

ব্যাপকভাবে তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলির গবেষণার জন্য তিনি বহুল পরিমাণে অশোধিত পদার্থ সংগ্রহের চেষ্টা করতেন। বেলজিয়মের রেডিয়ম ফ্যাক্টরি, কাটাঙ্গার খনির ব্যবসা-পরিচালকদের সৌজন্যে শেষ অবধি বরাবরই একরকম ব্যবস্থা হয়ে যেত, তাঁরা মাদাম কুরীকে বিনামূল্যে কয়েক টন্ অশোধিত ধাতু পাঠিয়ে দিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি সানন্দে বাঞ্ছিত মৌলিক উপাদান নিষ্ক্রমণে নিযুক্ত হতেন।

বছরের পর বছর তাঁর ল্যাবরেটারির সমৃদ্ধি বেড়ে চলল। জ্যঁ পেরিনের সঙ্গে মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে ঘুরে ঘুরে ল্যাবরেটারির জন্যে বৃত্তি প্রার্থনা ক'রে বেড়াতেন। যেহেতু তিনি মাদাম কুরী, কর্তৃপক্ষ তাঁর আবেদন মঞ্জুর করতেন। এইভাবে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি পাঁচ লক্ষ ফ্রাঙ্ক গবেষণার খাতে জমা পেলেন।

মাঝে মাঝে ভিক্ষাব্রতের গ্লানিতে ক্লান্ত বোধ করলে ইভের কাছে বাইরের ঘরে অপেক্ষা ক'রে বসে থাকার দৈন্য-অপমানের আশঙ্কা ইত্যাদির গল্প করতেন, শেষে মৃদু হেসে বলতেন: 'মনে হয়, একদিন ওরা আমাদের ভিখারীর মতো হাঁকিয়ে দেবে!'

কুরী-ল্যাবরেটারির কর্মীরা এই পরম নির্ভরযোগ্য কর্ণধারের সাহায্যে রেডিও-এ্যাকটিভিটির বিভিন্ন শাখা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান ক'রে চলল।

১৯১৯ থেকে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের অন্তবর্তী সময়ের মধ্যে চারশ' তিরাশিখানা

বৈজ্ঞানিক তথ্য রেডিয়ম ইন্সটিটিউটের পদার্থবিদ্ ও রসায়নবিদদের দ্বারা প্রকাশিত হয়, এর মধ্যে চৌত্রিশখানাকে থিসিসের পর্যায়ে ফেলা যায়। এই চারশ' তিরাশিখানার ভেতর একা মাদাম কুরীর রচনাই ছিল একত্রিশটি।

এই সংখ্যাটি বৃহৎ শোনালেও এ বিষয়ে কিছু বক্তব্য আছে। জীবনের শেষভাগে মাদাম কুরী চূড়ান্ত আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যতের পথ প্রশস্ত করতে ব্যস্ত ছিলেন এবং অধিকাংশ সময় পরিচালনা ও অধ্যাপনায় কাটাতেন। আশেপাশের তরুণদের মতো যদি তিনি প্রতিটি মিনিট গবেষণায় ঢেলে দিতে পারতেন, তাহলে আরও কত কি না সৃষ্টি ক'রে যেতেন! এছাড়া যে সব কাজে পদে পদে সাহায্য ক'রে প্রেরণা যুগিয়ে ছিলেন, তার ভেতর মারীর কতখানি হাত ছিল, সে-খবরই বা কে রাখে?

এসব প্রশ্ন তাঁর মাথায় আসত না। সমবেত কর্মীগোষ্ঠী তাঁর সাহায্যে যা'কিছু জ্ঞান আহরণ ক'রে আনত, তাতেই তিনি তৃপ্তি পেতেন। এমন কি, "আমার ল্যাবরেটারি" ব'লে উল্লেখ পর্যন্ত না ক'রে শুধু "ল্যাবরেটারি" কথাটির মধ্য দিয়ে গোপন আনন্দ প্রকাশ করতেন। এই কথাটি বলার সময়ে জগতে আর সমস্ত ল্যাবরেটারির অস্তিত্ব পর্যন্ত তাঁর চোখের সামনে থেকে লোপ পেত।

মনস্তাত্বিক মহৎগুণের অধিকারিণী ছিলেন তিনি এবং তারই গুণে এই নিঃসঙ্গ বৈজ্ঞানিক আর সকলের কাজের প্রেরণা-স্বরূপ ও পরিচালিকা হয়ে দাঁড়ালেন। মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্টতা করতে পারতেন না, বহু বৎসর দৈনিক সান্নিধ্যের পরেও তাদের মাদমোয়াজেল ও মঁসিয়ে বলতে তাঁর ভুল হতো না। অথচ কর্ম-সাথীদের অন্ধভক্তি তিনি অর্জন করতে জানতেন। বৈজ্ঞানিক আলোচনায় মেতে গিয়ে যদি কখনও বাগানের বেঞ্চে আধ ঘণ্টার বেশী বসে থাকতেন, তখনই কোন সহকারীর অনুনয় ভরা কণ্ঠস্বর তাঁকে বাস্তব জগতে টেনে আনত: 'মাদাম, আপনার ঠাণ্ডা লাগবে! মাদাম, অনুগ্রহ ক'রে ভেতরে আসুন।' হয়তো বা লাঞ্চের সময় খেতে যেতেই ভুলে গেছেন, কেউ এসে সন্তর্পণে তাঁর পাশে ফল, রুটি রেখে দিয়ে গেল।...

ল্যাবরেটারির ঠিকে মিস্ত্রী আর শ্রমিকের দল আর সকলের মতোই তাঁর প্রতি কেমন এক আকর্ষণ অনুভব করত,—জগতে দুর্লভ এই আকর্ষণ। একদিন মারী তাঁর এক ড্রাইভার জর্জ রয়টোকে ইন্সটিটিউটের ছোকরা হিসেবে নিযুক্ত করলেন—অর্থাৎ একাধারে মুটে, যান্ত্রিক, ড্রাইভার, মালী

সবরকম কাজ তাকে করতে হবে। সে-লোকটি দৈনিক মাদাম কুরীকে রু-পিয়ের কুরী থেকে কে ছ বেতুনে গাড়ি ক'রে নিয়ে যাবার জন্তে আর কেউ বহাল হলো ভেবে কেঁদেই আকুল হলো।

তাঁর চারপাশের এইসব কাজের মানুষদের সঙ্গে মারী এক অচ্ছেন্ত বন্ধন অনুভব করতেন, কিন্তু কখনও তা প্রকাশ করতেন না এবং এই বিরাট পরিবারের ভেতর সবচেয়ে উৎসুক, উদ্যমশীল কর্মী তাঁর নজরে ঠিকই পড়ে যেত। ১৯৩২-এর আগষ্ট মাসে তাঁর এক প্রিয় শিষ্যের মৃত্যু-সংবাদে মারী যেমন অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, তেমন আমি তাঁকে আর কখনও দেখি নি। তিনি লেখেন :

'পারীতে ফিরে নিদারুণ দুঃসংবাদে মর্মাহত হলাম। আমার অতি আদরের তরুণ রসায়নবিদ রেমদ্ আর্দেশ নদীতে ডুবে মারা গেছে। আমি একেবারে বসে পড়েছি। তার মা আমায় লিখলেন, এই ছেলেটি জীবনের অমূল্য সময়টুকু ল্যাবরেটারিতে কাটিয়েছিল। এই যদি তার কপালে ছিল, তবে এত পরিশ্রমের প্রয়োজন কি ছিল? এমন সুন্দর এক যুবা, কি ভদ্র, কি নম্র, কি অসাধারণ বুদ্ধি!—নদীর ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে গিয়ে এ সমস্তই মুহূর্তে নিঃশেষ হলো!…'

অমুক গবেষক অমুক দোষের জন্য ভাল বৈজ্ঞানিক হতে পারবে না, এ ধরনের ত্রুটি তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টি এড়াত না। তাঁর চোখে বিশৃঙ্খল ব্যবহার দম্ভের চেয়েও বড় দোষ বলে মনে হতো। পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ বিশৃঙ্খলার দ্বারা যে ক্ষতি হতো, তাতে তিনি রুষ্ট হতেন। একদিন বন্ধুদের কাছে তিনি তাঁর এক অপটু কর্মীর কথা বললেন: 'যদি সবাই এর মতো হতো, তবে পদার্থবিদ্যাকে মাথা উঁচু ক'রে আর দাঁড়াতে হতো না।'

কর্মীদের ভেতর কারো গবেষণার তথ্য অনুমোদিত হয়ে ডিপ্লোমা পেলে বা পুরস্কারের যোগ্য বলে মনোনীত হলে তার সম্মানার্থে "ল্যাবরেটারি-প্রীতিভোজের" ব্যবস্থা হতো। গ্রীষ্মকালে বাইরে বাগানে গাছগাছালির মাঝে এই প্রীতি-সম্মেলন হতো। শীতকাল হলে সবচেয়ে বড় লাইব্রেরি ঘরখানা আচম্‌কা বাসনপত্র নাড়াচাড়ার শব্দে সজাগ হয়ে উঠত। সে সব আজব বাসন! ল্যাবরেটারির গেলাসগুলো চায়ের পেয়ালা, আর শ্যাম্পেনের পাত্র হিসেবে ব্যবহার করা হতো আর নাড়াচাড়ার কাঠিগুলো হতো চামচ। মেয়ে-কর্মীরা ঘুরে ঘুরে সাথীদের, অধ্যাপকদের ও ছোট পরিচালক-গোষ্ঠীর সভ্যদের কেক ইত্যাদি পরিবেশন করত। এঁদের মধ্যে রেডিয়ম

ইন্সটিটিউটের বক্তৃতাসভার পরিচালক আঁদ্রে ডবিয়েরন্, প্রধান সহকারী ফের্‌ন আউলেক্ এবং অত্যন্ত উত্তেজিত, আনন্দিত মারীকে ভিড়ের মধ্যে নিজেদের চায়ের গেলাসখানা সামলাতে ব্যস্ত দেখা যেত।

কিন্তু হঠাৎ সব চুপ হয়ে যেত—মাদাম কুরী জয়পত্র বিভূষিত ব্যক্তিকে অভিনন্দন জানাবেন। অল্প কয়েকটি সহৃদয়তাপূর্ণ বাক্যে মাদাম কুরী তার কাজের অভিনবত্বকে প্রশংসা ক'রে, কি কি অসুবিধার ভেতর তাকে কাজ করতে হয়েছে, সে-বিষয়ে উল্লেখ করতেন। এই প্রশংসার সঙ্গে যে আন্তরিকতা মেশানো থাকত, তাই শুনে সবাই উচ্চরোলে আনন্দ প্রকাশ ক'রে উঠত, হয়তো বা সেদিনের নায়কের পিতামাতাকে উদ্দেশ্য ক'রে একটু মিষ্টি কথা, কিংবা বিদেশী হলে তার সুদূর মাতৃভূমির উদ্দেশ্যে কিছু ভাল কথা বলে তিনি বক্তৃতা শেষ করতেন: 'তোমার মাতৃভূমির সঙ্গে আমার পরিচয় আছে; সেখানে তোমার সহকর্মীরা আমায় সাদরে অভ্যর্থনা করেছিলেন। তাদের মাঝে আশাকরি এই রেডিয়ম ইন্সটিটিউটের মধুর স্মৃতি তুমি বয়ে নিয়ে যাবে। তুমি দেখেছ এখানে আমরা কিভাবে কঠোর পরিশ্রম করি এবং আমাদের যথাসাধ্য ক'রে থাকি…'

কয়েকটি প্রীতিসম্মেলন মারীর পক্ষে বিশেষ আবেগ নিয়ে দেখা দিল, যেমন সেবার কন্যা আইরিন ও জামাতা ফ্রেডরিক জোলিও যখন ডক্টর থিসিস্ পেশ ক'রে সফল হয়। মাদাম কুরী তাঁর নিজের চোখের ওপর এই দুজনের গবেষণাকে ফলবতী হতে দেখলেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে এই তরুণ-দম্পতি এক অভূতপূর্ব জয়লাভ করেন, আণবিক রূপান্তরের গবেষণা করার পর আইরিন ও ফ্রেডরিক জোলিও কৃত্রিম রেডিও-এ্যাকটিভিটি আবিষ্কার করে: তেজস্ক্রিয় মৌলিক উপাদান থেকে স্বতঃবিচ্ছুরিত রশ্মির সাহায্যে কয়েকটি পদার্থ (যথা এলুমিনিয়ম) বের ক'রে নিয়ে প্রাকৃতিক রূপ থেকে ভিন্ন এইসব পদার্থকে নবতর তেজস্ক্রিয় উপাদানে রূপান্তরিত করে এবং তারপর থেকে সেগুলিও রশ্মি বিচ্ছুরণ করে। রসায়ন, দেহতত্ত্ব, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদির ওপর এই আশ্চর্য আণবিক সৃষ্টির ফলাফল সহজেই চোখে পড়ে: কুরী চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রয়োজন মেটানোর জন্য রেডিয়ম-সম্পদে পূর্ণ পদার্থ প্রচুর পরিমাণে তৈরি করা সহজ হবে—হয়তো এমন দিন আসতে আর দেরী নেই।

ফিজিকাল সোসাইটির যে সভায় এই তরুণ দম্পতি তাদের কাজের ব্যাখ্যা

ক'রে শোনাল, সেখানে আর সকলের মাঝে মারী গর্বিত, একাগ্রচিত্তে বসে বসে শুনলেন। তাঁর এবং পিয়ের কুরীর প্রাক্তন সহকারী এলবার্ট লাবোর্দের সঙ্গে দেখা হতে আনন্দে ফেটে পড়লেন : 'আসুন! আসুন! ওরা চমৎকার বলল, না! আমরা আবার পুরোনো ল্যাবরেটারির দিনগুলোতে যেন ফিরে চলেছি! উত্তেজনায়, আনন্দে সেদিনের সন্ধ্যায় কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে করতে নদীর ধার দিয়ে হেঁটে তিনি বাড়ি ফিরলেন এবং "ছেলেমেয়েদের" সম্বন্ধে অনর্গল কথা বললেন।

রু-পিয়ের কুরীর বাগানের অপর প্রান্তে সদলবলে প্রফেসর রেগো গবেষণা ও চিকিৎসার মাধ্যমে ক্যানসারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে যাচ্ছিলেন;— মারী এঁদের ভালোবেসে "ওধারের বাসিন্দা" নাম দিয়েছিলেন। ১৯১৯ থেকে ১৯৩৫-এর মধ্যে রেডিয়ম ইন্সটিটিউটে ৮৩১৯ জন রোগীকে চিকিৎসা করা হয়।

ক্লোদ্ রেগো ছিলেন সত্যিকারের ল্যাবরেটারি-সাধক। রেডিয়ম-যন্ত্রপাতি, আর একটি হাসপাতাল—এই নিয়েই ছিল তাঁর সাধনা। আরোগ্য রোগীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা দেখে প্রয়োজনের তাগিদে তিনি রেডিয়ম ধার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইউনিয়ন মিনিয়ের তাঁকে দশ গ্রাম রেডিয়ম দান করল। সরকারি সাহায্য ও নাগরিকদের দানের জন্যে তিনি আবেদন জানালেন: ব্যারন হেন্‌রি-দ্য-রথচাইল্ড ও লাজার ফ্রেয়র্ তাঁর প্রধান সহায় ছিলেন। আরও একজন মহান দাতা সন্তর্পণে নিজের পরিচয় গোপন রেখে কুরী-ফাউণ্ডেশনে ৩,৪০,০০০ ফ্রাঙ্ক দান করলেন।

এইভাবে ধীরে ধীরে রেডিও-চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র গড়ে উঠল। এই প্রতিষ্ঠান অসীম মর্যাদা পেল, বিভিন্ন দেশ থেকে দু'শোরও অধিক চিকিৎসক এখানে ক্যানসার চিকিৎসা-পদ্ধতি শিক্ষা করতে হাজির হলেন।

পদার্থবিদ ও রসায়নবিদ মাদাম কুরী শরীরতত্ত্ব ও চিকিৎসার ব্যাপারে অংশ গ্রহণ না করলেও এদের প্রগতির সঙ্গে মনেপ্রাণে যোগাযোগ রক্ষা ক'রে চলতেন। এই উচ্চমনা সম্পূর্ণ উদাসীন প্রফেসর রেগোর সঙ্গে সহকর্মী হিসেবে তাঁর অত্যন্ত মিল ছিল। মারীর মতো তিনিও চিরদিন সাংসারিক লাভের সুযোগ পরিহার ক'রে চলতেন, প্রসিদ্ধির জয়জয়কারকে সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করতেন। চিকিৎসার পশার জমিয়ে বড়লোক হবার কথা তাঁর মনেও আসত না। সুদক্ষ হস্তে পড়ে চিকিৎসার আশ্চর্য উপকার দেখে এই দুই পরিচালক যেভাবে মুগ্ধ হতেন, ঠিক তেমনি একটি ব্যাপারে দু'জনেই বিপন্ন

বোধ করতেন: সারা পৃথিবীময় রেডিয়মের অবিবেচিত অপব্যবহার এঁরা অসহায়ভাবে লক্ষ্য করতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে আজও চিকিৎসকেরা রোগীদের উপর এ জাতীয় চিকিৎসার গুরুত্ব না বুঝে "লাগে তো ভাল, না লাগে তো নাই"—এই মনোভাব নিয়ে রেডিয়ম প্রয়োগ করেন। কোথাও বা সত্বসংরক্ষিত ওষুধ, এমন কি রূপসজ্জা-সামগ্রীও "রেডিয়মের ভিত্তিতে প্রস্তুত" বলে বাজারে চালু হলো, কোথাও বা কুরীদের নামের অনুকরণে নাম জুড়ে বিক্রি হতে লাগল। এই জাতীয় উদ্যোক্তাদের ক্রিয়াকলাপ বিচার করতে বসব না, এটুকু শুধু বলতে পারি যে, এদের সঙ্গে আমার মা, সমগ্র কুরী-পরিবার, প্রফেসর রেগো এবং রেডিয়ম ইন্সটিটিউটের কোন যোগাযোগ ছিল না।

'দেখ তো, বিশেষ জরুরী কোন খবর আছে কি না!' ব্যস্তসমস্ত হয়ে মারী 'তাঁর বিনয়ী, বুদ্ধিমতী সেক্রেটারি' মাদাম রাজেকে বললেন। প্রায়ই খামের গায়ে সংক্ষিপ্ত ঠিকানা চোখে পড়ত: "মাদাম কুরী, পারী।"—কিংবা "মাদাম কুরী, বৈজ্ঞানিক, ফ্রান্স।" অর্ধেকেরও বেশী চিঠি আসত মনোবিকার-গ্রস্ত লোকদের কাছ থেকে, তাঁর স্বাক্ষর ও চিঠির জন্য অনুরোধ বহন ক'রে। স্বাক্ষরপ্রার্থীদের কাছে উত্তর যেত একখানা ছাপা কার্ডে এই ক'টি কথা নিয়ে: "মাদাম কুরী হাতের লেখা অথবা ছবিতে সই দিতে রাজী নন—দয়া ক'রে তাঁকে যেন মাপ করা হয়।"

আরও অনেক চিঠি আসত বিকারগ্রস্ত লেখকদের কাছ থেকে,—দশ-বারো পৃষ্ঠা চিঠি বিভিন্ন রঙের কালি দিয়ে লেখা। তারা সব পরিচয়হীন 'আবিষ্কারক,' উৎপীড়িত উন্মাদ, প্রণয়াসক্ত পাগল, এবং আশঙ্কাজনক উন্মত্ত লোক। তাদের 'চিঠির' একটিমাত্র জবাব ছিল উত্তর না দেওয়া।

আরও অনেক চিঠি অবশিষ্ট থেকে যেত। মাদাম কুরী বিচক্ষণতার সঙ্গে তাঁর সেক্রেটারিকে মুখে মুখে চিঠির জবাব বলে যেতেন, তার মধ্যে প্রবাসী সহকর্মীদের জন্য বিশেষ খবর যেত এবং যারা মনে করত মাদাম কুরী সবরকম অসুস্থতা ও যন্ত্রণার উপশম করতে পারেন, তাদের ব্যাকুল আবেদনের উত্তর থাকত। এছাড়া, যন্ত্রপাতির কারখানার কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি যেত; খরচের হিসাব, পাওয়ানা টাকার ফর্দ, "মাদাম ভ্যেভ্ কুরী, প্রফেসর ইন দি ফ্যাকাল্‌টি অব সায়েন্স"-কে উদ্দেশ্য ক'রে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে চিঠির জবাব: পরিচালনা সম্পর্কীয় কাগজের বন্যাকে মারী সাতচল্লিশটি পৃথক শক্ত

মলাটের ভেতর গুছিয়ে রাখতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথা তিনি মনেপ্রাণে পালন ক'রে চলতেন। যশ এবং নারীজীবনের মহিমার কোন মূল্যই তাঁর নিজের কাছে ছিল না, সুতরাং স্বাভাবিক ধারায় অধঃস্তন কর্মচারীর মতো বিজ্ঞানসভার অধিনায়কের কাছে "আন্তরিক শ্রদ্ধা" নিবেদন ক'রে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের কাছে "চিরকৃতজ্ঞ-ভৃত্য" দিয়ে দপ্তরের চিঠিপত্র দ্বিধাহীন চিত্তে শেষ করতেন।

বহির্জগতের সঙ্গে মাদাম কুরীর যোগাযোগ সাতচল্লিশটি মলাটের ভেতরও আবদ্ধ রইল না। সাক্ষাৎকারের দাবী জানিয়ে লোকে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলল। মঙ্গল ও শুক্রবারে মারী সবচেয়ে ভাল কালো পোশাকটি গায়ে দিতেন। মুখ অন্ধকার ক'রে, ভুরু নামিয়ে তিনি বলতেন: 'উপযুক্ত সাজ চড়াতে হবে, আজ যে আমার দিন।' ততক্ষণে ল্যাবরেটারির বাইরের ঘরে আবেদনকারী ও সাংবাদিকদের ভিড় জমে যেত; মাদাম রাজে আগে থেকে সাংবাদিকদের সাবধান ক'রে দিত: 'শুধু যদি আপনাদের কাজের কথা থাকে তবেই তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। মাদাম কুরী কারো সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ করেন না।' মাদাম কুরীকে বিনয়ের প্রতীক বলা যেতে পারে; কিন্তু তবু ঐ ছোট্ট অনাড়ম্বর অসুবিধাজনক ঘরখানার শক্ত চেয়ারে বসে মাদাম কুরীর আঙুল মট্‌কানো ও বারবার সন্তর্পণে ঘড়ির দিকে তাকানো লক্ষ্য ক'রে কোন সাংবাদিক বেশীক্ষণ কথাবার্তা চালাতে সাহস পেত না। সোম ও বুধবারে মারী ঘুম থেকে ওঠা অবধি অত্যন্ত ব্যস্ত ও উত্তেজিত থাকতেন। এই দুটি দিন তাঁকে পাঁচটার সময়ে বক্তৃতা দিতে হতো। দুপুরে খাওয়ার পর কে ত্থ বেতুনে নিজের পড়ার ঘর বন্ধ ক'রে একটি সাদা কাগজে বক্তৃতার অংশগুলি টুকে নিতেন। সাড়ে-চারটের সময়ে ল্যাবরেটারিতে গিয়ে একটা ছোট ঘরে বিশ্রাম করতেন। এসময়টা তিনি একাগ্রচিত্ত, উদ্বিগ্ন ও দুরধিগম্য হয়ে উঠতেন। পঁচিশ বছর ধরে তিনি পড়িয়ে এসেছেন, অথচ প্রত্যেকবার ঐ ছোট্ট গ্যালারি-ঘরে বিশ-তিরিশটি ছেলে মেয়ে তাঁকে দেখে একযোগে উঠে দাঁড়াবে একথা ভেবে এখনও তিনি ভয় পান!

অক্লান্ত এবং প্রচণ্ড পরিশ্রম। তাঁর "অবসর মুহূর্তে" মারী বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এবং বই রচনা করতেন। বিভিন্ন আণবিক ভারযুক্ত অভিন্ন একাধিক রাসায়নিক পদার্থ-বিষয়ক তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ, পিয়ের কুরীর সংক্ষিপ্ত মর্মস্পর্শী জীবনগাথা, মাদাম কুরীর বক্তৃতাগুলির একত্র সংকলন···এমনই সব রচনা।

এই আশ্চর্য ফলপ্রসূ কয়টি বৎসর ধরে কিন্তু এক নাটকীয় সংগ্রাম চলছিল : মাদাম কুরীর অন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা হলো।

১৯২০ সালে ডাক্তার বললেন, দুটি চোখে ছানি পড়ে ধীরে ধীরে তাঁর দৃষ্টি আচ্ছন্ন করবে। অন্তরের ব্যথা মারী অন্তরেই চেপে রাখলেন। কোনরকম দুর্বলতা প্রকাশ না ক'রে, মেয়েদের এই দুঃসংবাদ দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকারের উপায় আলোচনা করতে বসলেন; দুই বা তিন বৎসর পরে অস্ত্রোপচার করতেই হবে।...এখন থেকে এই দীর্ঘ প্রতীক্ষার দিনগুলির মাঝে তাঁর কাজ ও নিজের মধ্যে স্থূল থেকে স্থূলতর পর্দার ব্যবধান রচিত হবে।

১৯২০-র ১০ই নভেম্বর মারী লিখলেন ব্রনিয়াকে : 'চক্ষু, কর্ণ আজ আমার সবচেয়ে বড় বাধা। দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে এসেছে এবং সে-বিষয়ে সম্ভবতঃ বিশেষ কিছু করাও যাবে না। কানের ভেতর চব্বিশ ঘণ্টা গুন্‌গুন্ শব্দ শুনি, মাঝে মাঝে এত প্রচণ্ড হয়ে ওঠে সে-আওয়াজ, যে, রীতিমত কষ্ট বোধ হয়। এবিষয়ে আমার দুর্ভাবনার অন্ত নেই। হয়তো আমার কাজে বাধা পড়বে, একেবারে অসাধ্য হয়েও উঠতে পারে। এইসব অসুবিধার জন্য রেডিয়ম হয়তো কিছু পরিমাণে দায়ী, কিন্তু নিশ্চয় ক'রে কিছু বলা যায় না।

'আমার বর্তমান অসুবিধাগুলো হলো এই। আর যাই করো এবিষয়ে কারো কাছে বলো না, কারণ চারদিকে জানাজানি হয়, তা আমি চাই না। এখন এস অন্য কথায়।...'

আইরিন, ইভ, নিজের ভাইবোন, একান্ত অন্তরঙ্গদের কাছেই শুধু বলতেন : 'কাউকে বলো না।' তাঁর মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে, এখবর ভুলক্রমে বাইরে ছড়িয়ে গেলে সংবাদপত্রে প্রকাশ হয়ে যাবে : 'মাদাম কুরী অথর্ব হয়ে পড়েছেন।'

আত্মীয় স্বজন ও তাঁর চিকিৎসকেরা, ডক্টর মোরা ও পেতিৎ, এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন। মারী একটা ছদ্ম নাম নিলেন : মাদাম কারে। পরিচয়হীনা এক বৃদ্ধা, দুই চোখ যাঁর ছানিতে অন্ধ হয়ে এসেছে···মাদাম কারে, মাদাম কুরী নন। চোখের ডাক্তারের কাছ থেকে ইভ মাদাম কারের চশমা নিয়ে এল।

কুয়াশা ঢাকা রাস্তা পার হবার সময়ে বা সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়ে মারী কিছুই দেখতে পেতেন না, তখন মেয়েদের মধ্যে একজন তাঁর হাত ধরত এবং গোপনে হাতে চাপ দিয়ে সামনের বাধা বিপত্তির ইঙ্গিত দিত। টেবিল-ঢাকনির ওপর পরম বিশ্বাসে হাত বুলিয়ে করুণভাবে নুনের বাটি খুঁজতেন।

কিন্তু ল্যাবরেটারিতে এই দুঃসাহসিক অথচ অসম্ভব অভিনয় কতদিন চালানো সম্ভব? ইভ বলল যে, মায়ের ঘনিষ্ঠতম কর্মী বন্ধুদের সাহায্যে অনুবীক্ষণযন্ত্র এবং ওজনের যন্ত্রপাতির সূক্ষ্ম কাজগুলো চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে। শুকনো গলায় মারী জবাব দিলেন: 'আমার চোখ গেছে একথা কারুর জেনে কাজ নেই।' সূক্ষ্মতম কাজগুলির জন্য তিনি "অন্ধলোকের কর্মপন্থা" আবিষ্কার ক'রে ফেললেন। সবচেয়ে শক্তিমান লেন্‌স্ ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন এবং যন্ত্রপাতির সংখ্যা লেখা পিঠে মোটা মোটা রঙীন রেখা টেনে চিহ্নিত ক'রে নিলেন। বক্তৃতা দেবার মোটামুটি যে খসড়া করতেন, তাও বড় বড় হরফে লিখে নিতেন এবং গ্যালারি-ঘরের আধো অন্ধকারেও সে-লেখা পড়তে পারতেন। অসীম কৌশলে তিনি নিজের বিপদ লোকচক্ষুর অন্তরালেই রেখে দিলেন। যদি কোন শিষ্য সূক্ষ্মরেখাবিশিষ্ট পরীক্ষামূলক ছবি মাদাম কুরীকে দিতে বাধ্য হতো, মারী প্রথমে সুচতুর প্রশ্নে কৌশলে প্রয়োজনীয় তথ্যটি জেনে নিয়ে মনে মনে ছবির কাঠামো এঁকে নিতেন। তারপর ছবির কাঁচের প্লেটখানা হাতে নিয়ে নাড়া চাড়া ক'রে যেন সবই দেখতে পাচ্ছেন, এমনি ভাব দেখাতেন।...

এত সাবধানতা, এমন উচ্চস্তরের কৌশল অবলম্বন করা সত্ত্বেও ল্যাবরেটারির চোখে ধুলো দেওয়া গেল না। কিন্তু তারা এসম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করল না; মারীর মতো চতুর ভাবে তাদের সব-জানাকে তাঁর কাছ থেকে গোপন ক'রে রাখল।

মারী কুরী ইভকে লেখেন: ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই:

'ডার্লিং, বৃহস্পতিবার সকালে ১৮ই তারিখে আমার চোখে অস্ত্রোপচার করা হবে। তুমি যদি আগের দিন এসে পৌছতে পার তাহলেই চলবে। প্রচণ্ড গরম পড়েছে, তোমার কষ্ট হবে আশঙ্কা হচ্ছে।

'লারকুয়েস্তে আমাদের বন্ধুবান্ধবদের তুমি এই মর্মে জানিও যে, আমরা দু'জনে একখানা লেখা আরম্ভ করেছিলাম, সেটাই শেষ করার তাগিদ এসেছে ব'লে তোমার আসা প্রয়োজন।

'আমার অনেক চুমু নাও।—মা।

'যা না বললেই নয়, সেটুকুই তাদের বলো, মা মণি।'

এরপরে হাসপাতালে ক'দিন বেশ গরমের মধ্যে কাটল, অন্ধ মাদাম কুরে আহত মুখখানায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নীরব নিথর হয়ে পড়ে থাকতেন আর ইভ

চামচ-ক'রে তাঁকে খাইয়ে দিত। অচিন্তিত জটিলতার সূত্রপাতে উদ্বেগের কারণ ঘটল: রক্তস্রাবের দরুন কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সেরে ওঠার আশাভরসা গেল। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে আরও দুটি এবং ১৯৩০-এ চতুর্থ অস্ত্রোপচার হলো। চোখ সম্পূর্ণ সারতে না সারতে মারী আবার চোখের ব্যবহার শুরু করলেন, এদিকে চোখের অবস্থা কিন্তু সাংঘাতিক খারাপ হয়েছিল এবং দৃষ্টিও তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

প্রথম অস্ত্রোপচারের কয়েক মাস পরে ক্যালভেয়র থেকে ইভকে লিখলেন:

'আমি চশমা ছাড়াই চলা-ফেরা করার অভ্যাস করেছি এবং বেশ কিছুটা এগিয়েওছি। এবড়োখেবড়ো বিশ্রী পাথর ভরতি দুটো পাহাড়ের ওপর দুবার দুটো দলের সঙ্গে বেড়িয়ে এলাম। দিব্যি গেলাম, তাড়াতাড়ি হেঁটেও এলাম। যে অসুবিধা হয়, সেটা হলো একসঙ্গে দুটো ক'রে জিনিস দেখা, তাতেই আগন্তুক মানুষদের চিনতে কষ্ট হয়। দৈনিক কিছু লেখাপড়া করি। "এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা"র জন্য যে প্রবন্ধখানা লিখছি তাতে তোমার সাহায্য দরকার হবে।'

ধীরে ধীরে নিজের দুর্দশাকে তিনি জয় করলেন। স্থূল কাঁচের সাহায্যে প্রায় স্বাভাবিক দৃষ্টি তিনি অর্জন করলেন, একা বেরোলেন, এমনকি গাড়ি পর্যন্ত চালালেন এবং ল্যাবরেটারিতে সূক্ষ্ম মাপ-জোকের কাজও আবার শুরু করলেন। আশ্চর্য ঘটনা হলো এই যে, মারী অন্ধকার থেকে আলোর জগতে ফিরে এলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাজ চালিয়ে গেলেন।

১৯২৭-এর সেপ্টেম্বর মাসে মাদাম কুরী ব্রনিয়াকে একটা ছোট চিঠি লেখেন, তাঁর এই জয়ের মূলমন্ত্র সে-চিঠি থেকে পাওয়া যায়:

'মাঝে মাঝে আমার মনটা দমে যায়, আমি ভাবতে শুরু করি, এবার বোধহয় আমার কাজ বন্ধ ক'রে দেশে গিয়ে বাগান ক'রে দিন কাটাবার সময় এসেছে। কিন্তু আমার হাজার বাঁধন, জানি না কবে এসবের ব্যবস্থা ক'রে উঠতে পারব। এই সঙ্গে আরও একটা কথা বুঝতে পারছি না যে, শুধুমাত্র বিজ্ঞানের বই লিখে ল্যাবরেটারির সংস্পর্শ ছেড়ে আমি বাঁচব কি ক'রে?'

"ল্যাবরেটারি ছাড়া বাঁচব কিনা জানি না,"—মারী কুরীর এই স্বীকৃতির ব্যাকুলতা বুঝতে হলে দৈনিক সহস্র কর্তব্যের অবসানে তাঁকে প্রাণাধিক যন্ত্র-পাতির সামনে এসে দাঁড়ানোর মূর্তিটা দেখতে হবে, দেখতে হবে তাঁর সেই একাগ্র সাধনার রূপখানা। তাঁর সেই শীর্ণ মুখে যে নিবিড়তা, যে অপার আনন্দের আলো ফুটে উঠত, তার জন্য বিশেষ কোন পরীক্ষার প্রয়োজন হতো না। কাঁচের শিশিবোতল তৈরি করে যারা, তাদের মতো ফুঁ দিয়ে

কঠিন কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন ক'রে, নিখুঁত ভাবে ওজন ক'রে তিনি অসীম আনন্দ পেতেন। মাদমোয়াজেল শামী নামে এক মনোযোগী ও সচেতন কর্মী মাদাম কুরীর দৈনন্দিন জীবনের যে বর্ণনা করেছেন, তার মতো এমন আনন্দবিহ্বল মূর্তি তাঁর কোন ছবিতে ধরা পড়ে নি :

'তাপ মাত্রার গোলমালের ভয়ে সে-ঘরে আগুন জ্বালতে দিতেন না, ঠাণ্ডায় আধো অন্ধকারে তিনি যন্ত্রের সামনে বসে আছেন। যন্ত্রপাতি আবরণ-হীন, ক্রনোমিটর চালু করা হয়েছে, দাড়ি-পাল্লায় ওজন হচ্ছে ইত্যাদি পর পর কাজগুলো মাদাম কুরী আশ্চর্য অভ্যস্ত হাতে ছন্দময় ভঙ্গীতে সেরে যেতেন। কোন পিয়ানোবাদক মাদাম কুরীর মতো এমন দক্ষতার সঙ্গে হাত চালিয়ে যেতে পারতেন কিনা সন্দেহ।'

আকুল আগ্রহে হিসেব-নিকেশ ক'রে ফলাফল মেলাতে বসে যখন দেখতেন যে, পার্থক্যের মাত্রা অনুমোদিত সীমার অনেক নীচেই রয়ে গেছে, তখন তাঁর মুখে অকৃত্রিম আনন্দের আভা ফুটে উঠত, কারণ তখনই তিনি উত্তরের ত্রুটি-হীনতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতেন। এই কাজের সময় বাকী দুনিয়া তাঁর চোখের ওপর থেকে মুছে যেত। ১৯২৭-এ আইরিন যখন ভীষণ অসুস্থ এবং মারী দুশ্চিন্তায়, দুর্ভাবনায় হতাশ হয়ে পড়েছেন, সেসময়ে এক বন্ধু ল্যাবরেটারিতে তাঁর কাছে মেয়ের খবর জানতে এসেছিলেন। সে-ভদ্রলোকের কপালে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত উত্তর ও হিমশীতল দৃষ্টিমাত্র জুটল। ভদ্রলোক চলে যেতেই মারী চটে গিয়ে সহকারীকে প্রশ্ন করলেন : 'কাজের সময় মানুষকে লোকে বিরক্ত করতে আসে কেন বলতে পার?'

অত্যন্ত জরুরী এক পরীক্ষার বর্ণনায় মাদমোয়াজেল শামী লিখছেন : 'আল্‌ফা রশ্মির স্পেক্‌ট্রামের জন্য এক্‌টিনিয়ম 'এক্স' (Actinium X)-এর প্রস্তুতি মৃত্যুর আগে মারীর শেষকাজ।'

শুদ্ধ এক্‌টিনিয়ম 'এক্স'কে বিচ্ছুরণের অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজন ছিল। সারাদিনের পরিশ্রম এই বিচ্ছিন্ন করার পক্ষে যথেষ্ট হলো না। খাবার না খেয়েই মাদাম কুরী সারা সন্ধ্যেটা ল্যাবরেটারিতে কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু মৌলিক উপাদান বিচ্ছিন্ন করার পদ্ধতি অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ, সুতরাং যাতে উদ্ধৃত মূলের উৎস "শুকিয়ে" আসতে না পারে, সেজন্য রাত্রে একজন কারুর ল্যাবরেটারিতে থাকা দরকার হলো।

রাত দুটো। শেষ কাজ তখনও বাকী। মাটি থেকে উঁচুতে বিশেষ যত্নে

সংরক্ষিত অবস্থায় তরল পদার্থটিকে ঘণ্টাখানেক ধরে জাল দিয়ে এক নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পৌঁছে দিতে হবে। একঘেয়ে শব্দ ক'রে যন্ত্রটি ঘুরে চলেছে, কিন্তু মাদাম কুরী তার পাশ থেকে সরে ঘরের বাইরে গেলেন না। যন্ত্রটির দিকে এমন একাগ্রভাবে চেয়ে রইলেন, যেন তাঁর অন্তরের ঐকান্তিক আগ্রহই এক্‌টিনিয়ম 'এক্স'-এর উদ্ধার করার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই মুহূর্তে মাদাম কুরীর কাছে এই যন্ত্রটি ভিন্ন আর সমস্ত জিনিসের সত্তা লোপ পেয়েছে। তাঁর আগামী কালের জীবন অথবা ক্লান্তি কোন কিছুই তাঁর চেতনায় নেই। পরিপূর্ণ আত্মবিলুপ্তি, কাজের প্রতি তন্ময় আত্মনিবেদন···

আশানুরূপ ফল না পেলে মারী যেন এক অজানা আতঙ্কে মর্মাহত হতেন। বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে হাত রেখে চেয়ারে বসে পড়তেন, পিঠ কুঁজো, শূন্য দৃষ্টি, নির্বাক, অসহায় এক কৃষক রমণী যেন। আশেপাশের সহকর্মীরা আকস্মিক দুর্ঘটনার আশঙ্কায় কোনও প্রশ্ন করলে বিপদভরা কণ্ঠে যা' বলতেন তার অর্থ হয় : 'এক্‌টিনিয়ম 'এক্সকে' আমরা ধরতে পারলাম না।' কখনও কখনও সোজাসুজি শত্রুর প্রতি দোষারোপ ক'রে বলতেন : 'ঐ পোলোনিয়মের আমার ওপর রাগ আছে।'

কিন্তু সফল হলে তিনি উত্তেজনায় ছেলেমানুষ হয়ে যেতেন। খুশী হয়ে বাগানে বেড়িয়ে আসতেন, যেন লতানে গোলাপ, লিণ্ডেন্ ফুল আর সূর্যের কাছে মনের আনন্দটুকু নিবেদন ক'রে আসতেন। বিজ্ঞানের সঙ্গে সন্ধি ক'রে, হেসে, অবাক হয়ে তাঁর দিন কাটত।

তাঁর এই খোসমেজাজের সুযোগে কোন গবেষক তার গবেষণার কাজ তাঁকে দেখতে বললে তিনি সাগ্রহে তার সঙ্গে গিয়ে, যন্ত্রের ওপর ঝুঁকে পড়ে আণবিক সংখ্যা-গণনাটি দেখতেন এবং রেডিয়ম প্রতিক্রিয়ার অশোধিত ধাতুর লবনকে সহসা রশ্মি বিকীরণ করতে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন।

তাঁর ধূসর-ছোঁয়া চোখদুটি এই পরিচিত যাদুর সামনে মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখাত। মনে হতো বটেচেলি বা ভারমিয়েরের আঁকা জগদ্বিখ্যাত কোন অপূর্ব ছবির দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে। মৃদুস্বরে উচ্চারণ করতেন :

'ওঃ কি অপূর্ব দৃশ্য!'

॥ কর্তব্যের অবসান ॥

২৭

মাদাম কুরী প্রায়ই নিজের মৃত্যুর কথা বলতেন। পরম প্রশান্তির সঙ্গে এই অবধারিত ঘটনার উল্লেখ ক'রে তার বাস্তব পরিণামের বিষয় আলোচনা করতেন। সম্পূর্ণ নিরাসক্তভাবে এই জাতীয় মন্তব্য করতেন: 'বেশ বুঝতে পারছি আমার দিন ঘনিয়ে আসছে।' কিংবা, 'আমার অবর্তমানে রেডিয়ম ইন্সটিটিউটের কি হবে, আমার সেই এক চিন্তা রয়ে গেল।'

কিন্তু একে তিনি কিছুতেই খুশি মনে গ্রহণ করতে পারছিলেন না। শেষের কথা ভাবতে তাঁর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠত। গুণমুগ্ধের দল দূর থেকে মনে করত কি অসাধারণ জীবনই না তিনি পেছনে ফেলে রেখে যাবেন। কিন্তু মারীর চোখে দায়িত্বের তুলনায় এ জীবন তুচ্ছ।

ত্রিশ বছর আগে মৃত্যুর ছায়া সামনে রেখে পিয়ের কুরী মনে প্রাণে কাজের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলেন। পরে মারী সেই অস্পষ্ট কর্তব্যের আহ্বান স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। আশঙ্কিত আক্রমণের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য তাঁর চারপাশ দিয়ে পরিকল্পনা ও কর্তব্যের প্রাচীর গড়ে তুলেছিলেন। ক্রমবর্ধমান ক্লান্তি, পুরোনো ব্যাধি, ক্ষয়িষ্ণু দৃষ্টিশক্তি, কাঁধের বাত ও কানের ভেতর গুঞ্জনধ্বনি ইত্যাদি যাবতীয় দুর্বলতাকে তিনি ঘৃণা করতেন।

এসব চিন্তা ক'রে কি লাভ? এর চেয়েও অনেক বেশী প্রয়োজনীয় বহু কর্তব্য পড়ে আছে। মারী সম্প্রতি অশোধিত ধাতুর ব্যাপক সংশোধন ক্রিয়ার জন্য আরকুইলে একটা কারখানা গড়েছেন। বহুকাল ধরে এমনই এক কারখানার স্বপ্ন দেখতেন তিনি, আজ সেখানে অতি উৎসাহে প্রাথমিক পরীক্ষার কাজ আরম্ভ করেছেন। সেসময়ে তাঁর বই লেখার কাজও চলছিল— বিজ্ঞানের এক স্মৃতিস্তম্ভ গড়তে বসেছিলেন তিনি যা' মাদাম কুরীর মৃত্যুর পর আর কারও লেখা সম্ভব হবে না। এবং এই একই সঙ্গে এক্টিনিয়ম জাতীয় পদার্থের গবেষণা যেন এগোতেই চায় না ব'লে তাঁর মনে হচ্ছিল…এটা শেষ হলে আল্‌ফারশ্মির "সূক্ষ্মগঠন" সম্বন্ধে বিষদভাবে গবেষণা চালাতে

হবে। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ ক'রে মারী উঠে পড়ে ল্যাবরেটারির দিকে গেলেন, তারপর আবার রাতের খাওয়া সেরে সেখানেই ফিরে এলেন।···

অসম্ভব দ্রুতগতিতে কাজ এগিয়ে নোবার চেষ্টায় বরাবরের মতো এবারেও তিনি অত্যন্ত অসাবধান হয়ে পড়লেন। তেজষ্ক্রিয় পদার্থভরা টিউবগুলো চিম্‌টে দিয়ে ধরা; মুখখোলা টিউবে কখনও হাত না দেওয়া; ক্ষতিকর বিচ্ছুরণ থেকে বাঁচবার জন্য সীসের "বাক্‌লার" ব্যবহার করা ইত্যাদি যেসব বিধি তিনি ছাত্রদের ওপর একরকম জোর করেই চাপাতেন, নিজে কোনও দিন সেসব মেনে চলতেন না। রেডিয়ম ইন্সটিটিউটের নিয়মগুলির মধ্যে কেবলমাত্র রক্তপরীক্ষা করাতে তিনি আপত্তি করতেন না। তাঁর রক্ত ছিল অস্বাভাবিক। কিন্তু তাতে কি?···পঁয়ত্রিশ বছর ধরে মাদাম কুরী রেডিয়ম নিয়ে কাজ করেছেন, রেডিয়ম নিষ্ক্রান্ত গ্যাস-দূষিত বাতাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। যুদ্ধের সময় চার বছর ধরে এর চেয়েও বিপজ্জনক রঞ্জেন-যন্ত্রের সংস্পর্শে তাঁর আসতে হয়েছে। যে পরিমাণ বিপদ তিনি মাথায় নিয়েছিলেন, তার তুলনায় সামান্য একটু রক্তের দোষ, হাতে বিরক্তিজনক ও কষ্টকর পোড়া—যা' মাঝে মাঝে বেড়ে ওঠে, মাঝে মাঝে শুকিয়ে যায়, এ আর এমন বেশী কি শাস্তি।

ডিসেম্বর মাস, ১৯৩৩। সামান্য একটা অসুখে মাদাম কুরী একটু বেশীই কাতর হলেন। এক্সরে ক'রে দেখা গেল গল্‌ব্লাডারে একটা বেশ বড় পাথর রয়েছে। ম'সিয়ে শক্লোদোভস্কি তো এই রোগেই মারা গেছেন!···অস্ত্রোপচারের ভয়ে মারী নিজের ওপর কঠিন সব বিধিনিষেধ জারি করলেন এবং নিজের যত্ন নিতে শুরু করলেন।

যিনি এতকাল সবরকম আরাম জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন,—সো'এ একটা বাড়ি করা, পারীর বাসাটি বদল করা—তাঁর যেসব সাধ এতকাল ঠেলে রেখেছিলেন—হঠাৎ তিনি যেন এ সব নিয়ে উঠেপড়ে লাগলেন। খরচপত্রের হিসেব নিয়ে বসলেন, সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেললেন এবং দ্বিধাহীন মনে অনেক খরচের মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন। স্থির হলো যে, ১৯৩৪-এর অক্টোবর মাসে, আবহাওয়া পরিষ্কার হলে সো'-এর বাড়ি তৈরি শুরু হবে। মারী কে দ্য বেতুনের বাসা ছেড়ে ইউনিভারসিটির কাছাকাছি একটা নতুন ফ্ল্যাটে উঠে যাবেন। ক্লান্ত হয়ে পড়লেও তিনি নিজের কাছে প্রমাণ করতে চাইতেন যে, তাঁর স্বাস্থ্য মোটেই খারাপ হয় নি। তিনি ভার্সাইতে স্কেট্ করতে

গেলেন, স্বাভয়ে আইরিনের সঙ্গে স্কী খেলায় যোগ দিলেন, শরীরটাকে যে এতখানি হাল্‌কা আর ঝরঝরে রাখতে পেরেছেন—এ কথা ভেবে আনন্দ পেলেন। ঈস্টারের সময়ে ব্রনিয়াকে কাছে পেয়ে মোটরে ক'রে দক্ষিণে বেড়াবেন স্থির করলেন।

এই বেড়ানোই কাল হলো। দিদিকে কয়েকটি সুন্দর দৃশ্য দেখাবার ইচ্ছায় মারী একটু ঘুরপথ নিলেন। যখন ক্যাভালিয়েরে নিজের বাংলোয় পৌঁছলেন, তখন তিনি অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়লেন, পথে ঠাণ্ডাও লেগেছিল। হিমশীতল বাড়িতে পৌঁছে হিটার জ্বালানো হলো বটে, কিন্তু তবু ঘর গরম হতে বেশ সময় লাগল। ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে মারী হঠাৎ ভেঙ্গে পড়লেন। ব্রনিয়ার আলিঙ্গনের মধ্যে অসুস্থ অসহায় শিশুর মতো কাঁদতে লাগলেন। নিজের বইখানার চিন্তা মন জুড়ে ছিল, হঠাৎ মনে হলো ব্রঙ্কাইটিসে ভুগলে সেটি তো শেষ করা হবে না। পরদিন সকালে মারী এই মানসিক অবসাদ জয় করলেন, আর কখনও এমন ঘটে নি।

কয়েকটি উজ্জ্বল দিন তাঁর মনের ভার হাল্‌কা ক'রে দিল, তিনি ভরসা পেলেন। পারীতে ফিরে বেশ ভাল বোধ করলেন। একজন ডাক্তার বলল তাঁর ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল। এছাড়া, গত চল্লিশবছর ধরে প্রত্যেক ডাক্তার যা' বলেছেন, ইনিও সেই কথাই বললেন, যে তাঁর দেহ অত্যধিক পরিশ্রান্ত। সামান্য জ্বর গায়ে লেগেই থাকত, মারী সেটুকু গ্রাহ্যই করতেন না। কিছু দুশ্চিন্তা নিয়েই ব্রনিয়াকে পোল্যাণ্ডে ফিরতে হলো। ওয়ার্‌স'-গামী ট্রেনের পাশে যে প্ল্যাটফর্মে এর আগে বহুবার দেখা হয়েছে, সেইখানে শেষবারের মতো দুইবোন আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন।

মারী সুস্থতা আর অসুস্থতার মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলেন। যেদিন সুবিধে বুঝতেন, ল্যাবরেটারিতে যেতেন। যখন তা সম্ভব হতো না, তখন বাড়ি বসে বই লিখতেন। নিজের নতুন বাসায় সপ্তাহে বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আসতেন, আর সো'-এর বাড়ির প্ল্যান তৈরি করতেন।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে তিনি ব্রনিয়াকে লেখেন :

'বাগান-ঘেরা একখানা বাড়ির জন্য মনটা আকুল হয়ে উঠেছে। আমার মনে হয় এবারকার প্ল্যানটা ঠিক হয়েছে। বাড়ির দামটা আমার নাগালের মধ্যে এসেছে। কাজেই শিগগিরই বাড়ির ভিত গেঁথে ফেলব।'

কিন্তু ইতিমধ্যে দেহের অভ্যন্তরে গোপন শত্রু বেশ কায়েমী দখল জমিয়ে

বসেছে। এক নাগাড়ে তা লেগে রইল এবং দেহের কাঁপুনি বেড়েই চলল। মাকে ডাক্তার দেখাতে রাজী করতে ইভকে কৌশল অবলম্বন করতে হলো। ডাক্তারি যারা করে, তারা সবাই কেমন যেন "ঘ্যানঘেনে" এবং "এদের কিছুতেই টাকা নেওয়ান যায় না"—কোন ফরাসী ডাক্তারই মাদাম কুরীর কাছ থেকে কখনও ফী নিতেন না—সেইজন্য মারী কিছুতেই ডাক্তার দেখাতে চাইতেন না। প্রফেসর রেগো মারীর সঙ্গে এমনি দেখা করতে এলেন এবং বন্ধু ডাক্তার র‍্যাভো'র নির্দেশ নিয়ে হাসপাতালগুলোর ডাক্তার প্রফেসর বুলিনকে একবার দেখাবার কথা মারীর কাছে প্রস্তাব করলেন। মারীর রক্তহীন মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন: 'আপনাকে শুয়ে থাকতে হবে। আপনাকে বিশ্রাম করতেই হবে।'

এ ধরনের মন্তব্য মাদাম কুরীর কাছে নতুন নয়। এ কথায় কান দেওয়া তিনি দরকার মনে করলেন না। কে স্ত বেতুনের ক্লান্তিকর সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করতেই থাকলেন, রেডিয়ম ইন্সটিটিউটে প্রতিদিন হাজিরা দেওয়াও বন্ধ করলেন না। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে মে মাসে একদিন তিনি সাড়ে-তিনটে পর্যন্ত ল্যাবরেটারিতে থেকে গেলেন এবং দুশ্চিন্তাভরে তাঁর চিরসাথী টিউব আর অন্যান্য যন্ত্রপাতির গায়ে হাত বুলোতে লাগলেন। আশেপাশের কর্মীদের বললেন: 'আমার জ্বর এসেছে, বাড়ি ফেরা দরকার।'

তিনি বাগানে এলেন। ফুলেরা নতুন রঙের ডালি সাজিয়ে বসে আছে। হঠাৎ একটা শুকনো গোলাপ-লতার কাছে গিয়ে তাঁর কারিগরকে ডেকে বললেন: 'জর্জ, এই গোলাপ লতাটা দেখেছ ? এক্ষুণি এর যত্ন দরকার।' গাড়িতে ওঠার আগে আবার বললেন: 'জর্জ, ভুলো না, গোলাপ লতাটা…'

একটি দুমড়ানো চারাগাছের প্রতি মমতাপূর্ণ দৃষ্টি—ল্যাবরেটারির কাছ থেকে এই তাঁর শেষ বিদায়।

এরপর আর তিনি বিছানা ছেড়ে উঠলেন না। গ্রিপপি নামে এক অজানা রোগের সঙ্গে অসম যুদ্ধ এবং ঘুরে ফিরে ব্রঙ্কাইটিসের ধাক্কা তাঁকে ক্লান্তির সীমায় নিয়ে গেল। তিনি হাসপাতালে গিয়ে ভালরকম চিকিৎসা করাতে রাজী হলেন। দু'খানা রেডিওগ্রাফ এবং পাঁচ ছয় রকম পরীক্ষা করার পর বিশেষজ্ঞরা হতভম্ব হয়ে গেলেন। শরীরের কোন অঙ্গই রোগাক্রান্ত বলে মনে হলো না, স্পষ্ট ক'রে কোন রোগ ধরা গেল না।

কিন্তু এক্সরের ছবিগুলোতে ফুসফুসের অতি পুরোনো ক্ষত এবং সামান্য একটু ঘায়ের ছবি পাওয়া গেল—সেই অনুসারে মারীর চিকিৎসা চলতে লাগল। আগের তুলনায় অবস্থার কোন পরিবর্তন হলো না। কে দ্য বেতুনে ফিরে যাবার পর "স্যানেটোরিয়ম" শব্দটি প্রথম উচ্চারণ করা হলো।

ভয়ে ভয়ে ইভ এই 'নির্বাসনের' কথা তাঁর সামনে উত্থাপন করল। এবারে আর তিনি অমত করলেন না। নির্মল বাতাসের ওপর তাঁর ভরসা ছিল। তিনি ভাবতেন শহরের ধুলো আর গোলমালে তাঁর সারতে দেরী হচ্ছে। ঠিক হলো যে ইভ যাবে তাঁর সঙ্গে এবং কয়েক সপ্তাহ মায়ের কাছে থাকবে। তারপর ইভের মামা ও মাসীরা আসবেন পোল্যাণ্ড থেকে মারীর সঙ্গে থাকতে। আইরিন আগষ্ট মাসটা মায়ের পাশে থাকবে, তারপর শরৎ পড়লে তিনি আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন।

রোগিনীর ঘরে আইরিন আর ফ্রেডরিক জোলিও ল্যাবরেটারির কাজের কথা, সো'-এর বাড়ির কথা, সদ্য শেষকরা বইখানার প্রুফ দেখার কথা আলোচনা করত। জর্জ গ্রিকুরফ নামে প্রফেসর রেগোর এক অল্পবয়সী সহকর্মী প্রতিদিন এসে খবর নিয়ে যেত। ইভ মায়ের নতুন বাড়ির দেওয়ালের কাগজের রঙ, পরদা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকত। মেয়ের চোখের দিকে চেয়ে মারী মৃদু হেসে বলতেন: 'হয়তো, অনর্থক আমরা এত ঝঞ্ঝাট সহ্য করছি।'

অনেক আপত্তি অনেক মিষ্টি কথা ইভ আগে থেকে তৈরি করে রাখত এবং মাদাম কুরীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য রাজমিস্ত্রীদের তাড়া দিত। ডাক্তাররা একেবারে নিরাশ হন নি, এমন কি বাড়িতেও কেউ খুব বেশী চিন্তিত বলে মনে হতো না, তবু কেন জানি, সম্পূর্ণ অকারণে তার মনে হতো যে, শেষের দিনটির আর দেরী নেই।

রুগ্না মায়ের একান্ত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ইভ সুন্দর বসন্তের দিনগুলো কাটিয়ে দিল। মারীর পরিপূর্ণ অন্তর, সচেতন কোমল হৃদয় অশেষ মাধুর্য নিয়ে নতুন ক'রে দেখা দিল, সেই মুহূর্তে এ যেন আর সহ্য করা যেত না। যেন আগেকার দিনের সেই "মিষ্টি মামণি!" সর্বোপরি তিনি যেন সেই বয়ঃসন্ধিক্ষণের মানুষ, যিনি ছেচল্লিশ বছর আগে নবীন বয়সের ধর্মে লিখেছিলেন:

'যারা আমার মতো এমন গভীরভাবে অনুভব করে এবং নিজের চরিত্রের

এই দিকটা সংশোধন করতে পারে না, তাদের অন্তত: চেষ্টা ক'রে বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি করা উচিত।'

তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন, স্পর্শকাতর ও অতিশয় চাপা স্বভাবের এই ছিল মূলমন্ত্র: সারা জীবনভোর তিনি স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস, আর দুর্বলতার স্বীকৃতি থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখেছিলেন।

শেষ সময় পর্যন্ত তিনি মনের কথা কারুর কাছে প্রকাশ করেন নি, কিংবা অনুযোগ করেন নি, ক্বচিৎ কখনও অল্প দু'চার কথায় হয়তো কিছুটা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। শুধু ভবিষ্যতের কথাই তিনি বলতেন···ল্যাবরেটারির ভবিষ্যৎ: তিনি আশা করতেন, বরং বিশ্বাসই করতেন যে আইরিন আর ফ্রেডরিক জোলিও কয়েক মাসের মধ্যে নোবেল প্রাইজ পাবে। তাঁর নতুন বাসায়, সো'-এর নতুন বাড়িতে তিনি নিজেকে কল্পনা করতেন, কিন্তু হায়! সে সব স্বপ্নই থেকে গেল!

আরও দুর্বল হয়ে পড়লেন তিনি। স্যানেটোরিয়মে নিয়ে যাবার আগে ইভ ফ্যাকালটির বাছাবাছা চারজন, ফ্রান্সের সেরা ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করতে চাইল। তাঁদের নাম করব না, কারণ তাতে মনে হতে পারে যে, আমি তাঁদের দোষারোপ করছি, কিংবা তাঁদের প্রতি আমার অন্যায় অকৃতজ্ঞতা পোষণ করছি। আধঘণ্টা ধরে তাঁরা নানাভাবে রোগাক্রান্ত মারীকে পরীক্ষা করলেন। সন্দেহভরে তাঁরা তাঁর পুরোনো যক্ষ্মার আশঙ্কা করলেন। পাহাড়ে গেলে তাঁরা জ্বরটা ছেড়ে যেতে পারে ব'লে আশা প্রকাশ করলেন।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাবার তোড়জোড় চলতে লাগল। একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ভিন্ন আর কাউকে দেখা করতে দেওয়া হতো না, মারীকে যতটা বিশ্রাম দেওয়া যায়, ততই মঙ্গল। এসব সত্ত্বেও তিনি গোপনে তাঁর সহকারিণী মাদাম কোতেলকে ডেকে কাজ বুঝিয়ে দিলেন: 'আমি ফিরে আসা পর্যন্ত 'একটিনিয়ম'কে তুমি সাবধানে তালা দিয়ে রেখো। সব ঠিক ঠিক রাখবে, আমি এ বিষয়ে তোমার ওপর ভরসা রাখি। ছুটির পর আমরা এ কাজে হাত দেব।'

হঠাৎ রোগটা বেয়াড়া দিকে মোড় নিল, তবু তক্ষুণি তাঁকে বাইরে নিয়ে যাবার জন্য ডাক্তারদের নির্দেশ এল। ট্রেন-যাত্রায় শুধু যন্ত্রণা বাড়ল; স্যাঁ জেরভে-তে পৌঁছে মারী ইভ আর নার্সের কোলের ওপর অজ্ঞান

হয়ে পড়লেন। শেষ অবধি যখন সঁসেল্‌মো স্যানেটোরিয়মের সবচেয়ে ভাল ঘরে এনে তাঁকে ওঠানো হলো, তক্ষুণি এক্সরে ক'রে দেখা গেল ফুসফুসের দোষ নেই, বৃথাই এই ট্রেন-যাত্রার কষ্ট তাঁকে দেওয়া হলো। শরীরের তাপ উঠে গেল ৪০° ডিগ্রিতে। (৪০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড=১০৪° ফারেনহাইট।) এ খবরটি মারীর কাছ থেকে গোপন করা গেল না, কারণ তিনি সর্বদাই বৈজ্ঞানিকের নজর দিয়ে থারমোমিটর দেখতেন। তখন আর প্রায় কথাই বলতে পারতেন না, কিন্তু দু'টি চোখে আশঙ্কা ফুটে উঠত। জেনেভার প্রফেসর রশ সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয়ে আগের কয়দিনের রক্ত পরীক্ষার ফলাফল হিসেব ক'রে দেখলেন যে, রক্তের মধ্যে সাদা আর লাল দুই শ্রেণীর রক্তকণিকাই অত্যন্ত দ্রুত বেগে কমে গেছে। এনিমিয়ার সবচেয়ে কঠিন অবস্থা ব'লে তিনি রোগ নির্ণয় করলেন। মারীর দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, তাঁর গলস্টোন হয়েছে। ডঃ রুশ মারীকে প্রবোধ দিলেন। অস্ত্রোপচারের দরকার হবে না ব'লে তাঁকে অভয় দিলেন এবং অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তাঁর চিকিৎসার ভার নিলেন। কিন্তু ক্লান্ত দেহ থেকে প্রাণ বিদায় নেবার জন্যে যেন অধীর হয়ে উঠেছে। এরপর শুরু হলো সেই পর্ব যাকে আমরা বলি "স্বাভাবিক মৃত্যু"—যেখানে অসম্ভব মনোবলের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে প্রাণ সহজে বের হতে পারে না। মায়ের শয্যাপার্শ্বে ইভকে আরেকটি সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হচ্ছিল :—এতক্ষণ পর্যন্ত মারীর পূর্ণ জ্ঞানসমৃদ্ধ মস্তিষ্কে মৃত্যুর চিন্তা প্রবেশ করে নি। হাল ছেড়ে দেওয়ার আঘাত থেকে মারীকে এই মানসিক অবস্থাই রক্ষা করতে পারবে—এ অসাধ্য সাধন করতেই হবে। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, শারীরিক যন্ত্রণা কমাতেই হবে। মনের সঙ্গে সঙ্গে দেহটাও আশ্বস্ত হলো। কঠিন কোন চিকিৎসা নয়; ভরসা দেবার জন্যে অনর্থক রক্ত-চালনার প্রয়াস নয়। পারিবারিক যোগাযোগ স্থাপনার কোন চেষ্টা নয়, কারণ বিছানার পাশে আত্মীয়বর্গের সমাবেশ দেখে রোগিনী নিশ্চিত-সত্যের সম্মুখীন হয়ে হঠাৎ বিমূঢ় হয়ে যেতে পারেন। সেই নিদারুণ দিন-গুলিতে যাঁরা আমার মাকে সাহায্য করেছিলেন তাদের নাম আমি চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রাখব। স্যানেটোরিয়মের পরিচালক ডাক্তার টোবে এবং ডাক্তার পিয়ের লুই তাঁদের জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় ক'রে মারীর চিকিৎসা করছিলেন। "মাদাম কুরী মৃত্যুশয্যায়"—এই নিদারুণ সত্যের আশঙ্কায় স্যানেটোরিয়মের আকাশ-বাতাস স্তব্ধ হয়ে গেল। সারা বাড়িটা শ্রদ্ধা,

নিস্তব্ধতা ও আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। মারীর ঘরে দু'জন ডাক্তার পরে পরে প্রহরা দিতেন। তাঁরা তাঁকে সাহায্য করতেন, সান্ত্বনা দিতেন। এই দারুণ সংগ্রামে ইভকে তাঁরা এই মিথ্যার অভিনয়ে সাহায্য করতেন এবং তার বলার অপেক্ষা না রেখেই, মারীর শেষযন্ত্রণা লাঘব করার জন্যে ঘুমের ওষুধ ও ইন্‌জেকশানের ব্যবস্থা করলেন।

৩রা জুলাই মাদাম কুরী শেষবারের মতো নিজের হাতে থারমোমিটর নিলেন, থরথর ক'রে হাত কাঁপতে লাগল। মৃত্যুর অবধারিত আগের নীচু তাপমাত্রা পড়তে পারলেন। তাঁর মুখে খুশির হাসি ফুটে উঠল। ইভ ভরসা দিল, এইবার তিনি ভাল হয়ে উঠবেন। জানালার বাইরে স্থির পাহাড়গুলো আর সূর্যের দিকে আশাভরা চোখ মেলে বললেন: 'ওষুধে নয়, উঁচু পাহাড়ের নির্মল বাতাসে আমি ভাল হয়ে উঠব…'

মৃত্যুযন্ত্রণার মাঝে তিনি অদ্ভুত সব কথা বলতে লাগলেন: 'আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না, কেমন যেন অনমনস্ক হয়ে পড়ছি।' জীবিত কোন লোকের নাম তিনি করেন নি। তার আগের দিন বড় মেয়ে আর জামাই এসে পৌঁছেছিল। আইরিন, ইভ কিংবা আর কোন আত্মীয়ের নাম ধরে ডাকলেন না। নিজের কাজের ছোট বড় চিন্তা সেই আশ্চর্য মস্তিষ্কের ভেতর ঘুরপাক খেতে খেতে অসংলগ্ন ভাষায় মাঝে মাঝে প্রকাশ পেতে লাগল: 'অধ্যায়গুলো সব একভাবে পর্ব ভাগ ক'রে সাজানো উচিত ছিল… আমি ঐ বইটি প্রকাশ করার কথা ভাবছিলাম…'

চায়ের পেয়ালায় চামচ নাড়তে নাড়তে—না, হয়তো ল্যাবরেটারির সূক্ষ্ম কোন যন্ত্রের ভেতর কাঁচের কাঠি নিয়ে কিছু করছিলেন:

'এটা রেডিয়ম না মেসোথোরিয়ম,—কোনটা দিয়ে করা হয়েছিল?'

মনুষ্য-জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁর চিরপ্রিয়, চিরপরিচিত "দ্রব্য"সমূহ, যার পায়ে তিনি জীবন ঢেলে দিয়েছিলেন—তাদের সঙ্গে চিরদিনের মতো মিলিত হলেন।

এরপর সব কথা জড়িয়ে গেল—শুধু মাঝে মাঝে, ডাক্তার ইন্‌জেকশান দিতে গেলে, 'এ আমি চাই না, আমায় তোমরা ছেড়ে দাও'—এ ধরনের চরম ক্লান্তিমাখা আর্তনাদ ক'রে উঠছিলেন।

তাঁর শেষের মুহূর্তগুলিতে অসম্ভব শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। তাঁর দুর্বলতা যেন বাইরের, যে দেহ ক্রমশই তাপহীন হয়ে আসছিল,

তার ভেতরে কি প্রচণ্ড বেগে অবিশ্রান্ত হৃদযন্ত্রটি কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল! আরও ষোল ঘণ্টা ডাক্তার পিয়ের লুই আর ইভ দু'জনে এই রোগিনীর দু'খানি হিমশীতল হাত ধরে বসে রইলেন···জীবন ও মরণ কেউই যেন এঁর দায়িত্ব নিতে রাজী নয়। উষামুহূর্তে সূর্যদেব যখন পাহাড়গুলোকে সোনালী রঙে রাঙিয়ে দিয়ে পবিত্র সুন্দর আকাশ-পথে যাত্রা শুরু করলেন, আর সেই রাশি রাশি আলোকরশ্মি রোগিনীর ঘর, শয্যা, শীর্ণ গণ্ডদেশ ও মৃত্যুর ছোঁয়া-লাগা নিথর চোখ দুটিকে পর্যন্ত আলোর জোয়ারে ভাসিয়ে দিল, তখন যেন বাধ্য হয়ে হৃদযন্ত্র তার কাজ বন্ধ করল।

সেই দেহের ওপর তখনও বিজ্ঞানের শেষ কথা বলা হয় নি।

রোগের অস্বাভাবিক সব লক্ষণ, অন্যান্য রক্তহীন রোগের রোগীদের থেকে রক্ত পরীক্ষার ভিন্ন ফলাফল, সব মিলিয়ে মূল দোষী সাব্যস্ত হলো রেডিয়ম।

প্রফেসর রেগো লিখলেন: 'মাদাম কুরী ও তাঁর স্বামী যে সকল তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধান আজীবন ক'রে গেছেন, মাদাম কুরীকে তাদেরই শিকার বলে ধরা যেতে পারে।'

সঁসেলমোতে ডাক্তার টোবে নিম্নলিখিত রিপোর্ট দিলেন: '১৯৩৪ সালের ৪ঠা জুলাই মাদাম কুরী সঁসেলমোতে মারা যান। জ্বরের সঙ্গে এপ্লাস্টিক পার্ণিশস্ এনিমিয়া অতি কঠিন ভাবে রোগিনীকে আক্রমণ করে। সম্ভবতঃ বহুকাল যাবৎ রেডিয়েশন সঞ্চিত হওয়ার ফলে অস্থিমজ্জায় কোন প্রতিক্রিয়া হয় নাই।'

নিস্তব্ধ স্যানেটোরিয়ম থেকে পৃথিবীময় খবর ছড়িয়ে গেল। কোথাও কোথাও বেশীরকম নাড়া দিয়ে গেল: ওয়ারস'তে হেলা আর যোসেফ শক্লো-দোভস্কি ট্রেনে ক'রে ফ্রান্সের দিকে ছুটে আসছিলেন, বার্লিনে সেই ট্রেনে বসেই তাঁরা এই দুঃসংবাদ পেলেন। আর ব্রনিয়া, বেচারী ব্রনিয়া বৃথাই সঁসেলমোতে সময় মতো পৌছে অতি প্রিয় মুখখানিকে শেষবারের মতো দেখতে চেয়েছিলেন! মঁপেলিয়েতে জ্যাক কুরী; লণ্ডনে মিসেস মেলনী, পারীতে বন্ধু-বান্ধবেরা সবাই এই দুঃসংবাদে শোকে মুহ্যমান হয়ে গেলেন।

রেডিয়ম ইন্সটিটিউটের নবীন বৈজ্ঞানিকের দল নীরব যন্ত্রপাতির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদল। জর্জ ফোর্নিয়ে নামে মারীর এক প্রিয় ছাত্র লিখল: 'আমরা সব হারালাম।'

এইসব শোক, উত্তেজনা ও সম্মানের ক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে সঁসেলমোয়

তাঁর বিছানায় মারী বৈজ্ঞানিক ও কর্মী—যাঁরা শেষ পর্যন্ত তাঁর পাশে ছিলেন—তাঁদেরই মাঝে আশ্রয় পেলেন। চোখের দেখা দেখেও তাঁর শান্তিভঙ্গ যাতে না হয় সেইজন্য কোন অপরিচিতকে সেখানে যেতে দেওয়া হলো না। বিদায় কালে কি অপূর্ব মহিমায় তিনি চলে গেলেন, সে-দৃশ্য কোন কুতুহলীর দৃষ্টিপথে আসতে দেওয়া হলো না।

সব কিছু নির্মল, শুভ্র; মস্ত কপাল ছাড়িয়ে তুষার-শুভ্র কেশ; শান্তিতে গাম্ভীর্যে সে যেন এক বীর যোদ্ধার মুখ। সেই মুহূর্তে পৃথিবীর মধ্যে সুন্দরতম, পবিত্রতম যেন সে-রূপ!

রেডিয়মে দগ্ধ ক্ষত-বিক্ষত হাত দুটির চিরপরিচিত নাড়াচাড়া বন্ধ হয়ে গেছে। বিছানার চাদরের ওপর দুটি হাত স্তব্ধ ও ভয়াবহ রকম ভাবে নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। সেই হাত দুটি দিয়ে কি অসাধ্যই না সাধিত হয়েছিল।

১৯৩৪ সালের ৬ই জুলাই শুক্রবার দুপুর বেলা মাদাম কুরী বক্তৃতা বা শোভাযাত্রাবিহীন, রাজনৈতিক বা সরকারি প্রতিনিধির বিনা উপস্থিতিতে মৃত্যুরাজ্যে স্থান গ্রহণ করলেন। সো'এ তাঁর আত্মীয় বন্ধু ও প্রিয় সহকর্মীদের সামনে তাঁকে সমাধিস্থ করা হলো। পিয়ের কুরীর কফিনের ওপর তাঁর কফিন রাখা হলো। ব্রনিয়া আর যোসেফ পোল্যাণ্ড থেকে বয়ে-আনা দু'মুঠো মাটি কবরের মধ্যে ফেলে দিলেন। সমাধিস্তম্ভে আরও একটি লাইন যোগ দেওয়া হলো:

॥ মারী কুরী-শক্লোদোভস্কা ১৮৬৭—১৯৩৪ ॥

একবছর পরে মারীর শেষ বই তরুণ "পদার্থবিদ্যাভিলাষী"দের কাছে তাঁর শেষ বার্তা পৌঁছে দিল। রেডিয়ম ইন্সটিটিউটে আবার কাজ শুরু হলো। আলোয় উজ্জ্বল লাইব্রেরি-কক্ষটিতে অন্যান্য বিজ্ঞানের বইগুলির সঙ্গে সেই বিরাট মোটা বইখানা রাখা হলো। ধূসর রঙের মলাটের উপর রচয়িতার নাম মুদ্রিত: "মাদাম পিয়ের কুরী, সরবনের অধ্যাপিকা, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যায় নোবেল পুরস্কারের সম্মানে সম্মানিতা।"

বইয়ের নামটি ছিল গুরুগম্ভীর, উজ্জ্বল একটি শব্দ:

॥ রেডিওএ্যাকটিভিটি বা তেজস্ক্রিয়তা ॥

পরিশিষ্ট

॥ মাদাম কুরীর পুরস্কার-তালিকা ॥

প্রি গেনিয়ে, আকাদেমি দে সিয়ঁাস, পারী, ১২ই ডিসেম্বর, ১৮৯৮, এই পুরস্কারটি তিনি পুনরায় পান ১১ই ডিসেম্বর, ১৯০০ এবং ১৪ই ডিসেম্বর ১৯০২ খৃষ্টাব্দে।

ফিজিক্সের জন্য নোবেল পুরস্কার (আঁরী বেকেরেল ও পিয়ের কুরীর সঙ্গে মিলিত ভাবে) ১৯০৩-এ।

প্রি ওসিরি, মঁসিয়ে ব্রান্‌লির সঙ্গে ভাগাভাগি ক'রে ৪ঠা জানুয়ারি ১৯০৪-এ সঁ্যাদিকা দে লা প্রেস পরিজিয়েন-এর কাছ থেকে লাভ করেন।

একটোনিয়ন পুরস্কার ৬ই মে, ১৯০৭, রয়াল ইন্সটিটিউট্ অব গ্রেট ব্রিটেন থেকে।

কেমিষ্ট্রির জন্য নোবেল পুরস্কার, ২৩শে এপ্রিল, ১৯১১।

এলেন রিচার্ডস্ রিসার্চ পুরস্কার, ২৩শে এপ্রিল, ১৯২১।

গ্রঁ্যা প্রি দিউ মার্কি দ'র্জ্যাতোই ১৯২৩, ব্রোঞ্জের পদকসহ এই পুরস্কার পান সোসিয়েতে দঁকুরাজমেঁা পুর লঁ্যাদিউস্ত্রি ন্যাসিয়োনাল থেকে ১৫ই মার্চ, ১৯২৪এ।

ক্যামেরন পুরস্কার—ইউনিভারসিটি অব এডিনবরা, ১৯৩১।

॥ মাদাম কুরীর পদক ও মানপত্রাদি ॥

বর্থেলো মেডাল (পিয়ের কুরীর সঙ্গে) ১৯০৩। মেডাল অব অনার অব দি সিটি অব পারী (পিয়ের কুরীর সঙ্গে) ১৯০৩।

মতিউচ্‌কি মেডাল, ইটালিয়ন সোসাইটি অব সায়েন্সেস্ (পিয়ের কুরীর সঙ্গে) ৮ই আগষ্ট, ১৯০৪।

ডেভি মেডাল অব দি রয়াল সোসাইটি অব লণ্ডন (পিয়ের কুরীর সঙ্গে) ৫ই নভেম্বর, ১৯০৩।

কুলমান গোল্ড মেডাল অব দি সোসাইটি অব ইণ্ডাষ্ট্রি অব লিলি, ১৯শে জানুয়ারি, ১৯০৮।

ইলিয়ট ক্রেসন্ গোল্ড মেডাল, ফ্রাঙ্কলিন ইন্সটিটিউট, ৬ই জানুয়ারি, ১৯০৮।

এলবার্ট মেডাল, রয়াল সোসাইটি অব আর্টস্, লণ্ডন, ৪ঠা জুলাই ১৯১০।

গ্রাণ্ড ক্রস্ অব দি সিভিল অর্ডার অব আলফোনসে অব স্পেন ১৯১৯।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন মেডাল, এমেরিকান ফিলসফিকাল সোসাইটি, ১৯২১।

জন্ স্কট্ মেডাল, এমেরিকান ফিলসফিকাল সোসাইটি, ১৩ই এপ্রিল ১৯২১।

গোল্ড মেডাল অব দি ন্যাশানাল ইন্সটিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সস্, নিউইয়র্ক, ১৯২১।

উইলার্ড গিবস্ মেডাল, এমেরিকান কেমিকাল সোসাইটি, শিকাগো ১৯২১।

অর্ডার অব মেরিট অব রুমানিয়া, ফার্স্ট ক্লাস, উইথ ওয়ারেণ্ট এণ্ড গোল্ড মেডাল, ৪ঠা আগষ্ট, ১৯২৪।

গোল্ড মেডাল অব দি রেডিওলজিকাল সোসাইটি অব নর্থ এমেরিকা, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯২২।

মেডাল অব দি নিউ ইয়র্ক সিটি ফেডারেশন অব উইমেন্স্ ক্লাবস্ ১৯২৯।

মেডাল অব দি এমেরিকান কলেজ অব রেডিওলজি, ১৬ই এপ্রিল, ১৯৩১।

॥ মাদাম কুরীর সম্মানার্থক উপাধির তালিকা ॥

অনরারি মেম্বার অব দি সেসিয়েতে এঁপেরিয়াল দেজ আমী দে সিয়াঁস্ ন্যাচুরে দঁএোপোলজি এ দেৎনোগ্রাফি, ১লা ডিসেম্বর, ১৯০৪।

অনরারি মেম্বার অব দি রয়াল ইন্সটিটিউশন অব গ্রেট ব্রিটেন, ৯ই মে, ১৯০৪।

ফরেন মেম্বার অব দি কেমিকাল সোসাইটি অব লণ্ডন, ১৮ মে, ১৯০৪।

করেস্পণ্ডিং মেম্বার অব দি ব্যাটাভিয়ান ফিলসফিকাল সোসাইটি, ১৯০৪।

অনরারি মেম্বার অব দি মেক্সিকান সোসাইটি অব ফিজিক্স, ১৯০৪।

অনরারি মেম্বার অব দি মেক্সিকান একাডেমি অব সায়েন্সেস্, ৪ঠা মে, ১৯০৪।

অনরারি মেম্বার অব দি ওয়ার্স সোসাইটি ফর দি এনকারেজমেণ্ট অব ইণ্ডাষ্ট্রি এণ্ড কমার্স, ১৯০৪।

করেস্পণ্ডিং মেম্বার অব দি আর্জেনটাইন সোসাইটি অব সায়েন্সেস্, ৬ই নভেম্বর, ১৯০৬।

ফরেন মেম্বর অব দি ডাচ্ সোসাইটি অব সায়েন্সস্, ২৫মে, ১৯০৭।

ডক্টর অফ ল'জ, ইউনিভারসিটি অব এডিনবরা, ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯০৭।

করেস্পণ্ডিং মেম্বর অব দি ইম্পিরিয়াল একাডেমি অব সায়েন্সস্, সেণ্ট্-পিটার্সবুর্গ, ২৯শে জানুয়ারি, ১৯০৮।

অনরারি মেম্বার, সোসাইটি অব ন্যাচারাল সায়েন্সস্, ব্রান্স্উইক্, ১৯০৮।

ডক্টর অব মেডিসিন্, ইউনিভারসিটি অব জেনেভা, ১৯০৯।

করেস্পণ্ডিং মেম্বার অব দি একাডেমি অব সায়েন্সস্, বোলোন্, ১৯০৯।

এসোসিয়েট্ ফরেন মেম্বার অব দি একাডেমি অব সায়েন্সস্, ক্র্যাকাও, ১৯০৯।

অনরারি মেম্বার অব দি ফিলাডেল্ফিয়া কলেজ অব ফার্মেসী, ১৯০৯।

করেসপণ্ডিং মেম্বার অব দি সায়েন্টিফিক্ সোসাইটি অব চিলি, ১৯১০।

মেম্বার অব দি এমেরিকান ফিলসফিকাল সোসাইটি, ২৩ শে এপ্রিল, ১৯১০।

ফরেন মেম্বার অব দি সুইডিশ রয়াল একাডেমি অব সায়েন্সস্, ১৯১০।

অনরারি মেম্বার অব দি এমেরিকান কেমিকাল সোসাইটি, ১লা মার্চ, ১৯১০।

অনরারি মেম্বার অব দি লণ্ডন সোসাইটি অব ফিজিক্স, ১৯১০।

অনরারি মেম্বার অব দি সোসাইটি ফর ফিজিকাল রিসার্চ অব লণ্ডন, ১৯১১।

ফরেন করেস্পণ্ডিং মেম্বার, পোর্টুগীজ একাডেমি অব সায়েন্সস্, ১৯১১।

ডক্টর অব সায়েন্সস্, ইউনিভারসিটি অব ম্যাঞ্চেস্টার, ২৪শে নভেম্বর, ১৯১১।

অনরারি মেম্বার অব দি বেলজিয়ান্ কেমিকাল সোসাইটি, ১৬ই এপ্রিল, ১৯১২।

কোলাবরেটিং মেম্বার অব দি ইম্পিরিয়াল ইন্সটিটিউশন্ অব এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন, সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, ১২ই এপ্রিল, ১৯১২।

মেম্বার অব দি সায়েন্টিফিক্ সোসাইটি অব ওয়ার্স, ১৯১২।

অনরারি মেম্বার ইন্ ফিলসফি অব দি ইউনিভারসিটি অব লেম্বার্গ, ১৯১২।

মেম্বার অব দি ওয়ার্স ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি, ১৯১২।

ডক্টর অব দি পলিটেক্নিক্ স্কুল, লেম্বার্গ, ১৯১২।

অনরারি মেম্বার, ভিল্না সোসাইটি অব দি ফ্রেণ্ডস্ অব সায়েন্সেস্, ১৯১২।

মেম্বার এক্সট্রা-অর্ডিনারি অব দি রয়াল একাডেমি অব সায়েন্সেস্ (ম্যাথ্-মেটিক্স্ এণ্ড ফিজিক্স সেকশন) আর্মস্টারডাম, ২১শে মে, ১৯১৩।

ডক্টর, ইউনিভারসিটি অব বার্মিংহাম, ১৯১৩।

অনরারি মেম্বার অব দি এসোসিয়েশন অব আর্টস্ এণ্ড সায়েন্সেস্ অব এডিনবরা, ১৫ই জানুয়ারি, ১৯১৩।

অনরারি মেম্বার অব দি ফিজিকো-মেডিকাল সোসাইটি অব দি ইউনিভারসিটি অব মস্কো, মার্চ, ১৯১৪।

অনরারি মেম্বার অব দি ফিলজফিকাল সোসাইটি অব কেম্ব্রিজ, ১৯১৪।

অনরারি মেম্বার অব দি সায়ন্টিফিক্ ইন্সটিটিউশন্ অব মস্কো, ১৯১৪।

অনরারি মেম্বার অব দি ইন্সটিটিউশন অব হাইজিন, লণ্ডন, ১৯১৪।

করেস্পণ্ডিং মেম্বার অব দি ফিলাডেল্ফিয়া একাডেমি অব ন্যাচারাল সায়েন্সেস্, ২২শে এপ্রিল, ১৯১৪।

অনরারি মেম্বার অব দি রয়াল স্প্যানিশ সোসাইটি অব মেডিকাল, ইলেক্ট্রোলজি এণ্ড রেডিওলজি, ২৫শে এপ্রিল, ১৯১৯।

অনরারি ডিরেক্টর, রেডিয়ম ইন্সটিটিউট অব মাড্রিড্, ৫ই জুলাই, ১৯১৯।

অনরারি প্রফেসর, ওয়ারস ইউনিভারসিটি, ১৯১৯।

মেম্বার, পোলিশ কেমিকাল সোসাইটি, ১৯১৯।

অর্ডিনারি মেম্বার, ড্যানিশ রয়াল একাডেমি অব সায়েন্সেস্ এণ্ড লেটার্স, ১৯২০।

ফরেন মেম্বার অব দি বোহেমিয়ান সোসাইটি অব লেটার্স এণ্ড সায়েন্সেস ১২ই জানুয়ারি, ১৯২০।

ডক্টর অব সায়েন্সেস্ অব ইয়েল ইউনিভারসিটি, ১০ জুন, ১৯২১।

ডক্টর অব সায়েন্সেস্ অব দি ইউনিভারসিটি অব শিকাগো, ১৮ জুলাই, ১৯২১।

ডক্টর অব সায়েন্সেস্ অব দি নর্থ-ওয়েস্টার্ণ ইউনিভারসিটি, ১৫ই জুন, ১৯২১।

ডক্টর অব সায়েন্সেস্ অব স্মিথ কলেজ, ১৩ই মে, ১৯২১।

ডক্টর অব দি উইমেন্স মেডিকাল কলেজ অব পেনসিলভেনিয়া, ২৩মে, ১৯২১।

ডক্টর অব সায়েন্সেস্ অব কোলাম্বিয়া ইউনিভারসিটি, ১লা জুন, ১৯২১।

ডক্টর অব ল'জ অব পিটসবুর্গ ইউনিভারসিটি, ৭ই জুন, ১৯২১।

ডক্টর অব ল'জ অব ইউনিভারসিটি অব পেনসিলভেনিয়া, ২৩ মে, ১৯২১।

অনরারি মেম্বার, বাফেলো সোসাইটি অব ন্যাচারাল সায়েন্সেস্, ১৬ই জুন, ১৯২১।

অনরারি মেম্বার, মিনারালোজিকাল ক্লাব অব নিউইয়র্ক, ২০শে এপ্রিল, ১৯২১।

অনরারি মেম্বার, নর্থ এমেরিকান রেডিওলজিকাল সোসাইটি, ১৯২১।

অনরারি মেম্বার অব দি এমেরিকান মিউজিয়ম অব ন্যাচারাল হিস্টরি, ১৯২১।

অনরারি মেম্বার অব দি নিউ জার্সি কেমিকাল সোসাইটি, ১৬ই মে, ১৯২১।

মেম্বার অব দি ক্রিশ্চিয়ানা একাডেমি, ১৮ই মার্চ, ১৯২১।

অনরারি লাইফ মেম্বার অব দি নক্স্ একাডেমি অব আর্টস এণ্ড সায়েন্সেস্, ১৮ই জুন ১৯২১।

অনরারি মেম্বার, আমেরিকান রেডিয়ম সোসাইটি, ২৯শে জুলাই, ১৯২১।

অনরারি মেম্বার, নরওয়েজিয়ান সোসাইটি ফর মেডিকাল রেডিওলজি, ১৫ই অক্টোবর, ১৯২১।

অনরারি মেম্বার অব এলিয়ঁা ফ্রাঁসে অব নিউইয়র্ক, ১০ই জুন, ১৯২১।

এসোসিয়েট্ মেম্বার, আকাদেমি গু মেডিসিন, পারী ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২২।

মেম্বার অনোরের দ্যু গ্রুপ আকাদেমিক্ রিউস্ গু বেলজিকে, ২২শে জানুয়ারি, ১৯২২।

অনরারি মেম্বার অব দি রুমানিয়ান সোসাইটি অব মেডিকাল হাইড্রোলজি এণ্ড ক্লিমাটোলজি, ১০ই জানুয়ারি, ১৯২৩।

ডক্টর অব দি ইউনিভারসিটি অব এডিনবরা, ৯ই জুলাই, ১৯২৩।

অনরারি মেম্বার, চেকোশ্লোভাকিয়ান ইউনিয়ন অব ম্যাথমেটিশিয়েন্স এণ্ড ফিজিসিস্টস্, ২০শে জানুয়ারি, ১৯২৩।

অনরারি সিটিজেন অব দি সিটি অব ওয়ারস্, ১৯২৪।

অনরারি মেম্বার অব দি পোলিস কেমিকাল সোসাইটি অব ওয়ারস্, ১৯২৪।

ডক্টর অব মেডিসিন অব দি ইউনিভারসিটি অব ক্রাকাও, ১৯২৪।

অনরারি সিটিজেন অব দি সিটি অব রিগা, ১৯২৪।

অনরারি মেম্বার অব দি সোসাইটি অব ফিজিক্ রিসার্চ অব এথেন্স, ১৯২৪।

অনরারি মেম্বার, মেডিকাল সোসাইটি অব লুবলিন, পোল্যাণ্ড, ১৯২৯।

মেম্বার, "পন্টিফিসিয়া টাইবারিনা", রোম, ৩১শে মার্চ, ১৯২৬।

অনরারি মেম্বার, কেমিকাল সোসাইটি, সাওপলো, ব্রেজিল, ১৯২৬।

করেসপণ্ডিং মেম্বার, ব্রেজিলিয়ন একাডেমি অব সায়েন্সেস্, ১৯২৬।

অনরারি মেম্বার অব দি সোসাইটি অব ফার্মেসী এণ্ড কেমিষ্ট্রি অব সায়োপলো প্রোজিন, ১৭ই জুলাই, ১৯২৬।

অনরারি মেম্বার অব দি ব্রেজিলিয়ান এসোসিয়েশন অব ফার্মসিস্ট্স্ ২৩শে জুলাই, ১৯২৬।

ডক্টর অব দি কেমিকাল সেক্শন অব দি পলিটেক্নিক্ স্কুল অব ওয়ারস, ১৯২৬।

অনরারি মেম্বার অব দি একাডেমি অব সায়েনসেস অব মস্কো, ১৯২৭।

অনরারি মেম্বার, একাডেমি অব সায়েন্সেস অব ইউ. এস. এস. আর., ১৯২৭।

অনরারি মেম্বার, ইন্‌টারস্টেট্‌ পোষ্ট গ্রাজুয়েট মেডিকাল এসোসিয়েশন অব নর্থ এমেরিকা, ১৯২৭।

অনরারি মেম্বার অব নিউজিল্যাণ্ড্‌ ইন্সটিটিউট্‌, ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭।

অনরারি মেম্বার, সোসাইটি অব দি ফ্রেণ্ড্‌স্‌ এণ্ড সায়েন্সেস্‌ অব পোজনোন্‌, পোল্যাণ্ড, ৬ই মার্চ, ১৯২৯।

ডক্টর অব ল' অব দি ইউনিভারসিটি অব গ্লাস্‌গো, ১৯২৯।

অনরারি সিটিজেন অব দি সিটি অব গ্লাস্‌গো, ১৯২৯।

ডক্টর অব সায়েন্সেস্‌ অব দি সেণ্ট্‌লরেণ্ট, ২৬ অক্টোবর, ১৯২৯।

অনরারি মেম্বার অব দি নিউইয়র্ক একাডেমি অব মেডিসিন, ১৯৩০।

অনরারি মেম্বার, পোলিশ মেডিকেল এণ্ড ডেণ্টাল এসোসিয়েশন অব এমেরিকা, অক্টোবর, ১৯২৯।

অনরারি মেম্বার, সোসিয়েতে ফ্রঁাসেস্‌দেস্‌ এঁভ্যাতএর এত স্যাভাঁ, ১৯৩০।

অনরারি প্রেসিডেণ্ট, সোসিয়েতে ফ্রঁাসেস্‌দেস্‌ এঁভ্যাতএর এ স্যাভাঁ, ১৯৩০।

অনরারি মেম্বার, ওয়ার্ল্ড লীগ ফর পিস্‌, জেনেভা, ১৯৩১।

অনরারি মেম্বার, এমেরিকান কলেজ অব রেডিওলজি, ১৬ই এপ্রিল, ১৯৩১।

ফরেন করেস্‌পণ্ডিং মেম্বার, মাড্রিড আকাদেমি অব একজ্যাক্ট ন্যাচারাল ফিজিকাল সায়েন্সেস, ২৫শে এপ্রিল, ১৯৩১।

মেম্বার ইম্পিরিয়াল জার্মান একাডেমি অব ন্যাচারাল সায়েন্সেস্‌, হাল, ১৯৩২।

অনরারি মেম্বার, সোসাইটি অব মেডিসিন, ওয়ারস্‌, ২৮শে জুন, ১৯৩২।

অনরারি মেম্বার, চেকোশ্লোভাকিয়ান্‌ কেমিষ্ট্রি সোসাইটি, ১৯৩২।

অনরারি মেম্বার, ব্রিটিশ ইন্সটিটিউট্‌ অব রেডিওলজি এণ্ড রঞ্জেন সোসাইটি, লণ্ডন, ১৯৩৩।

॥ শুদ্ধিপত্র ॥

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৮	৮	প্রাণপন	প্রাণপণ
৭৬	১২	পড়েই	পড়ে
১০৯	২	হতাশ	হতাশা
১২৬	১০	সল্লোতেই	সাল্লোতেই
১২৭	২৬	ভালোবাসে	ভালোবাসেন
১৩৫	৯	ম্লাভ	ম্লাভ
১৪৬	২৯	দিন রাত্রী	দিনরাত্রি
১৯০	১৩	কাঞ্চল তৈলে	কাঞ্চন তোলে
১৯২	৩	মঁসিয়ে এবং বাউটি	মঁসিয়ে বাউটি এবং
২০৯	২৭	বিতরাগ	বীতরাগ
২৬৫	৭	পঙ্খা	পথা
৩২৩	১৭	উদ্যোক্তরা	উদ্যোক্তারা
৩৪০	শিরোনামা	ইল সাঁত লুস	ইল স্যাঁ লুই
৩৪৭	১	মামাম	মাদাম
৩৪৭	৩০	মনীষিণীর	মনীষীর